পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

অনীশ দেব

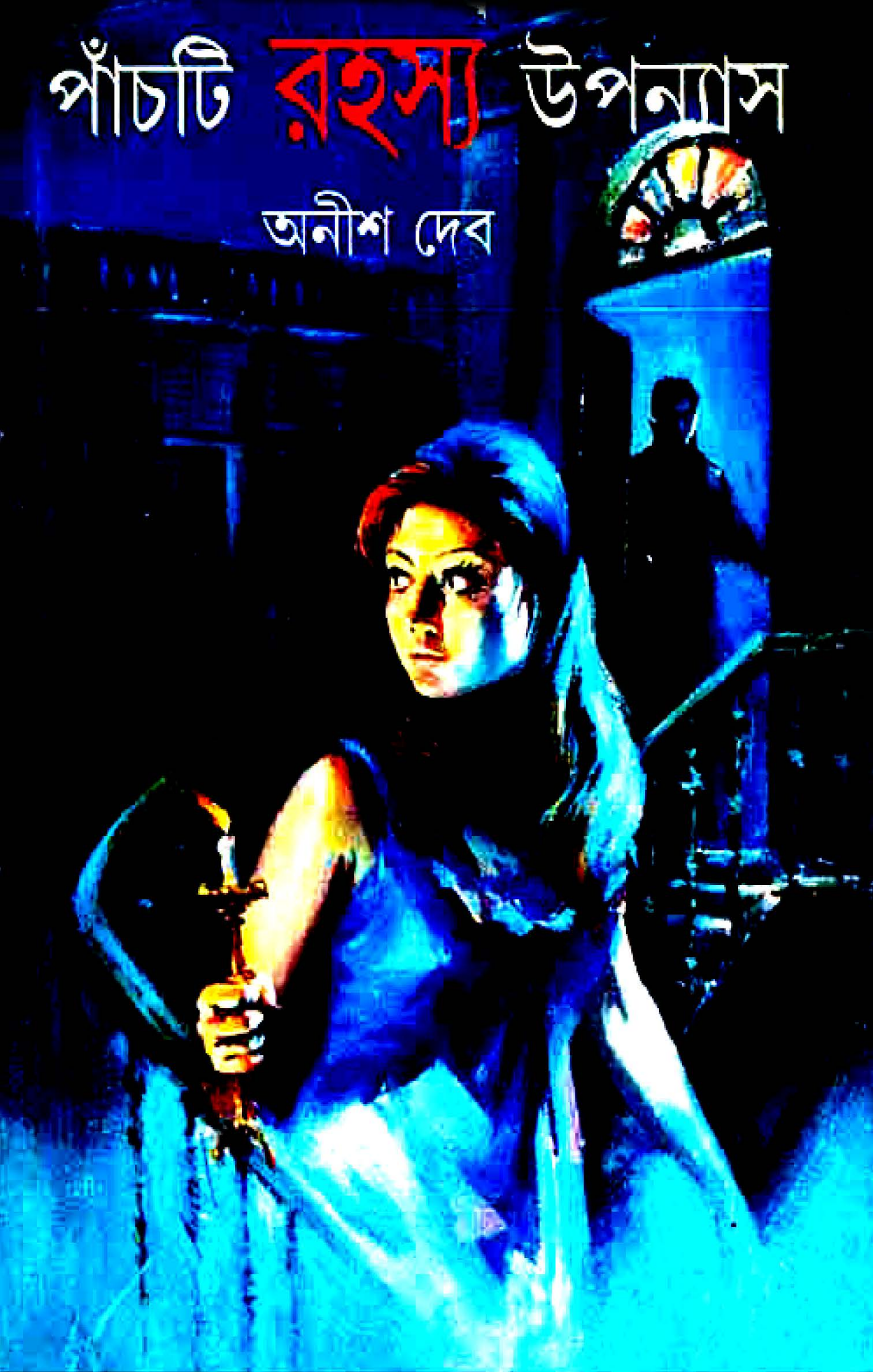

অনীশ দেব

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

সাপের চোখ	৯
তীরবিদ্ধ	১১১
সাক্ষী কেউ নেই	১৯৭
কিরাত আসছে	২৬১
গোলাপ বাগানে ঝড়	৩১১

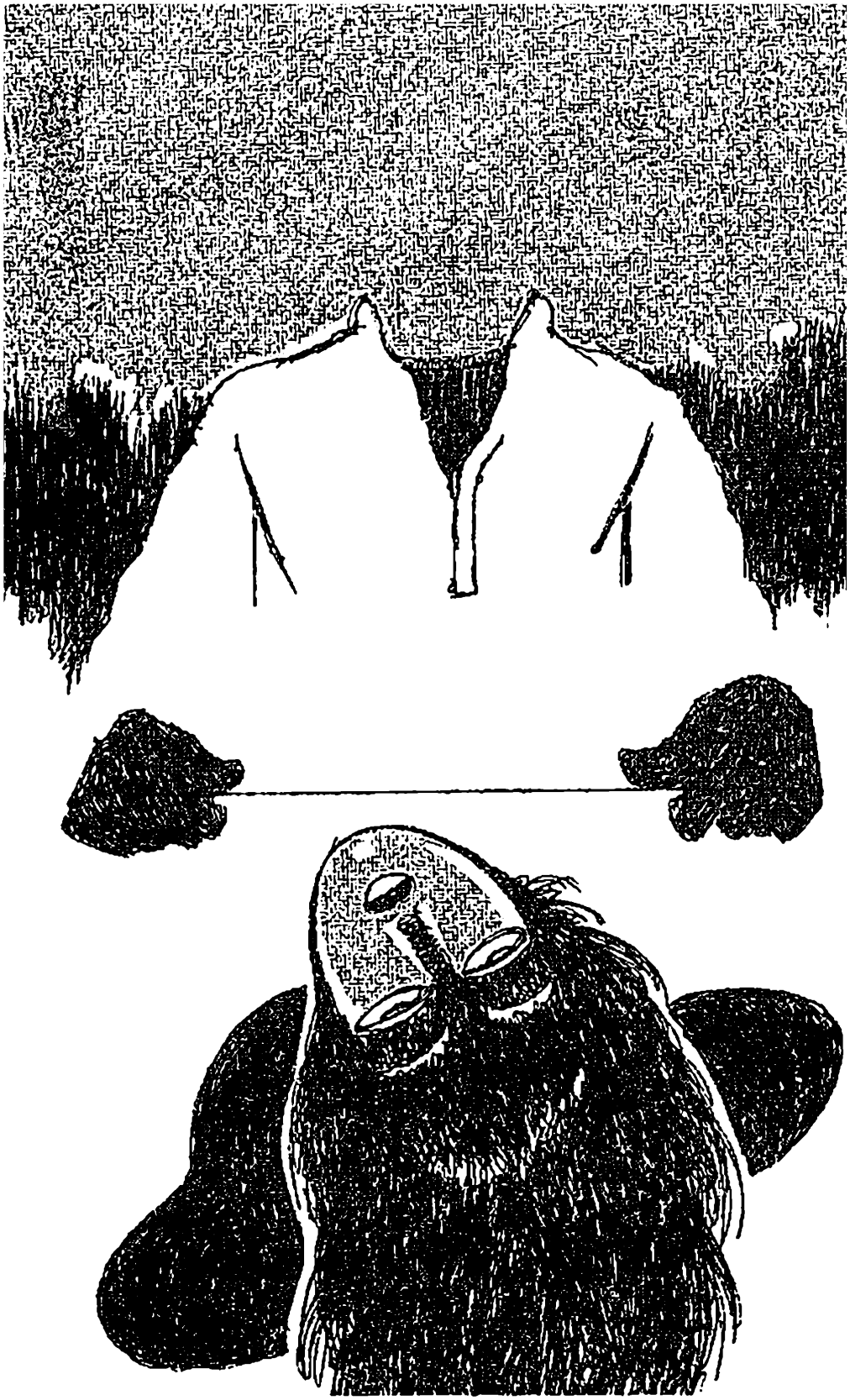

সাপের চোখ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূত্রপাত

ঘরটা আবছায়া অন্ধকার। কারণ ঘরের এক ও একমাত্র আলোর উৎস একটা অল্প শক্তির নীলাভ বাতি। অন্তত এই মুহূর্তে। ঘরের একমাত্র দরজা ও দুটো ছোট মাপের জানলা এখন বন্ধ। ফলে বদ্ধ বাতাসে সিগারেট ও মদের হালকা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। আরো অন্ধকারে নজর আরও তীক্ষ্ণ হলে চোখে পড়ে সিগারেটের টুকরোর ঠাসা অ্যাশট্রে ও পাশাপাশি নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক-কাটের মদের গেলাস। গেলাসের ঠোঁটে লিপস্টিক-চুম্বনের চিহ্ন। গেলাস ও অ্যাশট্রের ভার অসীম ধৈর্যে বহন করে দাঁড়িয়ে সুদৃশ্য এক গোলাপ-কাঠের টেবিল। টেবিলের পায়ার কারুকাজ আঁধারির ঘেরাটোপে এখন অদৃশ্য।

টেবিলের পাশেই অপরিপাটি বিছানা। বিছানার ওপর অপরিপাটি দুটো ফরসা শরীর। নীলচে আলোয় শরীর দুটোকে মনে হচ্ছে কেউটের ছোবলে আক্রান্ত, বিষাক্ত। ওদের সাম্প্রতিক শিথিলতা স্পষ্টভাবে বলে দেয়, কিছুক্ষণ আগেও ওরা উদ্দাম ছিল, উত্তাল ছিল, শারীরিক সংগ্রামে সাইক্লোন বইয়ে দিয়েছে সাদা চাদর ও নরম সাদা বালিশে সাজানো এই বিছানায়। মাথার ওপরে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় ঘুরে চলেছে সিলিং ফ্যান—উত্তপ্ত শরীর দুটোকে শীতল করে তুলতে যেন বদ্ধপরিকর।

এই প্রথম শরীর দুটোয় সামান্য নড়াচড়া দেখা দিল। হাত-পায়ের জট ছাড়িয়ে ওদের এতক্ষণ আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না, এখন ক্রমশ সে-জটিলতা সরে গিয়ে ওরা নিজস্ব অস্তিত্বে প্রকাশ পেল। আলস্যের 'উম—' শব্দ শোনা গেল মেয়েলি গলায়, এবং একই সঙ্গে ছায়াময় পুরুষটি বিছানায় উঠে বসল। অবিন্যস্ত সঙ্গিনীর পিঠে আলতো করে হাত বোলাল, তারপর ধীরে-ধীরে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল মেঝেতে।

খাটের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল, তার পরনে শুধু একটা অন্তর্বাস। আলো-আঁধারিতে মুখ-চোখের ভূগোল অস্পষ্ট। শ্লথ অথচ সতর্ক পায়ে সে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। দেওয়ালে গাঁথা আলোর সুইচে হাত রেখে একটু থমকাল। এখন যে-কাজ সে করতে চলেছে তাতে অসংখ্য উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন। সুতরাং একে-একে সবক'টা সুইচ 'অন' করে দিল সে। দুটো শক্তিশালী ফ্রস্টেড বাতি ও একটা টিউবলাইটের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের আনাচে-কানাচে। আলো-আঁধারি কেটে গিয়ে নির্লজ্জভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ল নগ্নতনু শয্যাবিলাসিনী। দুধসাদা এলোমেলো বিছানায় ও উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। শ্যাম্পু করা কাঁপানো চুল ছড়িয়ে আছে ফরসা পিঠে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে এখন স্পষ্ট দেখা গেল। ফরসা, ছিপছিপে পেশিবহুল চেহারা। বুকের ডানদিক থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে একটা লম্বা ক্ষতের দাগ। কাঁচাপাকা চওড়া গোঁফ। পরিষ্কার করে কামানো গাল দুটো সামান্য ভাঙা। কাঠবেড়ালির মতো চঞ্চল খুদে চোখ। স্বাভাবিকের তুলনায় কপালের বিস্তৃতি কম। আর

আগোছালো মাথার চুল ধবধবে সাদা। এই আশ্চর্য শেষ উপাদানটুকু লোকটার বয়েস সম্পর্কে ভুল ইঙ্গিত দেয়।

নইলে বলা যেতে পারে, তিরিশের অনভিপ্রেত দিকে সে পা দিয়েছে আনুমানিক আট বছর। এবং তার মুখে এক অদ্ভুত নিষ্পাপ সরলতা ছেয়ে রয়েছে।

লোকটা এবার পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল বিছানার কাছে। তাকিয়ে দেখল অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটির দিকে। তারপর বিছানার একপ্রান্তে তড়সড় করে রাখা নিজের পোশাক ধীরে-ধীরে পরতে শুরু করল।

বৈশিষ্ট্যহীন প্যান্ট, সাধারণ হাতকাটা গেঞ্জি ও কালো রঙের ফুলহাতা শার্ট। শার্টটা প্যান্টের ভেতর গুঁজে দিয়ে সে কোমরে বেঁধে ফেলল চওড়া খয়েরি বেল্ট। শব্দ করে দু-হাত ঘষে কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে নিল। তারপর বিছানা ঘুরে মেয়েটির নগ্ন শরীরের খুব কাছে এসে দাঁড়াল।

তার চোয়ালের হাড় শক্ত হল। মেয়েটির দিকে চোখ রেখেই প্যান্টের বাঁ-পকেট থেকে বের করে নিল মোটা চামড়ায় তৈরি একজোড়া ভারী কালো দস্তানা। আপনমনেই সে দাঁত বের করে হাসল। সারিবদ্ধ সুষম দাঁত ঝিকিয়ে উঠল উজ্জ্বল আলোয়। হাসতে-হাসতেই দস্তানাজোড়া হাতে পরে নিল লোকটা। যেন এ তার বহুদিনের অভ্যেস। তারপর মেয়েটির ফরসা পিঠে হাত রেখে রুক্ষভাবে নাড়া দিল।

প্রথমে অল্প, পরে আরও বেশি, নড়ে উঠল মেয়েটি। ওর ঠোঁট চিরে অস্বস্তির এক অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। মুখটা বারকয়েক ঘষল বালিশে। তারপর আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরল। চিত হল। কিন্তু চোখ খুলতে গিয়ে আলোর তীব্রতায় চোখ কুঁচকে ফেলল ও। ফলে নজর স্পষ্ট হল না। নইলে নিশ্চয়ই দেখতে পেত, বিছানার পাশে দাঁড়ানো লোকটার কালো দস্তানা পরা হাতদুটোর যেন মন্ত্রবলে জন্ম নিয়েছে একটা তার। তারটার একপ্রান্তে ছোট্ট সীসের বল ও সবুজ রেশমী সুতোর প্যাঁচ দেখে মনে হয় ওটা গিটারের তার। সম্ভবত নতুন কোনও সুরসৃষ্টির তাগিদে এখন উঠে এসেছে শিল্পীর হাতে।

আরও একবার রুক্ষ অস্থির ঝাঁকুনি পড়ল মেয়েটির শরীরে। এইবার ও পুরোপুরি চোখ মেলল। ঘুমের অতল থেকে ভাসতে-ভাসতে উঠে এল চেতনার জগতে। বিরক্তি ও বিস্ময় মুখে নিয়ে জড়ানো গলায় বলল ও, 'ওঃ—কী হল কী—!'

উত্তরে আবার এক অভদ্র ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি।

'শিট! হোয়াট দ্য হেল...' কথা বলতে-বলতে বিরক্তিভরে উঠে বসতে যাচ্ছিল মেয়েটি, কিন্তু তার আগেই সুপটু ঘোড়সওয়ারের মতো বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় একলাফে মেয়েটির শরীরে চেপে বসল লোকটা। পেটের ওপর বসে, শরীরের দু-পাশে দুটো পা দিয়ে যেন এক্ষুনি সে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে ভেপান্তরের দিকে, দু-হাতের বাঁধুনিতে গিটারের তার টানটান।

মেয়েটি এখন আধো চোখ মেলে বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওর রাতের প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে। লোকটার অদ্ভুত কার্যকলাপ যে ওকে ভীষণ অবাক করে দিয়েছে তা এখন স্পষ্ট বোঝা যায়। যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ মেয়েটি বুঝে ওঠার আগেই এক ক্ষিপ্র পাকে তারটা তৎপরভাবে জড়িয়ে গেছে ওর গলায়।

চিৎকার করতে হাঁ করল মেয়েটি। ওর আলজিভ পর্যন্ত দেখা গেল, কিন্তু গলা

BanglaBook.org

চিরে একটা অসম্পূর্ণ 'ওঁক—' শব্দ বেরিয়ে এল শুধু। কারণ দস্তানা পরা হাত দুটো ততক্ষণে তারটায় এক শক্ত গিঁট দিয়ে আসুরিক শক্তিতে টানতে শুরু করেছে। এবং সেই নিষ্ঠুর হাতের মালিক তখনও হাসছে।

এই অদ্ভুত আতঙ্ক, ঘৃণা ও বিস্ময় মেশানো অভিব্যক্তি তার দেখতে ভালো লাগে। সেইজন্যেই ঘরের সব আলো সে জ্বেলে দিয়েছে। ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে মেয়েটির। ঘুমন্ত অবস্থায় শাস্তি দিলে সেই শাস্তি অনেক কমজোরি হয়ে পড়ে। আনন্দ তৃপ্তিও অনেক কমে যায়। কিন্তু এখন? আঃ...কী সুন্দর! বিভিন্ন নিষ্ঠুর রেখা আঁকিবুকি কেটে ফেলেছে এই তরুণীর মুখে। বয়েস ওর বাড়িয়ে দিয়েছে বিশবছর। ফরসা দু-হাতে গলা আঁকড়ে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে তারের বাঁধন খুলতে, কিন্তু গলার নরম মাংসে তারটা কেটে বসায় সেটা মেয়েটির ধরাছোঁয়ার বাইরে, লুকিয়ে পড়েছে ওরই দেহে।

মেয়েটির নগ্ন শরীর তার ভারী শরীরের নীচে উথলে উঠছে আপ্রাণ চেষ্টায়। পাগলের মতো বিছানায় পা ছুড়ে ও জন্ম দিচ্ছে ভোঁতা শব্দের মিছিল। কিন্তু পুরুষ-শক্তির কাছে প্রথামতো পরাভিত হল নারী-শক্তি। মেয়েটির ছটফট করা শরীর ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। খোলা চোখদুটো পৌঁছে গেল বিশালতার সীমারেখায়। রক্তের উচ্ছ্বাস ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফরসা মুখে। ধীরে-ধীরে নেমে এল প্রশান্তি। মিলিয়ে গেল আতঙ্ক, ঘৃণা, বিস্ময় ও প্রতিরোধ। আবার আগের মতোই ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে চোখ খুলে। চিরকালের মতো।

উত্তেজনা ও তৃপ্তিতে থরথর করে কাঁপছে সাদা-চুল লোকটা। সারা মুখে ফুটে উঠেছে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। আলো পড়ে তার মুখ চকচক করছে। তীক্ষ্ণ চোখে সে খুঁটিয়ে দেখছে মেয়েটিকে। যেন প্রাণপণে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কী নাম এই মেয়েটির? মনের ভেতর সে হাতড়াতে লাগল অস্থিরভাবে। সুজি, মালবিকা, রীতা, রীনা? উঁহু, রীনা তো ওর নাম নয়? হতেই পারে না। সে তো তার মায়ের নাম!

'মা! মা-গো!' ডুকরে উঠল লোকটা। তার মা এখন কোথায়? কতদিন সে খুঁজছে, কিন্তু হদিশ পায়নি। এই পাপী পৃথিবী তার মাকে গ্রাস করেছে। যেমন গ্রাস করেছে এই নষ্ট মেয়েটাকে। হায়, পৃথিবী, তুমি কি নিষ্পাপ হতে পারো না?

নিস্পন্দ দেহটা ছেড়ে বিছানা থেকে নেমে এল লোকটা। মেয়েটির চোখ এখন শনশন করে ঘুরে চলা পাখার দিকে স্থির। ওর দিকে কিছুক্ষণ দেখল সে। ইস, সুন্দর মুখটা এখন কী বিশ্রী দেখাচ্ছে! নিখুঁত কবিতার ছন্দপতনের মতো লিপস্টিক ঘষা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে টুকটুকে লাল জিভের ডগাটা বেরিয়ে রয়েছে বাইরে। ওর নগ্ন শরীরে একমাত্র পোশাকটা এই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল। গলায় সোনার চেনে বাঁধা ক্রুশবিদ্ধ যীশু বিদ্রোহী দুই কাঞ্চনজঙ্ঘার ফাঁকে আশ্রয় পেয়ে মেয়েটির আত্মা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যীশু করুণাময়। পাপীদের আত্মাকে শান্তি দেন।

বুকের ভেতর হিংস্র নেকড়ের দাপাদাপি নিয়ে কালো জামার বুকপকেট থেকে আকাশি রুমাল বের করল সে। কপালের ঘাম মুছল দ্রুতহাতে। চকিতে চারপাশে চোখ বুলিয়ে ঘরের ভিতরে বিক্ষিপ্তভাবে পায়চারি শুরু করল। কী যেন এখন করতে হবে তাকে? চিন্তাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

রুমাল পকেটে রেখে থমকে দাঁড়াল সে। নজর পড়ল সুদৃশ্য আয়না লাগানো

BanglaBook.org

ড্রেসিং টেবিলের দিকে। বিছানার মুখোমুখি বিপরীত দেওয়াল ঘেঁষে ড্রেসিং টেবিলটা দাঁড় করানো। টেবিলে রাখা অসংখ্য প্রসাধন সামগ্রীর ভিড়ে মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা লিপস্টিকটা তার সহজেই নজরে পড়ল।

এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিল। সোনালি কেসে ভরা লিপস্টিকের ওপর সুন্দর মনোগ্রামে লেখা : 'কিস মি'। নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে লিপস্টিকের গায়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে সশব্দে চুমু খেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শয্যা-পতিতার দিকে। মনে-মনে ভাবল, প্রসাধনের অভাবে মুখটার সৌন্দর্য কীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

সুতরাং নিশ্চিত পদক্ষেপে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল সে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর খোলা চোখের দিকে। তারপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'মা—মা-মণি, না সাজলে তোমাকে যে মানায় না...।'

অদ্ভুত এক অনুভূতি হঠাৎই টের পেল লোকটা। তার বুক ঠেলে যেন এক দলা-পাকানো কান্না উঠে আসছে।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে আবার একসময় ফিরে এল সে। লিপস্টিকটা রাখতে গিয়ে লেসের ঝালর দেওয়া আয়নার কাচে চোখ পড়ল হঠাৎই। থমকে গেল মাঝপথে। অপলকে দেখতে লাগল নিজের খুব-চেনা মুখটাকে। এই মুহূর্তে কেমন যেন অচেনা লাগছে। কে তুমি? তোমার নাম কী?

নানারকম মুখভঙ্গি করে আয়নার প্রতিবিম্বে সেগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল লোকটা। যেন নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশের পারদর্শিতার চরম পরীক্ষা নিচ্ছে।

হঠাৎই তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল বোবা কান্না। থরথর করে কেঁপে উঠল পেশিবহুল শরীরটা। ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল কান্নার দমকে। রুমালটা আবার বের করে নিজের মুখে গুঁজে দিল সে। কান্নার যে-শব্দ বেরিয়ে আসতে চাইছিল, সেটা পালটে গেল অস্ফুট গোঙানিতে। ধারালো দাঁতে রুমালটা কামড়ে ধরে ধীরে-ধীরে বসে পড়ল লোকটা। চঞ্চল চোখ আয়নায় স্থির। ঝাপসা। দু-গাল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুর ঢল। মনের সমস্ত যন্ত্রণা, কষ্ট যেন তরল ধারায় বহতা নদী হয়ে বেরিয়ে আসছে শরীরের বাইরে।

রুমালটা নিয়ে চোখ মুছতে চাইল সে। টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল আয়নার মুখোমুখি। লিপস্টিকটা তুলে ধরে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর লেসের ঝালর একপাশে সরিয়ে পরিষ্কার কাচে লিপস্টিক দিয়ে লিখতে শুরু করল। অক্ষরগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে চাইছে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় প্রথম অক্ষরটা গোটা-গোটা হরফে লিখতে পারল সে। তারপর লিখতে আর কোনও অসুবিধে হল না।

লেখা শেষ করে লিপস্টিকটা ড্রেসিং টেবিলের জায়গামতো রেখে দিল সে। চোখের ধারা এখনও অকৃপণ। রুমাল দিয়ে আবার মুখ-চোখ মুছে নিল। বিক্ষিপ্তভাবে তাকাল চারপাশে। তারপর বিছানায় গিয়ে মেয়েটির ছড়ানো পায়ের কাছে বসল। তার শরীর এখনও অভ্যন্তরীণ মন্থনে কাঁপছে। সুতরাং শান্ত হওয়ার সময় চাই।

ঘন্টির মিহি তীক্ষ্ণ শব্দে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল সাদা চুল লোকটা। কে? পলকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নজর ছুটে গেল ঘরের দরজার দিকে। তখনই সে বুঝতে পারল শব্দটা কোথা থেকে আসছে। ড্রেসিং টেবিলের ডান প্রান্তে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

রয়েছে একটা ছোট্ট রুপোলি টেবিল-ঘড়ি। ঘড়িতে এখন কাঁটায়-কাঁটায় সকাল ছ'টা। হয়তো রাতে কেউ অ্যালার্ম দিয়েছিল, এখন সময় হতেই বেজে উঠেছে।

অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল সে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। নিজেকে দ্রুত পরিপাটি করে নিল। টেবিল থেকে একটা মোটা দাঁতের চিরুনি তুলে নিয়ে মাথা আঁচড়ে ঠিক করতে চাইল।

হঠাৎই লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠল। চিরুনিটা একপলক দেখে আবার রেখে দিল জায়গামতো। তখনই তার নজরে পড়ল আয়নার লেখাটা। সারা শরীরে যেন লজ্জা ও অপমানের বিদ্যুৎ খেলে গেল। উজ্জ্বল আলোয় লিপস্টিকের লাল অক্ষরগুলো যেন নিয়ন সাইনের মতো জ্বলছে। এ কী লিখেছে সে? ছি, ছি! অন্যায়?! একে কি অন্যায় বলে? রুমালটা নিয়ে এলোমেলো হাতে উত্তেজিতভাবে লেখাগুলো মুছতে শুরু করল লোকটা। সারা আয়নায় ছড়িয়ে গেল লিপস্টিকের লাল রঙ। হরফগুলো একেবারে নষ্ট না হলেও আংশিক ঢাকা পড়ল লাল রঙের কুয়াশায়। লিপস্টিক মাখা রুমালটা নিয়ে এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল লোকটা। তারপর সেটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল খাটের নিচে। ব্যস্তভাবে দিশেহারা চোখে দেখল চারপাশে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বিছানার মাথার দিকে দেওয়ালে খোদাই করা জানলার দিকে। পরদা সরিয়ে খুলে দিল বন্ধ জানলার পাল্লা।

আকাশ মেঘলা থাকায় এখনও রোদ ফোটেনি। গরাদহীন খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ছুটে এল এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া। পৃথিবীর চোখে প্রত্যূষের আলস্য। কিন্তু অনলস পরিশ্রমী চারটে মাছি জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। ইতস্তত উড়ে বেড়াতে লাগল।

যথাক্রমে আয়না ও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল লোকটা। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। দরজা টেনে আবার বন্ধ করে দিল। হাতের দস্তানাজোড়া খুলে পকেটে ভরে নিল সে! তারপর সতর্ক অথচ স্বাভাবিক পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

এদিকে ঘরের ভেতরে প্রথম মাছিটা তখন বসে পড়েছে মেয়েটির খোলা চোখে।

এক

ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে ক্রি স্কুল স্ট্রিটে বাঁক নিতেই সময় লেগে গেল দশমিনিট। কারণ সময় এখন এগারোটা। রাস্তায় গাড়ি ও পথচারীর সংখ্যা শীর্ষবিন্দুতে। সুরেশ নন্দা জিপের পিছনের সিটে বসে ছিল, আমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'কে বলে অ্যামেরিকায় গাড়ি সবচেয়ে বেশি!'

'কে বলে চিনের লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি!' আমি খাকি উর্দি পরা ড্রাইভার ইন্দ্রপাল দুবের পাশে বসে ছিলাম, সুরেশের দিকে মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলাম। এবং আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম শব্দ করে। যদিও পরিস্থিতি ও সময় হাসি-উপযোগী নয়। কারণ একটু আগেই খবর পেয়েছি ক্রি স্কুল স্ট্রিটে একটি মেয়ে খুন হয়েছে, আর আমরা এখন চলেছি সেই অকুস্থল অভিমুখে। কিন্তু আমাদের পুলিশি জীবনে যদি হাসির উপযুক্ত

BanglaBook.org

সময় খুঁজতে হয় তাহলে চিরটা কাল আমাদের রামগরুড়ের ছানা হয়েই কাটিয়ে দিতে হবে। তবে মুখে হাসলেও মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে একটু আগের ঘটনা। দুর্ঘটনার খবরটা নিয়ে টেলিফোনটা যখন এল।

ও-সি অমিতাভ দত্তের ঘর থেকে আমার ডাক এল ঠিক সাড়ে দশটায়। বিভিন্ন কাজের সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া লালবাজারে এক আদর্শ নিদর্শন। তিনতলায় আমার ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে গোটাচারেক ঘর পেরোলেই অমিতাভ দত্তের চেম্বার। বাইরের নামের ফলকটা সদ্য নতুন রঙে রাঙানো হয়েছে। হাতের সিগারেটটা বারান্দার এককোণে ছুড়ে ফেলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বহুদিনের পরিচিত দৃশ্য আরও একবার চোখে পড়ল।

সাবেকি ছাঁদহীন টেবিলের ওপারে বসে অমিতাভ দত্ত। কাঁচাপাকা চুল। সরু ফ্রেমের চশমা। চেহারা পদাধিকারের তুলনায় ছোটখাটো। একচিলতে কাঁচাপাকা গোঁফ বাহান্ন বছর বয়েসটাকে অন্তত দু-বছর কমিয়ে দিয়েছে। আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'বসুন—।'

বসলাম। টেবিলের আসবাবগুলো দেখতে-দেখতে অপেক্ষায় রইলাম। ও-সির ডাক যখন পড়েছে খবরটা যে খুনের তাতে সন্দেহ নেই। কে খুন হল আজ সাত-সকালে?

জবচনবী ফাইলের গাদা একপাশে সরিয়ে একটা কলম ও একটা নতুন ফাইল তুলে নিলেন দত্ত। সামনের সাদা প্যাডে পেনের আঁচড় কাটতে-কাটতে বললেন, 'বরাট, একটু আগেই একটা অ্যাংলো মেয়ে খুন হয়েছে। খবরটা যে দিয়েছে সে নিজের পরিচয় ভাঙতে চায়নি, তবে পুরুষের গলা।' হাতের ফাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আরও বললেন, 'এটা নিন। আপনার হাতে এখন অন্য কী কেস রয়েছে—মোটামুটি ইম্পর্ট্যান্ট?'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'নারকেলডাঙার দুজন ওয়াগন ব্রেকার খুনের কেসটা। সব নেতারাই এখন ওদের পলিটিকাল কালার দেওয়ার চেষ্টা করছে—।'

'এই কেস থেকে আপনাকে ছুটি দিলাম। সামন্তকে বলব ওটা হ্যান্ডল করতে। আপনি এটা নিয়ে লেগে পড়ুন। লোকাল থানা এতে ইন্টারফিয়ার করবে না। কার্স্ট রিপোর্টটা আমাকে কাল সকালে দেবেন। এস-আই নন্দাকে সঙ্গে নিতে পারেন, আর ফটোগ্রাফার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, এম-ও, সবাইকে ইমিডিয়েটলি ইনফর্ম করুন। পাবলিক কেঅস সামলাতে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে অলরেডি এস-আই চৌধুরী চারজন কনস্টেবল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে।' একটু ভেবে অমিতাভ দত্ত আরও যোগ করলেন, 'আসলে কথা কী জানেন, ওই এলাকায় খুনের ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সুবিধের ঠেকছে না। ও-কে। বেস্ট অফ লাক।'

প্রসঙ্গ শেষ। অতএব ফাইল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বুঝলাম, আর কোনও জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় ও-সি দত্ত অকুস্থলে যেতে প্রস্তুত নন।

করিডরে এস-আই তালুকদারের সঙ্গে দেখা হতেই সুরেশ নন্দা কোথায় গেছে জিগ্যেস করলাম। জানতে পারলাম, ও ব্যালিস্টিক সেকশানে গেছে একটা ফায়ার-আর্মস-এর এক্সপার্ট রিপোর্ট আনতে। সুতরাং নিজের ঘরে ফিরে এসে ফাইলটা টেবিলে রেখে পুরোনো স্টিলের আলমারি খুলে হোলস্টার সমেত ০.৩৮ পুলিশ-স্পেশালটা বেঁধে নিলাম কোমরে। তারপর টেলিফোন তুলে খবর দিলাম ফটোগ্রাফার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট ও

BanglaBook.org

মেডিক্যাল অফিসারকে। জানিয়ে দিলাম ও-সির নির্দেশ। অবশেষে চেয়ারে পা এলিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম সুরেশ নন্দার।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল এস-আই সুরেশ নন্দা। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রঙ কালো। দারুণ স্বাস্থ্য। বড়-বড় চোখে এক অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব যেন চিৎকার করে বলছে : জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...।

সরল মনের মেজাজি ছেলে সুরেশ, চাকরি-সংক্রান্ত কোনও রাজনীতিতে থাকে না। বিভিন্ন বই-টই পড়ার ঝোঁক আছে। আবার সন্ধের দিকে অফ ডিউটির সময়ে দাদি বালসারার ক্লাবে মার্শাল আর্ট শিখতে যায়। এ-খবরটা প্রথম যেদিন পাই সেদিন ওকে বলেছিলাম, 'তোমার গায়ে এমনিতেই মোষের মতো জোর। তার ওপর মার্শাল আর্ট শিখলে কোনও মেয়ে আর তোমাকে বিয়ে করবে না। কে-ই বা পালোয়ানের বউ হতে চায়, বলো?'

সুরেশ নন্দা হেসে বলেছে, 'সংস্কৃতে আছে না, কা তব কান্তা...। বিয়ে আমি করছি না।'

সুরেশ ঘরে ঢুকেই বলল, 'তালুকদারের কাছে খবর পেয়ে আসছি। কী ব্যাপার?'

আমি চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সংক্ষেপে বললাম, 'মার্ডার। লিলি জনসন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট। অতএব ইমার্জেন্সি।'

তৈরি হয়ে দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম হোমিসাইড স্কোয়াড ছেড়ে। ট্রান্সপোর্ট ডিভিশন থেকে জিপের নম্বর নিয়ে চলে এলাম একতলার চত্বরে। ইন্দ্রপাল দুবে লাল-সাদা জিপ নিয়ে তৈরি ছিল, আমরা উঠে বসতেই স্টার্ট দিল।

দুবেজির পাশে বসে আমি বললাম, 'জলদি—ফ্রি স্কুল স্ট্রিট,' তারপর জিপের পেছনের সিটে বসা সুরেশের দিকে তাকালাম, 'আর সবাই গিয়ে অকুস্থল তছনছ করার আগেই আমি বডি দেখতে চাই।'

'বডি নয়, ডেডবডি।' হেসে বলল সুরেশ।

আমরা রওনা হলাম।

ও-সি দত্তর ফাইল থেকে জেনেছি, বাড়ির নম্বর সাতান্ন। কিন্তু কুড কর্পোরেশনের অফিসের সামনে পৌঁছেই বুঝলাম, নম্বরের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, দূরে চোখে পড়ছে, একটা কালচে-নীল পুলিশ ভ্যান ও ইতস্তত সরব আলোচনায় মগ্ন জনতার জটলা।

রিপন স্ট্রিট ক্রসিংয়ের কাছাকাছি পৌঁছতেই অকুস্থলের ইশারা পেলাম। পুলিশ ভ্যানটা রাস্তার বাঁ-দিকে দাঁড় করানো থাকলেও কৌতূহলী জনতার ভিড় উপচে পড়ছে রাস্তার ডানদিকে একটা সরু গলির মুখে। দুজন কনস্টেবল সেখানে ভিড় সামলাতে ব্যস্ত।

ইন্দ্রপাল দুবে জিপটা ঘুরিয়ে রাস্তার ডানদিকে গলিটার ঠিক মুখে দাঁড় করাল। সঙ্গে-সঙ্গে ভিড়ের একটা অংশ এসে আমাদের গাড়ি ছেঁকে ধরল। আমি ও সুরেশ ভিড় সরিয়ে নেমে পড়লাম। একজন কনস্টেবল সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল, সেলাম ঠুকে বলল, 'আইয়ে স্যার, চৌধ্রিসাব অন্দর হ্যায়—।'

গলিটা চওড়ায় ফুটচারেক হবে। ঢুকবার মুখে ডানদিকে একটা রেডিয়ো, টিভি, রেকর্ড-প্লেয়ারের শো-রুম, আর বাঁ-দিকে একটা চিনে লন্ড্রি। বর্তমানে দুটো দোকানের ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। তাদের কৌতূহলী চোখ জনতার ভিড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁ-দিকের লন্ড্রির নীল ফ্রক পরা দুটো চিনে মেয়ে এমনভাবে সবাইকে

BanglaBook.org

দেখছে যেন বার-বার জামাকাপড় ময়লা হয়ে লন্ড্রিতে দেওয়ার সময় হয়েছে, তাদের নাম টুকে নেবে। আর ডানদিকের দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে পানের রসে ঠোঁট রাঙানো এক বিশালবপু কালো কুচকুচে ভদ্রলোক, হয়তো দোকানের মালিক হবে, যে-নজরে সবার মুখ খুঁটিয়ে দেখছে, তাতে মনে হতে পারে সে বহুদিনের হারানো খাতককে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কনস্টেবলটি ভিড় ঠেলে, 'হট যাও! হট যাও!' বলতে-বলতে পথ করে এগিয়ে চলল। আমি ও সুরেশ নন্দা তাকে নীরবে অনুসরণ করলাম। যেতে-যেতে সুরেশকে চাপা গলায় বললাম, 'চোখ-কান খোলা রেখো!'

উত্তরে ও ছোট্ট করে বলল, 'হুঁ—।'

গলিটা মাটি-বাঁধানো। এখানে ওখানে ইটের টুকরো দাঁত উঁচু করে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। দু-পাশে দুটো বিশাল বাড়ির নোনাধরা বালিপ্রধান সিমেন্টের দেওয়াল। কোথাও-কোথাও সিমেন্টের আস্তর সরে গিয়ে ভেজা ইট বেরিয়ে পড়েছে। চোখ তুলে ওপরে তাকালে দেখা যায় কয়েকটা ছোট-ছোট জানলা ও রোদের পালিশ দেওয়া একচিলতে আকাশ। দশ গজ মতো এগোতেই বাঁ-দিকের একটা ছোট দরজা দেখিয়ে দিল কনস্টেবলটি, বলল, এটাই সেই অকুস্থলের দরজা এবং এস-আই চৌধুরী ওপরে তিনতলায় আছেন।

বাড়িটার নম্বর যে সাতান্ন তার প্রমাণ দরজার বাঁ-দিকে নোনা ধরা দেওয়ালে মরচে ধরা পেরেকে গাঁথা রঙচটা টিনের নম্বর প্লেট। দরজার রঙ এককালে সবুজ ছিল, এখন কালো হতে চলেছে। এবং কিছু সময় ও নাড়াচাড়া দিলে দরজাটা যে দেওয়ালে বসানো ফ্রেমসমেত বেরিয়ে আসবে সে প্রতিশ্রুতিও স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। কনস্টেবলকে দরজায় মোতায়েন থাকতে বলে আমি আর সুরেশ ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, বাঁ-দিকের দেওয়ালে, সিঁড়ির নীচে, একটা চিঠির বাক্স লাগানো রয়েছে। সুরেশকে বললাম, দেখে নিতে, বাক্সের ওপরে কারও নাম লেখা আছে কি না। ও অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে কী যেন দেখল, তারপর বলল, 'নাম একসময় ছিল, এখন উঠে গেছে। শুধু পদবিটুকু পড়া যাচ্ছে—আয়ার।'

সামনেই একটা ধাপ উঠলে মূল সিঁড়িটা শুরু হয়েছে বাঁ-দিক থেকে। সিঁড়ির মুখেই ডানদিকে একটা দরজা। তালাবন্ধ। একটা নেমপ্লেটে কাঁচা হাতে ইংরেজি অক্ষরে লেখা রয়েছে 'স্টোর'। তালাটা একবার টেনে দেখলাম। বন্ধ। হাতে কিছুটা ধুলো লেগে গেল।

সিঁড়ির প্রথম ল্যান্ডিংয়ে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করছে দেওয়ালে খোদাই করা একজোড়া জালহীন ঘুলঘুলি। ফলে চড়ুইপাখি বাসা বেঁধেছে। কিন্তু দোতলায় পৌঁছে দেখলাম, সিলিং থেকে একটা উলঙ্গ বাল্‌ব ঝুলছে এবং এই দিনের বেলাতেও সেটা জ্বেলে রাখা হয়েছে। মিহি মেয়েলি কথাবার্তার টুকরো একটু আগেই কানে এসেছিল, এখন তার উৎস খুঁজে পাওয়া গেল।

দোতলায় সিঁড়ির মুখেই ডানদিকের ফ্ল্যাটের দরজাটা হাট করে খোলা। একটু ভেতরে দাঁড়িয়ে জনা তিন-চারেক মেয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কী যেন আলোচনা করছে। আমি আর সুরেশ ওদের দৃষ্টিপথে আসতেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওরা চুপ করে গেল। ভয় মেশানো চোখে দেখতে লাগল আমাদের।

BanglaBook.org

ওদের কারও পরনে গাউন, কারও পরনে নাইটি। বিধ্বস্ত প্রসাধনে মুখের চেহারা একই ডালে কয়েক বছর ধরে ফুটে থাকা গোলাপের মতো সতেজ।

আমাদের থমকে দাঁড়াতে দেখে একজন বলে উঠল, 'তিনতলায়, ইন্সপেক্টর।'

সুরেশ নন্দা হেসে জবাব দিল, 'থ্যাঙ্ক য়ু মিস।'

আমরা তিনতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা দিলাম। লক্ষ করলাম, দোতলায় বাঁ-দিকেও একটা ফ্ল্যাটের দরজা দেখা যাচ্ছে। কে থাকে এই ফ্ল্যাটে? মনে-মনে হাসলাম : কালই ইহার সঠিক উত্তর দিবে।

তিনতলায় এসে দোতলার মতোই দু-দুটো ফ্ল্যাটের সম্মুখীন হলাম। একটা ডানদিকে আর অন্যটা বাঁ-দিকে। কিন্তু ডানদিকের দরজায় মোতায়েন কনস্টেবল ও অপেক্ষমাণ সাব-ইন্সপেক্টর চৌধুরী খোলাখুলি জানিয়ে দেয় অকুস্থল কোনটা।

আমাদের দেখে 'আসুন স্যার...' বলে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল চৌধুরী : 'সিন অফ দ্য ক্রাইমে আপনারাই প্রথম। আমি ভেতরে যাইনি।'

চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম নীচে যেতে। জনতার ভিড়ে বা আশপাশের বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোনও দরকারি সূত্র পাওয়া যায় কি না তার খোঁজ করতে। একজন কনস্টেবল যেমন আছে তেমনই ফ্ল্যাটের দরজায় থাকুক।

চৌধুরী সিঁড়ি নেমে রওনা হলে আমি আর সুরেশ সবুজ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। আগেই লক্ষ করেছি, দরজার পাশে কলিং বেলের বোতাম ও ডান পাল্লায় বসানো 'ম্যাজিক আই' : বন্ধ দরজার ভেতর থেকে বাইরের লোককে দেখার জন্যে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলাম। এসব ক্ষেত্রে কোনও আঙুলের ছাপ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে দরজার স্বাভাবিক অংশে হাত না দিয়ে খুব ওপরে বা খুব নীচে হাত দিয়ে দরজা ঠেলে খোলা বা বন্ধ করা হয়। আমিও তাই করেছি। তখন বুঝিনি, এসব সতর্কতা নিষ্প্রয়োজন ছিল।

প্রথম নজরেই আমার বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। কয়েক মুহূর্ত সময় নিলাম শরীরের শীতলতা কাটাতে। আমার চোখের সামনে যে-দৃশ্য উপস্থিত, তা আমার আঠারো বছরের পুলিশি-জীবনে অভূতপূর্ব। এবং অভূতপূর্ব থাকলেই বোধহয় ভালো হত।

ঘরের প্রতিটি আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড়সড় ডাবল-বেড। আধুনিক ছাঁদে তৈরি। খাটের ওপরে পাতা নরম সাদা বিছানা এলোমেলো বিস্রস্ত। আর সেই অগোছালো বিছানায় পড়ে থাকা লিলি জনসন নামে মেয়েটি বিধ্বস্ত। ওর ধ্বংসস্তূপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আমার শিরদাঁড়ায় অতি চুপিসাড়ে হিলহিলে কালনাগিনীর চলাফেরা শুরু হল। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম লিলির বিছানার কাছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখি সুরেশ অবাক নজরে আমাকে দেখছে।

দুটো ফরসা সুঠাম পা দু-পাশে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে ছড়ানো। একটা হাত টানটান, অন্যটা বিছানার পাশ থেকে ঝুলছে। সারা শরীরে একটা অদ্ভুত কালো ছায়া ওকে মলিন করে দিয়েছে। এ ছাড়া 'বডি' কিছুটা ফুলেও উঠেছে। পাখার হাওয়ায় শ্যাম্পু করা চুলের একটা গুচ্ছ কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

না, এসব দেখে আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠেনি। আমি ভয়

BanglaBook.org

পেয়েছি, চমকে গেছি, লিলির মুখটা দেখে।

ওর আতঙ্কবিকৃত মুখে রক্তপলাশের তাণ্ডব। শুধু চোখের চারপাশটা ছাড়া সারাটা মুখ কেউ লিপস্টিক ঘষে লালে লাল করে দিয়েছে। ফাঁক হয়ে থাকা দু-ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলোকে চিনে নিতে কষ্ট হয়, কারণ লিপস্টিক-বিপ্লব থেকে ওরাও রেহাই পায়নি।

লিলির খোলা চোখদুটো সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে। কষ বেয়ে বেরিয়ে এসেছিল রক্তের রেখা। এখন শুকিয়ে গেছে। গলায় ডানদিক ঘেঁষে শক্ত করে গেঁট দেওয়া একটা তার। তারের আঁকাবাঁকা প্রান্ত দুটো বেরিয়ে থাকায় গেঁটটার অবস্থান আমি অনুমান করেছি মাত্র। নইলে গোটা তারটা টানের চাপে পুরোপুরি গলার মাংসে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গলার বাকি অংশটা ভীষণ ফুলে উঠেছে। দু-এক জায়গায় চোখে পড়ছে কালচে রক্তের দাগ।

সুরেশের মতো সাহসী ছেলেও 'হরিবল্' বলে অন্যদিকে চোখ ফেরাল। কিন্তু আমি তাকিয়েই রইলাম। আমার হৃৎপিণ্ড এক অজানা হিমেল হাওয়ায় কেঁপে উঠল। লিলির হত্যাকারী কি সত্যিই কোনও মানসিক রোগগ্রস্ত পুরুষ? না কি ঠান্ডা মাথায় ওকে খুন করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্যে খুনি এত কাণ্ড করেছে?

আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম সুরেশ নন্দার ডাকে, 'স্যার, আয়নাটা দেখুন।'

পলকে সংবিৎ ফিরে পেলাম। তাকালাম আয়নার দিকে। ঘরে ঢুকেই অন্যমনস্ক চোখে ঘরের আসবাবগুলো দেখেছিলাম। এখন ড্রেসিং টেবিলটাকে খুঁটিয়ে জরিপ করলাম।

বিছানার মুখোমুখি থাকায় ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে লিলি জনসনের মৃতদেহ। তবে প্রতিফলন অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার প্রথম কারণ, আয়নায় ওপরে ঝোলানো লেসের ঝালর। এবং দ্বিতীয় কারণ, গোটা আয়নাটা লিপস্টিকে মাখামাখি। কিছু একটা লিখে সেটাকে ঘষে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু লেখাটা মোটামুটি উদ্ধার করা যাচ্ছে : আমা...শাস্তি দিন। অর্থাৎ, 'আমাকে' বা 'আমায়' দিয়ে লেখাটা শুরু করা হয়েছিল। লেখাটার আগে, ওপর দিকে, 'অ' অক্ষরটা দু-বার ভাঙাচোরা ছাঁদে লেখা। লেখার সময় কি খুনির হাত কাঁপছিল? এখন হয়তো আর সন্দেহ নেই, এ-খুনি মানসিক খুনি।

সুরেশ নন্দাকে বললাম, 'লিপস্টিকটা খুঁজে দ্যাখো, আর লেখাটা কী দিয়ে মোছার চেষ্টা হয়েছে সেটা বের করো। সাবধানে খুঁজবে।' শেষ উপদেশটুকু হয়তো সুরেশ নন্দার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, তবু অভ্যাসবশে বলে ফেললাম। আমি মৃতা লিলিকে নিয়ে পড়লাম।

এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে লিলির মুখ দেখে ওর বয়েস আন্দাজ করা শক্ত, তবে শরীর বলে দেয় ও যুবতী ছিল। ঝুলে থাকা ডান হাতটা নাড়াতে গিয়ে বুঝলাম, দেহে মরণ-সঙ্কোচ শুরু হয়ে গেছে। ডানহাতের অনামিকায় একটা সোনার আংটি চোখে পড়ল। ডিজাইনটা একটা পেঁচিয়ে থাকা সাপ। সাপের চোখের জায়গায় ছোট-ছোট দুটো লাল পাথর বসানো। এরপর গলায় বাঁধা তারটাকে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলাম। পেতলরঙা সরু তার। একটা তারের ওপর আর-একটা খুব সরু তার নিখুঁতভাবে পাক দিয়ে গোটা তারটা তৈরি। গিটারের চার, পাঁচ ও ছ'নম্বর তার যেভাবে তৈরি করা হয়।

তারের ব্যাস থেকে অনুমান হয় তারটা চার নম্বর। এরকম তার যে-কোনও মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। তারটা হিসেবমতো খুনির হাতে কেটে বসার কথা। সেই আশায় তারের আঁকাবাঁকা প্রান্ত দুটোয় শুকনো রক্তের দাগের

BanglaBook.org

খোঁজ করলাম। না, সেরকম কোনও দাগ নেই। সুতরাং একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই এখন উপনীত হওয়া যায় : খুনির হাতে দস্তানা গোছের কিছু ছিল। আর তা যদি থেকে থাকে, তা হলে ঘরে তার কোনও হাতের ছাপই আমরা পাব না।

সুরেশ ইতিমধ্যে লিপস্টিকটা ড্রেসিং টেবিলে খুঁজে পেয়েছে। রুমালে জড়িয়ে সেটা ও পকেটে রাখল।

আমি ফিরে গেলাম বন্ধ দরজার কাছে। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটা জরিপ করতে লাগলাম। বাঁ-দিকের দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে ক্যালেন্ডার থেকে কেটে বাঁধানো দুটো বিমূর্ত ছবি। লিলি জনসন কি তা হলে চিত্রকলার সমঝদার ছিল?

সামনেই একটা ছোট চৌকো টেবিলকে ঘিরে দুটো গদিমোড়া ছোট্ট আধুনিক ঢঙের চেয়ার। টেবিলে কয়েকটা সাময়িক পত্রিকা এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। চেয়ার-টেবিল পেরিয়ে গেলেই একটা পাঁচ/সাড়ে পাঁচ ফুট কাঠের আলমারি। দেখে মনে হয় সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস, নীলামে কেনা হয়েছে। আলমারির পরেই একটা ছোট্ট জানলা, তারপর ড্রেসিং টেবিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে সুরেশ নন্দা, তারপর যথাক্রমে দেওয়ালে ঝোলানো প্ররোচনা দেওয়া নগ্ন-যৌবন-খচিত এক বিশাল ছবি, অনুমান—বাথরুম, আর-একটা ছোট জানলা, আবার অনুমান—কিচেন-কাম-ডাইনিং স্পেস, এবং সবশেষে আমার ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো বিছানা ও বিছানার পাশে রাখা গোলাপ-কাঠের টেবিল। টেবিলে সিগারেটের টুকরোয় ঠাসা একটা অ্যাশট্রে ও লিপস্টিকের ছাপসমেত একটা গেলাস।

সুরেশকে ইশারায় ওদিকে নজর দিতে বলে আমি এগিয়ে গেলাম খোলা জানলাটার কাছে। গরাদহীন জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখেই বুঝতে পারলাম, আমি নীচের মাটির গলিপথের দিকে তাকিয়ে আছি। সামনে অন্য একটা বাড়ির অন্ধ দেওয়াল।

দোতলার বাসিন্দা, লিলি জনসন ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিট—এই তিনটে ঘটনা যোগ দিলে একটাই উত্তর পাওয়া যায় : লিলি খারাপ মেয়ে ছিল। এবং তার চেয়েও খারাপভাবে খুন হয়েছে। পকেট থেকে সদা-সঙ্গী ডায়েরি আর বলপয়েন্ট পেন বের করে নিলাম। যে-জিনিসগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল সেগুলো লিখে নিতে শুরু করলাম। ততক্ষণে সুরেশ নন্দা চাবির গোছা খুঁজে বের করে কাঠের আলমারিটা তছনছ করতে শুরু করেছে।

ডায়েরি লেখা শেষ হলে গোটা ঘরটা আর-একবার ঘুরেফিরে দেখতে শুরু করলাম। বাথরুম ও রান্নাঘর সম্পর্কে আমার একটু আগের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হল।

বাথরুমটা বিশেষত্বহীন। লিলির ফ্ল্যাটের সাজসজ্জার তুলনায় অনেক বিবর্ণ। তবে একটা তাকে বেশ কিছু ওষুধের শিশি দেখা গেল। অ্যাসপিরিন, জেলুসিল ও ওভরাল ট্যাবলেট। খুশি হলাম। লিলি জনসন তা হলে ভারত-সরকারের পরিবার পরিকল্পনা নীতির তীব্র সমর্থক ছিল!

রান্নাঘরটা সাদামাটা। কম সময়ে রান্নার মোটামুটি উপকরণ সেখানে হাজির। দেখেশুনে বেরিয়ে আসব, সুরেশ দরজায় এসে দাঁড়াল, বলল, 'আলমারিতে বিশেষ কিছু নেই। একটা লেডিজ ছাতা, ভ্যানিটি ব্যাগ, গিল্টির গয়না আর একটা বাঁশের কাজ করা টেবিল ল্যাম্প। এ ছাড়া সব জামা-কাপড়-স্যানিটারি-ন্যাপি—।'

BanglaBook.org

কথা বলতে-বলতে দুজনে বাইরের ঘরে এলাম। খুনির ভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে পুরো ঘটনাটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। অবিন্যস্ত বিছানা-বালিশ পরীক্ষা করেই বোঝা গেছে খুনি রাতটা লিলির কাছেই ছিল। তারপর একসময় সে খুনটা করে। গিটারের তার ও দস্তানা যেখানে-সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। অতএব ধরে নিতে হবে, খুনি প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। খুনটা সম্ভবত হয়েছে শেষরাতের দিকে। কারণ শরীরে এখন মরণ-সঙ্কোচ শুরু হয়েছে, এবং প্রকাশ্য দিনের আলোয় খুন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। খুন হওয়ার পর শুরু হয়েছে লিপস্টিক-অনুষ্ঠান। লিলির মুখে লাল রঙ মাখানোর কোনও কারণ আপাতত আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে আয়নার লেখাটার জন্ম যে অনুতাপ ও অনুশোচনা থেকে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু লেখাটা খুনি মুছল কী দিয়ে? আর মুছলই বা কেন? ধরা পড়ার ভয়ে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে-সঙ্গেই পেলাম। সুরেশ নন্দা অনলস উৎসাহে প্রতিটি আনাচ-কানাচ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছিল, হঠাৎই একটা অস্ফুট শব্দ করে ও খাটের তলায় ঢুকে গেল এবং একটু পরেই লালরঙ মাখা দলাপাকানো একটা রুমাল অতি সন্তর্পণে বের করে নিয়ে এল।

হালকা নীল রঙের একটা সাধারণ রুমাল। দু-প্রান্ত ধরে সুরেশ রুমালটা টেনে খুলল। না, প্রত্যাশামতো কোনও মনোগ্রাম তাতে নেই। ওর কাছে গিয়ে নাক নামিয়ে রুমালটা শুঁকে দেখলাম। না, পারফিউমের কোনও গন্ধও সেখানে অনুপস্থিত। তা হলে কি রুমালটা লিলির নয়? খুনির নিজের?

বিছানার পাশে রাখা গোলাপ-কাঠের টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সুরেশ বলল, 'স্যার, গেলাসে আর প্রত্যেকটা সিগারেটে লিপস্টিকের ছাপ। তা ছাড়া, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পেয়েছি।'

'চিন্তার কিছু নেই। ফোরেনসিক রিপোর্ট থেকে সবই জানা যাবে।' একটু থেমে আবার বললাম, 'তুমি দরকারি তথ্য সব নোট করে নাও। এখন সব প্রশ্নের উত্তর পাবে না। যেমন, ঘরের সবক'টা আলো কেন জ্বলছে, কে জ্বেলেছে? লিপস্টিকের লেখা খুনি মুছল কেন? এইরকম আরও অনেক। তা ছাড়া, লিলি জনসন মেয়েটা সম্পর্কে আমরা এখনও কিছু জানতে পারিনি। বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখি। বিকেলে তোমার সঙ্গে আমি আলোচনায় বসব—।'

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল পাঁচজন। প্রথমজন সাবইন্সপেক্টর দীপক সামন্ত, দ্বিতীয়জন ফোরেনসিকের অতনু নিয়োগী, তৃতীয়জনকে আমি চিনি না—হয়তো মিস্টার নিয়োগীর সহকারী, চতুর্থজন মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর অনন্ত সকসেনা এবং পঞ্চম ও শেষজন ক্যামেরা-ফ্ল্যাশগানে সজ্জিত অল্পবয়েসী ফটোগ্রাফার নীলাংশু দে। ছেলেটা খুব কম সময়ে ফটোগ্রাফার হিসেবে খুব নাম করেছে।

সুরেশ ততক্ষণে নীল রুমালটা পকেটে ভরে ফেলেছে। ও হেসে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। বলল, 'ওয়েলকাম, ডক্টর সকসেনা। বডিটাকে এবার ডেড বলে ঘোষণা করুন।'

বৃদ্ধ ডক্টর সকসেনা ডেডবডির কাছে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'চমৎকার!

BanglaBook.org

একজন যুবতীকে এভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ ক'জন পায়! তবে মেয়েটা বেঁচে থাকলে ভালো হত এই যা!' আমার দিকে ফিরে হাসলেন ডাক্তার। বললেন, 'ইন্সপেক্টর বরাট, এবার এমন দু-একটা খুনের কেস দিন যাতে বডিগুলো জ্যান্ত থাকে।' লিলি জনসনকে ওপর-ওপর পরীক্ষা করে আবার তাকালেন, 'ইস, পাঁচ-দশ ঘণ্টা আগেও মেয়েটা বেঁচে ছিল! পোস্টমর্টেম করলে মোটামুটি কারেক্ট সময়টা বলা যাবে।'

সুরেশকে এবার ইশারায় কাছে ডাকলাম। নিচু গলায় বললাম, 'লিপস্টিক আর রুমাল তোমার কাছে থাক। পরে আমরা নিজেরা ল্যাবে দেব। আর কাউকে ও-দুটো জিনিসের কথা বলার দরকার নেই—' সুরেশের চোখে অবাক দৃষ্টি দেখে বললাম, 'পরে সব বুঝিয়ে বলব—।'

দীপক ডেডবডিটা ভুলে থাকার আশায় দেওয়ালের ছবি দুটো দেখছিল, কপালের ঘাম মুছে বলল, 'নীচে একেবারে মিছিল বসে গেছে। রিপোর্টারগুলোও জ্বালাতন শুরু করেছে। বারবার করে বলছি বিকেলে থানায় আসতে, শুনছে না।'

সুরেশ দীপকের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, যেন বলতে চাইল, উপায় কী! এই তো জীবন।

এমনসময় ক্যামেরা রেডি করে নীলাংশু এসে জানতে চাইল, কী-কী ছবি তুলবে।

সুরেশ আমার দিকে সপ্রশ্নে তাকাল। আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'প্রত্যেকটা পসিব্‌ল অ্যাঙ্গেল থেকে বডি ও ঘরের ফটো তুলে নাও। ইম্পর্ট্যান্ট কোনও জিনিস যেন বাদ না যায়। বিশেষ করে আয়নাটার গোটাকয়েক ক্লোজ-আপ চাই।' সুরেশকে আরও কাছে ডেকে নিলাম, 'আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাকো। সব কাজ সেরে ঘর সিল করে তারপর যাবে। যাওয়ার আগে ওপরের ছাদটাও একবার দেখে নিয়ো। আর শোনো, কোনও রিপোর্টারকে এখন ইন্টারভিউ দিয়ো না। বিকেলে কথা হবে।'

সুরেশ নন্দার বৃষস্কন্ধে লিলির সংসারের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি অকুস্থল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। প্রাথমিক অনুসন্ধানপর্বে এবার নিজেকে উৎসর্গ করা যাক।

দুই

BanglaBook.org

লিলির ফ্ল্যাট থেকে বেরোতেই প্রহরারত কনস্টেবলের মুখোমুখি হলাম। বেচারা একটা বিশাল হাই তুলতে মুখটা হাঁ করছিল, আমাকে দেখে মাঝপথে হাই থামিয়ে সেলাম করল। হাত তুলে সেলাম গ্রহণ করে জিগ্যেস করলাম, 'বিল্ডিংকে মালিক কাঁহা হ্যায়?'

সে ইশারায় লিলির ফ্ল্যাটের উলটোদিকের দরজাটা দেখিয়ে দিল। সুতরাং এগিয়ে গিয়ে কলিংবেলের সাদা বোতামে আঙুলের চাপ দিলাম। লক্ষ করলাম, দু-পাল্লার মলিন দরজায় কোনও ম্যাজিক-আই লাগানো নেই। একটা প্লাস্টিকের নেমপ্লেট ছিল। এখন সাদা অক্ষরগুলো বেশিরভাগই উঠে গিয়ে কালো প্লেটের ওপর শুধু কিছু ফুটকি আর দাঁড়ি পড়ে রয়েছে। বলা যেতে পারে, মর্স কোডে লেখা নেমপ্লেট আমি এই প্রথম দেখছি। অবশ্য এ-বাড়িতে আসা থেকে অনেক কিছুই প্রথম দেখছি।

দরজাটা খুলতে আট-দশ সেকেন্ড সময় লাগল। এবং তখনই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাতান্ন নম্বর বাড়ির মালিক নয়—মালকিন। একশো থেকে পেছনদিকে বয়েস হিসেব করলে প্রখর যুবতী বলতে কষ্ট হয়, আর সোজা পথের হিসেবে বৃদ্ধা বলতেও মনে দ্বিধা আসে। উগ্র প্রসাধন মুখের চামড়ার ভাঁজ লুকিয়ে ফেলতে সাহায্য করেছে। সস্তা পারফিউমের তীব্র গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মহিলার পরনে ঘন নীল জমিতে সাদা ফুলের ডিজাইন করা একটা ছাপা গাউন। হাঁটুর নীচে গাউন শেষ হয়ে যাওয়ায় অস্বাভাবিক ফোলা পায়ের ডিম দৃশ্যমান। পায়ে হলদে ফিতের হাওয়াই চপ্পল। হাতে গোল ফ্রেমে আঁটা একটা এমব্রয়ডারির কাজ। গোলাপি কাপড়ে গাঢ় সবুজ সুতোয় ফুল ও লতাপাতা আঁকার কাজ চলছে।

আমার চোখ মহিলার চোখে পড়তেই অবাক হলাম। উগ্র প্রসাধন ও সেন্টের বিপরীতধর্মী দুটি শান্ত ভিজে চোখ নিয়ে উনি আমার দিকে তাকিয়ে। সিঁড়ির বাল্‌বের আলোয় তাঁর রিমলেস চশমার কাচ চকচক করে উঠল। মাথার কাঁচা-পাকা চুলের কালো অংশ যেন সাদা অংশে নাম লেখাতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই সমান ভাগাভাগিতে দু-দলের অবস্থান বেশ ভালো লাগে।

আমার থমকে যাওয়া মনের বেসুরো স্রোতকে পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। আমার পোশাক দেখে উনি উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন জেনেও সামান্য গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, 'ইন্সপেক্টর বরাট—লালবাজার। মিস লিলি জনসনের খুনের ব্যাপারে কিছু কথা আছে, মিস—।'

'মিসেস—' নিচু গলায় ভুল শুধরে দিলেন উনি। গলার স্বর শান্ত, নেশা ধরানো। একেই কি বলে পেশাগত গুণ? আমি পদবিটা শোনার অপেক্ষায় ছিলাম, ভদ্রমহিলা আরও যোগ করলেন, 'মিসেস নায়ার। প্লিজ কাম ইন, ইন্সপেক্টর। এ গ্রেভ বিজনেস। নৃশংস। ভাবা যায় না।'

নায়ার পদবিটা শুনেই বুঝলাম নীচে চিঠির বাক্সের গায়ে 'এন' অক্ষরটা উঠে যাওয়ায় 'নায়ার'কে 'আয়ার' ভেবে ভুল করেছিল সুরেশ। তা হলে কি লিলি বা অন্যান্য ভাড়াটে মেয়েদের চিঠিপত্র মিসেস নায়ারের নামেই আসে? এর কারণ কী? মেয়েগুলো কি নিজেদের ঠিকানা-পরিচয় গোপন রাখতে চায়?

ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

আমার সামনেই বসবার ঘর। আসবাবপত্রগুলো পুরোনো হলেও সাজানোয় রুচি আছে। টেবিলের ওপর পাতা টেবিল ক্লথ, চেয়ারের কভার ও বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো রেডিয়োগ্রামের ঢাকনা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না সেগুলো মিসেস নায়ারের শিল্পী-হাতের পরিচয় দিচ্ছে। এ ছাড়াও বোঝা গেল, লাল ও গোলাপি রঙ তাঁর বিশেষ প্রিয়।

হাতের সেলাইটা রেডিয়োগ্রামের ওপর রেখে এসে টেবিলের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে উনি বসলেন। আমাকে ইশারায় বললেন মুখোমুখি বসতে। চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে গাউনের খুঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে-করতে চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন।

আমি চেয়ারে বসলাম। একপলক ওঁকে জরিপ করে নিয়ে কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নিলাম : ঝোপের চারপাশে লাঠি না চালিয়ে সরাসরি আঘাত করো। তাই করলাম।

BanglaBook.org

'লিলি জনসন ভাড়া খাটত?' আচমকা প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম মিসেস নায়ারের দিকে।

দুনিয়ার বিস্ময় চকিতে লাফিয়ে উঠল ওঁর শান্ত চোখে। উনি স্পষ্টতই আহত হলেন।

ওঁর মুখ দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, পুলিশ সম্পর্কে উনি বেশ ওয়াকিবহাল এবং লিলির ব্যাপারে পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে উনি মনে-মনে প্রস্তুতই ছিলেন। সেইজন্যেই হয়তো আপাত-শান্ত একটা পোশাক চড়িয়ে রেখেছিলেন নিজের আচার-ব্যবহারে। এখন সেই পোশাক খসে পড়ল। কিন্তু আমি নিরুপায়।

মিসেস নায়ারকে নীরব দেখে গলা সামান্য মোলায়েম করে যোগ করলাম, 'মিসেস নায়ার, এখন আর ভদ্রতা-লৌকিকতার সময় নেই। দিস ইজ টাইম এনাফ টু টক বিজনেস। তা ছাড়া, জানেনই তো, লজ্জা, ঘেন্না, ভয়—তিন থাকতে পুলিশে চাকরি নয়। তাই ওসব আমাদের একটু কম আছে,' হাসলাম : 'প্লিজ, প্রশ্নের জবাব দিন।'

'আপনি যে-অর্থে বলেছেন...ঠিক সে-অর্থে নয়...' চোখদুটো আনত, মুখে অস্বস্তি। তারপর চোখ তুলে চশমাটা পরে নিলেন : 'ও "সোনা ট্রাভেল্স" নামে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করত—দিনের বেলায়।'

'সোনা ট্রাভেল্স' আমি চিনি। চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক স্ট্রিটের ক্রসিংয়ের কাছাকাছি। ট্রাভেল এজেন্সি হিসেবে বেশ নামডাক আছে।

পকেট থেকে ডায়েরি বের করে দরকারি তথ্যগুলো লিখে নিতে শুরু করলাম। কানে এল দূর থেকে ভেসে আসা রেডিয়োর শব্দ। লক্ষ করলাম, মিসেস নায়ার বেশ উসখুস করছেন।

ঘরের দেওয়ালে লাগানো ফিকে ওয়াল-পেপারগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'লিলি আপনার এখানে কতদিন ছিল?'

'বছর দেড়েক।' আগের চেয়ে অনেকটা সহজ হয়েছেন।

'ওর খুনের খবরটা থানায় কে প্রথম ফোন করে জানিয়েছিল বলতে পারেন?'

আবার সতর্কতা উপচে পড়ল দু-চোখে। অভিজ্ঞতার ছাপে ভরা মুখের রেখা কঠিন হল।

'ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো পাড়াপড়শি কেউ হবে।'

'যে খবরটা দিয়েছে সে কিন্তু নিজের নাম-ধাম বলতে চায়নি।' আমার চোখ অপলক।

'কে-ই বা পুলিশি ঝামেলায় জড়াতে চায়, বলুন!' হাসিতে যান্ত্রিক ছোঁয়া।

'মৃতদেহ প্রথম কে দেখতে পায়?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ইতস্ততভাবে, 'আমি, আসলে ঠিক পৌনে দশটায় লিলি রোজ অফিসে বেরোত। সময়ের কখনও নড়চড় হত না। আজ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে আমিই ওকে ডাকতে যাই। তিন-চারবার কলিংবেল টিপেও যখন কোনও সাড়া পেলাম না তখন দরজা ঠেলতেই দেখি দরজা খোলা। তারপর...ওঃ গড! ওয়াজ ইট হরিব্‌ল!' দু-হাতে মুখ ঢাকলেন মিসেস নায়ার। অভিনয়? না-ও হতে পারে।

বেলা পড়ে আসছে। সামনের জানলার পরদা সরানো। ফলে একফালি চড়া রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। লক্ষ করলাম, এ-ঘরের জানলাও লিলির ঘরের মতো

BanglaBook.org

গরাদহীন। বোঝা যায়, বাড়িটা সাবেকি আমলের।

'খুনের খবরটা আপনি কাকে দেন?' নির্বিকার মুখে জানতে চাইলাম।

'দোতলার মেয়েদের চিৎকার করে বলি। তখন ওরা পাড়াপড়শিদের ডেকে সাত-পাড়া মাথায় করেছে।' একটু থেমে : 'আমার বাড়িতে ফোন নেই, থাকলে আমিই পুলিশে খবরটা দিতাম। বদনাম তো যা হওয়ার হয়েছেই।'

'আচ্ছা, একতলায় একটা তালাবন্ধ ঘর দেখলাম—"স্টোর" লেখা। ওটাতে কী আছে?'

ওই ঘরে দোকানদারেরা ওদের মালপত্র রাখে। পুরোনো বই, রেকর্ড, কাপড়-জামা—এইসব। ওদেরই একজনের কাছে চাবি থাকে।'

'দোতলায়?'

'দোতলার দুটো ফ্ল্যাটে দুজন-দুজন করে চারজন মেয়ে থাকে।'

থাক, ওদের কথা পরে বিস্তারিত শোনা যাবে। এখন লিলির কথায় ফিরে আসা যাক।

'লিলি জনসনের কোনও প্রেমিক ছিল? বয়ফ্রেন্ড?' আমার চোখে প্রত্যাশা। নিতান্ত ভদ্রতাবশেই আমি 'বরাবরের খদ্দের' শব্দটা ব্যবহার না করে 'বয়ফ্রেন্ড' বলেছি। কিন্তু মিসেস নায়ার সেই ভদ্রতাকে অসম্মান করে সম্ভবত মিথ্যে জবাব দিলেন, 'না-না...সেরকম কেউ ছিল না।'

এবার ঠোঁটকাটা স্বরে বলে উঠলাম, 'খদ্দের কীরকম আসত?'

'মিস্টার বরাট,' মিসেস নায়ার গুছিয়ে বসলেন : 'এ-অঞ্চলে বেশিরভাগ যে-ধরনের মেয়ে দেখা যায় লিলি ঠিক সে-জাতের ছিল না। এমনি চাকরি-বাকরি, সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে কাটাত, আর মাঝে-মাঝে...ওয়েল, শি পিক্‌ড আপ অকেশন্যাল ফ্রেন্ডস।'

'বুঝেছি, অর্ধগৃহস্থ।' উদাসীন স্বরে বললাম। মিসেস নায়ার বিমূঢ় অভিব্যক্তি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি সেটা বিশেষ আমল না দিয়ে পরের প্রশ্ন করলাম, 'ওর আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল?'

'ওর মুখে যদ্দুর শুনেছি, কেউ ছিল না।'

'আপনাকে কত ঘরভাড়া দিত?'

একটু ইতস্তত করলেন মিসেস নায়ার। যেন মনের ভেতরে কোনও দ্বন্দ্ব চলছে। তারপর : 'চারশো পঁচাত্তর।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, 'তবে ফার্নিচার, ইউটেনসিল—সব আমার। ওকে আমি ফার্নিশ্‌ড রুম দিয়েছি।'

এ-কথা বিশ্বাস করা ছাড়া আমার উপায় নেই। কারণ যে প্রমাণ দিতে পারত সে এখন গোলোকধামে। তবে সামান্য ভরসা দোতলার মেয়েরা। জানি না, ওদের বেলায় মিসেস নায়ারের নিয়ম-কানুন আলাদা কি না। হতে পারে, লিলি জনসনই ছিল এ-বাড়ির রাজলক্ষ্মী।

'কাল রাতে লিলির ঘরে কোন "অকেশন্যাল ফ্রেন্ড" এসেছিল?'

'ঠিক বলতে পারছি না। কাল সন্ধেবেলা আমি নিউ মার্কেটে শপিংয়ে গিয়েছিলাম। ফিরেছি রাত আটটা নাগাদ। তখন লিলির ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল—ভেতর থেকে।'

'লিলি কি খুব সাবধানী ছিল?' ওর ফ্ল্যাটের দরজায় লাগানো ম্যাজিক-আইটার

BanglaBook.org

কথা মনে পড়ায় প্রশ্ন করলাম।

পরক্ষণেই মিসেস নায়ারের চোখে সপ্রশ্ন ভ্রূকুটি দেখে কারণটা খুলে বললাম। তখন উনি জবাব দিলেন, 'লোকের ব্যাপারে লিলি খুব চুজি ছিল। ভেতর থেকে দেখে লোক পছন্দ না হলে দরজা খুলত না।'

ভাবলাম, চারশো পঁচাত্তর টাকা যে শুধু ঘরভাড়া দেয় আর এত বাছবিচার করে খদ্দের ঘরে নেয়, তার একরাতের দাম নিশ্চয়ই আকাশ-ছোঁয়া ছিল। আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলাম।

'কাল রাতের ব্যাপারটা কাকে জিগ্যেস করলে জানা যেতে পারে?'

আবার কিছুক্ষণ ইতস্তত ও দোটানা ভাব। তারপর ঃ 'কাল্লুকে জিগ্যেস করে দেখতে পারেন। ও বাড়ির বাইরেই সবসময় থাকে।'

বুঝলাম, কাল্লুই হল 'আলালের ঘরের', দালাল। ওকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। এ-জাতীয় লোকগুলো সাধারণত দাগী আসামী হয়।

'লিলির ঘরে রোজ কীরকম লোক আসত?'

'আগেই তো বলেছি—রোজ আসত না। তবে জেনারালি যে আসত, সে রাতে থেকে যেত। কাল রাতে কে যে এই ভয়ঙ্কর কাজ করল...জানেন, ইন্সপেক্টর, লিলি মেয়েটার মন খুব ভালো ছিল। মিষ্টি করে সবার সঙ্গে কথা বলত—আই উইল মিস দ্য গার্ল।' মিসেস নায়ারের চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল। উনি চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিলেন। গাউনের অদৃশ্য ভাঁজ থেকে বের করে নিলেন একটা রুমাল। তারপর সাড়ম্বরে চোখ মুছলেন।

এ এক দুর্লভ দৃশ্য। সদ্য-মৃতা পতিতার জন্যে তার মাসি সত্যিকারের চোখের জল ফেলছে। বলতে ইচ্ছে করছে, 'হায় কুমির! তোমার দিন গিয়াছে—।'

'মিসেস নায়ার, আপনি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছেন।' একটু থেমে আরও স্পষ্ট গলায়, 'চিন্তার কিছু নেই। লিলির ঘরে খুব শিগগিরই নতুন ভাড়াটে পেয়ে যাবেন।'

সাতান্ন নম্বর বাড়িটা পলকে হিরোসিমা-নাগাসাকি হয়ে গেল। তড়িৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস নায়ার। ডানহাতে ধরা চশমা ও রুমাল তিরতির করে কাঁপছে। গলার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠল বিপদসীমা পর্যন্ত। কয়েক সেকেন্ড প্রচণ্ড আক্ষেপে ওঠানামা করল গলার কণ্ঠা, কিন্তু ঠোঁট চিরে কোনও শব্দ বেরোল না। আমার মুখের কাছে ঝুঁকে এলেন তিনি। ভেতরকার সাপিনীটাকে প্রকাশ করে হিস্‌হিস্ স্বরে বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলুন, ইন্সপেক্টর! তা যদি না পারেন, ওয়েল...য়ু ক্যান লিভ মি অ্যালোন।' গলার স্বর তিন পরদা উঁচু হল ঃ 'আমি ভাবতেই পারছি না, কী করে এত সাহস...এত সাহস...' আবার কথার স্রোত হোঁচট খেল অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায়।

কিন্তু ততক্ষণে আমি উগ্র সেন্টের আসল কারণটা ধরে ফেলেছি। মিসেস নায়ারের রঙ-মাখা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এই মুহূর্তে কথা না বেরোলেও হুইস্কির হালকা গন্ধটা ঠিকই বেরিয়ে আসছে। লিলির ঘরে মদের বোতল সুরেশ খুঁজে পায়নি। সে-মদ কি তা হলে মিসেস নায়ার প্রয়োজনমতো সাপ্লাই দেন? না কি মেয়েরা নিজেরা এসে গেলাসে ঢেলে নিয়ে যায়?

আমি হাসলাম ঃ 'বসুন, মিসেস নায়ার।' একটু সময় দিয়ে ঃ 'উত্তেজনা আপনার

BanglaBook.org

শরীরের ক্ষতি করতে পারে।'

মিসেস নায়ার অন্ধ রাগে চিৎকার করে উঠলেন, 'গেট আউট! এক্ষুনি বেরিয়ে যান বলছি!'

উনি হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎই ভেতরের কোনও ঘর থেকে বুড়োটে গলায় ভাঙা চিৎকার ভেসে এল, 'অনিতা—অনিতা—কে? কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি? হু ইজ ইট?'

আমার ভুরুজোড়া নীরব প্রশ্নে সঙ্কুচিত হল, এবং মিসেস নায়ার আগুনঝরা চোখে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে দ্রুতপায়ে রওনা হলেন ভেতরের ঘর লক্ষ করে। ওঁর হাবভাবে মনে হল, যেন বিরাট এক বিপদ সামলাতে চলেছেন উনি।

মিসেস নায়ার চোখের আড়াল হতেই ডায়েরি রেখে একটা সিগারেট ধরালাম—কাজটা অনুচিত জেনেও। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলাম। একই সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখলাম ঘরটাকে।

বাঁ-দিকে, রেডিয়োগ্রাম থেকে কিছুটা দূরে, দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছোট কাচের আলমারি—একটা পাল্লার শার্সি ভাঙা। ভেতরে চিনেমাটির কাপ-প্লেট ঃ ধারগুলো ব্যবহারে বা অযত্নে ক্ষয়ে গেছে। আলমারির পাশে একটা তাকে কয়েকটা ধর্ম ও খ্রিস্ট সংক্রান্ত ইংরেজি বই। একটা পুরোনো আলনায় নোংরা অন্তর্বাস থেকে শুরু করে হালফ্যাশানের চটকদার শস্তা গাউন পর্যন্ত সবই ঝুলছে।

মাথার ওপর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে সেকেলে ভারী সিলিং পাখা অবিশ্রান্ত ঘুরলেও আমার কেমন যেন অস্বস্তিকর গরম লাগছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চিন্তায় মগ্ন হলাম।

এক ঃ লিলি জনসনের মৃত্যুতে মিসেস অনিতা নায়ার কি সত্যিই দুঃখ পেয়েছেন? না কি সবই নাটক? আমার বিশ্বাস, আর্থিক ক্ষতির আঘাত ছাড়া আর কোনও আঘাতই উনি পাননি।

দুই ঃ একজন সাইকোটিক কিলার সোনা ট্রাভেল্‌স-এর কোনও কর্মচারীকেই বা হঠাৎ বেছে খুন করল কেন? ব্যাপারটা কি নিছকই কাকতালীয়? এ-খুনের কি সত্যিই কোনও মোটিভ নেই?

তিন ঃ যে-নায়ার মাসিকে আমি অবলা-অসহায়া নারী ভেবেছিলাম, সে কি অবলা নয়? একটু আগে যার ভাঙা গলার স্বর পেলাম, সেই কি আমাদের মেসো?

প্রশ্নগুলোর উত্তর ভাবতে-ভাবতে আনমনা হয়েই রেডিয়োগ্রামের কাছে এসেছিলাম। খেয়াল নেই কখন মিসেস নায়ারের সেলাইয়ের কাজটা হাতে তুলে নিয়েছি। তারপর কী ভেবে রেডিয়োগ্রামের ডালাটা খুলতে যাব, পেছন থেকে অনিতা নায়ারের তীব্র স্বর শুনতে পেলাম, 'ও কী? ওটাতে আবার হাত দিচ্ছেন কেন? রেখে দিন!'

আমি চিরকালই অবাধ্য ছেলে। কেউ কিছু বারণ করলে সেটাই আমার বেশি করে করতে ইচ্ছে করে। সুতরাং শূন্য চোখে মিসেস নায়ারের দিকে তাকিয়ে রেডিয়োগ্রামের ডালাটা খুলে ফেললাম।

ভেতরে চোখ রাখতেই এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য আমার নজরে পড়ল। সেইসঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকের মতো শোনা গেল মিসেস নায়ারের অস্ফুট আর্তনাদ।

BanglaBook.org

রেডিয়োগ্রামের ভেতর রেডিয়ো কিংবা গ্রামজাতীয় কিছুই নেই। খালি বাক্সের ভেতর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুটো সাদা ঘোড়ামার্কা হুইস্কির বোতল। একটা ভর্তি, অন্যটা সামান্য খরচ হয়েছে। মিসেস নায়ারের পেটে হয়তো সেটুকুর হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

অনিতা নায়ারের মুখ ফ্যাকাসে। অভিব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অনেক চেষ্টার পর তিনি বললেন, 'ইন্সপেক্টর বরাট, আমি ভেবেছিলাম আপনার কাজ শেষ হয়েছে—' হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

আমি রেডিয়োগ্রামের ডালাটা বন্ধ করে সেলাইটা জায়গামতো নামিয়ে রেখে ধীরে-ধীরে মিসেস নায়ারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। হাতের সিগারেটটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ডায়েরি আর পেন পকেটে ভরে ফেললাম। ওঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'এ বয়েসেও ওসব ছাই-পাঁশ সহ্য হয়?'

'হয়,' ঠান্ডা গলায় উত্তর দিলেন অনিতা নায়ার, 'আর কিছু?'

'না, ধন্যবাদ।' বুঝলাম, হুইস্কির বোতল আবিষ্কার করে আমি ওঁর আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে ফেলেছি।

এবার অনিতা নায়ারকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চললাম ভেতরের ঘর লক্ষ্য করে : যে-ঘর থেকে একটু আগেই কেউ 'অনিতা' বলে ডেকে উঠেছিল। সেই মেয়েকে না দেখে আমি যাব না।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও স্পষ্ট টের পেলাম, মিসেস নায়ারের হতভম্ব দৃষ্টি ছুরির ফলার মতো আমার পিঠে এসে বিঁধছে। বিঁধুক। ওতে আমার কিছু যায় আসে না।

মেয়ের ঘরটা অস্বাভাবিক নোংরা আর উৎকট গন্ধে ভরা। মনে হল যেন রাজ্যের ইথার আর ডেটল কেউ উজাড় করে এই ঘরে ঢেলে দিয়েছে। দেওয়ালের বার্ধক্য ঢাকতে এ-ঘরেও রয়েছে রঙিন কাগজের প্রলেপ।

ঘরের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট। সেই কারণেই হয়তো একটা বড় জানলা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। জানলায় কাচের শার্সি। কাচের রঙ হলদে। কোলগেট কিংবা কোরহান্স দিয়ে মেজে নিলে ভালো হয়। ঘরে একটা চল্লিশ কি ষাট পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে—কিন্তু তাতে অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। জানলার কোল ঘেঁষে একটা সাদামাটা প্রাচীন খাট। খাটের কোলে সুপ্রাচীন তেলচিটে বিছানা। বিছানার কোলে জনৈক প্রাগৈতিহাসিক বৃদ্ধ। খাটের তলায় অ্যালুমিনিয়ামের পিকদানি, কস্মাই করা বেডপ্যান ও চামড়া বাঁধানো একটা ছোট মোড়া। বিছানার পাশেই একটা বড় টেবিল। সেখানে ঝুল-অলঙ্কৃত একটা টেবিল ফ্যান শনশন করে ঘুরছে। যেন চিৎকার করে বলছে : ওল্ড ইজ গোল্ড। ফ্যানের পাশে গোটাকয়েক ওষুধের শিশি, একটা গেলাস—তাতে অর্ধেকটা জল রয়েছে। এবং অদৃশ্য কোন এক রেডিয়োতে ইংরেজি খবর শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে আদর্শ রুগির ঘর।

'গুড মর্নিং, মিস্টার নায়ার।' ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে দু-পা এগিয়েই আমাকে থামতে হয়েছে। কারণ, অদৃশ্য শক্তিতে বিকর্ষণ করা উৎকট গন্ধ।

চাদর গায়ে শুয়ে থাকা বৃদ্ধকে লক্ষ করে নিজের পরিচয় দিলাম, 'আমি লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াড থেকে আসছি। ইন্সপেক্টর বরাট। আপনাদের এক

BanglaBook.org

টেনান্ট কাল রাতে খুন হয়েছে। লিলি জনসন। আলাপ ছিল?'

ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের শক্তিতে অনুভব করলাম, মিসেস নায়ার আমার ঠিক পেছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস যেন ঘরে ঝড় তুলছে।

মিস্টার নায়ার কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে হয়তো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন অনুপুঙ্খভাবে। মাথার বিচিত্র-রঙ চুলে গাঁটসর্বস্ব শীর্ণ আঙুল চালালেন। বিচিত্র-রঙ, কারণ চুলের ডগাগুলো কুচকুচে কালো, কিন্তু বাকিটা ধবধবে সাদা। সম্ভবত অনেকদিন কলপ পড়েনি। চশমার কাচের পিছনে ঘোলাটে চোখ মেলে বেশ কষ্ট করে দরজার কাছে দাঁড়ানো আমাকে দেখলেন তিনি। লিলি জনসনের মৃত্যুতে উনিও কি গুরুতর মানসিক আঘাত পেয়েছেন? বিচিত্র পৃথিবী। সবই সম্ভব।

চাদর ঢাকা শরীর নিয়ে সামান্য উঠে বসতে চেষ্টা করলেন নায়ার। পারলেন না। ঘড়ঘড়ে গলায় বলতে শুরু করলেন, 'না, মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না...তবে দেখেছি কয়েকবার,' হঠাৎই কাশির দমকে তাঁর কথা বন্ধ হল। দু-হাত মুখে চাপা দিয়ে বারকয়েক কাশলেন তিনি। বালিশের পাশ থেকে একটা রুমাল নিয়ে রক্তাভ মুখমণ্ডলে বুলিয়ে নিলেন। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'মেয়েটা ভদ্র ছিল। আর-পাঁচটার মতো নয়।'

'কেন, আর-পাঁচটা মেয়ে কী অন্যায় করেছে, যা লিলি করেনি?'

মিসেস নায়ার আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। খাটের তলা থেকে পিকদানিটা তুলে নায়ারের মুখের কাছে ধরলেন। গলাখাঁকারি দিয়ে অনেক চেষ্টায় বুকের শ্লেষ্মা কিছুটা হালকা করলেন নায়ার।

পিকদানিটা রেখে আমার দিকে ফিরলেন অনিতা : 'ওকে আর কিছু জিগ্যেস করবেন?'

স্থির চোখে চেয়ে থেকে বললাম, 'যদি আপনার আপত্তি না থাকে।' তারপর নায়ারের দিকে তাকিয়ে : 'লিলির খুনের ব্যাপারে কোনও সূত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারেন?'

নায়ারের চোখ অনিতাকে দেখল, গায়ের চাদর দেখল, জানলার শার্সি দেখল, ঘরের দেওয়াল দেখল, প্রতিটি আসবাবপত্র দেখার পর যখন দেখল আর কিছুই দেখার নেই তখন তাকাল আমার দিকে। ধীরে-ধীরে তিনি বললেন, 'না। কিছু দেখিনি। কিছু শুনিনি। দেখছেনই তো, ইনভ্যালিড হয়ে বিছানায় পড়ে আছি। এ ওল্ড ফর নাথিং ওল্ড চ্যাপ।'

কিন্তু চশমার কাচের আড়ালে বৃদ্ধের অস্থির চোখ আমাকে বলে দিল উনি অনেক কিছু গোপন করে যাচ্ছেন। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সময় হলেই সব খবর আদায় হবে।

আলোচনা শেষের ইঙ্গিত দিয়েই সম্ভবত চাদরের তলায় হাত ঢুকিয়ে লুকোনো ট্রানজিস্টরের ভলিউমটা বাড়িয়ে দিলেন নায়ার।

হেসে বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ। তবে রাত্তিরের ইংরেজি খবরটা শুনবেন। লিলি জনসনের খুনের গল্প তখন শোনানো হবে।'

থতমত নায়ারকে ছেড়ে বেরিয়ে আসছি, কানে এল তাঁর কাঁপা স্বর, 'মিস্টার

BanglaBook.org

বরাট, আপনাকে যেটুকু হেল্প করার সেটুকু অনিতাই করতে পারবে। ও ভীষণ কমপিটেন্ট। ওর তুলনা নেই।'

ফিরে তাকিয়ে দেখি নায়ার ক্লিষ্ট হাসছেন। হাসি আমারও পেল। স্বামীর মুখে স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাকে হাসিই পাইয়ে দেয়। তবে লক্ষ করলাম, যাঁর প্রশংসায় নায়ার এইমাত্র পঞ্চমুখ হলেন তাঁর মুখে সলজ্জ বিনয়ের প্রত্যাশিত রক্তাভা নেই, বরং অভিজ্ঞতার শিলালিপি সেখানে যততত্র ছড়িয়ে আছে।

চশমাটা আবার চোখ থেকে খুলে নিয়ে সেটার কাচ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন অনিতা নায়ার। গম্ভীরভাবে বললেন, 'সো লং, ইন্সপেক্টর। আমি চাই লিলির খুনি ধরা পড়ুক। এ মার্ডারার ক্যান নট বি স্পেয়ার্ড। বাই অল মিন্‌স।'

এ-কথা নিজের কানে শুনতে পেলে লিলি জনসন খুশি হত। বুঝত, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ কত বেশি।

'মিসেস নায়ার, আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, ফিরে আমাকে আসতে হবেই। পুলিশের কাজ একইসঙ্গে বিরক্তিকর ও জঘন্য। আমার পক্ষেও, আপনার পক্ষেও। তবুও আপনার সহযোগিতা আমার দরকার। এখন চলি।'

বিদায় নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম। নাকটা ধরে দু-একবার টানাটানি করে দেখলাম, নায়ারের ঘরের উৎকট দুর্গন্ধ এতক্ষণ সহ্য করে বেচারা বেঁচে আছে কি মরে গেছে। তারপর, দেওয়ালে টাঙানো মাতা মেরি ও যীশুর ছবির দিকে একপলক তাকিয়ে মিসেস নায়ারের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। অনিতা নায়ারের তীব্র সন্দেহকুটিল দৃষ্টি আমাকে যেন ঠেলে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

এখন আমার কানুকে দরকার। কানু, তুমি কোথায়?

অন্তর্দৃশ্য

স্বামীর ঘরের দরজায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর বরাটের নিষ্ক্রমণ লক্ষ করলেন অনিতা নায়ার। তারপর ভীষণ ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এলেন দরজা পর্যন্ত। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। বুকের ভেতরটা কেমন যেন শুকনো লাগছে। কেমন এক অদ্ভুত শ্বাসকষ্ট। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রেডিয়োগ্রামের দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে এক বিচিত্র দোটানায় দুলতে লাগলেন অনিতা। সেকেন্ড কয়েক পরেই কিছুটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন রেডিয়োগ্রামটার কাছে। সেলাইটা তুলে নিয়ে ডালা খুলে কিছুটা খরচ হওয়া হুইস্কির বোতলটা বের করে নিলেন। নির্জলা কয়েক ঢোক গিলে ফেললেন অভ্যাসলব্ধ দক্ষতায়। বোতলটা আবার লুকিয়ে রেখে সেলাইটা হাতে করে চেয়ারে বসলেন। সেলাইয়ের নকশার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে চিন্তার নকশা বুনে চললেন তিনি।

লিলি জনসনের মৃত্যু তাঁর কাছে আর্থিক আঘাত তাতে সন্দেহ নেই, তবে মেয়েটার ব্যবহার সত্যিই ভালো ছিল। বিপদে-আপদে টাকা দিয়ে মেয়েটা তাঁকে কম সাহায্য করেছে। তা ছাড়া বৃদ্ধ, পঙ্গু, সুদর্শন নায়ারের অনেক অত্যাচার ও হাসিমুখে সহ্য

BanglaBook.org

করেছে। এরকম ক'জন পারে? অস্বীকার কি করা যায় যে, এই মেয়েটার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল? হয়তো সেইজন্যেই যখন তিনি শুনেছেন লিলি প্রেমে পড়েছে, তখন দারুণ খুশি হয়েছেন। লিলিকে ডেকে একটা হুইস্কির বোতল প্রেজেন্ট করেছেন। জিগ্যেস করেছেন, কে সেই প্রেমিক?

লিলি বলতে চায়নি। নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। তাঁকে জানালে যদি প্রেমিকের কাছে লিলির আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়!

বোকা মেয়ে! ও বুঝল না, সারাটা জীবন প্রেম-চাতকী অনিতা নায়ার কখনও কারও এ-ক্ষতি করতে পারেন না। তবু প্রেম মেয়েটার কপালে সইল না। ওর অফিসে নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। কিন্তু কে, কে খুন করল ওকে এরকম নিষ্ঠুরভাবে? লিপস্টিকে রাঙানো লিলির বীভৎস মুখটা মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন অনিতা নায়ার। ঠিক সেই মুহূর্তেই নায়ারের ডাক কানে এল তাঁর : 'অনিতা! অনিতা!'

শব্দভেদী বাণের মতো সেদিকে কান ঘুরিয়ে হাতের সেলাই রেখে উঠে দাঁড়ালেন অনিতা নায়ার। রুমালে মুখটা একবার মুছে নিয়ে রওনা হলেন নায়ারের ঘরের দিকে।

চৌকাঠে পা দিতেই নতুন এক স্বামীর মুখোমুখি হলেন অনিতা।

সুদর্শন নায়ার হাসছেন। নির্লজ্জ হাসি। ইন্সপেক্টর বরাট থাকাকালীন যতটা অসহায় তাঁকে মনে হয়েছিল এখন বোঝা যায় ততটা অসহায় তিনি নন। কারণ তেলচিটে বিছানার ওপর তাঁর জীর্ণ শরীরটা প্রায় বসবার ভঙ্গিতে স্থির। ঘোলাটে চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। কালচে ঠোঁটের ফাঁকে হলদে দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে।

অদৃশ্য রেডিয়োটা স্তব্ধ করে দিয়ে ষড়যন্ত্র করার মতো চাপা সুরে নায়ার প্রশ্ন করলেন, 'ইন্সপেক্টর চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, চলে গেছেন।' একটু থেমে তারপর : 'তবে কাজ মেটেনি, আবার আসবেন।'

নায়ারের মুখে কালো ছায়া পড়ল। সন্দেহের স্বরে জানতে চাইলেন, 'ওঁকে আমার কথা কিছু বলোনি তো, নিতা?

'না, বলিনি।' নিস্পৃহ উত্তর মিসেস নায়ারের।

উনি এগিয়ে গেলেন বিছানার পাশে রাখা টেবিলের দিকে। ওষুধের শিশি থেকে একটা লাল রঙের ট্যাবলেট বের করে জলের গেলাস সমেত এগিয়ে ধরলেন সুদর্শন নায়ারের মুখের কাছে : 'তোমার কথা লোককে বলার মতো আর কী-ই বা আছে! নাও— খেয়ে নাও।'

বিরক্তিভরে আদেশ পালন করলেন সুদর্শন নায়ার। কিন্তু বোঝা গেল, অনিতার উত্তরে ভীষণ স্বস্তি পেয়েছেন। বিছানার তোশক বারকয়েক চাপড়ে বললেন, 'এসো, এসো। আমার কাছে এসে বোসো।' দুর্বল হাতে অনিতার হাত ধরে টানবার চেষ্টা করলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ডাকে সাড়া দিলেন অনিতা। গিয়ে বসলেন রুগ্ণ স্বামীর পাশে।

নায়ার ঝুঁকে পড়ে ওঁর গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। ঠিক যেন দুটো টারান্টুলা মাকড়সা ঘুরে বেড়াচ্ছে অনিতার নীল-সাদা গাউনের ওপর।

নায়ারের চোখ চকচক করে উঠল। জড়ানো গলায় বললেন, 'লিলি জনসন মেয়েটা দারুণ ছিল, না গো? উঃ, স্বাস্থ্য করেছিল বটে! সাম ডিশ!' সুদর্শন নায়ারের অস্থির হাত

BanglaBook.org

আরও দ্রুত হল অনিতার ভারী শরীরে : 'অন্য মেয়েগুলোর সঙ্গে ওর তুলনাই হয় না। মাত্র তিনবার ওকে দেখেছি, বুঝলে, কিন্তু এখনও ওর ছবি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ও যখন চলে-ফিরে বেড়াত তখন ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন আনন্দে নাচত —ওঃ!' অনিতা নায়ারের বুকে মুখ ঘষতে গিয়ে সুদর্শন নায়ারের শেষ চিৎকারটুকু যন্ত্রণার। বেকায়দায় কোনওরকমে ব্যথা লাগতেই তাঁর মুখে যন্ত্রণার আঁকিবুকি ভিড় করল। হাঁকাতে-হাঁকাতে অস্পষ্ট স্বরে তিনি বললেন, 'এই বয়েস, আর প্যারালাইজড্ পা দুটো—এ দুটো জিনিসই আমাকে মেরে রেখেছে। নইলে...নইলে আমি বাঁচার মতো বাঁচতে পারতাম, নিতা।'

অনিতা নায়ার নিস্পৃহ-নিরুত্তাপ হয়ে বসে ছিলেন। একবার চোখ নামিয়ে দেখলেন তাঁর বুকে মুখ গুঁজে থাকা সুদর্শন নায়ারের দিকে। সবই তিনি জানেন, বোঝেন। কিন্তু এ-এক বিচিত্র পরিস্থিতি। তাই আজও কোনও-কোনও মুহূর্তে অন্যের যৌবনভরা বুক ছেড়ে তাঁর দুঃখ-কষ্টভরা বুকে বৃদ্ধ সুদর্শন সান্ত্বনা খোঁজেন।

অনিতা বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, 'তোমার আশা কোনওদিন মিটবে না।'

উত্তরে সুদর্শনের হাত দুটো আবার পরিব্রাজক হয়ে উঠল। অনিতা চেষ্টা করলেন থামাতে, কিন্তু পারলেন না।

হঠাৎই অনিতার শরীর ছেড়ে একপাশে কাত হলেন সুদর্শন নায়ার। নোংরা ফুলকাটা বালিশের পাশে হাতড়ে একটা বাদামি মলাট দেওয়া চটি বই বের করে নিলেন। তারপর অতি উৎসাহে ভরা ঘোলাটে চোখে যতখানি সম্ভব ঝিকিমিকি তুলে অনিতার কাছে এলেন। চাপা গলায় বললেন, 'এসো—দেখি।'

উদ্গ্রীব হাতে বইটার রঙিন ছবির পৃষ্ঠাগুলো একে-একে ওলটাতে শুরু করলেন সুদর্শন। আরও একবার জরুরি গলায় স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন, 'কী হল, নিতা! এসো, দ্যাখো। এসব বই একা দেখলে তেমন—।'

'তুমি দ্যাখো, আমার দরকার নেই।' তাঁকে বাধা দিয়ে দ্রুত গলায় রুক্ষ উত্তর দিলেন অনিতা।

'কী? রাগ হয়েছে?' হলদে দাঁত বের করে হাসলেন নায়ার। এক হাতে স্ত্রীর একরোখা গম্ভীর মুখটা নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন।

ঝাপটা মেরে ফিরে তাকালেন অনিতা। হিসহিস করে বললেন, 'ছিঃ! তোমার লজ্জা করে না! কে তোমাকে এ-বই এনে দিয়েছে? ওই নোংরা লোকটা?'

নায়ারের হাসি অদৃশ্য হল না। শ্লেষের সুরে বললেন, 'বাইরের লোকদের জ্যান্ত মেয়ে এনে দিলে দোষ নেই, আর আমাকে এ-বই এনে দিলেই যত দোষ!' একটু থেমে সুর পালটে : 'তুমি শুধু-শুধুই লজ্জা পাচ্ছ, নিতা। হাজার হোক তুমি আমার বউ।' নায়ার আবার চোখ রাখলেন বইয়ের পাতায়।

দু-চোখে আগুন জ্বেলে ফুঁসে উঠলেন অনিতা, 'বউ! কে তোমার বউ? বাইরের লোকের কাছে বলো, বলো—আমাকে আর বোলো না! আই অ্যাম সিক অফ দ্য ওয়ার্ড।' মুখ ফিরিয়ে নিলেন অনিতা।

নায়ার চোখ তুলে তাকালেন ওঁর দিকে। অনিতাকে এভাবে রেগে উঠতে খুব কমই দেখেছেন তিনি। এ শুধু রাগ নয়, হয়তো ঘৃণাও। এই মুহূর্তের উত্তেজনায় ওঁর

BanglaBook.org

মুখ দিয়ে শুধু বিষমমাখানো হুল বেরিয়ে আসেনি, হুইস্কির নেশা ধরানো গন্ধও বেরিয়ে এসেছে। তা হলে কি লিলির ভয়ঙ্কর মৃত্যু অনিতাকে বিচলিত করেছে?

আবার বইয়ের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠায় চোখ ফেরালেন সুদর্শন। ভঙ্গিটা খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে সিদ্ধান্ত নিলেন, লিলির মৃত্যু তাঁকেও বিচলিত করেছে। তবে যে-কারণে অনিতা বিচলিত সে-কারণে নয়।

ছবির স্বর্ণকেশীর দিকে তাকিয়ে লোভাতুর হাসি হাসলেন সুদর্শন নায়ার। জড়ানো গলায় বললেন, 'সুইট বিচ!'

তিন

মিসেস নায়ারের ফ্ল্যাট থেকে বেরোতেই পুরোনো দৃশ্য আবার চোখে পড়ল। প্রহরী কনস্টেবল। সিলিং থেকে ঝোলানো উলঙ্গ বাল্‌ব। লিলির ফ্ল্যাটের সবুজ দরজা। এবং পরিবেশে বিষণ্ণ ছাপ। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে লিলির ফ্ল্যাটে ঢুকলাম।

আর সবাই চলে গেলেও সুরেশ এখনও যায়নি। ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা সুদৃশ্য টুলে বসে ডায়েরিতে কীসব যেন লিখে নিচ্ছিল, দরজায় শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে : 'সব কাজ শেষ, স্যার। এখন ঘরের জিনিসপত্রের মোটামুটি একটা লিস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। ওপরে গিয়ে ছাদটাও দেখে এসেছি। ওদিক দিয়ে পালাবার কোনও পথ নেই। মার্ডারার খুন করে সিঁড়ি দিয়েই নেমে গেছে।'

বিছানায় লিলি জনসন এখন অনুপস্থিত। সুরেশ নিশ্চয়ই বডি ডেসপ্যাচ করে দিয়েছে। শূন্য খাটের দিকে তাকিয়ে থেকে ছোট্ট করে 'হুঁ—' বললাম। সুরেশ নন্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ওর ডায়েরির দিকে চোখ রেখে জানতে চাইলাম, 'ডাস্টিংয়ের রিপোর্ট কী? কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?'

'স্পষ্ট নতুন প্রিন্ট অনেক পাওয়া গেছে, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সেগুলো একই লোকের—অর্থাৎ লিলি জনসনের। কারণ, ঘরের আলপিন থেকে এলিক্যান্ট পর্যন্ত সবেতেই ওই আঙুলের ছাপ।' হঠাৎই সুরেশের খেয়াল হওয়ায় ও জিগ্যেস করল, 'আপনার ওদিককার কাজ কেমন গেল?'

'বাড়ির মালিক-মালকিনের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেছি। লিলি সম্পর্কে দু-একটা তথ্যও জানা গেছে। তবে জানি না, তাতে কতটুকু সাহায্য হবে।' একটু হতাশ সুর ফুটে উঠেছিল আমার কথায়। সেটা শুধরে নিয়ে বললাম, 'ভলিদি নীচে এসো। আমি এখন যাচ্ছি এ-বাড়ির পাবলিক রিলেশনস অফিসার কানুর খোঁজে—ওকে ভেতরে চালান করব।' সুরেশের মুখে সপ্রশ্ন ভ্রূকুটি দেখে ব্যাখ্যা করলাম, 'এই সাতান্ন নম্বর বাড়ির দালাল—কানু।'

সুরেশ নন্দা হেসে ফেলল, 'আপনি এগোন, আমি ঘর সিল করে আসছি।'

লিলির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম নীচে। চোখের কাছে হাত তুলে ঘড়ি দেখলাম : বেলা প্রায় দুটো। সঙ্গে-সঙ্গে সিঁড়ির মাথার টিমটিমে আলো নিভে গেল। লোডশেডিং। ভ্যাপসা গরমে ইতিমধ্যেই আমার জামা-প্যান্ট ভিজে উঠেছে ঘামে।

BanglaBook.org

দোতলায় এসে লক্ষ করলাম দুটো ফ্ল্যাটের দরজাই বন্ধ। এই মেয়েদের পরে একসময় জিজ্ঞাসাবাদ করব।

বাড়ির বাইরে পা দিয়েই চোখে পড়ল সরু কাঁচা গলিটায় এখনও ইতস্তত ভিড়ের জটলা। তবে সকালের তুলনায় অনেক কম। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে কাল্লুকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। চেহারার বিবরণ জানি না, অতএব অনুমানই ভরসা।

কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টার পর জনৈক মাঝবয়েসি লোককে কাছে ডাকলাম। মোটাসোটা কালো শরীর। খালি গা। বুকের লোমগুলো সাদা। পরনে লুঙি। কাঁধে গামছা। হাতে বালতি। মাথায় টাক। সম্ভবত স্নান করতে চলেছে। সুতরাং স্থানীয় লোক। জিগ্যেস করলাম, 'কাল্লু কোথায়?'

উত্তরে সে পালটা প্রশ্ন করল, 'কওন কাল্লু? দলাল কাল্লু?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই বলল, 'খেতে গেছে। এই তো, গলি সে নিকালকে ডাঁয়ে। হোটেল "মেহফিল"।'

সঙ্গে-সঙ্গে গলি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। একটা পুলিশ-ভ্যান আমাদের জিপের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে। অন্য আর কোনও ভ্যান নজরে পড়ছে না। যদি কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়, তার জন্যেই হয়তো এই সবেধন নীলমণি পুলিশ-ভ্যানটা প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওর প্রতীক্ষা ব্যর্থ হবে না।

লক্ষ করে দেখি, যে-দুজন কনস্টেবল গলির মুখে ভিড় সামলাতে ব্যস্ত ছিল, এবং যে আরেকজন সাতান্ন নম্বর বাড়ির দরজায় মোতায়েন ছিল, তারা তিনজনেই ভ্যানের পেছন দিকে বসে খোশগল্পে মত্ত। হয়তো ওখানে এখন হেমা মালিনীর কোষ্ঠীবিচার হচ্ছে। ভ্যান ড্রাইভারকে তন্দ্রা ভাঙিয়ে বললাম, এস-আই নন্দা ওপরে আছেন। একটু পরেই আসবেন। আমার খোঁজ করলে যেন বলা হয়, আমি সামনের হোটেল 'মেহফিল'-এ আছি। উত্তরে সে ঘাড় নাড়ল।

ডানদিকের ফুটপাথ ধরে কয়েকটা দোকান পেরোতেই হোটেল 'মেহফিল'-এর সাক্ষাত পাওয়া গেল। উর্দু ছাঁচে ইংরেজি অক্ষরে হলদের ওপর লাল রঙ দিয়ে সবিস্তারে হোটেলের নাম লেখা। কলকাতায় ইদানীং আগাছার মতো 'চাঁপ-বিরিয়ানি' বেচার যে-সব মুসলিম হোটেল গজিয়ে উঠেছে, 'মেহফিল' তার আদর্শ নমুনা।

হোটেলে ঢুকতেই ডানদিকে স্বচ্ছ কাচের ঘেরাটোপের পেছনে বড় পেতলের থালায় চাঁপ, টিকিয়া ইত্যাদি সযত্নে তৈরি হচ্ছে। সেই কাচের ওপর বড়-বড় লাল হরফে ইংরেজিতে লেখা 'নো বিফ'। সুতরাং বলা যেতে পারে, 'মেহফিল' গোমাংস বিশেষজ্ঞ। বাঁ-দিকে চিনেমাটির টালি বাঁধানো লম্বা উনুনে শিককাবাব সেঁকা হচ্ছে। উনুনের তাপে জায়গাটা অসহ্য গরম। হয়তো সেই কারণেই শিককাবাবগুলোকে পাখার বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু লোডশেডিং কবলিত হয়ে পাখাটা এখন অচল।

একটা খুব অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম : দোকানের মালিক থেকে শুরু করে চায়ের খদ্দের পর্যন্ত প্রায় সকলেরই গায়ে নোংরা গেঞ্জি, এবং তা প্যাচপ্যাচে ঘামে ভেজা।

সতর্ক নজর মেলে হোটেলে ঢুকলাম।

পুলিশি আবির্ভাব এসব ক্ষেত্রে দুর্বল শরীরে মালটি-ভিটামিন টনিকের মতো কাজ দেয়। কারণ শিককাবাবি উনুনের পেছনে সানমাইকা লাগানো ছোট্ট ক্যাশ কাউন্টারে যে-

BanglaBook.org

লোকটা বসে ছিল সে একলাফে আমার পাশে এসে হাজির হল।

লোকটার কালো মুশকো চেহারা। মালের চর্চা করে-করে দু-চোখের নীচে চামড়া ঝুলে থলে তৈরি হয়ে গেছে। ধুতিটা-লুঙির মতো করে পরা। গায়ের শার্টটা বোধহয় কোথাও খুলে রেখেছিল, এখন পরে নিতে লাগল। জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে মনে হয় সাবানের নাম এখনও শোনেনি। তা ছাড়া, 'নো বিক' সাইনবোর্ড থাকা সত্ত্বেও লোকটার গা থেকে মোষের মতো গন্ধ বেরোচ্ছে।

একগাদা কালচে দাঁত ও একটা সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে মহিষনন্দন বিগলিত-করুণা হয়ে ফুলশয্যার রাতে বউকে প্রথম 'কাছে এসো' বলার মতো সুরে বলল, 'আসুন স্যার, বসুন, কী খাবেন বলুন—হেঁ-হেঁ—।'

আমি তখন হোটেলের খদ্দেরদের জরিপ করছি। বেশিরভাগই সম্ভবত মুসলমান—খাটিয়ে জাতের। জনাকয়েক বাঙালি এবং মাঝে-মাঝে অ্যাংলো, হিপি কিংবা চিনে।

সকলেই খাওয়ায় ব্যস্ত—শুধু একজন ছাড়া। সে খেতে-খেতেই মুখ তুলে তাকিয়েছে আমার দিকে। তারপর আর চোখ সরাতে পারেনি। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

তার দিকে চোখ রেখেই পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে বললাম, 'জায়গায় গিয়ে বোস। নইলে এক লাথিতে দাঁতের পাটি নামিয়ে দেব।'

বেচারা আমার কথা বুঝল কি না জানি না, তবে আমার অভিব্যক্তি যে তেমন সুবিধের নয় সেটা বুঝতে পারল। তাই চট করে ফিরে গেল নিজের সিটে। কিন্তু আমার দিক থেকে নজর সরাল না।

'কাল্লু কে আছে?' চিৎকার করে জনগণকে প্রশ্ন করলাম।

উদ্দেশ্য সফল হল। কিছুক্ষণ দোটানার মধ্যে থেকে সেই খাওয়া-থামিয়ে-দেওয়া বিশেষ খরিদ্দারটি উঠে দাঁড়াল। গায়ের রঙ ও চেহারা মাঝারি। মেহেদি রাঙানো মাথার চুল পাতলা। মুখে বসন্তের দাগ ঃ অনেক বসন্ত পার হয়ে এসেছে। অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রম হয়ে তার গায়ে সবুজ-সাদা চেক ময়লা বুশশার্ট, সাদা পাজামা, গলায় একটা পাতলা গোলাপি স্কার্ফ। মুখে কয়েকদিনের দাড়ি ও অনেকদিনের গোঁফ।

'কাল্লু?' লোকটাকে লক্ষ করে সরাসরি প্রশ্ন করলাম এবার।

উত্তরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সে।

এসব চরিত্রকে বিশেষ পাত্তা দিতে নেই। প্রথম থেকে এদের ওপর খবরদারি না করলে খবর আদায় করা যায় না। সুতরাং চেঁচিয়েই বললাম, 'জলদি খাওয়া সেরে উঠে আয়!'

দোকানের সব লোক আমার দিকে তাকিয়ে। আমি দ্রষ্টব্য।

কাল্লু আর খেল না। হাত ধুয়ে জামার খুঁটে আর পাজামায় মুছতে-মুছতে উঠে এল। আমার কাছে এসে বহুবার-পুলিশের-মুখোমুখি-হওয়া শান্ত স্বরে বলল, 'বোলেন, স্যার—।'

'থানায় গিয়ে বলব।' আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। ও ছাড়াতে চেষ্টা করবে কি না ভাবছিল, কিন্তু আমার পরবর্তী কার্যকলাপ ওকে নিরস্ত করল

পুলিশের গন্ধ পেয়ে হোটেলের দরজায় ইতিমধ্যে জটলা শুরু হয়ে গেছে। সকলেই মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলেছে যে, 'মেহফিল'-এ পুলিশ এসেছে সকালে মেয়েটার খুনের

BanglaBook.org

ব্যাপারে। কাল্লুকে নিয়ে বেরোতে যাব, দেখি আমাদের পথ জুড়ে জনা তিন-চারেক কৌতূহলী জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। এর আগে ভিড় ঠেলে-ঠেলে এতই বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, এবারে আর মুখে বলতে ইচ্ছে করল না 'সরে যান—', শুধু মাথার ঝাঁকুনিতে লোকগুলোকে ইশারা করলাম সরে যেতে। আদেশ পালনে ওদের মধ্যে হয়তো কিছুটা দ্বিধা দেখা দিয়েছিল, ফলে যা হওয়ার তাই হল। সারাদিনের ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ পেল পায়ের বুটজুতোর মাধ্যমে।

লাথিটা সামনের লোকটার পেছনেই পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ ছিটকে গিয়ে পড়ল ক্যাশকাউন্টারে বসা লোকটার প্রায় কোলে। এবং সেই মুহূর্তেই কাল্লুর টানটান করে রাখা শরীর শিথিল হল। নিজেকে ও ছেড়ে দিল আমার হাতে। ওর শুভবুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিলাম। ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'বেঁচে গেলি। নয়তো ক্যালেন্ডার বানিয়ে দিতাম।'

কাল্লুকে নিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম। জনতার জটলা একেবারে দ্রবীভূত না হলেও এখন মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে। কাল্লুকে বললাম, 'লিলি জনসনের খুনের জন্যে তোকে দরকার। শিগগিরই ছেড়ে দেব।'

ওর মুখে কোনও ভাবান্তর দেখলাম না। বোধহয় এরকম অ্যারেস্ট হওয়া ওর অভ্যেস আছে।

সাতান্ন নম্বরের গলির দিকে নজর দিতেই সুরেশকে দেখতে পেলাম। কাছে আসতেই ওকে ইশারা করলাম চোখ টিপে। অর্থাৎ, কাল্লুকে দাওয়াই সহকারে ভ্যানে তুলতে হবে। আমার স্থির বিশ্বাস, কাল্লু পুরনো দাগী। সুতরাং মিঠে কথায় চিঁড়ে ভেজার পাত্র সে নয়। ওর জন্যে কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন।

সুরেশ আমার ইশারা বুঝল। নিজের শরীরের শক্তি সম্পর্কে ও সচেতন নয় বলে স্কোয়াডে ওর বেশ বদনাম আছে। ও কাল্লুকে আঁকড়ে ধরে এক ঝটকা মারতেই কাল্লুর দেহটা পলকা কাঠির মতো ছিটকে গেল সামনে। পড়ে যেতে-যেতে নিজেকে সামলে নিল কাল্লু। অবাক সুরে বলল, 'আমি তো আপসেই যাচ্ছি। বেকার হাত উঠাচ্ছেন কেন, স্যার?'

ভ্যানের পেছনের দরজাটা হাঁ করে খোলাই ছিল। এবং অন্দরমহলের কনস্টেবল তিনজন 'মেহফিল'-এর কার্যকলাপ দেখে ইতিমধ্যেই বাইরে নেমে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং কাল্লুর কথার উত্তরে সুরেশ নন্দার পরবর্তী মার্শাল-আর্ট-জাতীয় ঝটকা এক উপবৃত্তাকার পথে উড়ন্ত কাল্লুকে পৌঁছে দিল ভ্যানের মেঝেতে। প্রচণ্ড ধপাস শব্দে ভ্যানের ড্রাইভারের তন্দ্রা ছুটে গিয়ে সে চমকে ফিরে তাকাল পেছনে।

আমি সুরেশকে বললাম, 'আমি জিপ নিয়ে ফিরছি। তুমি দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে ভ্যানে এসো। একজন কনস্টেবল লিলি জনসনের দরজায় যেমন মোতায়েন আছে, থাকবে। কারা আসে, যায়, যেন নোট করে নেয়। আর রাতে আমরা হয়তো আবার আসব দোতলার মেয়েগুলোকে ইন্টারোগেট করতে।'

'ও-কে।' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সুরেশ নন্দা।

আমি এগিয়ে গিয়ে জিপে উঠে বসলাম। ইন্দ্রপাল দুবে শিরদাঁড়া সোজা করেই স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসে ছিল। তন্দ্রামগ্ন হয়নি। বুঝলাম, জেগে থাকাটা ওর নেশা। আর তা যদি না হয় তা হলে বেচারা ইনসমনিয়ায় ভুগছে।

BanglaBook.org

আমাকে দেখেই দুবেজি গাড়ি স্টার্ট দিল। জিপ চলতে শুরু করল। লক্ষ করলাম, কৌতূহলী জনতা এখনও গলির মুখে ও পুলিশ-ভ্যানে বন্দি কান্নুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আর সুরেশ নন্দা হাত-পা নেড়ে বেচারা কনস্টেবলকে ডিউটি বোঝাচ্ছে।

দুপুর এখন আড়াইটে। সুতরাং রাস্তায় গাড়ির ভিড় অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। পথ চলতে-চলতে লিলির খুনের ব্যাপারে আমাদের পরবর্তী কার্যপ্রণালী ভাবতে শুরু করলাম।

এক ঃ কান্নুর ইন্টারোগেশান। দুই ঃ মিসেস নায়ারের দোতলার ফ্ল্যাটের মেয়েগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া, আর ওদের জিজ্ঞাসাবাদ। তিন ঃ গোটা কলকাতা শহর আঁতিপাঁতি করে গিটারের তার বিক্রি করে এমন প্রতিটি মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করা—গত এক সপ্তাহে বেশ কয়েকটা চার নম্বর তার কেউ কিনেছে কি না। কিনে থাকলে সেই ক্রেতার চেহারার বিবরণ। চার ঃ 'সোনা ট্রাভেল্‌স'-এ গিয়ে লিলি জনসন সম্পর্কে তথ্য ও খুনের সূত্র সন্ধান করা। আর পাঁচ নম্বর ও সব শেষের কাজ হল ঃ পরবর্তী খুনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা। কারণ, কোনও মানসিক বিকারগ্রস্ত খুনি সাধারণত একটা খুন করে থামে না। আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তা হলে লিলির খুনিও তাই করবে। এই কারণেই একটু আগে আমি একসঙ্গে বেশ কয়েকটা গিটারের তার কেনার কথা বলেছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, কে সেই দ্বিতীয়জন, যে এবার খুন হবে?

কে তুমি, দুর্ভাগ্যবতী?

চার

কান্নু মিঞাকে নিয়ে সুরেশ ফিরল সাড়ে তিনটে নাগাদ। স্বভাবতই ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে। হাজতে ওর থাকার ব্যবস্থা করে সুরেশ এল আমার টেবিলে। ওকে বললাম খাওয়া-দাওয়া সেরে মিনিট পনেরো বিশ্রাম নিয়ে তারপর আসতে। দুজনে মিলে কেসটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, আর ফার্স্ট রিপোর্টটাও তৈরি করে ফেলব। আরও বললাম নীল রুমাল ও 'কিস মি' লিপস্টিকটা নিজে গিয়ে ফরেনসিক ল্যাবে দিয়ে আসতে, এবং ও দুটো জিনিসের কথা যেন খবরের কাগজে ফ্ল্যাশ না হয়।

সুরেশ নন্দা চলে গেল।

আমি রিভলবার খুলে রাখলাম হোলস্টার সমেত। মাথার সবকটা বোতাম খুলে পাখার হাওয়ায় চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলাম। আমরা ভাগ্যবান। এখানে লোডশেডিং হয়নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে লিলি জনসনের চিন্তায় আচ্ছন্ন হলাম।

খারাপ মেয়েদের খুন করে ফেলতে হবে এ-কথা কেউ আইন করে বলে যায়নি। সুতরাং লিলির সুবিচার পাওয়ার অধিকার আছে। তা ছাড়া, খারাপ মেয়ে হওয়াটা ওর জীবনের অ্যাম্বিশন ছিল না। হয়তো পরিস্থিতি ও প্রয়োজন ওকে এ-পথে নিয়ে এসেছে। লিলি জনসন যে দেখতে সুন্দরী ছিল সে-কথা ওর একরাতের দাম ও সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট দেখেই অনুমান করা যায়। এইরকম একটা সুন্দরী মেয়ে যদি কোনও অফিসে চাকরি

BanglaBook.org

করে তা হলে তার প্রেমিক জুটতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। বিশেষ করে সেখানে লিলির পরিচয় ছিল অন্যরকম। সুতরাং ত্রিভুজ-প্রেমের চিরন্তন ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় কি না সে-কথা ভাবতে শুরু করলাম। আনমনা চোখে দেখতে লাগলাম সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় চকিতে জট পাকিয়ে যাওয়া সিগারেটের ধোঁয়ার সূক্ষ্ম তন্তুজাল। জানি না, এইভাবে কখন আমার তন্দ্রা এসে গেছে। ইন্দ্রপাল দুবের কাছে আমি হেরে গেছি।

সুরেশের ডাকে আমার চটকা ভাঙল। হাতঘড়িতে চোখ রেখে দেখি বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ইশারায় সুরেশকে টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বললাম। ও বসে নিজেকে গুছিয়ে নিল। তারপর একটা বড় খাম টেবিলের ওপর এগিয়ে দিল। বলল, 'স্যার, এতে ফাইল করার মতো ইনফরমেশন রয়েছে। আর আছে মিস্টার দে-র তোলা সমস্ত ফটোগ্রাফ—এমনকী ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলোও আছে। এক্সপ্রেস বলে সবই তাড়াহুড়ো করে করিয়ে নিয়েছি।'

আমি খামের মুখ খুলে লিলির ফ্ল্যাটের গ্লসি প্রিন্টগুলো দেখতে লাগলাম।

সুরেশ বলে চলল, 'ডক্টর সকসেনা বলেছেন পি-এম রিপোর্ট কাল পাওয়া যাবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সম্পর্কে এক্সপার্ট কমেন্টও কালকের আগে পাওয়া যাবে না। এদিকে কাল্লুর ফটো তুলে রেকর্ডস সেকশানে ছবি আর নাম দিয়ে বলেছি পুরোনো রেকর্ড কিছু থাকলে খুঁজে বের করতে।'

শেষ কথাটা শুনে আমি হাতের ফটো থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছি। কী ভেবে সুরেশকে বললাম, 'এক কাজ করো, কাল্লুকে এখানে নিয়ে এসো। ইন্টারোগেট করা যাক—।' আমার কথায় সুরেশ নন্দা যেন একটু অবাক হল।

আমাদের ঘরটায় তিনজন ইন্সপেক্টর বসে। অতীন দত্ত, মনোজ সেনগুপ্ত এবং আমি—মুকুন্দ বরাট। এই মুহূর্তে দত্ত অনুপস্থিত। সেনগুপ্ত কী একটা টাইপ করা রিপোর্টে চোখ বোলাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সেনগুপ্তদা, একটা রাঁড়ের দালালকে এখানে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। আপনার অসুবিধে হবে?'

সেনগুপ্ত চোখ তুলে তাকাল। পানের ছোপধরা দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, 'অসুবিধে আবার কী! বরং মজা লোটা যাবে। তা কোথাকার দালাল? রামবাগান?'

'না, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট।'

আমার উত্তর শুনে মনোজ সেনগুপ্ত গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝল, কোন খুনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দালালটার জবানবন্দি নেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি হাতের রিপোর্টটা গুছিয়ে বলল, 'থাক, আমি বরং পাশের ঘরে যাচ্ছি।'

অনুমান করলাম, লিলির খুনের বীভৎসতা বেশ চাউর হয়েছে স্কোয়াডে। তা ছাড়া, সেনগুপ্তদার মতো প্রৌঢ় ঝুটঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাইবে সে আর আশ্চর্য কী!

মনোজ সেনগুপ্ত ও সুরেশ নন্দা প্রায় একইসঙ্গে ঘর থেকে বেরোল। মিনিট কুড়ি পরে সুরেশ ফিরে এল। কাল্লু সমেত। কোঁকড়ানো চুলে হাত চালিয়ে বলল, 'নিন, স্যার, আসামী হাজির।'

কাল্লু যেন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। দু-হাত কোলের কাছে জড়ো করে ও ক্লান্ত চাউনি নিয়ে আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সুরেশকে ইশারা করতেই ও একটা টুল জোগাড় করে দিল কাল্লুর জন্যে। তারপর চেয়ার টেনে ওর পাশে

BanglaBook.org

সতর্ক ভঙ্গিতে বসল।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'কান্নু , যা-যা জিগ্যেস করব চটপট জবাব দিবি। নইলে আমি হাল ছেড়ে দেব, নন্দাসাহেবই বাকি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ওঁর হাতের দাওয়াই খেলে জানবি তোকে মেরামত করার মিস্তিরি এ-দেশে পাওয়া যাবে না।'

কান্নু একবার আড়চোখে সুরেশকে দেখল। সুরেশ নন্দা মিটিমিটি হাসছে।

কান্নু ছোট্ট করে মাথা নেড়ে জানাল, সে ঠিকমতো সব জবাব দেবে। অতএব প্রথম প্রশ্নটা করে ফেললাম।

'দালালির লাইনে ক'বছর আছিস?'

'প্রায় পাঁচ সাল, স্যার।' গলার স্বর কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা। অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওর কাছ থেকে আমি মেহেদি হাসানের গলা আশা করি না।

'তার আগে কী করতিস?'

দু-বার চোরা চাউনি সুরেশের দিকে, একবার আমার দিকে। একবার ঢোক গিলল। তারপর : 'ইয়ে...পকেট মারতাম, স্যার...।'

'নায়ারের বাড়ির মেয়েগুলোর জন্যে তুই-ই খদ্দের পাকড়াও করিস?'

'হ্যাঁ, স্যার। তবে ও-বাড়ির দিদিমণিরা...' একটু ইতস্তত করে : '...সব নোকরি করে। ঘরে লোক নেয় মরজিমাফিক। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা আমি দিদিমণিদের জিগ্যেস করে নিই, ঘরে আদমি বুলাব কি না, তাদের দিল-তবিয়ত ঠিক আছে কি না। তারপর গলির মুখে গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। খরিদ্দারের খোঁজ করি। দিদিমণিরা কেউই সাফসুরত-বেশ আদমি না হলে ঘরে তোলে না। তাই আমাকেও লোক বুঝে ডাকতে হয়...।'

সুরেশ একমনে কান্নুর কথা শুনছে। দু-হাতের দশ আঙুল মাথায়-মাথায় ঠেকিয়ে ও অল্প-অল্প দুলতে লাগল চেয়ারে। ছেলেটার অক্লান্ত উৎসাহ আমার ভালো লাগে। এরকম ছেলে দুর্লভ।

'কাল রাতে লিলি জনসন ঘরে ক'জন লোক নিয়েছিল?' পরের প্রশ্ন করলাম কান্নুকে।

'সির্‌ফ্ এক,' কান্নু একেবারে তোতাপাখির মতো গান গাইছে। সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড় খুনের মামলাকে ভীষণ ভয় পায়। মুখে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে আরও বলল, 'লিলি মেমসাবই বলেছিল একজনকে পাঠাতে। আমি গলির মুখে দাঁড়িয়ে লোক খুঁজছি, এমনসময় একটা কালো জামা পরা লোক নিজে থেকে আমার কাছে এল। তখন রাত আটটা বেজে গেছে। গলির মুখের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে জায়গাটা আঁধার হয়ে গেছে। লোকটা এসে আস্তে-আস্তে বলল, লিলি মেমসাবের ঘরে নিয়ে যেতে। আমি ভেবেছি, লোকটা হয়তো মেমসাবের পুরানা মাশুক—তাই নাম-ধাম সব মুখস্থ করে রেখেছে। সে যাই হোক, অওর বাত না বাড়িয়ে আমার নিজের ভাগের দশটা টাকা লোকটার কাছ থেকে নিয়ে আমি তাকে সোজা পৌঁছে দিয়েছি লিলি মেমসাবের ডেরায়, তিনতলায়—।'

আমি ঝুঁকে এলাম সামনে। প্রশ্ন করতে গিয়ে টের পেলাম আমার স্বর উত্তেজনায় কাঁপছে।

BanglaBook.org

'কেমন দেখতে লোকটাকে?'

'বললুম তো স্যার, তখন রাত হয়েছে। ভালো মতন আলো ছিল না। লোকটাকে ভালো করে দেখতে পাইনি। তা ছাড়া, খরিদ্দারদের আমরা অত নজর করে দেখি না।'

আমি আরও উদ্গ্রীব সুরে বলে উঠলাম, 'কান্নু, ভালো করে মনে করে দ্যাখ! চেহারা কিচ্ছু মনে পড়ছে না?'

কান্নু যেন চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। মাথার মেহেদি রাঙানো চুলে হাত চালাল বারকয়েক। তারপর : 'একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়েছিল, স্যার। লোকটার মাথার চুলগুলো ছিল ঠিক কাগজের মতো সাদা...আর কাঁচাপাকা গোঁফ ছিল...।'

আমি আর সুরেশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সাদা চুল? কাঁচাপাকা গোঁফ? খুনি কি তা হলে কোনও বৃদ্ধ? কিংবা প্রৌঢ়?

'লোকটার বয়েস কীরকম হবে? জোয়ান?' এবারের প্রশ্নটা করল সুরেশ নন্দা।

কান্নু ফিরে তাকাল সুরেশের দিকে : 'সেরকম জোয়ান নয়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর হবে।'

সুরেশ দুঃখের হাসি হেসে বলল, 'ব্যাড ল্যাক, স্যার। এইটুকুতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তা ছাড়া...।'

সুরেশের মন্তব্যকে মাঝপথে থামতে হল। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের পরিবেশের শান্ত গোছালো ভাব ছিন্নভিন্ন করে ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো এসে উপস্থিত হল এস-আই দীপক সামন্ত। মাথার চুল এলোমেলো। ফরসা মুখ টকটকে লাল। চোখের আকার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড়। গলার স্বরে রাজ্যের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততা।

'স্যার! স্যার! টেলিফোন—' হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল দীপক, 'লিলি জনসনের মার্ডারার ফোন করেছে! এখন ফাইভ এইট এক্সটেনশানে লাইন দেওয়া আছে। কুইক!'

ঘরে জরুরি-অবস্থাকালীন সামরিক ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল।

এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, আমার সারাটা শরীর থরথর করে কাঁপছে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট পলকে গুঁজে দিলাম টেবিলে রাখা কাচের ছাইদানে। সুরেশকে বললাম, 'কান্নুকে ভেতরে পুরে দাও। এক্ষুনি। তারপর একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে ফাইভ এইট এক্সটেনশানে চলে এসো। জলদি!'

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুরেশ নন্দা। ওর চেয়ারটা উলটে পড়ে গেল মেঝেতে। হাত বাড়িয়ে ঠেক ছেলেখেলার ভঙ্গিতে কান্নুকে কাঁধে তুলে নিল ও। কান্নুর বিস্মিত আর্তনাদকে আমল না দিয়ে, 'টেপটা নিয়ে এক্ষুনি আসছি,' বলে দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি দীপকের দিকে তাকালাম। ওর মুখ-চোখের চেহারা অনিশ্চিত।

ফাইভ এইট এক্সটেনশানটা হোমিসাইড স্কোয়াডের ডেস্ক সার্জেন্ট রজত চৌধুরীর টেবিলে—তিনতলারই দূরপ্রান্তে। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে দুদ্দাড় শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করলাম। পিছনে দীপক। জিমি হাইনস, তাকিয়ে দ্যাখো, আমি তোমার ৯.৯ সেকেন্ডে একশো মিটারের ওলিম্পিক রেকর্ড বোধহয় ভাঙতে চলেছি।

লিলি জনসনের খুনি টেলিফোন করবে আমি ভাবিনি। তবে এটুকু জানতাম, সাইকোটিক কিলারদের চরিত্র বড় বিচিত্র হয়। এই কারণেই সুরেশকে বলেছিলাম লিপস্টিক আর রুমালের ব্যাপারটা কাউকে না জানাতে। এখন খুনির কথায় যদি ওই দুটো জিনিসের

BanglaBook.org

উল্লেখ পাই, তা হলে সেটাই হবে চূড়ান্ত প্রমাণ।

রজত চৌধুরীর টেবিলে পৌঁছতে সময় লাগল মোটামুটি আট সেকেন্ড। রজত তখন টেলিফোনে কথা বলছে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে 'হুঁ'-'হ্যাঁ' করে ও-প্রান্তের লোকটির কথায় সায় দিয়ে সময় নিচ্ছে। আমাকে দেখেই টেলিফোনের রিসিভারটা বাড়িয়ে দিল ও : 'নিন, স্যার। কথা বলুন।'

রিসিভার কানে দিতেই আমার শরীরে সেই শীত-শীত অনুভূতিটা আবার ফিরে এল। শিরদাঁড়া জড়িয়ে আবার খেলা করতে শুরু করল হিলহিলে কালনাগিনী। যেন শুনতে পেলাম অসংখ্য দেবদারু গাছের পাতায় শিস কেটে যাওয়া ঠান্ডা হাওয়ার দাপাদাপির শব্দ। মনে পড়ল লিলি জনসনের লিপস্টিক মাখা দগদগে লাল মুখটার কথা। তৈরি হয়ে হালকা গলায় রিসিভারে কথা বললাম।

'হ্যালো—।'

'ইন্সপেক্টর...ইন্সপেক্টর বরাট...আপনি?' কর্কশ ফিসফিসে স্বরে ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল ইতস্তত অনিশ্চিত উত্তর।

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর বরাট বলছি। আপনি কে?' ইচ্ছে করেই গলার স্বরে রুক্ষ বিরক্তভাব ফুটিয়ে তুললাম। যেন আমি খুব ব্যস্ত। আজেবাজে লোকের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। কারণ আমার বিশ্বাস এতে কিছুটা কাজ হবে। যে-খুনি খুন করে টেলিফোনে জানাতে চায় নিজের অপরাধের কথা, সে নিঃসন্দেহে অহঙ্কার ও অনুশোচনায় সম্পৃক্ত। সুতরাং তাকে যদি বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া হয় তা হলে তার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে, এবং সে যথাসম্ভব আন্তরিকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে সে-ই খুনি। এ-ক্ষেত্রেও তাই হল।

'ইন্সপেক্টর..ইন্সপেক্টর...আমি লিলি জনসনকে খুন করেছি...' টেলিফোনে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমে গভীরতর হচ্ছে। কথা বলার সুরটা কেমন অদ্ভুতরকম মোলায়েম।

ঠিক তখনই একটা পোর্টেবল টেপরেকর্ডার নিয়ে হাজির হল সুরেশ নন্দা। সন্তর্পণে টেপরেকর্ডারটা রজতের টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। রাবার সাকার লাগানো মাইক্রোফোনটা নিয়ে চেপে আটকে দিল টেলিফোন রিসিভারের কথা শোনার প্রান্তে। সমস্ত কাজই প্রায় নিঃশব্দে হল। এবার রেকর্ডারের বোতাম টিপল সুরেশ। ম্যাগনেটিক টেপরেকর্ডার ঘুরতে শুরু করল। আর একই সঙ্গে আবার কথা বলতে শুরু করল লিলি জনসনের হত্যাকারী।

'লিলিকে...লিলিকে আমি ঠিক...ঠিক খুন করতে চাইনি, ইন্সপেক্টর। কিন্তু...কিন্তু ও এত...খারাপ মেয়ে ছিল যে...সত্যি বলছি, আমি প্রায় বাধ্য হয়েই ওকে...' ও-প্রান্ত নীরব হল হঠাৎ।

খেই ধরিয়ে দিতে আমি বলে উঠলাম, 'বলুন—।'

ইতস্তত করে কর্কশ স্বর উত্তর দিল, '...জানেন, ইন্সপেক্টর বরাট, খুনটা করার পর থেকেই বুঝতে পারছি, আমার কী যেন একটা হয়েছে...মানে, আমি...আমি নিজেকে ঠিক...সবসময় ধরে রাখতে পারছি না। আর লিলি..লিলিই তো নাম ছিল মেয়েটার, তাই না?'

প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে, এবং ও-প্রান্তে লিলি জনসনের খুনি যখন উত্তরের অপেক্ষা করছে তখন বলতেই হল, 'হ্যাঁ, লিলি জনসন—।'

BanglaBook.org

আমি এতক্ষণে কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। কারণ, এখনও প্রমাণ পাইনি এই লোকটা সত্যিই লিলির খুনি কি না।

'লিলিকে আমি...আমি...ভালো বলে জানতাম...ও যে রীনার মতো, সেটা...সেটা আগে বুঝিনি। বুঝলে কি আর...' কণ্ঠস্বর থমকাল।

রীনা! কে রীনা! সে-ও কি খুন হয়েছে এই খুনির হাতে?

সে-ও কি লিলির মতো খারাপ মেয়ে ছিল?

হঠাৎই সুর পালটাল কণ্ঠস্বর। ভাঙা গলায় বলল, 'ইন্সপেক্টর...আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, ইন্সপেক্টর...' তিন পরদা উঁচু হল গলার স্বর, '...আমাকে ...শাস্তি...দিন। আমাকে শাস্তি দিন...।'

টের পেলাম, শীত-শীত অনুভূতি এখন যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের উত্তাল দুন্দুভি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

আমাকে ঘিরে দীপক সামন্ত, রজত চৌধুরী ও সুরেশ নন্দা পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমার মনে পড়ল, লিলির ড্রেসিং টেবিলের আয়নার লিপস্টিকে লেখা লাইনটার কথা : আমাকে শাস্তি দিন। তুমি তা হলে সত্যিই লিলি জনসনের খুনি? সে-কথা যাচাই করতে পরের প্রশ্নটা করলাম।

'লিলির ঘরের আয়নায় কী লিখে এসেছেন আপনি?'

'কী...লিখে...এসেছি? ওঃ, হ্যাঁ...আমাকে আর যন্ত্রণা দেবেন না, ইন্সপেক্টর। লিখেও সেটা আমি আবার...মুছে ফেলেছি...আমি অপরাধী, ইন্সপেক্টর...আমি পাপী। আমাকে অ্যারেস্ট করুন। ফাঁসি দিন...প্লিজ..' করুণ আকুতি ঝরে পড়তে লাগল কণ্ঠস্বরে। একটু পরেই ভেসে এল ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ, আমি এভাবে আর পারছি না। অথচ আশ্চর্য, রীনাকে খুন করার পর কিন্তু এত দুঃখ হয়নি...এত কষ্ট হয়নি। কিন্তু লিলি...' কান্নার দমক রোধ করতে নাক টানার শব্দ শোনা গেল এবার, 'ফর গড্‌স সেক, ক্যাচ মি...ক্যাচ মি...প্লিজ...।'

'আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?' এখন আর কোনও সন্দেহ নেই যে, এই আমাদের লোক। সুতরাং সুরেশকে ইশারায় জানালাম তৈরি হতে। ও দীপককে বলল জিপ ঠিক করে আসতে। কলটা যদি কোনওরকমে ট্রেস করা যায় তাহলে খুনি যেখান থেকে ফোন করছে আমরা জিপ নিয়ে পলকে সেখানে গিয়ে হাজির হব।

কিন্তু আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ও আয়োজন নিষ্ফল হল। কারণ, ও-প্রান্তে কণ্ঠস্বর বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল, তারপর : 'আমাকে অ্যারেস্ট করুন, ইন্সপেক্টর...নইলে...আবার হয়তো আমি কিছু একটা করে বসব...প্লিজ...ফর গড্‌স সেক, প্লিজ...' এবং টেলিফোন আচমকা নামিয়ে রাখার শব্দ।

কিছুক্ষণ আমরা সকলেই চুপচাপ। এতক্ষণে বুকভরে আরাম করে শ্বাস নিলাম আমি। রেকর্ডারের টেপ এখনও ঘুরে চলেছে। আর টেলিফোন রিসিভার আমার হাতে নিষ্ক্রিয়, নিষ্প্রাণ ও অবিচল। ধীরে-ধীরে সেটা নামিয়ে রাখলাম।

'কী হল, স্যার?' রজত চৌধুরী জানতে চাইল আগ্রহের সুরে।

'কিচ্ছু না—' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলাম।

বোতাম টিপে রেকর্ডার বন্ধ করল সুরেশ নন্দা। ওকে বললাম, রেকর্ডারটা নিয়ে আমার ঘরে আসতে।

BanglaBook.org

চলে যেতে গিয়েও একটা কথা মনে পড়ায় থমকে দাঁড়ালাম। রজতকে জিগ্যেস করলাম, 'চৌধুরী, ফোনটা প্রথমে কীভাবে এসেছিল বলো তো?'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল রজত চৌধুরী। বলল, 'ফোনটা প্রথমে রিসেপশানে আসে। সেখানে হোমিসাইড স্কোয়াড চাওয়ায় লাইনটা ওরা আমার এখানে দিয়ে দেয়। লোকটা আমাকে বলে, লিলি জনসনের খুনের ব্যাপারে তার কিছু জরুরি কথা আছে, কার সঙ্গে কথা বলবে। আমি বললাম, আমাকে বলুন। তাতে সে একটু চটে গিয়ে বলল, আমাকে বললে হবে না, খুনের ইনভেস্টিগেশানের চার্জে যে-ইন্সপেক্টর আছেন তাঁকে চাই। কারণ লিলিকে সে-ই খুন করেছে। তখন আমি আপনার নাম বলে তাকে অপেক্ষা করতে রিকোয়েস্ট করি এবং মিস্টার সামন্তকে বলি আপনাকে জলদি ডেকে আনতে। আর অন্য এক্সটেনশান থেকে রিসেপশানে ফোন করে বলে দিয়েছি, কলটা ট্রেস করার চেষ্টা করতে।' থামল রজত।

এমনসময় ছুটে এসে ঘরে ঢুকল দীপক সামন্ত। আমাকে লক্ষ করে বলতে শুরু করল, 'স্যার, জিপ—' কিন্তু আমাদের তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝপথেই থেমে গেল।

ওর বিহ্বল সপ্রশ্ন চাউনির উত্তরে সুরেশ বলল, 'লোকটা লাইন কেটে দিয়েছে। কোত্থেকে ফোন করেছে জানা যায়নি।'

'সামন্ত, তুমি দ্যাখো তো কলটা ট্রেস করা গেছে কি না। আশা খুবই কম। তবে কোনও খবর পেলে আমাকে জানিয়ো।' আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

নিজের ঘরে ফিরে এসে আমি আর সুরেশ যখন আবার মুখোমুখি বসলাম, তখন শরীরে না হলেও মনের দিক থেকে আমরা দুজনেই সম্ভবত শ্রান্ত। টেপরেকর্ডারটা আমার টেবিলে নামিয়ে রেখেছে সুরেশ। একটা সিগারেট ধরিয়ে ওকে বললাম টেলিফোনের কথাগুলো প্লেব্যাক করে বাজিয়ে শোনাতে এবং রেকর্ডিংয়ের প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে। ও সামান্য অবাক হলেও কোনও প্রশ্ন করল না। টেপটা রিওয়াইন্ড করে বাজাতে শুরু করল। শোনা গেল লিলি জনসনের খুনির কণ্ঠস্বর।

'লিলিকে...লিলিকে আমি ঠিক...'

সিগারেটে গভীর টান দিয়ে আমেজের চোখ বুজলাম। মনোনিবেশ এখন সূক্ষ্ম ও গভীর হওয়া প্রয়োজন। টেলিফোনে শুধু খুনির কণ্ঠস্বর ছাড়াও অন্যান্য শব্দগুলো আমি ভালো করে শুনতে চাই। ওই শব্দ থেকেই হয়তো আন্দাজ করা যেতে পারে খুনি কী জাতীয় জায়গা থেকে টেলিফোনটা করেছে। কথা বলার সময়েই সেরকম কিছু শব্দ আমার কানে এসেছিল, এখন সে-বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

টেপরেকর্ডার একসময় থামল। সুরেশকে জিগ্যেস করলাম, 'কী, কিছু আন্দাজ করতে পারলে?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা শব্দ শোনা গেল। টাইপরাইটিং মেশিন চলার শব্দ, গাড়ির হর্নের শব্দ, বাস কিংবা লরিজাতীয় ভারী কোনও গাড়ি ছুটে যাওয়ার চাপা গর্জন...।'

'ঠিক ধরেছ!' আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম : 'শব্দগুলো শুনে মনে হচ্ছে কোনও অফিস থেকে খুনি ফোনটা করেছে আর সেই অফিস কোনও বিজি রোডের ওপর দাঁড়িয়ে। আর...খুনির আচমকা ফোন নামিয়ে রাখার কারণ হতে পারে তার

BanglaBook.org

কাছাকাছি কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি হঠাৎই চলে এসেছিল। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে অন্য জায়গায়...।'

'কীসের সমস্যা, স্যার?' সুরেশের অভিব্যক্তি সপ্রশ্ন হল।

'এখন সময় প্রায় সাতটা পনেরো। এ-সময় কি কোনও অফিস খোলা থাকে?'

'থাকতে পারে। ওভারটাইম। প্রাইভেট কার্ম হওয়াটাই স্বাভাবিক।' সুরেশ সমাধান জুগিয়ে দিল সহজেই।

কিন্তু আমি প্রতিবাদ করলাম : 'সুরেশ, প্রথম থেকেই আমরা কিন্তু জায়গাটাকে কোনও অফিস বলে ভেবে নিয়েছি। এর সবচেয়ে সহজ সম্ভাবনাটা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। জায়গাটা কোনও দোকান তো হতে পারে—যেখান থেকে পয়সা দিয়ে সহজেই ফোন করা যায়! তা ছাড়া, যে-কোনও দোকান সাধারণত সাড়ে সাতটা-আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে।'

'তা হয়তো হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে খুনির পক্ষে প্রাইভেসি পাওয়া শক্ত,' সুরেশের কথা বলার ভঙ্গিতে স্পষ্ট হল যে, আমার যুক্তিটা ওর মনঃপূত হয়নি।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ওকে বললাম কাগজপত্র গুছিয়ে তৈরি হতে, কারণ 'এফ.আই.আর.-টা' এখন লিখে ফেলব।

লিলি জনসনের ফাইল বের করে কাগজপত্র ঘেঁটে 'এফ.আই.আর.' তৈরি করতে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। সুরেশকে বললাম লেখাটা টাইপে দিতে। কাল সকালে ও-সিকে যাতে দেওয়া যায়। আর কানুচন্দ্রকে এখন আরেকবার নিয়ে আসতে। তখন হঠাৎই ফোনটা এসে পড়াতে কানুর জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করা যায়নি।

খটকা লাগলেও সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল সুরেশ নন্দা। আমি লিলি জনসনের ফাইলটা কাছে টেনে নিলাম। এ-পর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো লিখে রাখতে শুরু করলাম। কলম ও দুশ্চিন্তা পাশাপাশি রেখায় এগিয়ে চলল।

দুটো জিনিস এ-পর্যন্ত খুব ভাবিয়ে তুলেছে। এক : সাদা চুল। দুই : রীনা।

কানুর সাক্ষ্য যদি সত্যি হয় তা হলে ধরে নিতে হয় কোনও কারণে, সে ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা যাই হোক, খুনির মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। এবং রাতে সে লিলির সঙ্গে ছিল।

পি-এম রিপোর্ট পেলে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এরপর রহস্যময়ী রীনা। খুনির স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায় রীনা নামে একটি মেয়েকে সে এর আগে খুন করেছে এবং সেই মেয়েটিও লিলির মতো খারাপ ছিল। এই খবরটা রেকর্ড্‌স সেকশানে দিয়ে এক্ষুনি বলা দরকার খুঁজে বের করে দেওয়ার জন্যে। তা হলেই জানা যাবে, রীনা নামে কোনও মেয়ের খুনের খবর আমাদের এখানে আছে কি না এবং সেখান থেকেই হয়তো খুনির কোনও হদিশ পাওয়া যাবে।

সুতরাং দেরি না করে নিজেই রওনা হয়ে পড়লাম রেকর্ড্‌স সেকশন অভিমুখে। সুরেশ কানুকে নিয়ে এলে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

মানসিক কোনও খুনিকে নিয়ে কাজ করার সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল ওরা পুরোপুরি অনিশ্চিত। ওদের কার্যকলাপের কোনওরকম ইশারা আগে থেকে পাওয়া যায় না। তবে এই খুনি তৃতীয় কোনও খুন করুক আর না করুক, এটুকু বলতে পারি টেলিফোন

BanglaBook.org

আবার সে করবেই। কারও কাছে নিজেকে জাহির করাটা মানসিক খুনিদের একটা নেশার মতো। এই খুনির কাছেও।

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘরে ফিরে দেখি সুরেশ ও কান্নু আমার অপেক্ষায় বসে আছে। ওদের মুখোমুখি হয়ে নিজের চেয়ারে বসেই প্রশ্নবাণ শুরু করলাম।

'হ্যাঁ, তখন যা জিগ্যেস করছিলাম...। সেই সাদা চুল লোকটা রাতে লিলির ঘর থেকে আর বেরিয়ে আসেনি?'

'স্যার, ওই ইলাকায় আমি থাকি রাত বারোটা পর্যন্ত। সেই সময়ের মধ্যে লোকটা যে বেরিয়ে আসেনি তা আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।' একটু ভেবে কান্নু আরও যোগ করল, 'অবশ্য বেশিরভাগই এরকম করে। রাতটা মেমসাবদের ডেরায় কাটিয়ে দেয়। মেমসাবরা তেমন আপত্তি করে না।'

এইবার কান্নুর দিকে স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলাম আমি। ও একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল। আমিও সেটাই চাইছিলাম। ঠান্ডা গলায় বললাম, 'কান্নু, সাতান্ন নম্বরের দিদিমণিরা মরজিমতো খদ্দের নেয়। তা হলে তোর তো মাসে একশো-দেড়শো টাকার বেশি হয় না! সংসার চালাস কী করে?'

কান্নু আমতা-আমতা করল। চোরা চাউনিতে দেখল সুরেশের দিকে। সুরেশ কোনওরকম ইঙ্গিত না দিয়ে হঠাৎই বাঁ-হাতে ঘাড়টা টিপে কান্নুকে তুলে ফেলল টুল থেকে। তারপর ডান হাতে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় কষাল ওর গালে। একটা দাঁত ও কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটকে পড়ল মেঝেতে। দ্বিতীয় থাপ্পড় পড়তেই কান্নু রক্তাক্ত মুখ নিয়ে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠল। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'বই বেচি, স্যার—বই বেচি! আল্লার কসম, পকেট মারি না!'

সুরেশ ওকে আবার টুলে বসিয়ে দিল। কান্নু স্কার্ফটা নিজের মুখে গুঁজে নিল রক্তপাত বন্ধ করতে। আমি সুরেশের দিকে তাকালাম। সারাদিনের পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় ছেলেটার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আমি কান্নুকে লক্ষ করে জিগ্যেস করলাম, 'কীসের বই বেচিস? কারা কেনে?'

'ছবির বই বেচি, স্যার', জড়ানো গলায় বলল কান্নু, 'ও ইলাকায় যারা যায় তাদের অনেকেই কেনে—'

'সাতান্ন নম্বরের কেউ কেনে? কোনও দিদিমণি?'

কান্নুর উত্তরটা কিন্তু আমাদের দুজনকেই অবাক করল : বই কেনেন বৃদ্ধ নায়ার। অনিতা নায়ারের স্বামী!

আমি চমকে উঠলাম। ওই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসুস্থ বৃদ্ধ এসব নোংরা বই নিয়ে কী করেন? অনিতা নায়ার কি জানেন ব্যাপারটা?

আরও কিছু নিয়মমাফিক 'নাম-ধাম-পেশা' জাতীয় প্রশ্ন করে কান্নুকে রেহাই দিলাম। সুরেশ ওকে আবার রেখে আসতে গেল।

আমি টেপটা বাজিয়ে টেলিফোনের কথাগুলো আবার শুনতে লাগলাম।

সুরেশ নন্দা ফিরে এল একটু পরেই। চুপচাপ চেয়ারে বসে মনোযোগ দিয়ে টেপটা শুনতে লাগল। শুনতে-শুনতে হঠাৎ চাপা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল ও, 'স্যার! আর-একটা ক্লু পাওয়া গেছে! খুনি লিলিকে আগে থেকেই চিনত।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কাল্লু যখন বলেছে যে, সাদা-চুল লোকটা সরাসরি এসে বলে, লিলির ফ্ল্যাটে যাবে, তখন মানতেই হয়, সে লিলিকে আগে থেকে চিনত।'

আমার স্বাভাবিকতা সুরেশ নন্দাকে আরও উত্তেজিত করে তুলল। আমার কথা শেষ হতে না হতেই ও বলে উঠল, 'না, স্যার, কাল্লুর স্টেটমেন্ট থেকে নয়! টেলিফোন!' বলেই ও মাঝপথে টেপটা থামিয়ে আবার প্লে-ব্যাক করতে শুরু করল।

আমি এবার কৌতূহলী ও সন্দিহান হয়ে উঠলাম। শুরু হল টেলিফোনে খুনির সঙ্গে কথোপকথন। একটা বিশেষ লাইনে পৌঁছে সুরেশ বলল, 'স্যার, শুনুন!'

খুনির কণ্ঠস্বর তখন আবেগক্লিষ্ট স্বরে বলছে, 'লিলিকে আমি...আমি...ভালো বলে জানতাম...ও যে রীনার মতো, সেটা...সেটা আগে বুঝিনি। বুঝলে...।'

লাইনটা আবার বাজিয়ে শোনাল সুরেশ নন্দা। তারপর আরও একবার।

ওর কথার তাৎপর্য এবার স্পষ্ট বুঝলাম। খুনি লিলিকে চিনত। ভালো বলে জানত। তার মানে কি ভালো 'মেয়ে' বলে জানত? পরে আসল রূপ জেনে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়?

সুরেশকে প্রশংসার ধন্যবাদ জানালাম। ও টেপরেকর্ডার বন্ধ করল। ওকে বললাম, 'লিলির খুনের খবরটা এবার তুমি নিউজ মিডিয়াকে জানাতে পারো। তবে রুমাল ও লিপস্টিকের ব্যাপারটা চেপে যেয়ো—' সুরেশের উজ্জ্বল চোখ দেখে টের পেলাম, এখন ও বুঝতে পেরেছে এই খবর দুটো গোপন করার কারণ, 'তারপর কাল সকালে ডি ডি-র চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে দত্তসাহেবের পারমিশান নিয়ে পাঁচ-ছ'জনের একটা দল বেরিয়ে পড়বে গিটারের তারের খোঁজে। ভাগাভাগি করে কলকাতার বিভিন্ন অংশে, গিটারের তার বিক্রি করে এমন সব মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দোকানে, তোমরা প্লেন ড্রেসে গিয়ে খোঁজ করবে, গত এক সপ্তাহে গিটারের চার নম্বর তার একসঙ্গে একটার বেশি কেউ কিনেছে কি না। যদি কিনে থাকে, তা হলে সেই চেহারার বিবরণ—বিশেষ করে চুলের রঙ—জেনে নেবে। দরকার হলে ল্যাব থেকে গিটারের তারটা চেয়ে নিয়ো। এতক্ষণে বোধহয় ওদের কাজ হয়ে গেছে। সাদা-চুলওয়ালা কেউ যদি তার কিনে থাকে, তা হলে দোকানদার নিশ্চয়ই সেই বিশিষ্ট খদ্দেরকে মনে রাখবে।' একটু থেমে আরও বললাম, 'আমি এখন বেরোব! সাতান্ন নম্বরের অন্যান্য মেয়েগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তা ছাড়া, নায়ারের অদ্ভুত নেশাটারও একটু খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। তুমি কাল সকালে কাজ সেরে তারপর থানায় এসে রিপোর্ট কোরো। তখন আরও আলোচনা করা যাবে। এখন রেকর্ডারটা তুলে রেখে যাও।'

সুরেশ টেপরেকর্ডার নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি বসে-বসে কিছুক্ষণ ধোঁয়ার জাল বুনে চললাম। মাথায় আলোড়ন তুলছে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন টুকরো-টুকরো কতকগুলো ঘটনা। সাদা চুল। মিস্টার নায়ারের ছবির বই দেখার নেশা। রীনা। টেলিফোনে শোনা টাইপরাইটারের শব্দ, গাড়ির হর্নের শব্দ, বাস অথবা লরির গর্জন। গিটারের চার নম্বর তার। লিলি খুনির পূর্বপরিচিত। আর সব শেষে সোনা ট্রাভেল্‌স।

হারানো পুঁতিগুলো না পেলে আমার পুঁতির মালা সম্পূর্ণ হবে কী করে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বাড়িতে ফিরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তারপর রওনা হব সাতান্ন নম্বর বাড়ির উদ্দেশে—হারানো পুঁতির খোঁজে।

BanglaBook.org

পাঁচ

ধর্মতলা থেকে পায়ে হেঁটেই রওনা হলাম অকুস্থলের দিকে। এখন সাদা পোশাকে বেরোলেও ০.৩৮ পুলিশ স্পেশালকে শোল্ডার হোলস্টারে যথাযথ জায়গা দিয়েছি। অপ্রত্যাশিত বিপদ আমি ভীষণ অপছন্দ করি এবং সেই সংকট-মুহূর্তে আমি তৈরি থাকতে চাই।

সময় আটটা অতিক্রান্ত। কলে এখন ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের প্রধান যানবাহন রিকশা। সাম্প্রতিক সরকারি সিদ্ধান্তে জেনেছি রিকশা ও ঠেলাগাড়ি কলকাতার বুক থেকে তুলে নিয়ে হাত ও পায়ের কাছাকাছি ছেড়ে দেওয়া হবে। সত্যি যদি এ-সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়, তা হলে এখানকার খদ্দেরদের কোলে করে পৌঁছে দিতে হবে মেমসাহেবদের নির্দিষ্ট কোঠায়। এবং তখন কাম্বুজাতীয় লোকদের নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

রিকশা এ-রাস্তায় যত না চলে, তারচেয়েও বেশি রাস্তার গা ঘেঁষে বসে থাকে অপেক্ষায়—চলমান হওয়ার জন্যে। রাস্তার বাঁ-দিকটা অন্ধকার ও শান্ত। তুলনামূলকভাবে ডানদিক আলোকিত ও অশান্ত। এবড়ো-খেবড়ো ফুটপাথ ধরে আমি হেঁটে চললাম। রেকর্ডের দোকান, পুরোনো বইয়ের দোকান, বিউটি সেলুন, রেস্তোরাঁ, জুতোর দোকান, অফিসবাড়ি সবই এ-রাস্তায় আছে। এবং ব্যস্ত পথচারীর দল বিদেশি-বিদেশিনীখচিত হওয়ায় বৈচিত্র্য পাওয়া যায়।

সাতান্ন নম্বরের কাঁচা গলি খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হল। কারণ গলির মুখে লাগোয়া দুটো দোকানই এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

কাম্বুর কথা আমার বিশ্বাস হল : এই আলোয় কিংবা অন্ধকারে, খুনিকে ওর ভালো করে দেখার কথা নয়। পরপর বেশ কয়েকটা বাড়ির দেওয়ালে কাম্বুর পেশাদার ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। অলস পথচারী দেখলেই ওদের চোখ আশায় ঝিকিয়ে উঠছে।

শরীর ও মনকে তৈরি রেখে সাতান্ন নম্বরের গলিতে ঢুকে পড়লাম।

গলির একেবারে ভেতর দিকে দেওয়ালে গাঁথা একটা কর্পোরেশনের বাল্‌ব ও পড়শিদের বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা আলোই এ-গলির একমাত্র ভরসা। বাড়ির দরজায় প্রহরারত কোনও কনস্টেবলকে খুঁজে পেলাম না। ধরে নিলাম খইনি কিংবা বাথরুমের সন্ধানে কোথাও অদৃশ্য হয়েছে। অপেক্ষায় সময় নষ্ট না করে ভেতরে ঢুকলাম।

দিনের তুলনায় রাতের পরিবর্তন যেটুকু চোখে পড়ল তা খুব সামান্যই। এক : সিলিং থেকে ঝোলানো বাল্‌বকে এখন বেশি শক্তিশালী মনে হচ্ছে। দুই : স্টোর-এর দরজাটা খোলা, ভেতরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে।

উঁকি মারতেই নজরে পড়ল, দুটো সিড়িঙ্গে চেহারার লোক কয়েকটা গাঁঠরি ঠিক করে সাজিয়ে রাখছে। সম্ভবত স্থানীয় দোকানদার হবে।

দোতলায় দু-দিকের দুটো ফ্ল্যাটেরই দরজা আধখোলা। হয়তো সকালের ঘটনা ও কাম্বুর অনুপস্থিতির ফলে 'বাবু'র আকাল পড়েছে। কিন্তু মেয়েগুলো যে একটু হলেও ভয় পেয়েছে সেটা ওদের মিলিত হল্লোড় ও রেডিয়োর শব্দ শুনে বোঝা যায়। ওরা দলবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইছে।

BanglaBook.org

ভেসে আসা টুকরো কণ্ঠস্বর থেকে অনুমান হল, স্বরের মালকিনরা বয়েসের দিক থেকে কুড়ি থেকে চল্লিশের পরিব্যাপ্ত। অবশ্য আমি স্বর-বিশেষজ্ঞ নই। অনুমান ভুলও হতে পারে। তিনতলা থেকে ঘুরে এসে তারপর ওদের সঙ্গে কথা বলব। একই সঙ্গে মিসেস অনিতা নায়ার, তাঁর স্বামী ও লিলি জনসনের অতীত আমাকে খুঁড়ে দেখতে হবে।

তিনতলায় উঠে দ্বিতীয় কনস্টেবলকে তার জায়গামতো পেলাম। তবে বেচারা জেগে নেই, এককোণে বসে ঝিমোচ্ছে। হয়তো লিলিকে স্বপ্ন দেখছে।

আমার জুতোর শব্দে তার তন্দ্রারানি মাঝপথে উধাও হল। টলমল করে সটান উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে হাত কপালে তুলল। আমি মোলায়েম সুরে জানতে চাইলাম, 'হালচাল ঠিকঠাক হ্যায়?'

সে সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল 'সবকুছ ঠিকঠাক হ্যায়।'

আমর মনে পড়ল গুলজারের 'মেরে আপনে' ছবির গানের কথা। হয়তো এই কনস্টেবলচন্দ্রও সে-ছবিটা বাদ দেয়নি। অন্তত ওর উত্তর শুনে তাই মনে হয়। ওকে আবার পছন্দ অনুযায়ী ঘুমোবার বা পাহারা দেওয়ার অনুমতি দিয়ে বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটের দরজার বেল টিপলাম।

সাতান্ন নম্বরের সিঁড়িটা জব চার্নকের কথা মনে করিয়ে দেয়। সিঁড়িতে নিঃসঙ্গ প্রেমিকের মতো ঝুলন্ত বাল্‌বটা মনে করিয়ে দেয় টমাস আলভা এডিসনের কথা। আর সব শেষে, সামনের বহু আঁচড় কাটা পুরোনো সবুজ ভারী দরজাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধ মিস্টার নায়ারের কথা।

দ্বিতীয়বার বেল টিপতেই ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হু ইজ ইট?'

জোরালো গলায় উত্তর দিলাম, 'আমি—ইন্সপেক্টর বরাট।'

প্রশ্নকর্তাকে চিনতে আমি ভুল করিনি। অনিতা নায়ারের স্বামীদেবতা, কাপুর পিকচার-পোস্টকার্ডের খদ্দেরদেবতা, শ্রীপক্ষাঘাত নায়ার।

নায়ারের উত্তরে অনুমান হয় শ্রীমতী নায়ার বাড়িতে নেই। হয়তো গতকালের মতোই নিউমার্কেটে শপিংয়ে গেছেন। অতএব দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর বৃথা। দরজা খুলে কেউ আমাকে আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে যাবে না।

হাতের চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল সুবোধ বালকের মতো। ভেতরে ঢুকে দরজা আবার ভেজিয়ে দিলাম।

রাত্রিবেলা ফ্ল্যাটের চেহারায় অতিরিক্ত একটা বিষণ্ণ ছাপ পেলাম।

ঘরটা চোখ বুলিয়ে দেখছি, নায়ার তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কে? হু ইজ ইট?'

আমি এতটুকু ব্যস্ততা না দেখিয়ে রেডিয়োগ্রামের দিকে এগিয়ে গেলাম। ডালা খুলে দেখি সকালের খরচ হওয়া বোতলটার এখন মাত্র সিকিভাগ বাকি আছে। ডালা বন্ধ করে রওনা হলাম নায়ারের ঘরের দিকে। ততক্ষণে নায়ার তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করে ফেলেছেন।

অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব মনে হলেও আমি টেলিফোনে শোনা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওঁর গলাটা মিলিয়ে নিতে চাইলাম। কথা বলার ভঙ্গি কিছুটা মিললেও স্বর মিলল না। মনকে প্রবোধ দিলাম : টেলিফোনে লোকের গলা পালটে যায়। এবং নায়ারের ঘরে পা দিলাম।

BanglaBook.org

এই ঘরের আলোটা বিবর্ণতায় সব আলোকে হার মানায়। ঘরের ছবি ও চরিত্র দিনের তুলনায় এতটুকু পালটায়নি। বরং দুটোই আরও তীব্র হয়েছে।

নায়ার এখনও ময়লা চাদর ঢাকা দিয়ে আধশোয়া অবস্থায়। বুকের কাছে দুটো হাত এমনভাবে আঁকড়ে রাখা, যেন ভীষণভাবে কিছু একটা লুকোবার চেষ্টা করছেন। উলঙ্গ বাল্বের আলোয় তাঁর মুখের বলিরেখা আরও সুস্পষ্ট। ছোট ঘোলাটে চোখদুটো তীক্ষ্ণ করে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ওয়েল, ইন্সপেক্টর—কী চান, বলুন? দেখতেই তো পাচ্ছেন, অনিতা বাড়ি নেই—।'

'কোথায় গেছেন? নিউমার্কেট?'

'না—আশেপাশেই সামান্য কেনাকাটা করতে গেছে।' একটু বিরতি। তারপর : 'আমার দু-একটা ওষুধও আছে।' নায়ারের মুখে বিরক্ত ভাব ক্রমেই স্থিতিশীল হচ্ছে। হোক, আমার ধৈর্য ও নির্লজ্জতা অনেক বেশি স্থিতিশীল।

'ভালোই হয়েছে। আপনার সঙ্গে একটু ক্রিলি কথা বলা যাবে।'

ঘরের ডানদিকের কোণে একটা পিঠভাঙা চেয়ার ছিল, সেটা টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসলাম। ডায়েরি ও পেন অলস ভঙ্গিতে প্রস্তুত করে বললাম, 'আপনার পুরো নামটা এখনও জানতে পারিনি।'

'সুদর্শন নায়ার।' তারপর নতুন কী ভেবে : 'সত্যি বলতে কী, ওই মেয়েটার খুনের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। যা বলবার সব তো অনিতা আপনাকে—।'

আমি তাঁর কথা কানেও তুলছি না দেখে সুদর্শন নায়ারের কথাগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে অবশেষে অসমাপ্ত অবস্থাতেই মিলিয়ে গেল। আমি একমনে ডায়েরিতে কয়েকটা কথা লিখে নিচ্ছিলাম, ওঁর পাশ কাটানোর চেষ্টা শেষ হতে চোখ তুলে তাকালাম।

'এ-বাড়ির মালিক কে? আপনি, না মিসেস নায়ার?'

সুদর্শন নায়ার কিছুক্ষণ একরোখাভাবে চুপ করে রইলেন। আমার উপস্থিতি উনি যেন মোটেও সহ্য করতে পারছেন না। খালি উসখুস করছেন। তারপর ছোট্ট করে বললেন, 'আমি—কেন?'

আমি ডায়েরিতে ঝুঁকে পড়ে কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলাম। মানসিক দিক থেকে ওঁকে যতখানি কমজোর করে দেওয়া যায় ততই সুবিধে। তারপর : 'কীসের পয়সায় বাড়ি করলেন?'

আমার প্রশ্ন করার ঢঙে অভদ্রতার সুর নায়ারকে আহত করল। সেটা সামলে নিয়ে বললেন, 'ওষুধের ব্যবসা ছিল—বহু আগে। সেসব সেল করে দিয়ে প্রায় পনেরো বছর এ-বাড়িতে আছি—' ডান পাশে ঝুঁকে পড়ে টেবিল থেকে জলের গেলাস তুলে নিয়ে দু-ঢোক জল খেলেন। গলার কণ্ঠা ওঠানামা করল ক্লিষ্টভাবে। গেলাস রেখে চাদরে মুখ মুছে অনেকটা আত্মগতভাবে বললেন, 'অনিতা ছাড়া সংসারে আর কোনও টান নেই...এই তো বেশ আছি...।'

পরের প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম আচমকা, বুলেটের মতো : 'এ-বাড়িতে শুনেছি পাঁচটা মেয়ে ভাড়া খাটে?' পলকে নিজেকে শুধরে নিয়ে : 'মানে, ভাড়া থাকে?'

'হ্যাঁ, পাঁচজন ভাড়া থাকে—থাকত। এখন চারজন।' চাদরের তলায় নায়ারের চঞ্চল হাতজোড়া বন্দিদশায় অস্বস্তিতে নড়ছে। গলাখাঁকারি দিয়ে বারকয়েক কাশলেন।

BanglaBook.org

কিছুটা থুতু বোধহয় গিলেও ফেললেন। তারপর, 'এখন আমাদের বেশ অসুবিধে হবে। মেয়েটা মারা গিয়ে মাসে-মাসে ভাড়া তো গেলই, উলটে একটা ব্যাড রেপুটেশন হয়ে গেল। ওর ঘরে নতুন ভাড়াটে আর পাব কি না কে জানে! পুয়োর অনিতা!' বক্তব্যের শেষটুকু সবাইকে শুনিয়ে বলা স্বগতোক্তির মতো। শুনতে সময়ে-সময়ে ভালোই লাগে। এটুকু বুঝলাম, অনিতা নায়ারের মদের খরচ ও সুদর্শন নায়ারের ছবির বইয়ের খরচ নিয়মিত জোগাতে হলে শিগগিরই ওঁদের নতুন ভাড়াটে চাই।

'যে-চারটে মেয়ে এখন আছে তাদের নামগুলো বলুন তো।'

ডায়েরির পাতায় আমার পেন একপায়ে খাড়া।

নায়ার চিন্তামগ্ন হলেন। যেন মেয়ে চারজনের নাম তাঁর কিছুতেই মনে পড়ছে না। থেমে-থেমে একটু-একটু করে বলতে লাগলেন, 'কবিতা...কবিতা সেন। চন্দা... চন্দা...পদবিটা ঠিক মনে পড়ছে না। অনিতা বলতে পারবে। আর আছে মেরি কৃষ্ণমূর্তি। ডলি বেনসন...হ্যাঁ, বেনসনই হবে—।'

'ধন্যবাদ,' তীক্ষ্ণ চোখে সুদর্শন নায়ারকে লক্ষ করে প্রশ্ন করলাম, 'এদের মধ্যে লিলির সবচেয়ে বেশি বন্ধু কে ছিল—মানে বাড়ি-বাড়ি?'

'অত খবর তো রাখি না...মানে, বিছানায় পড়ে থাকি...অনিতা নিশ্চয়ই—।'

হাত তুলে ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিলাম। এক কথা বারবার শুনতে ভালো লাগে না। 'নায়ার মেয়েদের ব্যাপারে নিতান্তই নিস্পৃহ' এই আপ্তবাক্যটা বিশ্বাস করে হয়তো সুবোধ বালকের মতো ফিরে আসতাম, কিন্তু গোলমাল বাধাল কাল্লুর স্টেটমেন্ট। নায়ার ছবির বইয়ের ভক্ত। অতএব উনি মেয়েদের খবরও রাখেন। এ অনিবার্য।

'তবু আপনার একটা মতামত শুনতে চাই।' অভিব্যক্তিহীন মুখে ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলাম, 'সুদর্শন নায়ার, যু আর নট ট্রাইং এনাফ।' এবং কথা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ডায়েরি ও পেন সাময়িকভাবে চেয়ারে রেখে সটান গিয়ে দাঁড়ালাম নায়ারের বিছানার কাছে। ডেটল, ইথার ও বিচিত্র অস্বস্তিকর জিনিসের মিশ্র গন্ধ আরও তীব্র হয়ে ধাক্কা মারল নাকে। 'গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কী আহ্লাদ'! কিন্তু আমি নিরুপায়। শুধু মনে হল, এ-ঘরে ঢোকার আগে নাকটা ইনসিওর করে এলে পারতাম।

সুদর্শন নায়ার শেয়ালে তাড়া করা বাচ্চাসমেত মা মুরগির মতো সচকিত হয়ে পড়লেন। ভয় পেলেন বোধহয়। চাদরে ঢাকা হাত দুটোর এখন 'ধরণী দ্বিধা হও' গোছের ত্রাহি-ত্রাহি রবসম্পন্ন গতিবিধি। নায়ার একবার দেখছেন আমার দিকে, পরক্ষণেই তাঁর চোখ আবার ছিটকে যাচ্ছে চাদরে ঢাকা হাতের দিকে। কিছু একটা লুকোতে গিয়ে এত বিশ্রীভাবে উনি ধরা পড়ে যাচ্ছেন যে, আমার রীতিমতো লজ্জা করতে লাগল। তবু আবার জিগ্যেস করলাম, 'বলুন, লিলির প্রাণের বন্ধু কে ছিল?'

'বোধহয় মে-মেরি—' নায়ার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, সময় বিশেষে উনি সুন্দর তোতলাতে পারেন : 'মে-মেরি কৃষ্ণমূর্তি।'

এখনও উনি চাদরের দিকে তাকাচ্ছেন দেখে আমার স্থিতিশীল ধৈর্যের চ্যুতি ঘটল। এক ঝটকায় শ্যাওলা-সবুজ রঙের ময়লা চাদরটা টান মেরে ফেলে দিলাম মেঝেতে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বেরিয়ে এল বৃদ্ধের কালচে ঠোঁট চিরে। উনি স্তম্ভিত। হতচকিত। ওঁর পরনের ডোরাকাটা স্লিপিং গাউন স্বমহিমায় প্রকাশ পেল।

BanglaBook.org

পাজামা হাঁটু পর্যন্ত উঠে গিয়ে পাকা লোমে ছাওয়া দুটো সরু পা দেখা যাচ্ছে। হাত দুটো কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব আঁকড়ে রাখার ভঙ্গিতে জড়ো করা রয়েছে বুকের ওপর। ভেবেছিলাম কোনও অধর্মগ্রন্থ সেই যুক্ত করকমলে শোভা পাবে, কাম্বুর বক্তব্যের চাক্ষুষ প্রমাণ পাব, কিন্তু ফলত তা হল না।

আমি, বা আমরা, পুলিশেরা সাধারণত ০.৩৮ পুলিশ স্পেশাল ব্যবহার করে থাকি। এই মুহূর্তে সেটা আমার শোল্ডার হোলস্টার অলঙ্কৃত করেও রেখেছে। কিন্তু সুদর্শন নায়ার দেখলাম সেটা পছন্দ করেন না। কারণ তাঁ দু-হাতে মুঠো করে যে জিনিসটা ধরা আছে, সেটা একটা বীভৎস-দর্শন কোল্ট অটোমেটিক। আবিষ্কারের পরমুহূর্তে স্যামুয়েল কোল্টসাহেব হয়তো ঠিক এই ভঙ্গিতে কোল্টরিভলবার হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। যদিও সেটা ১৮৬১ সালের ঘটনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তাকে অনুসরণ করে হাই হিল জুতোর সদর্প ঠক-ঠক। অর্থাৎ অনিতা নায়ার কেনাকাটা সেরে ফিরেছেন। এবং, অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে উনি এদিকেই আসছেন।

'আপনার পায়ের প্যারালিসিস সারাতে কোল্ট অটোমেটিক কোন ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছে?' প্রশ্নটা নায়ারের উদ্দেশেই করেছিলাম, কিন্তু উত্তর এল আমার পিছন থেকে, নারীকণ্ঠে।

'আপনি আবার কী মনে করে, ইন্সপেক্টর বরাট?' স্বর রুক্ষ, অভদ্র : 'সকাল থেকে শুধু আমাদের পেছনে পড়ে আছেন!'

আমি হাসলাম। মিসেস নায়ারের অজ্ঞতায়। কারণ অভদ্রতা আমিও জানি এবং আমার অভদ্রতাকে সকলে ভয় পায়। বললাম, 'আপনার স্বামীর কাছে আমার "সচিত্র যৌনজীবন" নামে একটা ছবির বই আছে। ওটা ফেরত নিতে এসেছি। আর সেইসঙ্গে জানতে এসেছি, বইটা কেমন। ওঁর এই বয়েসেও কাজ দেয় তো?' হাসির অশ্লীলতা ষোলোআনা বাড়িয়ে এবার ফিরে তাকালাম অনিতার দিকে : 'কাম্বু নেই বলে বইয়ের সাপ্লাই তো আর বন্ধ হতে পারে না, কী বলেন মিসেস নায়ার?'

ঘরটা একবারে চুপচাপ হয়ে গেল। কান পাতলে বোধহয় হাওড়া ব্রিজে ট্রাম চলার ঘর্ঘর শব্দও শোনা যাবে।

অনিতা নায়ারের পরনে বাদামি রঙের আধুনিক মিডি। মুখে প্রসাধন টাটকা। হাতে কেনাকাটা করা জিনিস ভরতি পলিথিনের ব্যাগ। একবার স্বামীর দিকে তাকালেন, তারপর আমার দিকে। দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটে উঠল প্রথমে, তারপর আমার দিকে চোখ ফেরাতেই বেপরোয়া ভাব : তাঁদের গোপন আবাসে অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি বলে। হাতের ব্যাগটা বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে মেঝেতে রাখলেন। তারপর ব্যাগ হাতড়ে দুটো ওষুধের শিশি বের করে রেখে দিলেন স্বামীর 'হসপিটাল' টেবিলের ওপর। সেখানে 'ওল্ড ইজ গোল্ড' এখনও অবিশ্রান্ত ঘুরছে। এই সামগ্রিক নীরবতায় ওটার শব্দ যথেষ্ট প্রকট লাগছে।

আমি বিব্রত সুদর্শন নায়ারের দিকে দেখলাম। রিভলবারটা পিতামাতাহীন সন্তানের মতো অনাথ হয়ে পড়ে আছে তাঁর বুকের ওপরে। হাত বাড়িয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে ওটা তুলে নিলাম। অভ্যস্ত হাতে চেম্বারটা খুলে ফেললাম। সবক'টা খোপে গুলি ভরাই আছে।

BanglaBook.org

স্বামী ও স্ত্রীকে পর্যায়ক্রমে দেখে প্রশ্ন করলাম, 'লাইসেন্স আছে?'

'আছে—' অনিতা নায়ার জবাব দিলেন।

'দিন।' রিভলবারটা আবার ফিরিয়ে দিলাম নায়ারের বুকের ওপর। অনিতা নায়ার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, হয়তো লাইসেন্সটা নিয়ে আসতে। আমি এবার মনোযোগ ফেরালাম বৃদ্ধ নায়ারের দিকে : 'রিভলবার রেখেছেন কী দরকারে, মিস্টার নায়ার? কাকে শুট করবেন? আমাকে?'

প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিয়োর। সুতরাং আমাকে গুলি করার দুর্বুদ্ধি যাতে নায়ারের কখনও না হয় সেজন্য শোল্ডার হোলস্টারে হাত ঢুকিয়ে ০.৩৮ বের করে নিলাম। বললাম, 'কোপ্ট আর পুলিশ স্পেশাল—দুটোই নিজের-নিজের কাজে স্বনামধন্য। বিপদে-আপদে দুটোই সমান কাজ দেয়—' একটু থেমে ঠান্ডা গলায় : 'নায়ার, নেভার প্রোভোক মি, ও-কে?' রিভলবারটা আবার গুঁজে নিলাম হোলস্টারে।

ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠলেন সুদর্শন নায়ার। জড়ানো স্বরে তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'নো, নো, ফর ক্রাইস সেক। এ শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। মানে, বোঝেনই তো, মিস্টার বরাট, অনিতা বেরোলে আমি একা-একা থাকি। জায়গাটা এমনিতেই বিশেষ ভালো নয়, তার ওপর গতকালই এ-বাড়িতে একটা ক্রুটাল খুন হয়ে গেছে। শুধু-শুধু এই বুড়োকে আর ভয় দেখাবেন না...' সত্যিকারের অনুনয়-বিনয়, না অভিনয়?

এমনসময় লাইসেন্স হাতে করে অনিতা নায়ার ফিরে এলেন। মুখ গম্ভীর। আমার সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের লেশমাত্রও সেখানে নেই। সৌজন্যবোধবশত যে এককাপ চায়ের নেমন্তন্ন জানাবেন, সে-আশাও দূর অস্ত। এসব আমি গায়ে মাখি না। সয়ে গেছে। ঠ্যাটা হওয়াটা পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে একটা বিরাট গুণ। আমার সেটা আছে।

লাইসেন্সের হলদে পাতাগুলোর ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে নিলাম। সুদর্শন নায়ারকে লাইসেন্স ইস্যু করার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। তা হলে কি পুলিশ মহলে ওঁর হাত আছে? হয়তো যখন ওষুধের ব্যবসা করতেন তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লাইসেন্সটা পেয়েছিলেন, এবং তারপর থেকে নেহাতই গতানুগতিকভাবে ওটা রিনিউ করিয়ে আসছেন। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে। সুতরাং লাইসেন্সটা পকেটে রাখলাম।

আমার ধ্যান ভাঙল অনিতা নায়ারের কথায় : 'কাল্লু কখন ছাড়া পাবে?'

'সময় হলেই,' নরম সুরে জবাব দিলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'এখন যে-চারজন মেয়ে দোতলায় ভাড়া আছে তার মধ্যে লিলির সবচেয়ে বন্ধু কে ছিল?' প্রশ্নটা করেই চকিতে ঘুরে তাকালাম সুদর্শন নায়ারের দিকে। ঠোঁটে আঙুল তুলে ইশারা করলাম : চুপ, মুখ খুলো না।

মিসেস নায়ার অবাক হয়ে আমাদের কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর মুখ টিপে ছোট্ট করে উত্তর দিলেন, 'মেরি—মেরি কৃষ্ণমূর্তি।'

'চন্দা মেয়েটির পুরো নাম কী?'

আবার অবাক। তারপর : 'চন্দা সুখানি।'

আমি চেয়ারে ফিরে গিয়ে ডায়েরি ও পেন তুলে নিলাম। লেখা শেষ করে দুটোই ভরে ফেললাম পকেটে। এসে দাঁড়ালাম অনিতা নায়ারের খুব কাছে, 'মিসেস নায়ার, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই। ওঁকে আরও কয়েকটা কথা জিগ্যেস করার আছে। উড য়ু মাইন্ড?'

BanglaBook.org

মুখে অনিচ্ছার ভাব ফুটে উঠলেও ঝুঁকে পড়ে শপিংয়ের ব্যাগটা তুলে নিলেন অনিতা। চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

আমি ও সুদর্শন নায়ার আবার একা হলাম। পাশের ঘর থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ কানে আসতে লাগল। সম্ভবত শপিং-এর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হচ্ছে।

প্রথমে মেঝে থেকে চাদরটা তুলে নিয়ে সুদর্শন নায়ারের গায়ে চাপা দিলাম। চাদরটা ধরে মনে হল, বাড়ি ফিরে হয়তো অ্যাকোয়া-রিজিয়া দিয়ে হাত ধুতে হবে। নায়ারকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনার অসুখটা ঠিক কীসের?'

'ডক্টর তো বলছে এক ধরনের প্যারালিসিস। পায়ের দিক থেকে নার্ভগুলো সব শুকিয়ে যাচ্ছে।' একটু দম নিয়ে : 'এখন তবু মাথা তুলতে পারি, ক'মাস বাদে হয়তো তা-ও পারব না...সারবার কোনও আশা নেই। এ যেন তিলে-তিলে মৃত্যু।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মুখটা করুণ হয়ে এল। কিন্তু ওঁর কথা বা অভিব্যক্তি কোনওটাই আমি বিশ্বাস করলাম না। প্রমাণ চাই।

সুতরাং চোখের পলকে নায়ারের পলকা দেহটা তুলে নিলাম পাঁজাকোলা করে। নায়ার ঘড়ঘড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'হোয়াট ইজ দিস? হাউ ডেয়ার য়ু?' কিন্তু ততক্ষণে আমি চাদরসমেত ওঁকে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।

নায়ারের চোখে উলঙ্গ আতঙ্ক শকুনের ডানা হয়ে ঝাপটা মারল। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। অসহায়ভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন দাঁড় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, চকিতে হাত বাড়িয়ে সে-পতন রোধ করলাম আমি। কারণ এর জন্যে আমি তৈরি ছিলাম।

নায়ারের অবলম্বনহীন দেহটা আবার শুইয়ে দিলাম বিছানায়। চাদরটা গায়ে ঠিক করে টেনে দিলাম। রিভলবারটা পড়ে গিয়েছিল, সেটা ফিরিয়ে রাখলাম ওঁর বালিশের পাশে।

সুদর্শন নায়ারের শরীরটা ঠকঠক করে কাঁপছে : যেন ভীষণ শীত করছে। ওঁর যে দাঁড়াবার শক্তি নেই সে-প্রমাণ আমি পেয়েছি।

স্বামীর চিৎকারে ভয়ার্ত অনিতা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন টের পেলাম। সুদর্শন নায়ারের মুখ-চোখ লাল। শকটা এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি। ওঁকে সেটা সামলে ওঠার সুযোগ দিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলাম। অনিতা নায়ার অনুধাবন করলেন আমাকে। মুখের ভাবটা 'আর কী চাই?' গোছের। অনেকক্ষণ দোমনা থেকে তারপর বললেন, 'একজন বুড়ো মানুষকে এভাবে হ্যারাস করাটা ঠিক নয়। বলুন তো, আমরা কী অপরাধ করেছি? বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা কি অন্যায়? ভাড়া দেওয়ার সময় তো লোকের থেকে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট চাইতে পারি না!' চশমা চোখ থেকে হাতে নেমে এল। উসখুস করল হাতের আঙুলগুলো।

'আপনার দুজনে একা এভাবে থাকেন, খারাপ লাগে না?' আন্তরিকতা দেখিয়ে বলে উঠলাম। 'আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ মাঝেমধ্যে আসে না?'

সময় পেয়ে অনেকটা শান্ত হলেন অনিতা। বললেন, 'থাকলে তো আসবে—' তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা ঝরে পড়ল এই সমাজটার প্রতি : 'তা ছাড়া। খারাপের সঙ্গে খারাপের বন্ধুত্বই সম্ভব—আমার ভাড়াটেরাই আমার বন্ধু।'

'মিসেস নায়ার, আমি এখন দোতলার মেয়েদের সঙ্গে একটু কথা বলব। যদি

BanglaBook.org

প্রয়োজন মনে করি তাহলে আগামীকাল আপনাকে আর-একটু ডিস্টার্ব করব। ও-কে, সি যু।' ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে সহজ গলায় বললাম, 'আপনার স্বামীর লাইসেন্সটা কালই হয়তো ফেরত পেয়ে যাবেন—' তারপর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অনিতা চশমাটা আবার চোখে দিলেন।

'আসলে কী জানেন, ইন্সপেক্টর—' ফ্ল্যাটের ফাঁক করা দরজায় অনিতার চশমা-সজ্জিত বিষণ্ণ মুখ। সেখানে আলোছায়ার খেলা। খাটো করে কাটা মাথার চুল সিঁড়ির আলোয় ইতস্তত চিকচিক করে উঠল। উনি বলে চললেন, 'আমার স্বামী খুব ভিতু। আগে ওর ওষুধের বিজনেস ছিল। তখন রিভলবারটা কিনেছিল প্রোটেকশনের জন্যে। পরে সারেন্ডার না করে এখনও রেখে দিয়েছে। আমি কতবার বলেছি...'

বুঝলাম, উনি আশ্বাস চাইছেন। দিলাম। আমাদের বিদায় পর্ব শেষ হল। বন্ধ হল ফ্ল্যাটের দরজা। একজন পতি-প্রেমে-নোবেল-লরিয়েটের সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালো লাগল।

লিলির ফ্ল্যাটের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি, যা ভেবেছি ঠিক তাই। এবারে কনস্টেবলসাহেবের ঘুম আমি ভাঙাতে পারিনি। বেচারা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। ওর মুখটা টিপে বন্ধ করে দিলাম, নইলে মশা-মাছি ঢুকে পড়বে। এবং সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। ঘড়ি দেখলাম : সওয়া ন'টা।

কবিতা সেন, চন্দা সুখানি, ডলি বেনসন, মেরি কৃষ্ণমূর্তি। তোমরা সবাই বাড়ি আছ তো?

অন্তর্দৃশ্য

বসবার ঘরের টেবিলে চশমা খুলে নামিয়ে রাখলেন অনিতা নায়ার। রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছলেন। তারপর একটা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন আলনার কাছে। একটা নৈশ-পোশাক বেছে নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে জামা-কাপড় পালটে নিলেন। হাই হিল ছেড়ে চপ্পল পরে নিলেন পায়ে। মাথায় চুলে আঁটা ক্লিপ খুলে নিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে ঘেঁটে দিলেন। ক্লিপগুলো আলমারির মাথায় রেখে ছোট্ট রান্নাঘরে ঢুকলেন। একটা হলদেটে প্লেট নিয়ে স্বামীর রাতের খাবার যথাসম্ভব পরিপাটি করে বেড়ে নিলেন। আলুসেদ্ধ, স্যালাড, সুপ আর টোস্ট। তারপর যান্ত্রিক কর্তব্যপরায়ণ পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন সুদর্শন নায়ারের ঘরে দিকে।

রোগশয্যায় শুয়ে স্থির চোখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন নায়ার। দু-চোখ এখন আরও ঘোলাটে। কোন্ট অটোমেটিকটা বালিশের পাশে নিরীহ ভঙ্গিতে বিশ্রামে মগ্ন।

অনিতার পায়ের শব্দে উনি চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। দেখা গেল, তাঁর চোখের কোণ চিকচিক করছে। গালে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুরেখা।

পরক্ষণেই তাঁর চোখ আবার আগের লক্ষ্যে স্থির হল। অনিতা নায়ার খাবারের ট্রে-টা টেবিলের কোণ ঘেঁষে রাখলেন। তারপর বিছানায় স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন।

BanglaBook.org

ভাঁজ পড়া প্রাচীন কপালে হাত রাখলেন। সস্নেহ হাত। অভিমানী শিশুকে সান্ত্বনা দিতে কোনও মায়ের প্রচেষ্টা যেন।

কপাল থেকে অনিতার হাতটাকে নিজের বুকে টেনে নিলেন সুদর্শন নায়ার। তাঁর চোখের কোণ গড়িয়ে জলের ফোঁটা আবার ভাঁজপড়া গাল বেয়ে নেমে এল। রুদ্ধ আবেগে শীর্ণ পারাবত-বুক ওঠানামা করছে।

'খাবারটা খেয়ে নাও।' অনিতা চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। মৃদু স্বরে বলে উঠলেন, 'ছিঃ! তুমি আজ আবার ওই কাণ্ড করতে গিয়েছিলে? ভাগ্যিস ইন্সপেক্টর এসে পড়েছিলেন, তাই।'

সুদর্শন নায়ার ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'না এলে ভালো হত, নিতা, না এলে ভালো হত। আজ বোধহয় সাহস করে ট্রিগারটা টিপতে পারতাম...' অনিতার দিকে পাশ ফিরে নিজেকে সামলে নিয়ে : 'এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ বলতে পারো? সবসময়েই তো চেষ্টা করি নিজেকে শেষ করে দিতে, কিন্তু পারি না। বেসিক্যালি আই অ্যাম এ কাওয়ার্ড। আই নো ইট। আর তুমিও সেটা জানো—' স্মৃতিচারণের সুরে নায়ার বলে চললেন, 'একটা...একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পর...যখন আমি একা হয়ে গেলাম, তখনই হয়তো সুইসাইড করতাম...কিন্তু...কিন্তু, সেই সময়েই তো তুমি এলে আমার জীবনে...।'

অনিতার মনে পড়ল, স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে এই বাড়িতে উঠেছিলেন ভাড়াটে হয়ে। এই ফ্ল্যাটে। তখন বাড়ির মালিক, সুদর্শন নায়ার, এখানে থাকতেন না। মহম্মদ ইসলাম নামে একজন কেয়ারটেকার বাড়ির দেখাশোনা করত।

কিন্তু হঠাৎই একদিন সুদর্শন এলেন, বললেন, ঘর ছেড়ে দিতে। কারণ, এখন থেকে উনি একা থাকবেন। এই ফ্ল্যাটে। অন্যান্য ভাড়াটে অনিতার তুলনায় অনেক বেশি ভাড়া দিত—তাদের যৌবনও ছিল অনেক বেশি। সুতরাং কেয়ারটেকার ইসলাম মালিকের ইচ্ছে জানতে পেরে অনিতা নায়ারকেই বেছে নেয়, এগিয়ে দেয় সুদর্শনের দাবির সামনে অসহায় অবস্থায়।

সুদর্শন নায়ার জানতেন না তাঁর অলক্ষে ইসলাম এ-বাড়ি কাদের ভাড়া দিয়েছে, কী ব্যবসা সে চালায়। তখন তাঁর পক্ষাঘাতের প্রাথমিক অবস্থা। একটা পা টেনে খুব সাবধানে চলাফেরা করেন।

ইসলামের মুখে অনিতার অরাজি হওয়ার খবর পেয়ে নিজেই এলেন অনিতার ফ্ল্যাটে। অনিতা মরিয়া হয়েই তাঁকে খুলে বলেছেন নিজের জীবন-কাহিনী। বলেছেন, কী কষ্ট করে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। তারপর হঠাৎই প্রস্তাব দিয়েছেন অসুস্থ সুদর্শনকে দেখাশোনা করবার। সুদর্শন নায়ার তখন তাঁর ভাঙাচোরা পৃথিবী নিয়ে শান্তি ও স্বস্তির খোঁজে ভেসে বেড়াচ্ছেন। স্ত্রীর সাম্প্রতিক মৃত্যুতে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। যে-কোনও কারণেই হোক, তাঁর মনে সমবেদনা জেগেছিল অনিতার জন্য। রাজি হয়েছিলেন ওঁর প্রস্তাবে। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। ইসলাম চলে গেছে, অন্যান্য ভাড়াটে বদল হয়েছে বহুবার, কিন্তু অনিতা ও সুদর্শন একইরকম রয়ে গেছেন। হয়ে থেকেছেন একে অপরের অবলম্বন।

পুরোনো কথা ভাবতে-ভাবতে অনিতা নায়ার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। চোখের কোল মুছে তিনি তাকালেন সুদর্শনের দিকে। বৃদ্ধ ও শিশুতে কোনও তফাত নেই।

BanglaBook.org

ওঁর অসহায় মুখ দেখে এক অদ্ভুত ব্যথা ঢেউ তুলল অনিতার বুকে। সুদর্শন নায়ার বললেন, 'নিতা, একটা মানুষ এই পঙ্গু জীবন নিয়ে কতদিন বাঁচতে পারে বলো তো? দেখতে-দেখতে একটা যুগ পার হয়ে গেল। তাই তো তোমাকে বারণ করি, ওষুধ আর এনো না। ওতে কিচ্ছু হবে না। অল রাবিশ! আর, ওই ডাক্তারগুলো! দিনের পর দিন শুধু মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে পয়সা নিয়ে চলেছে! আমি আর পারি না, নিতা, আর পারি না। ওঃ গড!'

অনিতা কাছে টেনে নিলেন সুদর্শনকে। গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। সুদর্শনকে তিনি আজও বুঝে উঠতে পারলেন না। অনিতার পোশাকের আড়াল থেকে সুদর্শন নায়ারের চাপা স্বর শোনা গেল, 'মনে পড়ে, নিতা, প্রথম যেদিন আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করি সেদিন তুমি কীরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?'

'পড়ে গো, স্পষ্ট মনে পড়ে।'

'তারপর ধীরে-ধীরে তুমিও জেনে গেছ, যত চেষ্টাই করি না কেন, ট্রিগার টিপতে আমি পারব না। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি এসব জানতে পারে...বুঝতে পারে। আমাকে ঘরে একা ছেড়ে রেখে বেরোতে তোমার আর-একটুও ভয় করে না...' কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তারপর চোখ রাখলেন অনিতার চোখে : 'বাঁচার আনন্দ খুঁজে পেতে আমি কী না করেছি! তোমাকে লুকিয়ে কানুকে দিয়ে ওইসব নোংরা ছবির বইগুলো আনাতাম। একদিন জানতে পেরে তুমি কী রাগটাই না করেছ! তোমার আর দোষ কী? ...আবার যেদিন তোমাকে বলেছিলাম, আমার ঘরে ডলিকে পাঠিয়ে দাও, চন্দাকে আসতে বলো, তুমি আমার দিকে যেভাবে আগুনঝরা চোখে তাকিয়েছিলে তা আজও মনে পড়লে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু নিতা, আমি কী করব আমাকে বলে দাও! গিভ মি এনাফ রিজন টু গো অ্যালং উইথ দিস ব্লাডি লাইফ! প্লিজ!' সুদর্শন নায়ারের ঘোলাটে চোখ উজ্জ্বলতার তুঙ্গে, রক্তের উচ্ছ্বাস মুখমণ্ডলে বল্গাহীন রেসের ঘোড়ার মতো দাপাদাপি করছে। বড় বড় শ্বাস নিয়ে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি : 'নিতা, তুমি ভুল বুঝলে আমি সবথেকে বেশি কষ্ট পাই। তোমাকে না জানিয়ে লিলিকে, মেরিকে, ঘরে ডেকে এনেছিলাম আমি...তুমি জানতে পেরে খুব দুঃখ পেয়েছ জানি। কিন্তু তুমি কি বোঝো না, এসবই আমার মরণপণ চেষ্টা? নিজেকে ভোলানোর জন্যে এক ধরনের অভিনয়? এই অথর্ব পঙ্গু শরীরের বোঝা নিয়ে যাতে বেঁচে থাকার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সেজন্যে আমি হন্যে হয়ে উঠেছি! ছবির বই, মেয়ে—এ সবের লোভে পড়েও যদি ক'টা বছর আমি বাঁচতে পারি! ...ওঃ...যদি আমার...সুইসাইড করার সাহসটুকুও থাকত। এতটা ভিতু আমি ছিলাম না, নিতা। ওই একটা দুর্ঘটনা আমার গোটা জীবনটা ওলটপালট করে দিয়েছে। সেইদিন থেকে আমি ভিতু হয়ে গেছি...হেরে গেছি জীবনের সঙ্গে...।'

'থামো, থামো—খেয়ে নাও,' অনিতা বেশ অনুভব করছেন তাঁর স্থৈর্যের খোলস ধীরে-ধীরে চুরমার হয়ে পড়ছে। বাঁধভাঙা আবেগের ঢেউ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে প্রাণপণ চেষ্টায় সংবত করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু পারছেন না। পারলেন না। সুদর্শনের শরীরে হঠাৎই ঝুঁকে পড়লেন। সর্বহারার মতো আন্তরিক শক্তিতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর শীর্ণ শরীরটা। ভেঙে পড়লেন আকুল কান্নায়। বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাস পাক খেয়ে গড়িয়ে এল প্রপাতের মতো। কাঁদতে-কাঁদতেই বলে উঠলেন, 'চুপ করো, চুপ করো—এভাবে আর কষ্ট দিয়ো না গো। তোমাকে ভালোবাসি

BanglaBook.org

বলেই তো আজও ছেড়ে যেতে পারিনি। পাশে আছি। জানো, এইজন্যেই লিলিকে বলতাম, খারাপ মেয়েদের সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না। ব্যবসায় ক্ষতি হয়। মেয়েটা কি শুনেছিল আমার কথা? শোনেনি। ও সেই ভালোবাসল—প্রেমে পড়ল। আমার মতো।' সুদর্শনের চোখে-মুখে-শরীরে পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করলেন অনিতা নায়ার : 'আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি গো, প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। আই লাভ য়ু, ডার্লিং, আই লাভ য়ু—' অনিতার চুম্বন উচ্ছৃঙ্খল সাইক্লোন হয়ে যায় পলকে। এই চুম্বনে আজ হয় তো আগুন নেই, তবে আন্তরিকতা আছে, ভালোবাসা আছে। এই চুম্বন নিঃশব্দমন্দ্র নির্ঘোষে বারংবার বলে ওঠে : প্রেম অবিনশ্বর।

ছয়

দোতলার দুটো দরজার মধ্যে একটার অবস্থা একটু পালটেছে : বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টা এখনও আধখোলা। ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত সওয়া ন'টায় গিয়ে হাজির হলে পাদুকা কিংবা অর্ধচন্দ্রটাই ঐতিহ্যবাহী রীতি, কিন্তু ডলি-মেরিরা মনে হয় সে-পথ নেবে না। কারণ তথাকথিত রাবারস্ট্যাম্প মারা ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা—ওরা নয়।

লক্ষ করলাম, দরজায় কলিংবেল কিংবা ম্যাজিক আই—দুটোই অনুপস্থিত। এই চারজনের কি খদ্দেরের ব্যাপারে বাছবিচার নেই?

দরজা খুলতেই ওদের মুখোমুখি হলাম।

কবিতা, চন্দা, ডলি এবং মেরি। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

সকালে ওদের দেখে মনে হয়েছিল একই বৃন্তে বহুদিন ধরে ফুটে থাকা বৈর্যশীল গোলাপ। সে-ধারণা এখন পালটে যায়। অন্তত আংশিকভাবে।

ওদের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম।

আধুনিক ছাঁচে সাজানো ঘরের আকার ও প্রকার হিংসে করার মতো। আসবাবপত্রও একই দলের। রেডিয়ো, স্টিরিয়ো, এমনকী টিভি সেট পর্যন্ত ঘরে জায়গা পেয়েছে। সুন্দর গোলাপি পরদায় জানলার আব্রু রক্ষা হচ্ছে। সামনেই কাচঢাকা টেবিল। তাকে ঘিরে চারটে সোফা। তার তিনটেকে ভাগাভাগি করে ওরা চারজন জায়গা করে নিয়েছিল রেডিয়োতে বিবিধ-ভারতীর হিন্দি অনুষ্ঠান বাজছে, আর ওদের ব্যস্ত কাকলির প্রধান ভাষা ইংরেজি, দ্বিতীয় ভাষা বাংলা। হয়তো কবিতা সেনই বাংলা প্রচারের 'জাগো বাঙালি দলের হয়ে কাজ করছে।

ঘরের দেওয়ালে গাঁথা বিচিত্র ল্যাম্পশেডের দল সমানভাবে প্রতিভার প্রমাণ দিতে ব্যস্ত। সিলিং ফ্যান ঘুরছে নিঃশব্দে। টিভি সেটের ওপরে লাল-কালো ছাপা ঢাকনা দেওয়া তার ওপরে রাখা রাবার ম্যাটে ছোট্ট ফুলদানি। সেখানে প্লাস্টিকের ফুল শোভা পাচ্ছে হয়তো প্রতীকী নিনাদে বলছে : প্লাস্টিকের জীবন তোমাদের।

বসবার ঘরের পেছনেই হয়তো অন্যান্য ঘর-কিচেন-বাথরুম, কিন্তু বিভাজ দেওয়ালটা মেসনাইটের, তার ওপরে হালকা গোলাপি পরদা টানা। মাঝামাঝি জায়গা ভেতরে যাওয়ার দরজা। এখন সেটা ভেজানো।

BanglaBook.org

আমাকে ঢুকতে দেখে চারজনের দুজন উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমজনের পরনে লাল ম্যাক্সি, প্রসাধন মাঝারি, চুল মাথার ওপরে পাঁউরুটি-ঢঙে বাঁধা।

দ্বিতীয়জন সবুজ-মেরুন স্কার্ট-ব্লাউজ, গায়ের রঙ ময়লা, ঠোঁটের সিঁদুর বিশেষরকম জোরালো, কানে চোখে-পড়ার-মতো স্টেনলেস স্টিলের রিঙ।

প্রথমজন এগিয়ে গিয়ে রেডিয়োটা নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল। সুন্দর করে হেসে বলল, 'ডু কাম ইন, ইন্সপেক্টর।'

প্রতিহেসে ঘরে পা দিলাম আমি। একটা সোফা দখল করে বসলাম। ল্যাম্পশেডের আলো কাচের টেবিলের কিছু অংশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসছে, কারণ বাকি অংশ 'ফর য়ু' এবং 'ফর অল' পত্রিকার পরিচ্ছদহীন মেয়ের প্রচ্ছদচিত্রে ঢাকা।

ওদের নামগুলো জিগ্যেস করে প্রথমেই পরিচিত হয়ে নিলাম।

লাল ম্যাক্সি : ডলি বেনসন।

সবুজ-মেরুন স্কার্ট-ব্লাউজ : চন্দা সুখানি।

হাতকাটা সাদা ব্লাউজ, নেভি-ব্লুর ওপর সাদা বুটি জর্জেট ও কালো চুলের বিদিশার অন্ধকার বন্যা নিয়ে কবিতা সেন। শ্রাবস্তীর কারুকার্যটুকু পেলেই ওকে বনলতা সেন বলে ডাকতে পারতাম।

এবং সবশেষে সাধারণ হলদে-কালো ছাপা ভয়েলের শাড়িতে মেরি কৃষ্ণমূর্তি। রোগা, ভাঙা-চোয়াল শরীরে এক অদ্ভুত পাশ্চাত্য সৌন্দর্য রয়েছে।

ওদের রাতের চেহারায় বাহ্যিক চমক স্পষ্টত দৃশ্যমান। একমাত্র ডলিকেই অল্প প্রসাধনে ভালো লাগছে। আর সেটা বোধহয় ও নিজেও জানে।

প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষ হলে ডলি বেনসন চন্দার সঙ্গে নিচু গলায় কীসব কথাবার্তা বলে 'আসছি' শব্দটা ছোট্ট করে উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট ছেড়ে। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে চন্দা বলল, 'আমাদের ফ্ল্যাটে গেছে—।'

কবিতা সেনের সবিস্তারিত ব্যাখ্যায় জানলাম, এই ফ্ল্যাটটায় সে ও মেরি থাকে। এবং অন্যটায় ডলি ও চন্দা।

ডায়েরি ও পেন বের করে গুছিয়ে বসতে-বসতে বললাম, 'এত রাতে ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত—।'

'আমরা তো রাতেই সবসময় ডিসটার্বড হই,' প্রত্যুৎপন্ন উত্তর জুড়ে দিল কবিতা।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ডলি ফিরে এল। হাতে অতিথি-আপ্যায়নে সাজানো চা ও স্ন্যাক্স। ওদের রীতি ঐতিহ্যবিমুখ দেখে ভালো লাগল। ভদ্রতায় ওরা কৃপণ নয়। কিন্তু আমি কৃপণ হলাম। ভদ্রতা না দেখিয়ে শরীরের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিলাম। চা ও স্ন্যাক্স শেষ করলাম পলকে। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করলাম প্রশ্ন-উত্তরের পাঁচালি।

জানা গেল, এখন যে দারুণ ঘরটায় আমরা বসে আছি সেটাই অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট সাধারণ আপ্যায়নকক্ষ। এবং ঘরের প্রতিটি জিনিস, এমনকী টেবিলে রাখা পত্রিকা দুটো পর্যন্ত, ওদের সম্মিলিত পয়সায় কেনা। ভালো। এরকম 'পতিতা সমবায় সমিতি' খুব কম দেখা যায়।

আমাকে ঘিরে ওরা চারজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। সোফাতেই। মেরির নরম দৃষ্টি ও শিথিল বসার ভঙ্গি জানিয়ে দিচ্ছে লিলি জনসনের মৃত্যু ওকে আঘাত দিয়েছে।

BanglaBook.org

সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম, লিলি সম্পর্কে ওদের যতটুকু জানা আছে তা যেন আমাকে খুলে বলে। কারণ লিলির ভয়ঙ্কর খুনিকে ধরতে গেলে ওর বিষয়ে সবকিছু জানা দরকার।

ওরা তিনজনে ঘাড় হেলিয়ে নীরবে সায় দিল। একমাত্র ব্যতিক্রম মেরি কৃষ্ণমূর্তি পাথরের মূর্তি।

তারপর সংলাপপ্রিয়া কবিতা সেনই প্রথম মুখ খুলল, 'ইন্সপেক্টর, লিলি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি খবর আপনাকে দিতে পারবে মেরি। ওর সঙ্গে লিলির বেশি মেলামেশা ছিল।' চন্দা ও ডলির দিকে ফিরে, ' কী রে, ঠিক বলিনি?' ওরা দুজন সমস্বরে সমর্থন জানাল।

মেরি একবার চোখ তুলে দেখল কবিতাকে, তারপর তাকাল আমার দিকে। শীতল সুরে বলল, 'কবিতা ঠিকই বলেছে, তবে ওর সম্পর্কে আমি যেটুকু আপনাকে বলতে পারব তাতে আপনার খুনি ধরার কাজে কোনও সাহায্য হবে কি না জানি না...।'

আমি উত্তরে বললাম যে, মিস্টার ও মিসেস নায়ারও আমাকে বলেছেন, লিলির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল মেরি কৃষ্ণমূর্তি। ও 'ফর য়ু' পত্রিকাটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তাতে মনোযোগ দিল।

কর্মপদ্ধতি আমি ঠিক করে নিলাম। প্রথমে কবিতা, ডলি ও চন্দার কাছ থেকে ওদের ব্যক্তিগত এবং এই বাড়ি সম্পর্কে গতানুগতিক তথ্য জেনে নেব। তারপর ওদের ছুটি দিয়ে একা মেরিকে নিয়ে পড়ব। সুতরাং কাজ শুরু করলাম।

গতানুগতিক প্রশ্নের গতানুগতিক উত্তরে জানা গেল কবিতা সেন একটা মারোয়াড়ি ফার্মে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। মাইনে বলতে চাইল না। ও আর মেরি এই ফ্ল্যাটটার জন্যে ভাড়া দেয় মোট চারশো টাকা।

চন্দা এবং ডলিও একই ভাড়া দেয়। ওরা দক্ষিণ কলকাতার একটা রেডিয়ো, টিভি-র শো-রুমে একইসঙ্গে সেল্‌সগার্লের কাজ করে। এই ঘরের সবকিছু ওদের নিজের পয়সায় কেনা, তবে অন্যান্য ঘরের সাদামাটা ফার্নিচার মিসেস নায়ারের।

কবিতা এখানে আছে বছর দুয়েক, ডলি চারবছর ও চন্দা মাত্র আটমাস। লিলির সঙ্গে ওদের কথাবার্তা খুবই কম হত। কারণ ওদের তিনজনেরই মতে লিলি বেশ একটু অহঙ্কারী ছিল। কেন? নখ খুঁটতে-খুঁটতে চন্দা বলল, 'ওর রেট ছিল সবচেয়ে বেশি। সেজন্যেও হতে পারে। তা ছাড়া, রিসেন্টলি লিলি প্রেম করতে শুরু করেছিল।' কে সেই প্রেমিক? ওরা তিনজনেই তাকাল মেরি কৃষ্ণমূর্তির দিকে। চোখে যেন নীরব প্রশ্ন, 'কী, বলে দেব?'

'গৌতম ভাস্কর—ওর সঙ্গেই অফিসে কাজ করত।' হাঁটুতে হাত রেখে পত্রিকা থেকে চোখ সরিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মেরি। আবার চোখ ফেরাল 'ফর য়ু'তে।

মিস্টার ও মিসেস নায়ার কীরকম লোক? প্রশ্ন করেছিলাম ডলি-চন্দা-কবিতাকে, কিন্তু লক্ষ করলাম, মেরি তীব্র চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে। কিন্তু সে এক অনুপলের জন্যে। আবার ও শান্ত, নম্র, বিষাদ-প্রতিমা।

ডলি, চন্দা ও কবিতার যেটুকু অভিমত পাওয়া গেল তাতে এটুকু বোঝা যায়, মিস্টার ও মিসেস নায়ার নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। মিসেস নায়ারই বাড়ির দেখাশোনা করেন।

BanglaBook.org

একটু-আধটু সুরাপানের অভ্যেস আছে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ওরাও তাঁর কাছ থেকে মদ চেয়ে নিয়ে আসে। প্রায়ই মেয়েদের সুবিধে-অসুবিধের খোঁজ নেন ভদ্রমহিলা, তবে ভাড়া বাকি পড়লে আর ক্ষমা নেই।

সুদর্শন নায়ার বৃদ্ধ, পঙ্গু ও শয্যাশায়ী। খুব ভালো লোক। আবার মেরির জ্বলন্ত দৃষ্টি। অনেক আগে ওষুধ-টষুধের ব্যবসা ছিল।

ওদের সঙ্গে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ দেখা করতে আসে না? সেরকম কেউ আসে না। সবসময় আসা-যাওয়া করে কানু। আর ইদানীং—গত মাসছয়েক—বার দু-চার এসেছে অজিত শুক্লা নামে এক ভদ্রলোক। সে আবার লিলির সঙ্গেও দেখা করত।

আমার চোখ ফিরল মেরির দিকে। ও ছোট্ট করে বলল, 'উনিও লিলির অফিসের...।'

বুঝলাম, অতি সন্ন্যাসিনীতে গাজনজাতীয় কিছু একটা নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং ডায়েরি রেখে হাততালি দিয়ে বলে উঠলাম, 'ও-কে গার্লস! সাহায্যের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ। এখন আমি মেরির সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই। ডোন্ট মাইন্ড।'

ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও বিরক্তি : পর্যায়ক্রমে এই তিনরকম মুখভাব নিয়ে ঘর ছাড়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল চন্দা, ডলি ও কবিতা। যাওয়ার আগে 'সি যু' বলে নিষ্ক্রান্ত হল চন্দা সুখানি ও ডলি বেনসন। আর কবিতা সেন আমার দিকে তাকিয়ে দু'কান ছুঁয়ে হাসল। নীল শাড়ি ও কালো কেশরাশি বাতাসে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'দরকার হলেই ডাকবেন, মিস্টার বরাট। পুলিশের হাতে ক্রস এক্সামিন্ড হতে আমার দারুণ লাগে—।'

যদি ভুল না শুনে থাকি তা হলে 'এক্সামিন্ড' শব্দটার ওপর একটু বেশি জোর দিয়েছে কবিতা সেন, এবং একইসঙ্গে ওর মুখে শ্রাবস্তীর বদলে বস্তির কারুকার্য ফুটে উঠল। আদর্শ পতিতা। ওকে আর বনলতা নামে ডাকতে হল না। বাঁচলাম।

ঘর খালি হল। আমি ও মেরি এখন একা। হাতের পত্রিকাটা ও রেখে দিয়েছে। চুপচাপ বসে আছে মাথা নিচু করে।

খবর আদায় আমার এক ও একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং পুরুষত্বে আঘাত লাগলেও নিকৃষ্টতম পদ্ধতিই বেছে নিলাম। দরকার হলে এর জন্যে পরে অনুতাপ করব।

'মিস মেরি আপনি হয়তো গিটারের চার নম্বর তার দেখে থাকবেন। খুব শক্ত। ওটা যদি কোনও মেয়ের নরম গলায় ফাঁস দিয়ে সেরকম জোরে টানা হয় তা হলে তারটা গলায় কেটে বসে শিরদাঁড়ায় গিয়ে ঠেকবে। কপাল ভালো বলতে হবে, লিলি জনসনের খুনি তারটা লিলির গলায় মাঝামাঝি বসে যেতেই রেহাই দিয়েছে। আরও একটা গোপন খবর আপনাকে বলতে পারি। লিলি মরে যাওয়ার পর খুনি ওর গোটা মুখে ঘষে-ঘষে লাল লিপস্টিক লাগিয়ে দিয়েছে। সে-দৃশ্যের বীভৎসতা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।'

দু-হাতে মুখ ঢেকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে মেরি। আমি জানতাম, ও সইতে পারবে না। কথা শেষ করতে বলে উঠলাম, 'এ-নৃশংস খুনি সাধারণ খুনি নয়। এর খুনের কোনও স্পষ্ট কারণ আমরা এখনও জানতে পারিনি। সম্ভবত লোকটা মানসিক রোগগ্রস্ত। আউট অ্যান্ড আউট সিক। এ-জাতীয় খুনি একটা খুন করে থামে না। এরপর কে ওর শিকার হবে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। খুনি

BanglaBook.org

যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে ততই ভালো—সবার পক্ষে।' একটু সময় দিয়ে : 'সেইজন্যেই আপনার আন্তরিক সহযোগিতা চাই, মিস মেরি। লিলি জনসন আপনার বন্ধু ছিল। ওর খুনের শোধ নিতে আমাকে সাহায্য করাটা আপনার কর্তব্য বলেই আমি মনে করি...।' মুখ থেকে হাত সরিয়ে এবার চোখ তুলে তাকিয়েছে। কাজল কালো চোখের কোল ভারী। পরনের শাড়িটা সামান্য গুছিয়ে নিল : 'এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, আপনার সঙ্গে যা কথাবার্তা হবে তা সবই গোপন থাকবে। নিতান্ত দরকার না হলে মামলায় মেনশান করব না...।'

মেরি কৃষ্ণমূর্তি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। সম্ভবত আমি ওকে আশানুরূপ দ্রবীভূত করতে পেরেছি। ও আমার মুখোমুখি সোফায় বসে তীক্ষ্ণ চিবুক তুলে তাকাল।

'বলুন, কী জানতে চান—।'

'লিলি অহঙ্কারী ছিল?'

'ওরা বলল, শুনেছি। কিন্তু ও অহঙ্কারী ছিল না—ওদের তিনজনের সঙ্গে খুব কম মিশত।' কণ্ঠস্বর আরও একাগ্র হল : 'ইন্সপেক্টর বরাট, ডলি-চন্দা-কবিতা ওরা জানে এটা ওদের পেশা। কিন্তু লিলি তা ভাবত না। নেহাত প্রয়োজন ও পরিস্থিতি ওকে বাধ্য করেছিল মাঝে-মাঝে ঘরে গেস্ট তুলতে। ওর মনটা ছিল বরাবরের মতোই আত্মসম্মানী। আত্মীয়-স্বজন বলতে কলকাতায় কেউ নেই। শুধু চাকরি করে যে-টাকা পেত তাতে জীবন চলতে চায় না...।'

মেরি কৃষ্ণমূর্তি, তুমি ক'বছর পশ্চিমবঙ্গে আছ? তোমার বাংলা যে অনেককে লজ্জা দেবে।

'...এই আমার কথাই ধরুন না। ডলিদের চোখে হয়তো আমিও অহঙ্কারী। কিন্তু আমি কী করে ভুলব বলুন তো, যে আমার বাবা কলেজের প্রফেসর ছিলেন, আমার ছোট ভাই ইস্কুলে পড়ে?'

'কোন ইস্কুলে?' বিস্ময় ও কৌতূহলের তীর আমার বুকে যুগপৎ বিদ্ধ হল।

'কালিম্পংয়ে—ন্যাশনাল হাইস্কুল...মাসে-মাসে আমি টাকা পাঠিয়ে দিই...' মুখ আনত হল আবার : 'বাবা মারা গেলেন...মা ছোটবেলাতেই গেছেন...একটা ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। কী করে জানি না, লেখাপড়া শিখেও নষ্ট হয়ে গেলাম। ব্যাঙ্গালোরে থাকতেই একটি বাঙালি ছেলের প্রেমে পড়েছিলাম। তার মিথ্যে আশ্বাসে কলকাতায় এসে কী পরিণতি হল! কত কষ্ট করে যে ভাইটাকে ইস্কুলে দিয়েছি, আর নিজে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানোর চাকরি জুটিয়েছি, সে একমাত্র আমিই জানি। সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকি। জানাজানি হলেই বোধহয় চাকরি যাবে।' অশ্রুবিন্দু যে কত সুন্দর হতে পারে তা কবি ও সাহিত্যিকরা অকৃপণভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রমাণ পেলাম, বাস্তব কল্পনার চেয়ে শতগুণে মধুর। মেরি ছোট্ট সাদা রুমাল বের করে চোখের জল মুছল। মেঘের আড়ালে সূর্যের ঝিলিকের মতো হাসল : 'যাকগে, বাদ দিন ওসব কথা...এখন তো বুঝলেন কেন লিলি অহঙ্কারী, কেন আমি অহঙ্কারী। ইন্সপেক্টর, উই ডোন্ট বিলং টু দিস প্রফেশন। এটা শুধুই একটা আর্থিক প্রয়োজনের ভরতুকি।'

'গৌতম ভাস্কর সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'দেখতে-শুনতে ভালো। কথাবার্তায় স্মার্ট। সোনা ট্রাভেল্‌স-এ অ্যাসিস্টেন্ট

BanglaBook.org

ম্যানেজারের পোস্টে আছে। শুনেছি গৌতম নাকি খুব বড়লোকের ছেলে। নেহাতই শখে এবং ইদানীং লিলির টানে চাকরি করে। মোটামুটি ইমোশনাল বলতে পারেন—অল্পেতেই রেগে ওঠে। ম্যানেজারকে চাকরি ছাড়ার হুমকিও দিয়েছে বারদুয়েক—নিতান্তই তুচ্ছ কারণে। কিন্তু ছেলেটা এফিসিয়েন্ট বলে ওরা ছাড়েনি। লিলি মারা যাওয়ায় এখন গৌতম কী করবে জানি না।'

'লিলি ওখানে চাকরি করছে কতদিন?'

'পাঁচ-ছ'বছর হবে—এখানে যতদিন ছিল, ততদিন।' হাসল, 'দেখতে-দেখতে কীভাবে দিন চলে যায়।' আনমনা সুরে শূন্য দৃষ্টি সামনে মেলে ধরে : 'এ-বাড়িতে আমার প্রায় সাত বছর হয়ে গেল। সবচেয়ে পুরনো ভাড়াটে বলতে এখন আমিই।'

যে-গরু দুই দেয় তার লাথিও হজম করতে হয়। ফলে লিলির খবর জানতে গিয়ে আমাকে নির্বিবাদে মেরির খবরও হজম করতে হচ্ছে।

'ভাস্কর এখানে প্রায়ই আসত?'

'না—একদিনও আসেনি। লিলির বারণ ছিল।' মেরি হাত নেড়ে বোঝাতে চাইল আমাকে : 'অফিসের কাউকে ও এখানে আসতে বলত না। বাড়ি বলতে যা বোঝায় এটা তো ঠিক তা নয়। আমিও তো ইস্কুলের কাউকে এখানে নিয়ে আসতে পারি না। আসলে আমার আর লিলির অবস্থা ছিল হাঁসের দলে বকের মতো। মাঝে-মাঝে নিজের অক্ষমতায় ও রেগে উঠত, কান্নাকাটি করত। গত মাসে তো জেদ করে কাল্লুকে বলে ঘরে লোক নেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু পারবে কী করে? বাড়িভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পর পেটে টান পড়তেই মত পালটায়—।'

লিলি, আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম।

'গৌতম ভাস্করের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, আলাপ আছে, কারণ গৌতম আর লিলির সঙ্গে বারতিনেক আমি গিয়েছিলাম—সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়। আমি লিলিকে বলতাম, তোদের সঙ্গে গিয়ে আমি কাবাবমে হাড্ডি হতে চাই না। কিন্তু ও ছাড়ত না। বলত, তুই ছাড়া আর কে আছে আমার।'

'লিলিকে গৌতম কীরকম ভালোবাসত?' সামান্য থেমে দ্বিধা কাটিয়ে : 'ও জানত লিলি আসলে কী?'

'আসলে কী মানে?' রুখে উঠল মেরি কৃষ্ণমূর্তি। এই প্রথম ওকে সত্যি-সত্যি রেগে উঠতে দেখলাম। সুতরাং আমি নিশ্চুপ। মাতা মেরির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

'ইন্সপেক্টর বরাট—' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও মুখ খুলল, 'আমাদের ঘেন্না করবেন না। দুশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে গেলে ইস্কুলের সাড়ে তিনশো টাকা মাইনেতে কোনও দিদিমণির চলতে পারে না। তা হলে তার ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চালাবে কে? ভদ্রঘরের মেয়েদের তো পিসতুতো-মাসতুতো-পাড়াতুতো নানান ভাইয়ের সঙ্গে হাজার ফষ্টিনষ্টি হলেও ভদ্রঘরে ঠিক বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়! তা হলে আমাদের প্রেম করতে বাধা কীসের? আমাদেরটা লোকে জেনে গেছে বলে? জানুক। সব জেনেও যদি কেউ ভালোবাসতে চায়, তা হলে?'

ঘরের টিভি, রেডিয়ো, টেবিল, সোফা—সব জায়গাতেই এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজলাম। অবশেষে মেরির মুখে। কিন্তু কোনওরকম সাহায্যই সেখানে পেলাম না। আমাকে হেরে

BanglaBook.org

যেতে দেখে হাসল মেরি। তিক্ত হাসি। বলল, 'কিছু মনে করবেন না! এ-প্রশ্নের উত্তর আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি তো সামান্য একজন ইন্সপেক্টর!' নিরুপায় হয়ে অপমানটা হজম করলাম। তা ছাড়া, মেরিকে আঘাত দিতে মন চাইল না। ও বলল, 'গৌতমকে সমস্ত কথা লিলি নিজেই খুলে বলেছিল—মাত্র চারদিন আগে। কারণ সেইদিনই গৌতম লিলিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে একটা সোনার আংটি উপহার দেয়—।'

'লাল পাথরের চোখ বসানো প্যাঁচানো সাপ?' আমি হিসেব মেলানোর উদ্দেশ্যে জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ। সেইদিন রাতে লিলি আমার কাছে আসে। ভীষণ কান্নাকাটি করে আংটিটা আমাকে দেখিয়ে বলে, "ওকে সব আজ খুলে বললাম রে। একটা সরল ছেলেকে আমি ঠকাতে পারব না। মরে গেলেও না!" আমি ওকে অনেক সান্ত্বনা দিই। ওর কাছ থেকেই জানতে পারি, সমস্ত ঘটনা জেনে গৌতম খুব কষ্ট পায়। তারপর থেকে ক'দিন নাকি ওদের বনিবনাটা কমে গিয়েছিল—গৌতমের তরফ থেকেই—'

লিলিকে আমি...আমি...ভালো বলে জানতাম—ও যে রীনার মতো...।

মেরি আবার বলতে শুরু করল, 'কিন্তু গতকাল সন্ধেবেলা লিলি খুব খুশি হয়ে আমাকে এসে বলল যে, ওদের সবকিছু আবার মিটমাট হয়ে গেছে। খারাপ ব্যবহারের জন্যে গৌতম খুব দুঃখ করে লিলির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। শুনে আমারও ভালো লেগেছিল, কিন্তু...পুয়োর গার্ল! ও ঠিক করেছিল বিয়ের পর চাকরি এবং এই ফ্ল্যাট—দুটোই ছেড়ে দেবে...বেচারার ভাগ্যটাই খারাপ!'

'শুনে মনে হচ্ছে, লিলি গৌতম ভাস্করকে ভীষণ ভালোবাসত...' একটু ইতস্তত করে পরের কথাটা বললাম, 'আপনি...ইয়ে...জানেন, ওদের মধ্যে কোনওরকম...ফিজিকাল রিলেশান ছিল কি না?'

'না, ছিল না,' বলিষ্ঠ জবাব পেলাম, 'লিলি বলেছিল, "গৌতমকে আমার সবকিছু দেব বিয়ের পরেই, আগে নয়।" একটু থেমে, 'আরও বলেছে, "গৌতম তো আমার গেস্ট নয়—লাভার।"'

'গৌতম ভাস্কর ছাড়া লিলির অফিসের আর কারও সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। গৌতমের সঙ্গে একজন বন্ধু প্রায়ই থাকত। ওরই অফিসে অ্যাকাউন্টস্-এ কাজ করে। রতন শর্মা। ভীষণ ভদ্র আর লাজুক। আমার সঙ্গে তো লজ্জায় মুখ তুলে কথাই বলতে পারছিল না—।'

আচমকা থেমে গেল মেরি। যেন মুখ ফসকে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে। বিব্রত হলে ওকে ভালোই দেখায়। ও যা, তাই বলে ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু নিয়তি অপ্রতিরোধ্য, তাই মেরি দেহ ফেরি করে, আর আমি পুলিশে মালিশ করে চলেছি।

চিন্তা করে দেখলাম, এটুকু সময়ে মেরি কৃষ্ণমূর্তি প্রেম, পতিতা ও সমাজ—এই তিনটে বিষয়ে আমাকে যে-পরিমাণ জ্ঞান দিয়েছে তাতে কুড়িতে আঠারো পাওয়ার মতো 'সতী পতিতা' অথবা 'অসতী প্রেমিকা' নামে একটা প্রবন্ধ আমি অনায়াসে লিখে ফেলতে পারি। সুতরাং এবার ওকে সামান্য প্রতিষেধক খাওয়ানো যেতে পারে। সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'রতন শর্মাকে আপনি ভালোবাসেন?'

BanglaBook.org

প্রথমে বিস্ময়ে চমকে ও আমার চোখে তাকিয়েছে। তারপর আশঙ্কা ও দ্বিধা। অবশেষে বেপরোয়া ভঙ্গিতে 'ভালোবাসি কি না জানি না, তবে ভালো লাগে...অল্প ক'দিনের তো আলাপ।' মাথা নিচু করল মেরি। মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস। শাড়ির আঁচল ধরে নাড়াচাড়া করে চলেছে। দেবদাসের মুখোমুখি লাজুক পার্বতী। ধন্য শরৎচন্দ্র!

'লিলির খুনের খবরটা ওরা জানতে পেরেছে?'

'না। কালকের কাগজে বেরোলেই জানতে পারবে।'

'একটু আগে শুনলাম সোনা ট্রাভেল্‌স-এর অজিত শুক্লা নায়ারদের ঘরে যাতায়াত করত। লিলির সঙ্গেও দেখা করত।' মেরি এখন মুখ তুলে তাকিয়েছে। ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'ব্যাপার আবার কী?' হাত ওলটাল : 'অজিত শুক্লা মিসেস নায়ারের কেমন যেন এক রিলেটিভ হয়। মিসেস নায়ার আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসতেন লিলিকে। ওকে একদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন অজিতের চাকরির জন্যে। বেচারা বেকার থেকে খুব কষ্ট পাচ্ছে। লিলিই অনেক চেষ্টা করে অজিতকে অ্যাকাউন্টস্ সেকশনে ঢুকিয়ে দেয়—অবশ্য গৌতমও হেল্প করেছিল। মিসেস নায়ার তখন লিলিকে কথা দিয়েছিলেন, ওর ব্যাপারে অফিসে কোনওরকম জানাজানি অন্তত অজিতের তরফ থেকে হবে না। তা ছাড়া, চাকরিতে ঢোকার পর এ-বাড়িতে যাওয়া-আসার ব্যাপারে ওকে লিলি বারণ করে দিয়েছিল।' কিছুক্ষণ নীরব : 'এই মেয়েকে আপনি অহঙ্কারী বলে ভাবতে পারেন? ও খুব ব্রড মাইন্ডেড ছিল।'

বুঝলাম, ব্রড মাইন্ডেড ব্রড হিসেবে লিলি জনসন এক দৃষ্টান্ত।

'ইন্সপেক্টর বরাট—' মেরি আবার বলল, 'অজিত শুক্লার চাকরির ব্যাপারটা একটু গোপন রাখবেন। জানাজানি হলে অজিতের ক্ষতি হবে।'

'অজিত ছেলে হিসেবে কেমন? পরিচয় আছে?'

'না, পরিচয় নেই, তবে গৌতম ও রতনের মুখে ওর কথা শুনেছি। লিলির মহানুভবতায় ছেলেটা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবসময় নিজের কৃতজ্ঞতা দেখাতে চাইত। তা ছাড়া, মাত্র চারমাস ও চাকরিতে ঢুকেছে, তার মধ্যেই গৌতম ভাস্কর আর রতন শর্মার সঙ্গে ভালোরকম বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। শুনেছি, খুব সরল মনের ছেলে—'

একটা ব্যাপারে আমার সামান্য খটকা লাগছে : অজিত শুক্লার কথা মিসেস নায়ার গোপন করলেন কেন? একটা সাধারণ ব্রড তাঁর আত্মীয়কে চাকরি দিয়েছে, এই লজ্জায়?

'মিস মেরি, ভালো করে ভেবে বলুন...এমন কোনও ঘটনা কি আপনি জানেন, খুনের সঙ্গে যার সম্পর্ক না থাকলেও আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল?'

মেরি কৃষ্ণমূর্তির ভুরু কুঁচকে উঠল। কাজল আঁকা চোখ সূক্ষ্ম হল। সুষম দাঁতে কামড়ে ধরল পাতলা ঠোঁটের কোণ। তারপর চিন্তাগতভাবে বলল, 'একদিন ...নায়ারদের ফ্ল্যাট থেকে একটা অদ্ভুত গলা পেয়েছিলাম। এ-স্বর...আমার চেনা কারও নয়...' ইতস্তত করল : 'দিন সাত-দশ আগের কথা। রাত তখন আটটা হবে, তিনতলায় লিলিকে ডাকতে গেছি, শুনলাম নায়ারদের ফ্ল্যাটে কথা হচ্ছে। সুদর্শন নায়ারের গলা চিনতে পারলাম। উনি আস্তে-আস্তে বলছেন, "তোমাকে কতবার বারণ করেছি এখানে আসবে না, তবু কেন আসো? আমার ভালোমন্দ তোমাকে দেখতে হবে না!" তখন খুব অস্পষ্ট স্বরে

BanglaBook.org

একটা অচেনা গলা উত্তর দিল, "আমার জীবনটা তোমার জন্যেই ছারখার হয়ে গেছে। কিন্তু তোমারটা আমি ছারখার হতে দেব না। নেভার।" সুদর্শন নায়ারের সুর তখন চড়া হল : "আমার সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। সেইদিন তোমাকে ক্ষমা করে দেখছি বিরাট ভুল করেছি! আমার কাছে তুমি মৃত। ডেড!" উত্তরে সেই আগন্তুক ইনিয়েবিনিয়ে কী যেন বলল—সম্ভবত টাকা-পয়সা নিয়ে। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, "তোমাকে আমি কতবার বাঁচিয়েছি, বলো তো? সে তোমাকে ভালোবাসি বলেই। অথচ সবাই আমাকে ভুল বোঝে। আশ্চর্য!" নায়ারের গলা শোনা গেল তখন, "তোমার উপকারে-উপকারে আমি ক্লান্ত। এবার—" এমন সময় লিলি দরজা খুলে দিতেই আমি ওর ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ি। আর কিছু শুনতে পাইনি। ওদের কথাবার্তার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝিনি। সেইজন্যেই ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লেগেছিল।' মেরি থামল।

'মিসেস নায়ার লোকটার কথা জানেন?'

'বোধহয় না। কারণ, মনে হয়, লোকটা যখন এসেছিল তখন উনি ঘরে ছিলেন না।'

'আর কখনও ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছেন?'

'না—।'

'অচেনা কারওকে কখনও নায়ারদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখেননি?'

'না।'

ডায়েরি ও পেন রেখে দিলাম টেবিলের ওপর। মেরি কৃষ্ণমূর্তির দিকে চেয়ে হাসলাম।

বললাম, 'এবার আপনাকে নায়ারদের সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করব।' মেরির চোখে-মুখে দ্বিধার ভাব ফুটে উঠতে দেখে আশ্বাস দিলাম : 'ভয় নেই। তৃতীয় ব্যক্তি টের পাবে না—।'

'নতুন আর কী বলব! শুনেছি, মিসেস নায়ার বয়েসকালে নাকি...আমাদের মতোই ছিলেন...' গ্লাসটপ টেবিল ও 'ফর অল' পত্রিকার প্রচ্ছদের নগ্ন লাস্যময়ীর শরীর ডিঙিয়ে আমার হাত চেপে ধরল মেরি। হাতের কোমলতার জন্যে ওকে পুরোপুরি একশো নম্বর দিলাম। ও বলল, 'দেখবেন, ইন্সপেক্টর বরাট, আমার নামটা যেন কোনওরকমে না ওঠে, প্লিজ...' একটু ভেবে : হাত ছেড়ে দিয়ে, 'আরও শুনেছি...নায়াররা স্বামী-স্ত্রী নয়...একসঙ্গে থাকে...।'

একেবারে নতুন তথ্য। খেই ধরিয়ে দিতে মেরিকে বললাম, 'আর মিস্টার নায়ার?'

মেরি কৃষ্ণমূর্তির রোগা শরীর টান-টান হল। মুখ লালচে হল উত্তেজনায়। ঘৃণায় ঠোঁটের সরু রেখা তির্যক হল। বুঝলাম, নিজেকে সংযত করার একান্ত চেষ্টা করছে। ওর মুখ থেকে উত্তরটা ছিটকে এল—থুতুর মতো।

'হি ইজ আ ফিল্‌থ! নোংরা জঘন্য চরিত্রের লোক!' মাতা মেরি রেগে গেছেন।

আমি অপেক্ষায় রইলাম। মেরির এত রাগ ও ঘৃণার কারণ ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

একটু পরে ও বলল, 'লোকটা একটা...পারভার্ট।'

বললাম, 'জানি। নায়ার লুকিয়ে নোংরা ছবির বই কেনেন। কানু সাপ্লাই দেয়।'

BanglaBook.org

'শুধু বই?' মেরি কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করল, 'থাক, এর বেশি কিছু বলতে পারব না। আমার গা গুলোচ্ছে।' মুখ নামাল মেরি।

আমার কৌতূহল উচ্ছৃঙ্খল হতে চাইলেও উপায় নেই।

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে মেরি ইতি টেনেছে।

'সুদর্শন নায়ারের প্রতি লিলির কীরকম মনোভাব ছিল?'

'ও নায়ারকে ঘেন্না করত—আবার করুণাও করত।' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে 'ইন্সপেক্টর বরাট, রাত অনেক হল। যদি কিছু মনে না করেন, আজ ছুটি দিন।'

ডায়েরি ও পেন গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'থ্যাঙ্কস এ লট, মিস মেরি। হঠাৎ যদি কিছু জানাবার প্রয়োজন মনে করেন, থানায় ফোন করে আমাকে চাইবেন। লিলির খুনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। হি কুড কিল এগেইন। আপনারা চারজনেই খুব সাবধানে থাকবেন। অবশ্য তিনতলায় আর সদর দরজায় একজন করে কনস্টেবল মোতায়েন আছে। কোনও সাহায্যের দরকার হলে ওদের ডাকতে পারেন।' ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এল মেরি, 'রতন শর্মাকে আপনি সত্যিই ভালোবাসেন?' ও নিরুত্তর : 'দেখবেন, লিলির মতো দেরি না হয়ে যায়। তা হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব কষ্ট পাব।' মেরি কৃষ্ণমূর্তিকে আমি হয়তো ভালোবেসে ফেলেছি।

বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটে বাকি তিনজন বোধহয় আমার বিদায়ের জন্যেই উন্মুখ হয়ে ছিল। পায়ের শব্দ পেয়ে ওরা দরজায় বেরিয়ে এল। দলগত হাসাহাসি করে বিদায় জানাল আমাকে। বলল, মামলা মিটে গেলে অতিথি হয়ে আসতে। অবাক হলাম কবিতা সেনকে দেখে। ওর মাথায় এখন বব করা চুল। একটু আগে দেখা 'অন্ধকার বিদিশার নিশা' তাহলে পরচুলা ছিল!

মেয়েরা ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরল মেরিকে। টানতে-টানতে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। আমার সঙ্গে ওর এতক্ষণ কী হয়েছে সেটাই জানতে চায়। নারী-কৌতূহল অমর রহে!

একতলায় নেমে লক্ষ করলাম স্টোর-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

কাঁচা গলিতে পা দিয়ে অদৃশ্য কনস্টেবলকে ফিরে পেলাম। সাতান্ন নম্বরের দরজার পাশে অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন খদ্দের ধরার অপেক্ষায়। ওকে বললাম সোজা হয়ে দাঁড়াতে। নইলে এই এলাকার পুরোনো খদ্দেররা ভাববে শুধু পুলিশে চাকরি পেয়েছে।

BanglaBook.org

অন্তর্দৃশ্য

বিছানায় শুয়ে উসখুস করছিল মেরি কৃষ্ণমূর্তি।

রাত এখন প্রায় বারোটা। খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে শুয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু ঘুম এখনও আসেনি। অথচ পাশের বিছানায় কবিতা গভীর ঘুমে মগ্ন। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়ল মেরি। গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ। ঘরের এককোণে রাখা জাগ থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে ফেলল ঢকঢক করে। জাগটা রেখে আবার ফিরে এল বিছানায়। বসল।

বসবার ঘরের বিলাসিতা ওদের অন্যান্য ঘরে অনুপস্থিত। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না। ওরাই বুঝতে দেয় না। লিলির চেয়ে কষ্টে ওদের দিন কাটে। কিন্তু তাই বলে লিলিকে কখনও ঈর্ষা করেনি মেরি। ভাবতেই অবাক লাগছে, ও নেই। ওপরের ফ্ল্যাট থেকে আর কখনও লিলির চলাফেরার শব্দ পাওয়া যাবে না। ওকে সত্যিকারের ভালোবাসত বলেই ইন্সপেক্টরের কাছে লিলির কিংবা নিজের বিষয়ে কোনও কথাই গোপন করেনি মেরি। শুধু সুদর্শন নায়ারের ওই নোংরা ব্যাপারটা ছাড়া। জঘন্য। শরীর-বিলাসিনী হয়েও ওই কথা দ্বিতীয়বার ভাবতে ওর লজ্জা করে। মনটা মরে যেতে চায় মরমে।

ঘটনার শুরু প্রায় আড়াই বছর আগে, এক ঝমঝমে বৃষ্টিভরা রাতে। মেরি বাইরের ঘরে বসে একটা পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। তখনও কবিতা সেন এ-বাড়িতে আসেনি। জুডি নামে অন্য একটা অ্যাংলো মেয়ে থাকত। সে তখন কোথায় যেন বেরিয়েছিল—মেরিকে ফ্ল্যাটে একা রেখে।

হঠাৎই মেরির মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হল দরজায় কারও নক করার শব্দে। ঠক-ঠক-ঠক। ইতস্তত ভঙ্গিতে, থেমে-থেমে।

হাতের ম্যাগাজিন রেখে উঠে দাঁড়াল মেরি। ঘড়ি দেখল : রাত প্রায় আটটা। কপালে নীরব প্রশ্নের ভাঁজ নিয়ে দরজা খুলে দিল। এবং অবাক হল।

দরজায় দাঁড়িয়ে কান্নু। বৃষ্টিভেজা মুখে বসন্তের দাগগুলো আরও বীভৎস দেখাচ্ছে।

'কী চাই?' বিরক্তির সুরে মেরি বলে উঠল, 'বলেছি তো, আজ কোনও গেস্ট পাঠানোর দরকার নেই।'

হাত দিয়ে গোঁফে লেগে থাকা বৃষ্টির জল মুছে নিল কান্নু। চাপা গলায় বলল, 'গেস্টের জন্যে আসিনি, মেরি মেমসাব। মালিককে ক'টা বই দিয়ে আসতে গিয়েছিলাম, উনি বললেন আপনাকে একবার খবর দিতে...' একটু থেমে, ইতস্তত করে : 'মালিক আপনাকে একবার ওপরে ডাকছেন।'

আর দাঁড়ায়নি কান্নু। সিঁড়ি দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মেরির কপালে ভাঁজের বুনট আরও ঘন হল। মালিক—অর্থাৎ সুদর্শন নায়ার। উনি হঠাৎ এ-সময়ে কেন মেরিকে ডাকছেন? ওদের বাড়িভাড়াসংক্রান্ত যাবতীয় কথাবার্তা হয় মিসেস নায়ারের সঙ্গে। দরকার হলে মিসেস নায়ার নিজেই ডাকতে আসেন। কান্নু...সুদর্শন নায়ার...সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মেরির কাছে।

ফ্ল্যাটের দরজা টেনে দিয়ে গায়ের শাড়িটা ঠিক করে গুছিয়ে নিল মেরি। রওনা হল তিনতলায়।

লিলির ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ মনে হল। হয়তো গেস্ট আছে। সুতরাং অনিশ্চয়তা বুকে নিয়ে নায়ারদের ফ্ল্যাটের বেল টিপল মেরি। দরজা খুলতে কেউ এল না। শুধু ছোট্ট করে নায়ারের গলা পাওয়া গেল, 'কাম ইন—।'

ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। সামনের ঘরে কেউ নেই। অনিতা নায়ার কোথাও গিয়ে কি বৃষ্টিতে আটকে পড়েছেন? ভেতরের ঘরের দিকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে পা বাড়াতে যাবে, নায়ারের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'কে? মেরি?'

উত্তর না দিয়ে সুদর্শন নায়ারের ঘরে গিয়ে ঢুকল মেরি। এই ঘরটায় আগে কখনও ও আসেনি। নোংরা ঘরের বিচিত্র উৎকট গন্ধে ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

সুদর্শন নায়ার চেষ্টাকৃত প্রশান্ত মুখে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে আধশোওয়াভাবে

BanglaBook.org

স্থির হয়ে রয়েছেন। মেরিকে দেখে হাসলেন। হলদে দাঁতে আন্তরিকতার চেয়ে ধূর্ততা বেশি ফুটে উঠল। বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো। অনিতার ফিরতে দেরি আছে। কিন্তু হঠাৎ যদি ও ফিরে এসে দরজা বন্ধ পায়, তা হলে কেলেঙ্কারি বাধাবে।'

মেরি তাঁর কথার আগাপাস্তলা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নিষ্ক্রান্ত হল তাঁর অনুরোধ অথবা আদেশ পালন করতে।

ফিরে এসে দেখল নায়ার বসে আছেন একইভাবে, তবে তাঁর হাতে এখন রয়েছে কতকগুলো বাদামি মলাট দেওয়া চটি বই। ওকে দেখে বললেন, 'ওই চেয়ারটা নিয়ে বোসো—দাঁড়িয়ে কেন?'

মেরি কথা না বাড়িয়ে ডান পাশে রাখা একটা পুরোনো চেয়ার নিয়ে বসল। লক্ষ করল, সুদর্শন নায়ার ওকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছেন। যেন ধীরে-ধীরে লেহন করে চলেছেন ওর শরীরের প্রতিটি সমতল, উত্তল ও অবতল অংশ। ভীষণ অস্বস্তিতে ও কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কখনও নখ খুঁটছে, কখনও শাড়ির ভাঁজ টেনে ঠিক করছে, কখনও বা নিজের হাতের রেখা খুঁটিয়ে দেখছে।

মেরি মুখ তুলে তাকাল সুদর্শনের পরের কথায়। চমকে উঠল তড়িৎস্পৃষ্টের মতো।

'তোমার ভাই কেমন পড়াশোনা করছে?'

সুদর্শন নায়ার এ-কথা হঠাৎ জানতে চাইছেন কেন?

'ভালোই—' মাথা নামিয়ে ছোট্ট করে বলল মেরি।

'মেরি, এটা তো মানবে, তোমাদের থেকে বাড়িভাড়া আমি অনেক কম নিই?' সুদর্শন হাসলেন : 'জানবে, এই অল্প ভাড়ায় এ-পাড়াতে একটা কুঁড়েঘরও পাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বডি সেল করতে হবে।'

রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেরি। ফুঁসে উঠে বলল, 'আজেবাজে কথা ছেড়ে কীজন্যে ডেকেছেন বলুন!'

'রাগ করো না। রাগলে তোমারই ক্ষতি হবে।' শব্দ করে হেসে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে, 'তোমরা যে আমার ভাড়াটে কাগজে-কলমে তার কোনও প্রমাণ নেই। সুতরাং, যখন খুশি এ-বাড়ি থেকে উৎখাত করে দেব। তারপর, সব কেলেঙ্কারি জানিয়ে তোমার বাড়িতে, আর তোমার ভাইয়ের স্কুলে চিঠি দেব। আর...আর...যে দুশো টাকা দেব ভেবেছিলাম, সেটাও যাবে।... রেগে কী লাভ? চুপচাপ বসে পড়ো।'

থরথর করে কাঁপছে মেরি কৃষ্ণমূর্তি। হয়তো আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পড়ে যাবে, এই ভয়ে ও চেয়ারে বসে পড়ল। এ কী বলছেন সুদর্শন নায়ার! ওকে নিরাশ্রয় করবেন, ওর ভাইয়ের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করবেন! তা হলে বৃথাই এত কলঙ্ক মুখে এঁকে এতগুলো বছর মেরি প্রাণপাত কষ্ট করল? চাকরি চলে গেলে যদি পথে দাঁড়াতে হয় তবে...।

মেরির মুখে ফুটে ওঠা তীব্র আশঙ্কার ছবি পড়ে নিতে কোনও কষ্ট হল না সুদর্শন নায়ারের। ঠান্ডা ফোঁসলানো গলায় বললেন, 'আমি বুড়োমানুষ বলে কি আমার কোনও সাধ-আহ্লাদ নেই? অন্য সব ক্ষমতা হারিয়েছি বলে কি ছোঁয়ার ক্ষমতা, দেখার ক্ষমতাও হারিয়েছি, অ্যাঁ?' কাশি ও হাসি মেশানো এক বিচিত্র শব্দ করলেন তিনি : 'কাম অন, মেরি, বি আ গুড গার্ল। আমি বাড়ির মালিক। আমার ভাড়াটেরা খদ্দেরকে ঠকাচ্ছে কি না সেটা আমার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যেসব মালমশলা দিয়ে তোমরা খদ্দের

BanglaBook.org

ভোলাচ্ছ, দেখা দরকার তাতে কোনও ভেজাল আছে কি না, কী বলো?'

মেরি কৃষ্ণমূর্তির কান লাল হয়ে উঠল। মাথার মধ্যে ঘরের টেবিল পাখাটার মতো কেমন এক শনশন শব্দ হচ্ছে। সুদর্শন নায়ারের কালচে ঠোঁট দুটো লালায় ভিজে উঠেছে। চশমার কাচের ও-পিঠে ঘোলাটে চোখে ধকধক করে উঠেছে প্রত্যাশার আগুন।

মেরি এখন কী করবে?

লাভ-ক্ষতি নিয়ে মনে-মনে দাঁড়িপাল্লায় বারবার ওজন করল ও। বুকের ভেতর ঘূর্ণির মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠছে ঘৃণা, ক্ষোভ, লজ্জা, কান্না ও নিরুপায়তার সফেন প্রপাত।

'নাচতে নেমে ঘোমটা দিয়ে লাভ কী?' ফিসফিস করে বললেন সুদর্শন, 'ওয়াঙ্গ আ ব্রড, অলওয়েজ আ ব্রড। তোমার সঙ্গে ভার্জিন মেরির শুধু নামটুকুতেই যা মিল। শুধু-শুধু সময় নষ্ট কোরো না। অবশ্য বললাম তো, তোমার সময়ের দাম আমি দেব। পুরো দুশো।' একটু থেমে : 'এমনিতে তো পাও ঘণ্টায় পঁচাত্তর, হুঃ! নাও, খোলো!' সুদর্শন সামনে কিছুটা ঝুঁকে এলেন।

মেরির দু-কানে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। ছোট ভাই জোসেফ-এর সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ও বুঝল, এই অসহায় মুহূর্তে ওকে উদ্ধার করার জন্য নিতান্ত কাকতালীয় হিসেবেও অনিতা নায়ার এখন ফিরবেন না। সে-সম্ভাবনা থাকলে সুদর্শন নায়ার কখনওই এতটা দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারতেন না।

বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ যেন ওকে নাচতে বলছে তালে-তালে। মনে কেমন নেশা ধরছে মেরির। শুনতে পেল, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে জর্জরকাম বুড়ো ভাম বলছে, 'ভয় নেই। কেউ জানতে পারবে না। ইট উইল বি আ টপ সিক্রেট...' আবার হাসছে।

হঠাৎই নিস্তরঙ্গ মন নিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরি। চোখে ফুটে উঠল পেশাদারি লাস্য। ব্যবসায়ী সুরে নায়ারকে বলল, 'টাকাটা আগে দিন!'

সুদর্শন নায়ার বিচিত্র হেসে বললেন, 'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা!' বালিশের নীচ থেকে কতকগুলো একশো টাকার নোট বের করে একে-একে দুটো গুনে নিলেন 'এই নাও—।'

উঠে গিয়ে টাকাটা নিয়ে চেয়ারের ওপর রাখল মেরি। তারপর অতি কষ্টে ভাবতে চেষ্টা করল, ও বন্ধ বাথরুমে একা শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এবং কাপড় খুলতে শুরু করল দ্রুতহাতে।

একইসঙ্গে হাতের বইগুলো প্রথমটা খুললেন সুদর্শন নায়ার। চোখ ছিটকে যাচ্ছে একবার মেরির দিকে, একবার হাতের বইয়ে। দেখলেন, প্রথমে খসে পড়ল সাদা জমিতে বেগুনি ফুল ছাপা ভয়েলের শাড়ি। হলদে ব্লাউজটা খোলার আগেই সুদর্শন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, না, মেরি কৃষ্ণমূর্তির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কোনও ছন্দপতন হয়নি। শাড়িকে অনুসরণ করল ব্লাউজ ও লেসের কাজ করা সায়া।

সুদর্শন হাতের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন ক্ষিপ্র হাতে। চোখ সদা চঞ্চল। যেন বইয়ের কোনও বর্ণনার সঙ্গে মেরিকে মিলিয়ে নিচ্ছেন। নাইলনের ব্রা ও প্যান্টি-সজ্জিতা কোনও মেয়েকে এতদিন শুধু ছবিতেই দেখে এসেছেন তিনি। এবং সে-ছবি শরীরে কোনও

BanglaBook.org

টঙ্কার জাগায়নি। কিন্তু মেরির সঙ্গে ছবির তুলনা হয় না। সব-দেখা-যায় প্যান্টি ও ব্রা-র এত ক্ষমতা, সেটা সুদর্শনের জানা ছিল না। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। কথা বলতে গিয়ে বুঝলেন গলার স্বরও কাঁপছে : 'খোলো...থামলে কেন?' শ্বাস-প্রশ্বাস সাঙ্ঘাতিকরকম ভারী হয়ে এখন হাঁফানিতে কষ্ট পাচ্ছেন।

ব্রা ও প্যান্টি ক্রমান্বয়ে জায়গা নিল অন্যান্য জামাকাপড়ের স্তূপে।

উচ্চ কিংবা নিম্ন—সবরকম আঙ্গিকের সঙ্গীতেই মেরি সমান পারদর্শী। গজদন্তের নিটোল স্তম্ভের মতো ও দাঁড়িয়ে আছে। অজন্তা-ইলোরা, তোমরা হেরে গেলে! আর থাকতে পারলেন না। হাতছানি দিয়ে ওকে কাছে ডাকলেন সুদর্শন।

মেরি ছোট-ছোট পা ফেলে এগিয়ে এল। শুরু হল ওর প্রত্যঙ্গের নাচ। সুদর্শন বিছানার চাদরটা খামচে ধরলেন একহাতে।

মেরি কৃষ্ণমূর্তি যেন অদৃশ্য তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে নিস্পৃহভাবে দেখছে এই অশ্লীল খেলা। যে-খেলায় অংশ নিয়েছেন সুদর্শন নায়ার এবং ওর পাপী দেহটা।

তারপর বিছানায় গিয়ে বসেছে মেরি। অনুভব করেছে মসৃণ ত্বকে টারান্টুলা মাকড়সার দৌরাত্ম্য। অবশেষে হাতের বই দেখে পছন্দমতো ভঙ্গিতে ওকে দাঁড়াতে, বসতে, চলতে বলেছেন সুদর্শন। এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে সব আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছে মেরি।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পর ও মুক্তি পেল। ধীরে-ধীরে জামা-কাপড় পরে নিল। নায়ারের জীবন্ত চোখ ওর প্রতিটি নড়াচড়া শুষে নিতে লাগল আগ্রাসী ব্যগ্রতায়। আর মাঝে-মাঝেই অব্যক্ত আনন্দের এক বিচিত্র শীৎকার বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর ঠোঁট চিরে।

টাকাগুলো চেয়ার থেকে তুলে নিতে ওর রীতিমতো ঘেন্না করছিল, কিন্তু চিন্তা করে দেখল তাতে লাভ নেই। ওয়াগ্স আ ব্রড, অলওয়েজ আ ব্রড।

টাকাটা মুঠো করে ও দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসেছে নায়ারের ফ্ল্যাট থেকে। চলে আসার সময়ে ঘর্মাক্ত শিথিল দেহ নিয়ে শুয়ে থাকা সুদর্শন ওকে আবার আশ্বাস দিয়েছেন, ব্যাপারটা গোপন থাকবে। এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মেরি সেসব শোনার জন্য আর অপেক্ষা করেনি। চলে এসেছে নিজের ফ্ল্যাটে।

ততক্ষণে জুডি ফিরে এসেছে। ওকে কিছু না বলে বাথরুমে চলে গেছে মেরি। সারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে বমি পেয়েছে। তারপর স্নান করে বেরিয়ে এসে কানুকে ডেকে পাঠিয়েছে। নিস্পৃহ স্বরে বলেছে, 'গেস্ট নেব। যেখান থেকে পারো ডেকে আনো।'

কানু ইতস্তত করে বলেছে, 'এত রাতে, মেমসাব...'

'যা বলছি করো।' অবাক কানুর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে মেরি। তাকিয়ে দ্যাখে, একপাশে দাঁড়িয়ে জুডি অবাক হয়ে ওকে দেখছে।

মেরি তখন হঠাৎই হেসে বলেছে, 'ওয়াগ্স আ ব্রড, অলওয়েজ আ ব্রড। খাতায় নাম লেখালে আর নিস্তার নেই, কী বলিস?'

বাইরে তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে।

জুডি কিছু না বুঝে বিস্মিত চোখে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

সবই মনে হয় সেদিনের কথা!

বিছানার পাশে রাখা টেবিল থেকে হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে রেডিয়াম ডায়ালে সময়

BanglaBook.org

দেখল মেরি। একটা বেজে গেছে। এবার শুয়ে পড়ল ও। ওসব কথা মনে পড়লেই শরীরটা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে।

শুধু একবার নয়, এ-পর্যন্ত চারবার ওকে একই খেলা দেখাতে হয়েছে সুদর্শন নায়ারকে। পরে ও জেনেছে, প্রথম রাতে অনিতাকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছিলেন সুদর্শন। এবং তারপর থেকে সুযোগ পেলেই ভাড়াটে অন্য মেয়েদের ডেকে পাঠিয়েছেন। অবশ্য ওরা কেউ মেরির কাছে মুখ খোলেনি...একমাত্র লিলি জনসন ছাড়া। তবে লিলি টাকা ভালোবাসত। ফলে নায়ারের সঙ্গে টাকা নিয়ে দরাদরি করত। শেষবার যেদিন লিলি নায়ারের ঘরে যায়, সেদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। লিলির মুখেই ঘটনাটা শুনেছে মেরি।

তিনদিন আগের কথা। সুদর্শন ও লিলি যখন সেই অশ্লীল খেলায় মত্ত তখন হঠাৎই বাইরের ভেজানো দরজা খুলে একটা লোক ঢুকে পড়ে নায়ারদের ফ্ল্যাটে। অনিতা নায়ার হতে পারেন, এই কথা ভেবে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুদর্শনের ঘরের দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে লিলি। কিন্তু ওর বিশ্বাস, আগন্তুক তার আগেই নগ্ন লিলিকে দেখে ফেলে।

নায়ার চিৎকার করে ওঠেন, 'কে? কে? হু ইজ ইট?' কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। শুধু শোনা গেছে, দুদ্দাড় পায়ে কারও বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গেই জামা-কাপড় পরে তাড়াতাড়ি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসে লিলি। না, লোকটাকে ও দেখতে পায়নি।

এখন লিলি মারা গেছে। কিন্তু কবিতা-চন্দা-ডলি-মেরি রয়েছে। সকলকেই নির্দিষ্ট পরিক্রমায় নত হতে হয় সুদর্শনের নোংরা ইচ্ছের কাছে।

মেরির ধারণা, অনিতা নায়ার ব্যাপারটা জানেন। জেনেও চুপ করে থাকেন। না, মেয়েরা কেউ ওঁকে বলতে সাহস পায়নি। অথবা বলেনি। কারণ চন্দা, ডলি ও কবিতা অন্য জাতের মেয়ে। উঁহু, ভুল হল। ওরাই ঠিক জাতের মেয়ে। নাচতে নেমে ঘোমটা দেয় না। সুদর্শন যতবারই ডাকবেন ততই ওদের লাভ। আর লিলি ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবে নিয়েছিল। বলত, 'মেরি, আর তো বেশিদিন এখানে নেই। গৌতমকে বিয়ে করেই সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব। নায়ার যদি আমার চেহারা দেখে গাদা-গাদা টাকা দিতে চায়, দিক না। বিয়ের পর কাজে লাগবে।'

'সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব।'

সত্যিই তো, চলেই গেছে ও। কিন্তু মেরির এ-কাজে অনিচ্ছা থাকলেও মুক্তি নেই। জোসেফ ওর গলায় সংসার-বাঁধনের ফাঁস হয়ে বসে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল মেরি।

অনুনয় করে ডাকল, ঘুম, এবারে তুমি এসো।

BanglaBook.org

সাত

পরদিন সুরেশ নন্দা এসে আমার মুখোমুখি হল বেলা এগারোটায়।

কাল রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু

মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছি। তারপর ডায়েরি বের করে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা এবং জবানবন্দির ওপর বারবার করে চোখ বুলিয়েছি নতুন কোনও সূত্রের আশায়। পাইনি। অথবা, পেলেও বুঝতে পারিনি। তবে সুদর্শন নায়ার ও অনিতা নায়ার সম্পর্কে মেরির বলা তথ্যগুলো আমাকে ভাবিয়েছে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী নন। নায়ারের ঘরে অচেনা আগন্তুকের কণ্ঠস্বর। সে বারবার নায়ারকে বাঁচিয়েছে বলে দাবি করছে। কী বাঁচিয়েছে? প্রাণ? তারপর জানা গেছে, সুদর্শনের বিকৃতি শুধু ছবির বইতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। মেরিকে উনি কী করেছেন যে, তাঁর প্রতি মেরির অত বিদ্বেষ, ঘৃণা? ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর শরীরের ওপর কি তিনি সুযোগ নিয়েছেন? হয়তো তাই।

স্পষ্ট বুঝলাম, এইসব বিষয়ে নায়ারদের কাছ থেকে কোনওরকম সহযোগিতাই পাওয়া যাবে না। আমার এখন শেষ অবলম্বন সোনা ট্রাভেল্‌স। এবং খুনির টেলিফোন। যদি টেলিফোনে বেফাঁস কোনও সূত্র উপহার দেয় সে।

সুরেশকে গতরাতের অনুসন্ধানের ফলাফল খুব সংক্ষেপে জানালাম। বললাম, 'ইন্টারোগেশানের জন্যে এখন শুধু বাকি গৌতম ভাস্কর, রতন শর্মা ও অজিত শুক্লা। এর মধ্যে গৌতম ভাস্করই আসল। সে লিলির প্রেমিক ছিল। লিলি মারা যাওয়ার চারদিন আগে ওর স্বপ্নভঙ্গ হয়। জানতে পারে লিলি খারাপ মেয়ে ছিল। সুতরাং আজ বিকেলে ওখানে যাব। তৈরি থেকো।'

সুরেশ সায় দিল নীরবে। তারপর বলল, 'স্যার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট, পি-এম রিপোর্ট, লিপস্টিক, রুমাল আর তারের ব্যালিস্টিক রিপোর্ট—সবই পাওয়া গেছে।' আমার টেবিলের একপ্রান্তে রাখা একটা বড় বাদামি খাম ও একটা সবুজ ম্যানিলা ফোল্ডার দেখিয়ে দিল সুরেশ। ও কখন ওগুলো রেখে গেছে দেখিনি।

এখন অতসব খুঁটিয়ে দেখার ধৈর্য নেই। সুতরাং ওকে বললাম সংক্ষেপে মতামতগুলো জানাতে। আমি পরে সময় নিয়ে সব দেখব।

সুরেশ দু-হাতের দশ আঙুল মাথায়-মাথায় ঠেকিয়ে পরিচিত ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল। বলল, 'লিলি জনসন মারা গেছে ভোরের দিকে, কারণ ওর পেটে রাতের খাবার-দাবার যা কিছু পাওয়া গেছে সবই হজম হয়ে গেছে। এ ছাড়া পেটে মদ ও ফুসফুসে নিকোটিন ডিপোজিট পাওয়া গেছে। "কিস মি" লিপস্টিক পাওয়া গেছে মোট চার জায়গায়: আয়না, নীল রুমাল, অ্যাশট্রের সিগারেটের টুকরো এবং লিলির ঠোঁটে-মুখে। খুনি খুব সম্ভব রাতে ওর সঙ্গে ছিল। কারণ, সে-প্রমাণ দেখা গেছে লিলির শরীরে।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল সুরেশ নন্দা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরিষ্কার পাওয়া গেছে একটাই। এবং সেটা লিলির নিজের। এ-ছাড়া অন্য কোনও পরিষ্কার ছাপ পাওয়া যায়নি—লিপস্টিকটাতেও না। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, খুনির হাতে দস্তানা ছিল। এর আরও একটা প্রমাণ তারের রিপোর্ট। তারটা অতি সাধারণ, গিটারের চার নম্বর তার। তারের দু-প্রান্তে শুকনো পাকা চামড়ার কিছু আঁশ পাওয়া গেছে। তারের চাপে লিলির গলার মাংস কেটে গিয়ে থাইরয়েডের নীচে ক্রিকয়েড হাড় ভেঙে গেছে। অতএব বলা যেতে পারে খুনি শক্তিশালী।

'রুমালটাও সাধারণ সুতির। কোনও মনোগ্রাম বা বিশেষ কোনও গন্ধ সেখানে পাওয়া যায়নি।' সুরেশ নন্দা থামল।

এই হল বিশ্লেষণের নিট ফল।

BanglaBook.org

রেকর্ড্‌স সেকশানে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। কাল্লুর পকেটমারী পেশা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলেও রীনা নামে কোনও পুরোনো ভিকটিমের খোঁজ ওরা এখনও পায়নি। এমনও হতে পারে, 'রীনা' নামটা হয়তো পুলিশে রিপোর্টেড হয়নি। অন্য কোনও নামে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল লাশটার।

আর্মস ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খোঁজ নিতেই জেনেছি, সুদর্শন নায়ারের লাইসেন্সটা ভ্যালিড, তবে আর ভ্যালিড থাকা উচিত নয়। আমি ওটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনভ্যালিড করার অনুরোধ জানিয়ে চলে এলাম। এখন নায়ারের রিভলবার রাখার কোনও যুক্তি নেই। তবে লাইসেন্সটা ক্যান্সেল না হওয়া পর্যন্ত রিভলবারটা সিজ করা যাবে না।

সুরেশকে বললাম, কাল্লুকে সন্ধেবেলা ছেড়ে দিতে। ছেড়ে দেওয়ার আগে যেন হুমকি দিয়ে শেষবারের মতো ভালো করে বাজিয়ে নেয়—যদি কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

খুনির টেলিফোন কল ট্রেস করার ব্যাপারটা জিগ্যেস করতেই সুরেশ জানাল, না, সেখানেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

খুব একটা হতাশ হলাম না। এইরকম উত্তরই যেন আমি আশা করেছিলাম।

'লিলির ঘরে টাকা-পয়সা কিছু পাওয়া গেছে?' প্রশ্ন করলাম সুরেশ নন্দাকে।

'হ্যাঁ—আলমারিতে। সাড়ে চারশো মতো। কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল বলে মনে হয় না। সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। আজ সকালে এক-আই-আর-টা ও-সির কাছে জমা দেওয়ার সময় এই পয়েন্টটা আমি লিখে দিয়েছি।'

ঠিক করলাম, আজ সময় করে একবার অমিতাভ দত্তের সঙ্গে কেসটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। তবে লাভ খুব একটা হবে বলে মনে হয় না।

'আসল কথাটাই তোমাকে জিগ্যেস করা হয়নি,' হেসে বললাম সুরেশকে, 'গিটারের চার নম্বর তার-অভিযানের খবর কী?'

'আর বলবেন না,' হতাশ সুরে জানাল সুরেশ, 'ডি ডি-র চৌধুরী এবং আরও তিনজন এস-আইকে নিয়ে মোট চারটে টিম করা হয়েছে। তারটা ল্যাব থেকে নিয়ে আমি সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছি। তারপর বেরিয়ে পড়েছি অনুসন্ধানে। কিন্তু নাথিং ডুয়িং। দুপুরে আর-একবার বেরোব ভাবছি।'

'তুমি কোনদিকটা কভার করছ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'চিৎপুর এলাকার দোকানগুলো। শতকরা সত্তরভাগ দোকান এই এলাকাতেই।' একটু চিন্তা করে ও বলল, 'আজ রাতের মধ্যেই মনে হয় আমার এলাকাটা শেষ করতে পারব। অন্য সবার রিপোর্টও আশা করি কালকের মধ্যে এসে যাবে। কারণ, লিলি জনসনের মামলাই এখন টপ প্রায়োরিটি।' সুরেশ উঠে দাঁড়াল। ওকে বললাম টেপরেকর্ডারটা পাঠিয়ে দিতে। ওটা আমি আর-একবার শুনতে চাই।

'দিচ্ছি' বলে চলে গেল সুরেশ নন্দা।

একটু পরে বেয়ারা এসে টেপরেকর্ডারটা টেবিলে রেখে গেল।

চালিয়ে শুনতে লাগলাম লিলি জনসনের খুনির কণ্ঠস্বর। কল্পনায় তার ছবিটা আঁকতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবই ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। খুনি লিলিকে ভালো মেয়ে বলে জানত। গৌতম ভাস্করও তাই। খুনের মাত্র চারদিন আগে সে সবকিছু জানতে পারে।

BanglaBook.org

ক'দিন ওদের বনিবনাও ছিল না। স্বপ্নভঙ্গের আঘাত শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে প্রকাশ পায়নি তো? তারপর রয়েছে রীনা-রহস্য। তাকেও কি গিটারের তার দিয়ে খুন করা হয়েছে?

টেপরেকর্ডার বন্ধ করে দিলাম।

চিন্তা ছেড়ে একটা সিগারেট ধরালাম। প্যাকেটের ওপর বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। নিশ্চয়ই দেহের স্বাস্থ্যের কথাই বলছে। মনের নয়। আমার এখন মনের স্বাস্থ্যকে ঠিকঠাক রাকা দরকার।

টেবিলের একপাশে আজকের কয়েকটা খবরের কাগজ রাখা আছে। চোখের কোণ দিয়ে সেদিকে একবার দেখলাম। ধোঁয়া ছাড়লাম আয়েস করে। লিলির খুনের খবরটা সংক্ষিপ্ত গুরুত্ব পেয়েছে কাগজের পাতায় : চতুর্থ পৃষ্ঠার নীচের দিকে। খবরে রুমাল, লিপস্টিক, অনিতা নায়ার, সুদর্শন নায়ার, বাড়ির নম্বর ও লিলির রাতের বীভৎস রূপ সম্পর্কে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করা হয়নি। ব্যাপারটাকে একটা 'সাধারণ ফাঁস দিয়ে হত্যা'র চরিত্র দেওয়া হয়েছে। সুরেশ নন্দা বুদ্ধিমানের মতো রিপোর্ট দিয়েছে বলা যায়। এতে এইটুকু সুবিধে হবে যে—

সেই মুহূর্তেই টেলিফোনটা এল।

এবারেও পড়িমরি করে ছুটে এল দীপক সামন্ত। ব্যস্ত গলায় বলল, 'স্যার, সেই টেলিফোন! রজত চৌধুরীর টেবিলে—কালকের মতো—' কথা শেষ করেই ও চটপট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার আগে বলে গেল চিৎকার করে, 'দেখি কলটা ট্রেস করতে পারি কি না।'

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে মনোবলবর্ধককে গুঁজে দিলাম অ্যাশট্রেতে। এক ঝটকায় টেবিল থেকে টেপরেকর্ডারটা তুলে নিয়ে ছুটলাম রজত চৌধুরীর টেবিলে।

এবার পৌঁছতে দশ সেকেন্ড লাগল। হয়তো হাতে রেকর্ডারটা থাকার জন্যেই।

আমাকে দেখে রিসিভার এগিয়ে দিল চৌধুরী। রেকর্ডারটা ওর টেবিলে নামিয়ে রেখে ইশারায় বললাম মাইক্রোফোনটা রিসিভারে ফিট করতে।

ও মাইক্রোফোন ফিট করে টেপ ঘুরিয়ে ফাঁকা জায়গা আসতেই বোতাম টিপে রেকর্ডিং শুরু করল। ততক্ষণে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি, 'হ্যালো, ইন্সপেক্টর বরাট বলছি—' এবং নিজের ঘড়ি দেখেছি। বারোটা বেজে এক মিনিট। বারবেলা শুরু হয়েছে।

গভীর মনোযোগেও ও-প্রান্তের প্রতিটি খুঁটিনাটি শব্দ শুনতে চেষ্টা করলাম।

কর্কশ ফিসফিসে কণ্ঠস্বর সেই একই ভঙ্গিতে থেমে-থেমে বলতে শুরু করল, 'হ্যালো, ইন্সপেক্টর...খবরের কাগজ দেখলাম। লিপস্টিকের কথাটা ওরা দেয়নি...বোধহয় ভুলে গেছে। আর...' একটা ইতস্তত ভাব : 'বাড়ির নাম-ঠিকানা...কিছুই দেয়নি। বাদ পড়ে গেছে। জানি না...এগুলো না দিলে...লোকে খারাপ মেয়েগুলোর কাছ থেকে সাবধান হবে কী করে...।'

স্পষ্ট লক্ষ করলাম, কণ্ঠস্বরে গতকালের সেই আর্তি, অনুশোচনা আর নেই। অবাক হয়ে লাভ নেই। এই মুহূর্তে খুনি হয়তো ভাবছে, সে কোনও অন্যায় করেনি। মানসিক খুনিদের সবকিছুই বেহিসেবি।

'ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর...শুনছেন তো?' আমার সাময়িক নীরবতায় সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, শুনছি...বলুন।'

'লিলি...লিলি একটা নোংরা জঘন্য মেয়ে ছিল। ...বেশ্যা! ও...ও বেঁচে থাকলে অনেকের ক্ষতি করত, ইন্সপেক্টর।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঘন-ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তারপর : 'কালকের টেলিফোনের জন্যে আমি...আমি দুঃখিত। কী বোকার মতোই না কান্নাকাটি করেছি! লিলির মতো একটা বাজারে মেয়েকে...খুন করে...বলুন, কী অন্যায়টা আমি করেছি? বলুন?'

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'ওই বাড়িতে আরও অনেক নোংরা কাজ হয়, আপনি জানেন না।'

উত্তেজিত করে তুলতে চাইলাম লিলি জনসনের খুনিকে। যদি বেফাঁস কিছু তার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে। আরও বললাম, 'শুধু লিলিকে খুন করে কি বাকি মেয়েগুলোকে আপনি ভালো করতে পারবেন? লিলি যা করত, তারচেয়েও খারাপ কাজ ওরা এখন করবে...' মেরি কৃষ্ণমূর্তি যে-কথা আমাকে বলতে চায়নি তার ওপর নির্ভর করেই আন্দাজে টোপ দিলাম।

গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝলক যেন দমকা হাওয়ার মতো আমার কানে এসে ঝাপটা মারতে লাগল। তারপর অস্ফুট স্বর ভেসে এল ও-প্রান্ত থেকে, 'হ-হ্যাঁ, জানি, কী খারাপ কাজ করবে। জামা-কাপড় গায়ে রাখার জন্যে ওদের জন্ম হয়নি!' আবার তীব্র হাঁফানির শব্দ : 'সেইজন্যেই তো লিলির গা থেকে সব জামা-কাপড় আমি খুলে নিয়েছিলাম....ওর দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি...শুধুই ওকে পাপের শাস্তি দেওয়ার জন্যে...।'

জামা-কাপড় প্রসঙ্গটা আমার কাছে একটু দুর্বোধ্য লাগছে। কিন্তু শ্রবণের একাগ্রতা আমি এতটুকু শিথিল করিনি। গাড়ির হর্নের শব্দ। বাস কিংবা লরির গর্জন। টাইপরাইটারের ক্ষীণ কলরব। আজও সব একই শব্দ। নতুন শব্দ কই?

'ইন্সপেক্টর, সবাইকে আমি শাস্তি দেব...একসঙ্গে পাঁচটা গিটারের তার আমি কিনেছি...এখনও চারটে আছে আমার কাছে...'

আমার বুকের ভেতরে তুষারপাত শুরু হল। এখনও তো সাতান্ন নম্বরে চারটে খারাপ মেয়ে বাকি! তা হলে কি খুনি ওদের সবাইকেই একে-একে খুন করবে বলে মনস্থ করেছে? তাই সে মোট পাঁচটা চার নম্বর তার কিনেছিল? চমক ভাঙল কর্কশ টুকরো কথায়, 'রীনার...রীনার জন্যে তার লাগেনি...আমার দুটো হাতই...সময়ে-সময়ে ভেতরটা আমার কেমন যেন করে ওঠে...আমার খুব কষ্ট, ইন্সপেক্টর...আমি—।'

হঠাৎই টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। লাইন কেটে গেছে।

কিন্তু এখন আমি খুশি। কারণ ফোন নামিয়ে রাখার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা কথা খুব ক্ষীণ হলেও স্পষ্টভাবে আমার কানে এসেছে। খুনি যেখান থেকে ফোন করছে, সেখানে কেউ কাউকে চেঁচিয়ে বলছে : 'আগামীকাল আই-সি টু-সিক্স-থ্রিতে দুটো টিকিট হবে।' সমস্ত শব্দ যোগ করে আমার মনে এখন জায়গাটার যে-ছবি তৈরি হয়েছে সেটা আমাকে আশাবাদী করে তুলতে চাইছে। খুনি হয়তো আরও কিছুক্ষণ কথা বলত, কিন্তু টেলিফোনের কাছাকাছি কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে পড়ায় তাকে তাড়াহুড়ো করে ফোন নামিয়ে রাখতে হয়েছে।

BanglaBook.org

আমারই অনুরোধে রেকর্ডিংটা আমাকে একবার বাজিয়ে শোনাল রজত চৌধুরী। না, কোনও শব্দই শুনতে আমার ভুল হয়নি। পরে প্রয়োজন হলে রেকর্ডিংটা জায়গামতো ভলিয়ুম অ্যামপ্লিফাই করে নেওয়া যাবে। তখন সেটা আরও জোরালো, আরও স্পষ্ট হবে। টেপরেকর্ডারটা নিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

সবে চেয়ারে বসেছি, হাঁফাতে-হাঁফাতে দীপক-সামন্ত এসে ঘরে ঢুকল : 'কলটা মোটামুটিভাবে ট্রেস করা গেছে। ওটা করা হয়েছে টু-ফোর এক্সচেঞ্জের কোনও টেলিফোন থেকে। অর্থাৎ ধর্মতলা থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে ল্যান্সডাউন পর্যন্ত, আর পুবদিকে খাল পর্যন্ত—।'

আমার হাসি পেল। এর নাম যদি মোটামুটিভাবে ট্রেস-করা হয়, তা হলে কলটা ট্রেস না করতে পারলেই ভালো ছিল। ওর খবরটুকু শুধু শোনা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমার করার নেই।

দীপক চলে যাচ্ছিল, একটা কথা মনে পড়তেই ওকে ডেকে থামালাম। ও ফিরে তাকাল সপ্রশ্নে। বললাম, 'দত্তসাহেবকে বলে সাতান্ন নম্বর বাড়িতে দুজন প্লেন ড্রেস দিয়ে দাও। দুজনের অন্তত একজন যেন আর্মড থাকে। কোনও সাদা-চুল লোককে ওই বাড়ির আশেপাশে দেখলে যেন ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করে। আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।'

দীপক সামন্ত অবাক হলেও কোনও প্রশ্ন করল না। নীরবে চলে গেল আদেশ পালন করতে।

টেলিফোনে লিলি জনসনের খুনিকে আমি যদি ঠিকমতো উত্তেজিত করে থাকতে পারি। এবং তার ন্যায়বোধের বিবেক যদি জেগে উঠে থাকে, তা হলে খুব শিগগিরই সে দ্বিতীয় খুন করবে। কারণ, তার কাছে এখনও চার-চারটে গিটারের তার বাকি আছে।

নতুন করে মনের স্বাস্থ্য ফেরাতে একটা সিগারেট ধরালাম। শুনতে পেলাম বিবেকচন্দ্রের একটানা নীরব কণ্ঠস্বর : এবারের খুনটা তোমাকে রুখতেই হবে, এবারের খুনটা তোমাকে...।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, পারব রুখতে?

প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি রাত সাড়ে আটটায়।

আট

পার্ক স্ট্রিট ও চৌরঙ্গী রোড যেখানে কালজয়ী সঙ্গমে সংযুক্ত, সে-জায়গাটা পেরিয়ে একশো গজখানেক গেলেই বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে আছে সোনা ট্রাভেল্স। হলদে রঙের বাড়ি। দোতলার বিশাল বারান্দায় লোহার ফ্রেমে সুস্থিত দাঁড়িয়ে রঙিন বিজ্ঞাপন চিৎকার করে বলছে : একটা আধুনিক গ্রামোফোন কিনে ফেললেই আপনার গৃহকোণ সুখী হবে। লিলি কেনেনি। উপযুক্ত শিক্ষাও পেয়েছে।

দোতলার বারান্দার ঠিক নীচেই নিয়ন সাইনে লেখা : সোনা ট্রাভেল্স। এখন দিন, ফলে নিয়ন সাইন নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নামের ঠিক ওপরে একটা সুললিত ছন্দোময় উড়ন্ত পাখি আঁকা রয়েছে। পাতাল রেলের তুঙ্গ কর্মব্যস্ততাকে পেছনে ফেলে এবং ওই

BanglaBook.org

উড়ন্ত পাখির জাত ও লিঙ্গ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে-করতে সোনা ট্রাভেল্‌স-এর বিশাল কাচের দরজায় হাত রাখলাম। কাচের ওপরে বড় হরফে সবুজ রঙে 'এস' অক্ষরটি সুন্দর ছাঁদে লেখা। এবং তার ঠিক পেছনেই লাল রঙ করা সুদৃশ্য গ্রিল একই সঙ্গে ট্রাভেল এজেন্সির সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা জোরদার করছে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শীতল বাতাস চোখে-মুখে এসে ঝাপটা মারল। যেন বলতে চাইল : তুমি যে এসেছ মোর ভবনে...।

সুরেশ নন্দা আমার ঠিক পেছনেই ছিল। হেসে বলল, 'ব্যবসায়ী কাকে বলে! একজন স্টাফ মেম্বার মারা গেল তবু ছুটি দেয়নি।'

আমিও হেসে বললাম, 'কাল যাতে দেয়, সে-কথা বলে যাব।'

ঢুকেই ডানদিকে রিসেপশন। প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে নিজেকে এখন সুন্দরীদের দলে ধরে রেখেছে এমন একটি মহিলা সেখানে বসে আছে। পরনে জরি বসানো নীল শাড়ি ও ম্যাচ করা ব্লাউজ। মাথার সূক্ষ্ম সিঁদুর-রেখা শ্যাম্পু করা চুলের ফাকে 'ধরণী দ্বিধা হও' বলে লজ্জায় লুকিয়ে পড়তে চাইছে। হয়তো স্বামীকে দেখতে পেলেই আবার নির্ভয়ে সগৌরবে উঁকি মারবে।

তাকে বললাম, 'ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মহিলা বোধহয় আঁচ করল, লিলি জনসনের খুনের ব্যাপারেই আমরা এসেছি। সুতরাং একান্ত ব্যস্ততায় বলল, 'বসুন, খবর দিচ্ছি।' তারপর পি-বি-এক্স বোর্ডের কীসব তার টানাটানি করে একটা ফোন তুলে নিল।

যন্ত্রের জটিলতা বরাবরই আমাকে অবাক করে। এই জটিলতা বুঝে তাকে ঠিকমতো চালাতে গেলে একটা জটিল মন দরকার। সেইজন্যেই হয়তো পি-বি-এক্স অপারেশানে মেয়েরা প্রাধান্য পায়।

রিসেপশনের মুখোমুখি দেওয়াল ঘেঁষে কালো সিন্থেটিক চামড়ায় মোড়া আধুনিক সোফা ও সেটি। একটা খাটো গোল টেবিলকে ঘিরে বিমূর্ত ভঙ্গিতে সাজানো রয়েছে। সেখানে অপেক্ষমাণ তিনজন বিভিন্ন বয়েসের সাহেবি অতিথি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে সোনা ট্রাভেল্‌স-এর ব্যবসা যে-কোনও ব্যবসায়ীর চোখে ঈর্ষা জাগাবে। রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আর সুরেশ সেটিতে পাশাপাশি বসলাম। এবং এই প্রথম পরিবেশটা খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম।

আমাদের সামনে, ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক বসানো টেবিলে কিছু দৈনিক পত্রিকা এবং ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জানাতে কয়েকটা সাময়িক পত্রিকা রয়েছে। এমনকী ভ্রমণ সংক্রান্ত বিদেশি ভাষার দুটো সুশোভন পত্রিকাও চোখে পড়ল। তার পাশেই একটা প্লাস্টিকের অ্যাশট্রে।

ঘরের দেওয়াল ডিসটেম্পার করা হালকা সবুজ। সেখানে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত ট্যুরিস্ট ব্যুরোর 'ইন্ডিয়া' লেখা কয়েকটা বহুবর্ণ প্রচার চিত্র। বাঁ-দিক ঘেঁষে লম্বা আকাশি রঙের মসৃণ কাউন্টার—সেখানেও ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকের রাজত্ব। কাউন্টারের মাঝামাঝি জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে ছন্দোময় ভঙ্গিতে গতিশীল একটা এরোপ্লেনের মডেল দাঁড় করানো রয়েছে। তার ওপরে একটা সাদা চাকতিতে উজ্জ্বল লাল রঙে লেখা, 'ফ্লাই লুফ্‌ৎহান্সা'। এ-অনুরোধ কেউ রাখবে কি না জানি না। টিউব লাইটের প্রচ্ছন্ন আলোয়

BanglaBook.org

গোটা ঘরের পরিবেশ এক স্নিগ্ধ মোলায়েম রূপ পেয়েছে।

ইতিমধ্যে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সাদা উর্দি-পরা বেয়ারা। বুকের বাঁ-দিকে 'এস' মনোগ্রামের ধাতব সাইনবোর্ড। রিসেপশন-রূপসী সাহেবি হিন্দিতে বেয়ারাটিকে বলল, জনৈক সরকারসাহেবের কাছে আমাদের নিয়ে যেতে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ওর সঙ্গে যান। সোজা গিয়ে একদম শেষে ডান দিকের চেম্বারটা—মিস্টার এ. কে. সরকার।'

উত্তরে আমিও হাসলাম। তারপর আমি এবং সুরেশ বেয়ারাটিকে অনুসরণ করলাম।

বাঙালির প্রতিষ্ঠান। দেখে ভালো লাগল। সুরেশকে কানে-কানে বললাম, 'পার্টনারশিপের ব্যবসা নয়, বুঝলে, তা হলে, অ্যাদ্দিনে গড়ের মাঠ হয়ে যেত।'

সুরেশ মজা করে বলল, 'বাঙালি হয়ে বাঙালির নিন্দে করছেন!'

আকাশ-নীল কাউন্টারের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। কাউন্টারে বসে আছে মোট চারজন। প্রথম জন একটি মেয়ে। মাথায় ফোলানো-ফাঁপানো চুল। নাক-মুখ-চোখ-বুক, সবই উদ্ধত—তবে শেষেরটা সবচেয়ে বেশি। চেহারায় ইঙ্গ-ভারতীয়ের ইঙ্গিত। ছাইরঙের স্কার্ট-ব্লাউজের ডানদিকে একটা সাদা ফুল এঁকে যেন বলতে চাইছে ঃ এখানে এসো, শান্তি পাবে।

দ্বিতীয় জন দাড়ি-গোঁফহীন বাবরি-চুল যুবক। গায়ের রঙ ব্রাজিলের পেলেকে সরাসরি দশ গোলে হারিয়ে দেওয়ার মতো। পরনে নেভি-ব্লু জিন্‌সের প্যান্ট, ঘিয়ে রঙ ঢোলা সিল্কের শার্ট।

তৃতীয় জন মধ্যবয়েসি। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা। চশমা, টাক ও মুখের ম্রিয়মাণ ভাব সংসার-ক্লান্ত-বাঙালি বলে সদর্পে জাহির করছে। গায়ে যথারীতি ঘামে নোনতা ধুতি ও পাঞ্জাবি।

শেষ জন টাইপ-মেশিন বুকের কাছে নিয়ে ব্যস্ত লেডি-টাইপিস্ট। দেখে মনে হচ্ছে, এল. সি. স্মিথ লেখা টাইপ-মেশিনটাই তার জীবনের 'পরমং তপঃ'। মুখে বয়েস ও বিরক্তির ছাপ ঃ একে অপরের পরিপূরক। নেহাত-প্রয়োজন-তাই এইরকম ভঙ্গিতে একটা কমলা রঙের ছাপা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে রেখেছে।

বাবরি-চুল যুবক প্রকাশ্যেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ গলায় সাম্প্রতিক একটি ছবিতে ডাস্টিন হফম্যানের অভিনয় ও অস্কার পুরস্কার পাওয়া নিয়ে অ্যাংলো মেয়েটিকে কিছু একটা বলছে। মেয়েটির চোখে-মুখে কপট কৌতূহল। জিভ ঠেলে ডান দিকের গালটা ফুলিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ, ছেনালিতে পরিপক্ক।

আমার একটু অবাক লাগল। লিলি জনসনের নৃশংস মৃত্যুর খবর সদ্য জানার পরও কর্মচারীদের এ-ধরনের আচরণ অস্বাভাবিক। কিন্তু মধ্যবয়েসি ভদ্রলোকের বিচলিত ভাব লক্ষ করে বুঝলাম, লিলির মৃত্যুতে ভেতরে-ভেতরে প্রত্যেকে কম-বেশি নাড়া খেলেও বাইরে আপ্রাণ চেষ্টায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে চাইছে।

আমাদের দেখে সকলের মধ্যে চাপা গুঞ্জন ও চোখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওরা নিজেদের আবার সামলে নিয়েছে।

কাউন্টারকে বাঁ-দিকে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম ভেতরে।

BanglaBook.org

ভেতরে এসে অফিস স্পেসটা অনেকটা সরু প্যাসেজের রূপ নিয়েছে। প্যাসেজের দু-পাশে কাচের দরজা দেওয়া চেম্বার, এবং দরজার ওপরে চেম্বারের মালিকের নাম ও পদমর্যাদা লেখা।

বেয়ারাকে অনুসরণ করে ডানদিকের শেষ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজার কাচে স্পষ্ট করে লেখা : এ. কে. সরকার—এম ডি.।

ছোট্ট করে 'যাইয়ে' বলে আমাদের উৎসাহ দিয়ে বেয়ারা বিদায় নিল। দরজা ঠেলে আমি ও সুরেশ ভেতরে ঢুকলাম।

বাইরের ঘরে সাজসজ্জার যতরকম ঘটা দেখেছি, তার ষোলোআনাই এ-ঘরে উপস্থিত। ডানদিকের দেওয়ালে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর দুটো পোস্টার ও আন্তর্জাতিক বিমান-পথের একটা রঙিন মানচিত্র পাশাপাশি টাঙানো রয়েছে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে সোনা ট্রাভেল্‌স-এর এটা বড় ক্যালেন্ডার—তাতে এরোপ্লেনের ক্রমবিবর্তনের ধারাচিত্র দেখানো রয়েছে। লুকনো টিউব লাইটে আলোকিত বিশাল গ্লাসটপ টেবিলে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সামনে যা-যা থাকা উচিত সবই রয়েছে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে স্থান পেয়েছে একটা অ্যালুমিনিয়াম পাতের ডেট ক্যালেন্ডার, একটা ছোট্ট ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড ও লাল-হলদে 'মহারাজা মূর্তি'।

এ. কে. সরকার সম্ভবত আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। চোখাচোখি হতেই ভদ্রতা ও কর্তব্যবোধের হাসি ফুটিয়ে তুললেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে।

সরকারসাহেবের পোশাক-পরিচ্ছদে রামধনুর সাতটি রঙ সমানভাবে মিশে আছে—অর্থাৎ, সাদা। গলায় মেরুনের ওপর সাদা-চেক রেশমি টাই। জামার হাতায় সুদৃশ্য ক্রেড পাথরের কাফলিঙ্ক। বয়েস মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ। মাথার চুল কাঁচা হলেও জুলপি রেহাই পায়নি। কপালে চুলের সীমারেখা ভাঁটার টানে অনেকটা পিছিয়ে গেছে—ফলে কপাল প্রশস্ত হয়ে চামড়ার ভাঁজগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে। কাঁচাপাকা সরু গোঁফের নীচেই দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁট। ঠোঁটের ফাঁকে দৃঢ়সংবদ্ধ ধূমায়িত পাইপ। চাউনি ও কথায় সংযম, অভিজ্ঞতা এবং অতি আধুনিক সভ্যতার ছাপ।

করমর্দনের সঙ্গে-সঙ্গেই পরিচয়ের পালা শেষ হয়েছিল। উপরন্তু আমি আই-ডি কার্ডটা বের করে তাঁকে দেখিয়েছি। এবং আমাদের শুভ আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বলেছি। তৎক্ষণাৎ তাঁর গোলগাল মুখে একটা অসহায় ত্রস্তভাব ফুটে উঠল। কিন্তু সে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী অভিব্যক্তি। পরক্ষণেই বললেন, 'বসুন, মিস্টার বরাট। বসুন, মিস্টার নন্দা।'

পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি টেবিলের এ-প্রান্তে রাখা তিনটে ঘুরন্ত চেয়ারের দুটো বেছে নিয়ে আমি ও সুরেশ বসলাম। ঘরের পরিবেশ ঘুমের আমেজ এনে দেয়। শীতাতপ যন্ত্রের ওপর অবিশ্বাসবশে একটা পেডাস্ট্যাল র‍্যালি ফ্যান প্রাণপণে ঘুরে চলেছে। কোন এক অদৃশ্য ও অশ্রুত সঙ্কেতে একজন বেয়ারা এসে তিনকাপ কফি টেবিলে রেখে গেল। সরকারসাহেব হাতের ইশারায় অনুরোধ করলেন কফির কাপে চুমুক দিতে।

প্রথম চুমুকের পরেই প্রথম প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম, 'লিলি জনসন মারা গেছে বলে অফিস ছুটি দেননি?'

টেবিলে রাখা পেনস্ট্যান্ড থেকে একটা সবুজ রঙের বলপেন তুলে নিয়ে আঙুলে

BanglaBook.org

ঘোরাতে-ঘোরাতে সরকারসাহেব সময় নিলেন। প্রশ্নটা ওজন করে একসময় জবাব দিলেন, 'নাঃ। আমাদের যা কাজ তাতে উইক ডে-তে অফিস বন্ধ রাখলে অনেক ক্ষতি হয়। তাই ঠিক করেছি আজকের জন্যে সবাইকে একদিনের স্যালারি এক্সট্রা দিয়ে দেব।'

'লিলি কেমন মেয়ে ছিল?'

'একসেলেন্ট! ওর মতো এফিসিয়েন্ট স্টেনোগ্রাফার আমাদের অফিসে খুব কম আছে।' মাথার বিরল চুলে একবার আলতো করে হাত বুলিয়ে নিলেন তিনি।

আড়চোখে লক্ষ করলাম, সুরেশ নন্দা নোটবই নিয়ে কথাবার্তার প্রয়োজনীয় অংশ টুকে নিচ্ছে। এবং থেকে-থেকে কফির কাপে মনোযোগ দিচ্ছে।

'লিলি কোথায় বসত?'

'দোতলায়,' শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন এ. কে. সরকার। হাতের বলপেনটা জায়গামতো রেখে ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড থেকে একটা গোলাপি ছোট্ট পতাকা তুলে নিলেন। উনি এই নৃশংস খুনের খবরে বিচলিত যদি হয়েও থাকেন সেটা আমাদের ভালো করে বুঝতে দিচ্ছেন না।

হাতের পতাকা জরিপ করতে-করতে তিনি বললেন, 'অ্যাকাউন্ট্স সেকশনে। ও অ্যাকাউন্ট্স-এর ব্যাপারগুলোয় ইনভল্ভ্ড ছিল।'

বুঝলাম, সোনা ট্রাভেল্স-এর আধিপত্য দোতলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং মেরির খবর অনুযায়ী রতন শর্মা ও অজিত শুক্লা, দুজনেই অ্যাকাউন্ট্স-এ বসে দোতলায়। বাকি রইল গৌতম ভাস্কর। আমার বিশ্লেষণ যদি ভুল না হয় তা হলে গৌতমও একই জায়গায় বসে, এবং লিলির কাছাকাছি।

সরকারসাহেবকে প্রশ্ন করতেই আমার অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণিত হল। বললাম, আমি অজিত শুক্লা, রতন শর্মা ও গৌতম ভাস্করের সঙ্গে লিলির বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। সরকারসাহেব নির্লিপ্ত সুরে বললেন, 'শিয়োর। ওরা লিলির সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ছিল—হয়তো আপনাকে দরকারি কোনও খবর দিলেও দিতে পারবে। আমি শুধু বলতে পারি, মেয়েটা পাচ্চুয়াল, ওয়েল বিহেভ্ড ছিল। কাগজে দেখলাম লিখেছে : ওকে ফাঁস দিয়ে খুন করা হয়েছে—ওঃ, রিয়েলি প্যাথেটিক!' পতাকা রেখে সুগন্ধী সুবাসিত রুমাল—সাদা অবশ্যই—বের করে কাল্পনিক ঘাম মুছে নিলেন এ. কে. সরকার।

সুরেশকে বললাম, 'লিলি জনসন সম্পর্কে অফিসিয়াল ইনফরমেশনগুলো যা জানার মিস্টার সরকারের কাছ থেকে জেনে নাও। লিলি কদ্দিন চাকরি করছে, কত মাইনে পেত, এইসব। আমি ওপরে অ্যাকাউন্ট্স সেকশানে যাচ্ছি। ওঁদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি। তোমার হয়ে গেলে রিসেপশনে অপেক্ষা কোরো।' এবার তাকালাম সরকার-সাহেবের দিকে 'প্লিজ হেল্প হিম, উইল য়ু—?'

'ওহ্, বাই অল মিন্স—' হেসে বললেন এ. কে. সরকার।

আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বার ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হলাম। বাইরে এসে দরজার মুখোমুখি নজরে পড়ল দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়িতে বিভিন্ন নারী-পুরুষের যাতায়াতে ট্রাভেল এজেন্সির ব্যস্ততা অনুমান করা যায়। শ্লথ পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম।

দোতলায় উঠে একতলার সঙ্গে মিল খুঁজে পেলাম শুধু 'অ্যাকাউন্ট্স' লেখা কাচের দরজায়। প্রথমেই যে বিরাট তফাতটা নজরে পড়ে সেটা হল শীতাতপহীনতা এবং টেবিল

BanglaBook.org

ও সিলিং ফ্যানের আধিক্য। সবগুলো নিজের-নিজের চরিত্র ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন গতিতে ঘুরে চলেছে। আর যে ছোট্ট তফাতটুকু নজরে পড়ে সেটা শব্দসংক্রান্ত। একতলায় চৌরঙ্গী রোডের কর্মব্যস্ততার শব্দ যেমন পৌঁছতে পারেনি, দোতলায় সেই শব্দ দ্বিগুণ শক্তিতে এসে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। গাড়ির হর্নের বিচিত্র সুর, চলন্ত বাসের ইঞ্জিনের গর্জন এবং সর্বোপরি অফিসের চলন্ত টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ।

শব্দকল্পের এই দুরন্ত রাজত্বের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি, ঘরের লাগোয়া যে-বারান্দাটা চৌরঙ্গী রোডে উঁকি মারছে, সেই বারান্দার দরজার কাচ অনেকখানি ভাঙা। সারানো হয়ে ওঠেনি। ফলে প্রাণোচ্ছল শব্দস্রোতকে বাধা দেওয়ার প্রধান প্রহরীই অসুস্থ। এ ছাড়াও দুটো কাচের জানলা রয়েছে রাস্তার দিকে। অফিসের ভেতরে অনুপ্রবেশের জন্যে পশ্চিমী সূর্যও এই তিনটে পথই বেছে নিয়েছে।

ঘরে সারি-সারি টেবিল-চেয়ারে বসে প্রায় দশ-বারোজন কর্মচারী কাজে ব্যস্ত। তার মধ্যে মহিলা এখন দুজন, গত পরশু তিনজন ছিল। দুজন মহিলার একজন টাইপ মেশিনের সামনে চঞ্চল আঙুলে বসে। অন্যজন হিসেব-নিকেশের কাজে ডুবে রয়েছে। তার পাশেই একটা টেবিলে একটা ছাইরঙা টাইপরাইটার। আসন শূন্য। লিলি নেই।

অ্যাকাউন্টস সেকশানের সাজগোজ সাদামাটা। কোনও বাড়তি জিনিস নেই। টেবিল-চেয়ার, কাগজপত্র, ক্যালেন্ডার, দেওয়াল ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, টাইপরাইটার, টেলিফোন—সবই উপযুক্ত জায়গামতো দৃশ্যমান। এক কথায়, পেশাদারি ছাপ।

ঘরের খোশগল্প, গুঞ্জন আমাকে দেখে পলকে স্তব্ধ হল। সকলেই প্রায় ফিরে তাকাল আমার দিকে।

দরজার কাছাকাছি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে ছিলেন। সন্দিহান দৃষ্টি, চোখের নীচে অভিজ্ঞতার কালি, রোগা চেহারা, পানের রসে ঠোঁট লাল। তাঁকে নিজের পরিচয় দিলাম। উনি খুব একটা অবাক হলেন না। হয়তো আমাদের আগমন-সংবাদ ওঁরা নীচ থেকে আগেই পেয়েছেন।

ওঁকে বললাম, গৌতম ভাস্করের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকের একটা কোণ দেখিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিকে এগোলাম। বহু জোড়া চোখ আমাকে অনুসরণ করল।

নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছে অন্যান্যদের থেকে কিছুটা দূরত্বে পাশাপাশি দুটো টেবিল আবিষ্কার করলাম। এই টেবিল দুটোর আকৃতি ও প্রকৃতি ঘরের অন্যান্য টেবিলের থেকে আলাদা। আরও বিশাল এবং দামি। এ ছাড়া দুটোতেই প্লাস্টিকের ফলকে টেবিলের অধিকারীর পদমর্যাদা লেখা রয়েছে। ম্যানেজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। গৌতম ভাস্কর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। সুতরাং তার টেবিল বেছে নিতে অসুবিধে হল না। চোখের কোণে লক্ষ করলাম, বেঁটেখাটো রোগা ম্যানেজার পাশের টেবিল থেকে আমাদের দিকে লক্ষ করছে।

নাম-পদমর্যাদা না জানা থাকলেও গৌতম ভাস্করকে আমি সহজেই চিনে নিতে পারতাম। বছর চল্লিশের সুন্দর স্মার্ট চেহারা, ফরসা রঙ, গভীর চোখের অধিকারী। উসকোখুসকো চুল। চওড়া ফ্রেমের চশমা থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে চোখ লাল ও ফোলা। লিলি দেখলে খুশি হত কেউ ওর জন্যে চোখের জল ফেলছে। বিস্কুট রঙ

BanglaBook.org

পলিয়েস্টার হাফ শার্ট ভাস্করকে চমৎকার মানিয়েছে। হাতে বিদেশি ডিজিটাল ঘড়ি। মেরি কৃষ্ণমূর্তির কথা মনে পড়ল ঃ বড়লোকের ছেলে, শখে চাকরি করে। গলার ভাঁজে পাউডারের দাগ নজরে পড়ল। নাকে এল সুন্দর সেন্টের গন্ধ।

আনমনাভাবে একটা নীল-হলদে কাচের পেপার-ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল গৌতম ভাস্কর। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ তুলে তাকাল।

বিনা আমন্ত্রণেই ওর মুখোমুখি চেয়ারে বসলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। ভাস্কর ক্লিষ্ট হাসল ঃ 'বলুন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' তারপর মাথা নিচু করে চশমা খুলে রুমাল বের করে চোখ মুছল। চশমা পরে নিয়ে আবার তাকাল, 'জানি না, এ-অবস্থায় কী সাহায্য আপনাকে করতে পারব...এরকম একটা আনএক্সপেক্টেড শক্...।'

ছোট্ট করে বললাম, 'মেরির কাছে সব শুনেছি—।'

ও সামান্য চমকে উঠল। তারপর বলল, 'ও—' সম্ভবত পরক্ষণেই খেয়াল হয়েছে আমি পুলিশে চাকরি করি।

লিলিকে ও কতটা ভালোবাসত সে-কথা এখন জিগ্যেস করাটা ইয়ার্কির পর্যায়ে পড়বে। সুতরাং পুলিশি সুরে বললাম, 'ভাস্কর, লিলি মারা গেছে। ব্রুটালি মার্ডারড্। এক সাইকোটিক কিলার ওকে খুন করেছে।'

স্থির চোখে ওর মুখের ভাব লক্ষ করতে লাগলাম। সেখানে তখন কৌতূহল অনেক বেড়েছে। দু-চোখ প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত।

আমি গলার স্বর সামান্য নামিয়ে বললাম, 'এখন আর ফর্মালিটি করে লাভ নেই। লিলির আসল পরিচয় আপনি জানতেন?'

উত্তর দেওয়ার আগে গৌতম ভাস্কর একবার পাশের টেবিলে ম্যানেজারের দিকে দেখল, উনি এ-দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন কি না। তারপর চাপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, জানতাম—'মাথা নামাল ঃ 'কয়েকদিন আগে লিলি নিজেই বলেছিল—' কণ্ঠস্বরে স্বপ্নভঙ্গের তিক্ততা?

'সব জেনেও আপনি ওকে বিয়ে করতে রাজি ছিলেন, না মত পালটেছিলেন?'

মুখ তুলল। ইতস্তত করে বলল, 'না...মত পালটাইনি।'

'খুনের আগের দিন লিলির সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল?'

'তেমন কিছু হয়নি। অফিসে কাজের ফাঁকে মাঝে-মধ্যে যেরকম খোশগল্প হয় আর কী!' একটু হেসে ঃ 'তবে আগামী রোববার আমাদের চারজনের সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল...।'

'চারজন?' আমার চোখের দৃষ্টিও সপ্রশ্ন হল, 'আর দুজন কে?'

'মেরি কৃষ্ণমূর্তি আর রতন শর্মা—' ইশারায় কয়েকটা টেবিল পরের একটি তরুণকে দেখিয়ে দিল ভাস্কর।

বয়েস ভাস্করের মতোই। তবে আরও রোগা। রঙ মাঝারি, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। বসে থাকলেও বোঝা যায় শরীরের কাঠামো বেশ লম্বা। পোশাক রঙচঙে। কিন্তু টাইয়ের রঙ সাদা।

রতন শর্মাকে দেখে আবার তাকালাম ভাস্করের দিকে। বললাম, 'লিলিকে কে খুন করতে পারে বলে মনে হয়?'

গৌতম ভাস্কর প্রথমে বলল, 'কী করে বলব?' তারপর কী ভেবে ঃ 'কত বাজে

BanglaBook.org

ধরনের লোক ওর কাছে রাতে যেত...তাদেরই কেউ কোনও কারণে—'ভাস্করের ফরসা মুখ লাল হল। শব্দগুলো উচ্চারণের মধ্যে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ঝরে পড়ল।

'লিলি মারা যাওয়ার চারদিন আগে আপনি ওকে একটা আংটি দিয়েছিলেন?'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভাস্কর বলল, 'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?' একটু যেন বিদ্রোহী।

'সেদিন ও আপনাকে এমন কোনও কথা বলেছিল, যা আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল?'

ইতস্তত করে নখ খুঁটল। কপালে ভাঁজ পড়ল। তারপর : 'না, সেরকম কিছু বলেনি। শুধু নিজের সব কথা শুনিয়েছিল। ...কী কষ্ট করে ও বড় হয়েছে...কীভাবে নিতান্ত সমস্যার চাপে পড়ে ওই নোংরা পথে পা দিয়েছে...সব, এভরিথিং। শুনতে আমার বুক ভেঙে গেছে, ইন্সপেক্টর। ইট ওয়াজ সো হার্ড অন মি। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। ভেবেছি ও ঠাট্টা করছে..কিন্তু পরে ওর চোখে জল দেখে বুঝলাম, না, সব সত্যি।' চোখের কোণ আবার চিকচিক করে উঠছে। গলার স্বর অবরুদ্ধ। মাথা নামিয়ে দু-হাতে চেপে ধরল ভাস্কর, 'ওঃ গড! ইট ওয়াজ ট্রুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ! সে-রাতে...আমি ঘুমোতে পারিনি...' ওর দেহটা ফুলে-ফুলে উঠছে। গলার স্বর জড়িয়ে গেছে। বলল, 'ওর সঙ্গে দু-দিন কথাও বলিনি। কিন্তু তারপর আর থাকতে পারিনি। ভেবে দেখলাম, লিলি তো কোনও দোষ করেনি। ও পরিস্থিতির হাতের পুতুল ছিল মাত্র।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আর কিছু আমার জানার নেই। বললাম, 'মিস্টার ভাস্কর, লিলি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসত। ওকে ভুল বুঝবেন না। দরকার হলে আপনাকে পরে হয়তো আবার বিরক্ত করতে পারি।'

গৌতম ভাস্কর ভেজা চোখে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে দেখল মাত্র। ওর স্বপ্নভঙ্গের আঘাতটা যে খুব জোরালো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ম্যানেজারের টেবিলে চোখ পড়তেই দেখি একটা প্যাডের কাগজে কীসব লিখে চললেও তাঁর কান দুটো ভাস্করের টেবিল লক্ষ্য করে মুখিয়ে আছে। ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার উপস্থিতি টের পেয়েও উনি মুখ তুলছেন না। অপরাধবোধ? একটু কেশে বললাম, 'লাভ নেই ম্যানেজারসাহেব, কিচ্ছু শুনতে পাবেন না। প্রয়োজনে আমি খুব চাপা গলায় কথা বলতে পারি।'

মুখ তুলে এবারে তাকালেন ম্যানেজারসাহেব। হতভম্ব দৃষ্টি দিশেহারা। দাঁত বের করে হাসলাম, তারপর রওনা হলাম রতন শর্মার টেবিল লক্ষ্য করে।

রতন শর্মা টেবিলে উসখুস করছিল। হয়তো ভাবছিল কখন আমি আসব। ওর আশা পূর্ণ করলাম।

রতন শর্মার কাছ থেকে লিলির বিষয়ে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। শুধু বোঝা গেল, মেরি কৃষ্ণমূর্তির প্রতি সামান্য দুর্বলতা ওর মনে স্থান পেয়েছে। শেষে সরাসরি জিগ্যেস করলাম, 'মেরিকে আপনি ভালোবাসেন?'

থতমত খেলেও রতম শর্মা খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল : 'আই লাইক হার। খুব মিষ্টি মেয়ে।'

এ-বিষয়ে আমিও একমত।

BanglaBook.org

পরের প্রশ্ন : 'লিলি জনসন অজিত শুক্লাকে এখানে চাকরি দিয়েছিল...সে কোথায় বসে?'

'ওই তো—' রতন শর্মার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, দরজা দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে, দেওয়াল ঘেঁষে, একটা সবুজ পেডাস্ট্যাল ফ্যান রয়েছে। তার মুখোমুখি বসে এক যুবক। তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে। চোখাচোখি হতেই আন্তরিক হাসল। উত্তরে আমিও হাসলাম। উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালাম তার উদ্দেশে।

ফরসা। তেলহীন কালো কোঁকড়ানো চুল। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। কেমন যেন একটা ছেলেমানুষী ছাপ আছে। ঠোঁটের কোণে হাসিটি বিজ্ঞাপনের স্থিরচিত্রের মতো স্থায়ী। সব মিলিয়ে এই হল অজিত শুক্লা।

পরিচয় ও উদ্দেশ্য খুলে জানাবার পর অজিত শুক্লা হাসল, বলল, 'মিস্টার ভাস্কর আর মিস্টার শর্মার সঙ্গে কথা বলতে দেখেই বুঝেছি—' নিজে উঠে এসে একটা চেয়ার টেনে দিল আমাকে বসতে। পেডাস্ট্যাল ফ্যানটা চেষ্টা করে ঘুরিয়ে দিল আমার দিকে। তারপর ঘুরে গিয়ে বসল নিজের চেয়ারে। টেবিলের কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে বলল, 'বলুন, ইন্সপেক্টর বরাট, কী জানতে চান?'

'লিলি আপনাকে এ-চাকরিতে ঢুকিয়েছে?'

'হ্যাঁ—ওঁর ঋণ আমি শোধ করতে পারলাম না। শি ওয়াজ জাস্ট গ্রেট।' স্মৃতিচারণের সুর।

'ওর বিষয়ে সব কথা আপনি জানতেন?' সূক্ষ্ম নজরে অজিত শুক্লার অভিব্যক্তি লক্ষ করতে লাগলাম।

'হ্যাঁ, জানতাম—সত্যি, খুব দুঃখের ব্যাপার।' অজিত শুক্লা যেন শূন্য দৃষ্টি সামনে মেলে দিয়ে লিলিকে কল্পনায় দেখছে, 'এর জন্যে আমাদের সমাজব্যবস্থা দায়ী, ইন্সপেক্টর। কলকাতায় একা মেয়েদের ভালো একটা থাকার জায়গা নেই। যেগুলো আছে সেগুলোর খরচ আকাশছোঁয়া।'

কে তুমি? নারী প্রগতির নেতা?

'মেয়েটাকে আপনার কেমন মনে হত?'

'আগেই তো বললাম—গ্রেট।' একটু থেমে গৌতম ভাস্করের দিকে ইশারা করে : 'মিস্টার ভাস্কর ওঁকে বিয়ে করে সুখী হতেন।'

'ওর আসল পরিচয়টা আপনি আর মিস্টার ভাস্কর ছাড়া অফিসের আর কে জানে?'

'কেউ না। এমনকী রতন শর্মাও না।'

'সাতান্ন নম্বর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আপনার যাতায়াত আছে?'

'চাকরিতে ঢোকার আগে দু-একবার গেছি। তারপর যাতায়াত করতে মিস জনসন নিজেই বারণ করেছিলেন। তাই আর যেতাম না।' অজিত শুক্লা দুঃখের হাসি হেসে বলল, 'এখন তো আর যেতেও ভালো লাগবে না। যে এই চাকরিটা দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাল, তার-ই প্রাণ চলে গেল...'

'কেন, অনিতা নায়ার তো রয়েছেন—আপনার আত্মীয়?' আকস্মিক ভঙ্গিতে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে বেসামাল করে দিতে চাইলাম অজিত শুক্লাকে। কিন্তু শুক্লার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। বলল, 'মিসেস নায়ার আমার সেরকম আত্মীয় কিছু নন। উনি

BanglaBook.org

এককালে আমার মায়ের বন্ধু ছিলেন। ওঁর বিপদে মা অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল সে-ধার উনি দেব-দেব করেও শোধ করতে পারেননি। তারপর মা বহুকাল মারা গেছে কিন্তু মিসেস নায়ারের সঙ্গে আমার যোগাযোগটা থেকে গিয়েছিল। বি-কম পাশ করে বহুদিন কোনও চাকরি জোটাতে পারছি না দেখে উনি নিজেই একদিন বললেন যে, ওই টাকা তাঁর পক্ষে কোনওদিন শোধ করা সম্ভব হবে না—এত আর্থিক কষ্টে ওঁকে কাটাতে হয়। বরং উনি আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপর মিসেস নায়ারই লিলি জনসনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। পরে...' সামান্য দ্বিধা, কুণ্ঠা : 'ভাসা-ভাসা ভাবে জানতে পারি ও-বাড়ির মেয়েদের আসল পরিচয়। তবে বিশ্বাস করুন, ইন্সপেক্টর, লিলি জনসনের জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। এত চমৎকার মনের একটা মেয়ে, তাকে কি না...যাক সে-কথা।' থামল অজিত শুক্লা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আর কিছু আমার জিজ্ঞাস্য নেই। নিয়মমাফিক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। অজিত শুক্লাও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলেই বলবেন, ইন্সপেক্টর বরাট। লিলিকে যে খুন করেছে তার ধরা পড়া উচিত। অ্যাট এনি কস্ট!'

আমি হাসলাম। বললাম, 'ধরা সে পড়বেই। আমার হাত থেকে কোনও আসামী কোনওদিন ছাড়া পায়নি। তবে মিস্টার শুক্লা, আপনাকে হয়তো পরে এবার লালবাজারে আসতে হতে পারে—ফর্মাল স্টেটমেন্ট দিতে। এটা রতন শর্মা ও গৌতম ভাস্করকেও জানিয়ে রাখবেন। চলি—।'

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তখনই।

জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ করে চলে আসছি, একটা গাড়ির তীব্র হর্নের শব্দ কানে যেন আমার তালা লাগিয়ে দিল। মনোযোগ চলে গেল শব্দকল্পের দিকে। হর্নের বিচিত্র সুর, বাস ও লরির ভারী ইঞ্জিনের গর্জন, খটাখট টাইপরাইটারের শব্দ। এই শব্দগুলো নিয়ে মনের ভেতর নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎই কানে এল একটা নতুন শব্দ : 'পরশু আই-সি ফোর-ও-টুতে চারটে টিকিট হবে।'

গোটা অ্যাকাউন্ট্স সেকশানটা পলকে কোনও এক অদৃশ্য হারিকেনের শিকার হয়ে উথালপাথাল হয়ে গেল। শূন্যে বনবন করে ঘুরপাক খেয়ে যেন টলতে-টলতে আবার স্থির হল নিজের মেরুদণ্ডে। আমার শীত-শীত করে উঠল। চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে এল কোনও অজানা কারণে। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

তাকিয়ে দেখি, অ্যাকাউন্ট্স সেকশানের কাচের দরজা খুলে একতলার সেই সংসার-ক্লান্ত বাঙালি ভদ্রলোক উঁকি মেরেছেন। এবং ফ্লাইট নাম্বার আই-সি ফোর-ও-টুতে চারটে এয়ার টিকিট কেনার খবরটা উনি দিচ্ছেন গৌতম ভাস্করকে। খবরটা দিয়েই ভদ্রলোক উধাও হয়ে গেলেন।

গৌতম ভাস্কর নিজের টেবিল থেকে উঠে এসে রতন শর্মার সঙ্গে কথা বলছিল। খবরটা শুনেই শর্মার টেবিল থেকে একটা প্যাড টেনে নিয়ে বলপেন দিয়ে কী যেন লিখে নিল। তারপর প্যাডের পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে ফিরে গেল নিজের টেবিলে। কাগজটা চাপা দিয়ে রাখল।

সন্তর্পণে সন্দিহান চোখে ঘরের সবাইকে দেখতে লাগলাম। আমার মনে পড়ে গেছে আজ সকালে খুনির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় শুনতে পাওয়া প্রক্ষিপ্ত

BanglaBook.org

কণ্ঠস্বর ঃ 'আগামীকাল আই-সি টু-সিক্স-থ্রিতে দুটো টিকিট হবে।' আমার অবাধ্য চোখ তখন সাদা চুলের সন্ধানে গোটা অ্যাকাউন্টস সেকশানটা চষে বেড়াচ্ছে। কুঁসছে নিষ্ফল আক্রোশে। সাদা চুল কেউ নেই। তবুও হতাশ হলাম না আমি। লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলাম গৌতম ভাস্করের দিকে।

ভাস্কর টেবিলের কাগজপত্র গোছগাছ করছিল, আমাকে আবার আসতে দেখে অবাক চোখে তাকাল। ওকে প্রশ্ন করলাম, 'আগামীকাল আই-সি- টু-সিক্স-থ্রিতে দুটো টিকিট কাটতে দিয়েছেন আজ?'

'দুটো তো নয়—মোট পাঁচটা দিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছেন কেন?'

'আজ ঠিক বারোটায় কেউ আপনাকে চেঁচিয়ে ওই ফ্লাইটে দুটো টিকিট কাটতে বলেছে?'

'বলতে পারে। কারণ এয়ার টিকিটের অ্যারেঞ্জমেন্টটা জেনারালি আমি ইনিশিয়েট করি...।'

আমি অধৈর্য হয়ে পড়লাম। বললাম, 'আপনি আসল প্রশ্নটা বুঝতে পারেননি, ভাস্কর। এগজ্যাক্টলি বারোটায় কেউ আপনাকে দুটো টিকিট কাটতে বলেছে?'

আমার কণ্ঠস্বরে একটু থতমত খেয়ে গেল ভাস্কর। বলল, 'বসুন, কাগজপত্র দেখে বলছি—' আমি অবাধ্যভাবে দাঁড়িয়েই রইলাম। আমার চঞ্চল চোখ ততক্ষণে আবিষ্কার করে ফেলেছে ঘরের এক নির্জন অংশে কয়েকটা ফাইলিং ক্যাবিনেটের পাশে দাঁড়ানো ছোট টেবিলটা। তার ওপরে একটা টেলিফোন-বই ও দুটো নিরীহ টেলিফোন।

কাগজপত্র পরীক্ষা করে গৌতম ভাস্কর চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। দুটো টিকিটের রিকুইজিশন দিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু—এইমাত্র যিনি চারটে টিকিটের কথা বলে গেলেন। কিন্তু আপনি সে-কথা জানলেন...।'

'জানতে হয়।' বাধা দিয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। খেয়াল করিনি রতন শর্মা কখন যেন নিজের টেবিল ছেড়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর দিকে একবার ভুরু কুঁচকে দেখে ভাস্করকেই প্রশ্ন করলাম, 'তখন কেউ কি ওই টেলিফোনে কথা বলছিল?'

আঙুলের ইশারায় নির্জন কোণে রাখা ছোট্ট টেবিলটা দেখালাম।

গৌতম ভাস্কর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না। আসলে...একটু প্রাইভেসি আছে বলে কোম্পানির সবাই ব্যক্তিগত ফোনগুলো এখান থেকে করে...।'

তুমি নিজে করোনি তো? একই জায়গায় দুটো টেলিফোনের প্রয়োজন জানতে চাইলে রতন শর্মা বলল, একটা ইন্টারকম লাইন। অন্যটা পি-অ্যান্ড-টি, অর্থাৎ জিরো ডায়াল করে সরাসরি বাইরে ফোন করা যায়।

ওখানে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের দিকে ফিরে কেউ যদি কথা বলে তা-হলে সে-কথা ঘরের আর কারও কানে মোটেও পৌঁছবে না।

শর্মাকে জিগ্যেস করে জানলাম, এমনিতে সোনা ট্রাভেল্‌স সাড়ে পাঁচটায় ছুটি হলেও কাজের চাপের জন্যে ছুটির পর সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অনেকেই থেকে যায় অফিসে। কেউ-কেউ রাত আটটা পর্যন্তও থাকে।

আমার মনে জটিল ক্যালকুলাস দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে সঠিক উত্তরের দিকে। শুনির প্রথম টেলিফোন এসেছিল সাতটা নাগাদ। তখন এখানে ওভারটাইমে

BanglaBook.org

অনেকে ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খুনির অত উচ্ছ্বাস, কান্নাকাটি, কিছুই কি কারও নজরে পড়েনি? না পড়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, দেওয়ালের দিকে মুখ করে টেলিফোন করলে টেলিফোনকারীর শুধু পিঠটুকু ছাড়া আর কিছু ঘরের কারও নজরে পড়বে না। লিলি জনসনের খুনি, তোমার বুদ্ধি আছে। এবং তুমি ভাগ্যবান।

আমার শীত-শীত অনুভূতিটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোতলার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। শর্মা ও ভাস্কর বারবার করে বলল, কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলেই জানাতে। রতন শর্মা কাচের দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল। ওকে হঠাৎই ওদের কোম্পানির ফোন নম্বরটা জিগ্যেস করলাম। জানা গেল টু-ফোর-ফাইভ-ওয়ান-সিক্স-থ্রি। সামন্তের কথা মনে পড়ল ঃ '...টু-ফোর এক্সচেঞ্জ...।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে পরিস্থিতি জরিপ করতে লাগলাম। লিলি জনসনের খুনি ছায়া-ছায়া আকার নিলেও সাদা চুলের হিসেবে সব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া, খুনি নিশ্চয়ই লিলির অচেনা ছিল। তা না হলে ও তাকে ঘরে নিত না। ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে পত্রপাঠ বিদায় দিত। অথচ খুনি লিলিকে 'ভালো মেয়ে বলে জানত...' ওঃ ভগবান! আমাকে একমাথা সাদা চুল দাও! যে করে হোক!

নীচে এসে দেখি সুরেশ নন্দা রিসেপশনে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানাতেই উত্তর পেলাম, 'অলওয়েজ ওয়েলকাম।'

আমাকে দেখে সুরেশ উঠে দাঁড়াল। দুজনে বেরিয়ে আসছি, শুনলাম কুচকুচে কালো বাবরি চুল ছেলেটি অ্যাংলো মেয়েটিকে বলছে, 'জানো, তোমাকে দেখতে অনেকটা লিজ টেলরের মতো!' ছেলেটির কথা যদি সত্যি হয় তা হলে তাকে দেখতে রিচার্ড বার্টনের মতো।

আমাদের জিপটা বেশ কিছুটা দূরে পার্ক করা ছিল। সেটুকু পথ হেঁটেই গেলাম। আজ ইন্দ্রপাল দুবে নেই। সুরেশ নিজেই চালাচ্ছে। স্টিয়ারিং-এ বসে স্টার্ট দিয়ে ও বলল, 'কিছু পেলেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি—' একটু থেমে যখন দেখলাম সুরেশ নন্দা ভয়ঙ্কররকম উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছে, তখন জবাব দিলাম, 'প্রচুর নতুন সূত্র ও সমস্যা উপহার পেয়েছি। খুনি এই সোনা ট্রাভেল্‌স-এ থাক বা না থাক, টেলিফোনটা সে এখান থেকেই করেছিল। পজিটিভ এভিডেন্স পাওয়া গেছে।'

জিপ ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় তাকিয়ে দেখি গৌতম ভাস্কর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন হোর্ডিংয়ের ফ্রেমের আড়াল থেকে আমাদের লক্ষ করছে।

সুরেশ নন্দা দ্রুতবেগে জিপ ছুটিয়ে দিল চৌরঙ্গী রোড ধরে ।

BanglaBook.org

অন্তর্দৃশ্য

গৌতম ভাস্করের চোখের সামনে ক্রমে ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল লাল-সাদা জিপটা। তারপরেও অনেকক্ষণ আনমনা হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল সে। কিছুতেই আজ কাজে মন বসাতে পারছে না। অবশ্য অফিসে আসামাত্রই যে প্রাতঃকালীন গুঞ্জন লিলির মৃত্যুকে

ঘিরে শুরু হয়েছিল সেটা সরকারসাহেবের নজর এড়ায়নি। নিজের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গৌতমকে ডেকে পাঠিয়েছেন বেয়ারা দিয়ে।

'সাব, সরকারসাব একবার দেখা করতে বলেছেন—।'

অবাক হয়েছে গৌতম। সকালেই তলব, এইরকম মানসিক অবস্থায়? অনিশ্চিত পায়ে সরকারসাহেবের ঘরে গেছে সে।

'আমাকে ডেকেছেন, স্যার?'

চোখ তুলে তাকিয়েছেন এ. কে. সরকার। বলেছেন, 'হ্যাঁ, বোসো।'

নীরবে আদেশ পালন করেছে গৌতম ভাস্কর। তারপর অপেক্ষা করেছে।

পাইপ ধরিয়ে তাতে গভীর টান দিয়ে সরকারসাহেব বলেছেন, 'গৌতম, তুমি আজ বাড়ি যাও। রেস্ট নাও। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি—।'

হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়েছে সে। গম্ভীর স্বরে বলেছে, 'থ্যাঙ্ক য়ু, স্যার—' তারপর বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

লিলির সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতার ব্যাপারটা তা হলে এ. কে. সরকারেরও অজানা নয়! কপালের শিরা দপদপ করে এক দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণার সূচনা হয়েছে। আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছে বুকটা। অফিসের প্রায় সকলেই ওদের ভালোবাসার ব্যাপারটা জানলেও লিলির সত্যিকারের পরিচয়টা জানে না—অন্তত এখনও জানে না। এখন লিলি খুন হওয়ার পর সে-খবর জানাজানি হবেই। ইস, কী লজ্জা! কী অপমান! লোকে বলবে, গৌতম ভাস্কর একটা শরীরপসারিনীকে বিয়ে করতে চলেছিল! সেদিক থেকে রেহাই পেয়ে গেছে সে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা ওর সামাজিক মান-সম্মান রক্ষা করেছে। কিন্তু—।

এই একটা 'কিন্তু'ই গৌতমের বুকের গভীরে অমরকণ্টক হয়ে এক রক্ত-ঝরানো ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে। বারবার নিজেকে সে প্রশ্ন করেছে। উত্তর পেয়েছে একটাই : লিলিকে সে ভালোবাসে। পাপে-পুণ্যে মিলিয়ে ওই সুন্দর মেয়েটা যেন এক-অঞ্জলি গোলাপ। গোলাপে কাঁটা থাকে। সেই কাঁটার আঘাত গৌতমকেও পেতে হয়েছে। মাত্র পাঁচদিন আগে।

সামনে পশ্চিমের আকাশে সূর্য শয্যাশায়ী। আকাশ ও ছেঁড়া মেঘের দলকে নিজের রক্ত উৎসর্গ করে সে এখন স্মৃতি হয়ে যাবে একরাতের জন্যে। গৌতম ভাস্করের চশমায় লাল মেঘের টুকরো অলস ছায়া ফেলে গেল।

ওর চোখ দুটো আবার জ্বালা করছে। লিলিও স্মৃতি হয়ে গেছে। তার আগে ছায়া ফেলে গেছে গৌতমের জীবনে। সেদিন চোখের জলে ও গৌতমের বুকের আগুন নেভাতে পারেনি। আগুন ও জল পাশাপাশি অবস্থান করলে প্রশমন নেমে আসে। তাই তো জানত গৌতম। কিন্তু সেদিন তা হয়নি। আগুন ও জলের দুয়ে জন্ম নিয়েছে বিষ। সে-বিষ কাউকে মারে না, শুধু নীলকণ্ঠ করে দেয় চিরকালের মতো।

চোখ মুছল গৌতম। রুমালে মুছে নিল চশমার কাচ। গোটা আকাশটা এখন উজ্জ্বল লালে মাখামাখি। সেদিন এরকমই একটা লাল গাউন পরেছিল লিলি। ছুটির কিছুক্ষণ আগে গৌতম গিয়ে ওকে বলেছিল, ছুটির পরে থাকতে। এক জায়গায় যাবে। কথা আছে।

লিলি সহজভাবেই রাজি হয়েছে। কারণ গৌতম ভাস্করের সঙ্গে ছুটির পর

BanglaBook.org

অনেকদিন ও বেরিয়েছে। এবং অফিস থেকে ছুটি পেয়ে যখন ওরা রাস্তায় নেমেছে তখন আকাশ ছায়া-ছায়া হয়ে দিনের সমস্ত আলো শুষে নিয়েছে।

পরিচালকের ভূমিকা নিয়েছে গৌতম, লিলি শুধু ওর অনুসারী।

ওদের আঁকাবাঁকা নীরব পথ-চলা একসময় শেষ হয়েছে ভিক্টোরিয়ার মাঠে। হ্রদের সামনে। এতটা পথ চুপচাপ এলেও অনেক নিঃশব্দ কথা আদান-প্রদান করেছে দুজনে। গৌতম বারবার অনুভব করে দেখেছে পকেটের জিনিসটা আনতে ভুল হয়েছে কি না। কৃষ্ণকালো প্রশান্ত হ্রদের পাশে বেঞ্চিতে বসে কিছুক্ষণ ওরা প্রশ্রয় দিল অস্থির বাতাসকে। তারপর নিস্তব্ধতা আবার শ্বাসরোধী হয়ে উঠল। তখন লিলি বলল, 'চুপচাপ কেন, কিছু বলো—।'

গৌতম পকেট থেকে ততক্ষণে বের করে এনেছে সোনার আংটিটা। প্যাঁচানো একটা সাপ। অন্ধকারেও তার পাথর বসানো দুটো লাল চোখ নিভে যাওয়া দেশলাইকাঠির ধিকধিকে আগুনের মতো জ্বলছে।

আংটিটা দেখে লিলি বলে উঠেছে, 'হাউ নাইস!'

উত্তর না দিয়ে থরথর হাতে লিলির ডান হাতটা টেনে নিয়ে অনামিকায় আংটিটা নিমেষে পরিয়ে দিয়েছে গৌতম। অস্ফুট স্বরে বলেছে, 'তোমার পালিয়ে বেড়ানোর পথ বন্ধ হল, লিলি। পরিভাষায় একে বলা হয়, এনগেজমেন্ট। অন্য আর কেউ যখন উপস্থিত নেই, তখন আকাশের চাঁদ-তারা আর এই জল সাক্ষী থাক।' আরও কাছে মুখ নামিয়ে এনে : 'আই লাভ য়ু।'

লিলি ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে হতচকিত। তারপর খুশি। কিন্তু ওর চোখ তখন স্থির হয়ে গেছে সামনের নিথর কালো জলে। এক রুদ্ধকম্পন ওর সারা শরীর ভূমিকম্পে মাতিয়ে দিয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টাতেও চোখের জলকে ধরে রাখতে পারেনি। গৌতমের হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে ভেঙে পড়েছে আকুল কান্নায়। কোনও সান্ত্বনা, কোনও প্রবোধ কানে তোলেনি।

প্রায় মিনিটদশেক পর ফরসা গালে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুরেখা নিয়ে লিলি শান্ত গলায় বলেছে, 'গৌতম, আমাকে বিয়ে করার আগে কতগুলো কথা তোমার জানা দরকার—।'

হেসে ওকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছে ভাস্কর : 'আমি কিছু জানতে চাই না।'

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে লিলি : 'না, তোমাকে জানতেই হবে!' হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে অদ্ভুত স্বরে ও উচ্চারণ করেছে, 'আমি খারাপ মেয়ে, গৌতম। আমি...আমি...।'

গৌতম পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টায় কী একটা বলতে গেছে, লিলি বাধা দিয়েছে ওকে, 'প্লিজ, আমাকে বলতে দাও। আমি...আই অ্যাম রিয়েলি আ প্রস্টিটিউট। একটা... একটা খারাপ মেয়ে!'

বজ্রাহত দেবদারুর মতো নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে গৌতম। মুখের সমস্ত রক্ত পলাতক হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওর মস্তিষ্কে। লিলির গলার স্বরে এমন কিছু একটা ছিল যাতে ওর কথা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তবুও গৌতমের প্রেমিক-মন বিশ্বাস করতে চায়নি। সেই প্রচণ্ড বিপর্যস্ত মুহূর্তেও হাসতে চেষ্টা করেছে : 'ওসব ছেড়ে দাও। তোমার অতীত

BanglaBook.org

আমি জানতে চাই না। বর্তমানকে নিয়েই আমি খুশি—।'

লিলি ফুঁপিয়ে উঠেছে বোবা কান্নায়, ভাঙা গলায় বলেছে, 'অতীতের কথা কে বলছে? আমি খারাপ মেয়ে ছিলাম—এখনও তাই।' তারপর কান্না মেশানো স্বরে টুকরো-টুকরো কথায় শুনিয়েছে ওর নিষ্ঠুর জীবনযাত্রার কথা। ওর অসহায়তার কথা। শেষদিকে ওর কোনও কথাই আর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কথা বলতে-বলতে ও চেষ্টা করছিল আংটিটা আঙুল থেকে খুলে ফেলতে। কিন্তু পারেনি।

গৌতম ভাস্করের সারা শরীরে তখন অগ্নিকাণ্ড। বুকের ভেতর অসহায় দমকলের অস্থির ছোটাছুটি। সেই অবস্থাতেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। দলা-দলা থুতু মুখের ভেতরে ডুবিয়ে দিয়েছে জিভটাকে। ওর হাত-পা কাঁপছে এক দুর্বোধ্য কারণে। কানের মধ্যে সশব্দে ক্রমাগত বেজে চলেছে কোনও পিতামহ-ঘড়ির পেন্ডুলাম। বিধ্বস্ত, বিস্রস্ত লিলিকে রেখে সে রওনা হয়েছে দ্রুত পয়ে। ওর মন তখন বুকের ভেতরে দুরারোগ্য ক্যানসারে মৃত্যুবরণ করছে। হ্রদের জলে চাঁদের ছায়া লিলির চোখে কতক্ষণ ঝাপসা হয়ে থেকেছে তা সে জানতে পারেনি। জানতে চায়ও না...।

লোহায়-লোহায় এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ সংবিৎ ফিরিয়ে দিল গৌতম ভাস্করের। পাতাল রেলের কাজ হচ্ছে। অন্ধকার বারান্দায় সে একা দাঁড়িয়ে।

আবার চোখ মুছল গৌতম। সময় পেয়ে ওর সেদিনের উত্তেজনা, ঘৃণা স্তিমিত হয়েছিল। এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সে দেখতে পেয়েছিল লিলির নিরুপায় জীবনটাকে। কিন্তু ঠিক তখনই কেউ নৃশংসভাবে খুন করল মেয়েটাকে। গৌতমকে সামাজিক অপমানের হাত থেকে বাঁচাল। একে কি বাঁচা বলে?

এই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে-ভাবতে শিথিল পায়ে আবার অ্যাকাউন্ট্স সেকশানে ফিরে এল গৌতম ভাস্কর।

নয়

থানায় ফিরে সুরেশ নন্দাকে নিয়ে বসলাম।

ওকে বললাম গৌতম ভাস্কর, রতন শর্মা, অজিত শুক্লা ও এ. কে. সরকার সম্পর্কে বিশদভাবে খোঁজখবর নিতে।

ওর কাছেই শুনলাম, আমি চলে আসার পর নাকি সরকারসাহেব লিলির নামে শুধু গাদা-গাদা সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। বেঁচে থাকলে দিতেন কিনা সন্দেহ।

ওকে বললাম নিয়মমাফিক স্টেটমেন্টের প্রয়োজন হলে ওদের থানায় ডাকিয়ে সুরেশ যেন সে-কাজ সেরে নেয়। ওর কাছে আরও জানলাম, কোনও মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দোকানে এখনও পর্যন্ত সেই বিশেষ ক্রেতার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এবং রীনার ব্যাপারেও রেকর্ড সেকশান নিরুত্তর।

'কাল্লুকে এবার তা হলে ছেড়ে দাও।' সুরেশকে বললাম, 'তবে ওর ওপর ওয়াচ রাখতে হবে। আমি রাতে নায়ারদের ফ্ল্যাটে একবার যাব। তুমি তার আগেই একবার যেয়ো। ডিউটিতে যারা আছে তাদের বোলো অ্যালার্ট থাকতে। এ-খুনি কখন কী করে

BanglaBook.org

বসবে বোঝা মুশকিল। তবে একটু আন্দাজ করতে পারছি, খারাপ মেয়েদের ওপর তার একটা জাতক্রোধ আছে। এমনকী, যদি দেখা যায় ওই "রীনা"ও একটি ব্যবসায়ী মেয়ে, তা হলে আমি অবাক হব না।'

লিলি জনসনের ফাইলটা নিয়ে তাতে নতুন সব তথ্য জুড়ে সুরেশ সেটা হালফিল করে রাখতে লাগল।

স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করতে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

অন্তর্দৃশ্য

রাতের বেলা রোজ যেমনটা থাকে আজও সেইরকম চেহারা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের। একটুও পালটায়নি। লিলি জনসনকে খুন করার দিন রাতের পরিবেশ, ঠিক এইরকমই ছিল। সেদিন কোনও অসুবিধে হয়নি। আজও হবে না। তবে লিলির সঙ্গে সে রাত কাটিয়েছিল ঃ একটা বেশ্যার সঙ্গে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা করা যায়! কিন্তু আজ সেসব কিছু করবে না। চুপচাপ কাজ সেরেই চলে যাবে। কারণ এখন সাতান্ন নম্বর বাড়ির গলিতে, দরজায় সব জায়গায় পুলিশি পাহারা। খুব সতর্কভাবে তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করতে হবে।

গলির কাছ থেকে কিছুটা দূরে একটা পানের দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াল সে। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখে গলির আশেপাশের প্রতিটি লোককে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বলা যায় না, সাদা পোশাকে কোনও পুলিশ হয়তো গলিটার দিকে নজর রাখছে।

তার অনুসন্ধান ফলবতী হল। দুজন শক্ত-সমর্থ চেহারার লোককে সে খুঁজে পেল যারা অন্যদের থেকে আলাদা। কাঁচা গলিটার দিকে ওদের ঘন-ঘন সতর্ক চাউনিই স্পষ্ট বলে দিচ্ছে ওরা পুলিশের লোক।

পকেটে রাখা গিটারের তারটা হাত দিয়ে একবার অনুভব করল সে। আরও তিনটে তার বাড়িতে আছে। সময়মতো কাজে লাগবে।

হালকা পায়ে এবার হাঁটতে শুরু করল সে। নির্বিকারভাবে কাঁচা গলিটা পেরিয়ে গেল। সুদর্শন-চোখ কিন্তু সেই বিশেষ লোক দুজনের ওপর স্থির লক্ষ্যে নিবদ্ধ। মাঝে-মাঝে ওরা অন্যমনস্ক হচ্ছে। অন্যান্য লোকজন-দোকানপাটের দিকে তাকিয়ে দেখছে। এই অন্যমনস্কতার সুযোগে ফিরে এসে ছায়াময় গলিতে ঢুকে পড়ল সে।

বাড়ির দরজায় কেউ নেই। সুতরাং অন্ধকারে মিশে বাড়ির ভেতর সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। তার খুব চেনা। নিশ্চিত পায়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

দোতলায় পৌঁছে সে থমকাল। মনের মধ্যে হাতড়ে চলল চারটে নাম। অসংখ্য ঘুরপাক খেয়ে যে চেনা নামটা বারবার ভেসে উঠতে লাগল অন্য সব নামগুলো ছাপিয়ে, সেটা মেরি কৃষ্ণমূর্তি।

ওর ফ্ল্যাটটা যেন কোন দিকে? ডানদিকে, না বাঁ-দিকে?

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ মনের মধ্যে চলল জোড়-বিজোড় খেলা। তারপর সিদ্ধান্ত নিল সে : ডানদিকে।

এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে চাপ দিতেই খুলে গেল ফ্ল্যাটের ভেজানো দরজা। সত্যি, খারাপ মেয়েগুলো ভীষণ সাহসী হয়! কী নিশ্চিন্তে দরজা খোলা রাখে!

দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি মারল সে। অতি সন্তর্পণে। শৌখিন ল্যাম্পশেডগুলোর একটা জ্বলছে এবং এতক্ষণ যে যান্ত্রিক ধারাভাষ্য সে শুনতে পাচ্ছিল, সেটার উৎস ঘরে সাজানো ওয়েস্টন টিভি সেট। টিভি চলছে বলেই হয়তো ঘরের আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে।

শরীর বেচে কী পয়সাই না করেছে মেয়েগুলো!

কিন্তু চলমান টিভির দর্শক হিসেবে কাউকে দেখতে পেল না সে। হয়তো সাময়িকভাবে উঠে ভেতরে গেছে। আর সময় নষ্ট করল না। বেড়ালের মতো চতুর ক্ষিপ্রতায় ঢুকে পড়ল ভেতরে। ডান দেওয়াল ঘেঁষে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল মেসনাইট প্রাচীরের কাছে। তার ওপরের আবরণ হালকা পরদা। পরদার ভাঁজের আড়ালে আত্মগোপন করল সে। এখন শুধু অপেক্ষা। অপেক্ষা করতে তার ভালোই লাগে। এর মধ্যে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা আছে। মেরিকে আসতেই হবে এখানে। এখন হোক, আর একটু পরেই হোক। তারপর...।

ঘরে ঢুকে ফ্ল্যাটের দরজাটা সে ভেজিয়ে দিয়েছিল, সেটা এখন ধীরে-ধীরে আবার খুলে যাচ্ছে। পরদার আড়াল থেকে সবই দেখতে পাচ্ছে সে। ঘরে ঢুকল একটা মেয়ে—না, মেরি নয়। চেহারায় বাঙালি ছাপ। তবে সাজগোজ অত্যন্ত উৎকট। হবেই তো। ব্যবসার সময় হয়েছে যে! মেয়েটি চেঁচিয়ে মেরির নাম ধরে ডাকল। তারপর টিভি দেখতে লাগল। টিভিতে তখন 'স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের প্রগতি' নিয়ে আলোচনা করছেন জনৈক মন্ত্রী মহোদয়। তাঁর বক্তব্যের সার : প্রগতি বিনা গতি নেই। কানু বিনা গীত নেই।

এমনসময় মেরি কৃষ্ণমূর্তি ঘরে ঢুকল। পরনের পোশাক আধাআধি। শায়া ও ব্লাউজের ওপর শাড়িটা চাদরের মতো জড়ানো। বোঝা যায়, সাজগোজ এখনও শেষ হয়নি। ঘরের আবছায়া আলোয় ওদের দুজনকেই কেমন রহস্যময়ী মনে হচ্ছে।

মেরিকে দেখে প্রথম মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, 'এ কী? তুই এখনও তৈরি হোসনি? আটটায় শো!'

মেরি মনমরা সুরে বলল, 'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। তোরা যা!'

উত্তরে জোরালো প্রতিবাদে প্রথম মেয়েটি বলল, 'তা আবার হয় নাকি? টিকিট কাটা হয়ে গেছে।' তারপর মেরিকে ঠেলা মেরে : 'যা, যা, তৈরি হয়ে নে জলদি। সিনেমা-টিনেমা দেখলে মনটা ভালো লাগবে।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রথমা।

মেরি ক্লান্ত পায়ে দরজায় এগিয়ে গেল। ছিটকিনি এঁটে দিল ভেতর থেকে। তারপর চলন্ত টিভির দিকে পা বাড়াল।

পরদার আড়ালে তার হাসি পেল। ঝকঝকে দাঁতে হিংস্র হাসল সে। মেরির মন সে এখনই ভালো করে দেবে। তার জন্যে সিনেমায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কালো দস্তানা দুটো ধীরে-ধীরে পরে নিল সে। লুকিয়ে রাখা চার নম্বর ভারটা উঠে এল তার হাতে। তারপর পায়ে-পায়ে পরদার আড়ালে-আড়ালেই সে এগিয়ে চলল টিভি লক্ষ্য করে।

BanglaBook.org

মেরির কাছাকাছি পৌঁছে চুপিসারে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। না, মেরি তাকে দেখতে পায়নি। ও ঝুঁকে পড়ে টিভির নব্ ঘুরিয়ে ছবিটা পরিষ্কার করতে চাইছে।

সে ঠিক ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, গিটারের তার হাতে টানটান। এই মুহূর্তে তার মনে কোনও অনুতাপ নেই, অনুশোচনা নেই।

বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তারটা পেঁচিয়ে গেল ঝুঁকে থাকা মেরি কৃষ্ণমূর্তির গলায়। পরিবর্তী ক্রিয়ায় নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। তারটা আঁকড়ে ধরে আপ্রাণ চেষ্টায় মুক্ত হতে চাইল ফাঁস থেকে। কিন্তু ততক্ষণে তার ডান হাঁটু চাপ দিতে শুরু করেছে মেরির শিরদাঁড়ার ঠিক নীচে। ওর নরম শরীরটা গলায় পেঁচানো তারের ভয়ঙ্কর টানে বেঁকে গেছে পিছন দিকে, কিন্তু হাঁটুর চাপের ফলে পড়েও যাচ্ছে না। এ এক অদ্ভুত ভারসাম্য।

একমিনিট...দু-মিনিট...মেয়েটার ধস্তাধস্তি একসময় থামল। হাত-পা ছুড়তে গিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে মেরি। কিন্তু তারের টানে ওর দেহটা আধবসা অবস্থায় সোজা হয়ে।

সে তারের দু-প্রান্ত ছেড়ে দিতেই মেরি মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। ওর মুখ দিয়ে কি রক্ত বেরিয়ে এসেছে? তার ডানহাতের কবজিতে চটচটে জিনিসটা তা হলে কী?

হাতটা মুখের কাছে তুলে অল্প আলোয় দেখতে চাইল সে। হ্যাঁ, একটা কালচে ছোপ যেন নজরে পড়ছে। এগিয়ে গিয়ে গোলাপি পরদায় ঘষে-ঘষে হাত মুছল সে। দস্তানা জোড়া খুলে পকেটে ভরল। টের পেল, সারা মুখে তার বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। এবার নিষ্প্রাণ মেরির ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। অস্থির নিষ্ঠুর হাতের টানে ওর গায়ের জামা-কাপড়গুলো খুলতে লাগল। খুলতে গিয়ে ছিঁড়েও গেল কিছু-কিছু। এসব মেয়েদের জামা-কাপড় দিয়ে কী হবে! এগুলো খোলার জন্যেই তো রোজ কষ্ট করে পরা! তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল।

মেরিকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বড়-বড় শ্বাস নিতে লাগল সাম্প্রতিক পরিশ্রমের কারণে। তারপর সে শিথিলভাবে বসে পড়ল সোফায়। চিন্তা করতে লাগল আনমনে।

সত্যি, মেয়েটা যদি ভালো হত, তা হলে এভাবে ওকে মরতে হত না। তার চোখ জ্বালা করছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ওরা কি বোঝে না, কাউকে মেরে ফেলতে তার কত কষ্ট হয়? এভাবে আর কতদিন সে নিজে পাপ করে অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে? ওঃ, তার কি মুক্তি নেই? স্বস্তি নেই? শান্তি নেই? একটা রুদ্ধ কান্নার ঢেউ দলা পাকিয়ে জমাট বেঁধে আছে গলায়। চোখের নোনতা জলের রেখা নেমে এসে তার ঠোঁটের কোণ ছুঁয়েছে। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করবে সে? ফোন করবে পুলিশে? স্বীকার করবে নিজের অপরাধ? যে-শাস্তি ওরা দেয় তাই মাথা পেতে নেবে?

চোখের জল মুছে সে উঠে দাঁড়ায়। অশান্ত আবেগে পেশিবহুল শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। টিভিতে তখন যান্ত্রিক স্বর শোনা যাচ্ছে : নারীসমাজে যারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত, তাদের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর...।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজায় ব্যস্ত হাতে কেউ নক করল—ঠক, ঠক, ঠক...।

BanglaBook.org

দশ

টেলিফোনটা এল রাত ঠিক সাড়ে আটটায়।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন। সুরেশ বেশ কিছুক্ষণ আগেই ফ্রি স্কুল স্ট্রিট রওনা রয়েছে। ওর রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে দরকার হলে আরও একজন প্লেন ড্রেস ওখানে পোস্টিং করে দেওয়া যাবে। অলসভাবে বসে থেকে সামান্য তন্দ্রামতো এসেছিল। এস. আই. তালুকদারের ব্যস্ত স্বরে সেটা অঙ্কুরেই বিনাশ হল।

'স্যার, রজত চৌধুরীর টেবিলে এখনই একবার আসুন—একটা ফোন এসেছে! চৌধুরী বলল, টেপ রেডি আছে!' এবং পলকে তালুকদার অদৃশ্য।

সুতরাং আমিও তুলনামূলক গতিতে চঞ্চল হলাম। কে ফোন করেছে আমি জানি। আর সেই কারণেই বুকটা আমার কেঁপে উঠেছে।

টেলিফোন তুলেই প্রথমে যে-শব্দটা কানে এল সেটা অবরুদ্ধ ফোঁপানি। কেউ গুমরে-গুমরে কাঁদছে।

রজত চৌধুরী রেকর্ডিং চালু করে দিয়েছে এবং তালুকদারকে আমি বলেছি 'কল ট্রেস' করার চেষ্টায় যেতে। কী লাভ হবে জানি না। এখন রাত সাড়ে আটটা। সুতরাং সোনা ট্র্যাভেল্‌স থেকে ফোনটা আসেনি।

বার তিনেক 'হ্যালো' বলে চিৎকার করে উঠতেই ও-প্রান্ত থেকে কান্না-ভাঙা কর্কশ স্বরে উত্তর ভেসে এল, 'ইন্সপেক্টর, আমি আর পারছি না। ক্যাচ মি! ফর গডস্‌ সেক, ক্যাচ মি!'

আমার বুকে গ্রিনল্যান্ডের বাতাস খেলতে শুরু করল। এই সুরে এখন যে-অনুতাপ, যে-অনুশোচনা, তার কোনও তুলনা নেই। লিলি জনসন খুন হওয়ার পরে এরকম অনুতপ্ত স্বর আমি শুনেছি, কিন্তু তার তীব্রতা, একাগ্রতা এত ভয়ঙ্কর ছিল না। তখনকার মতো এই অপরাধবোধের সুরও কি পালটে যাবে আগামীকাল? কিন্তু কোন অপরাধ থেকে জন্ম নিয়েছে এই অনুতাপ? লিলির মৃত্যু? না কি...।

উত্তর পেলাম প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

'মেরি কৃষ্ণমূর্তি মারা গেছে, ইন্সপেক্টর। আই কিল্‌ড হার। আমি—আমি ওকে খুন করেছি। ও তো নষ্ট মেয়ে ছিল...লিলি জনসনের মতো...আপনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন...ওরা শুধু বেশ্যাই নয়, ওরা আরও খারাপ...।'

ঝটিতি টেলিফোনটা ধরিয়ে দিলাম রজত চৌধুরীর হাতে। ছুটে ফিরে গেলাম নিজের ঘরে। রিভলবার সমেত চামড়ার বেল্টটা ব্যস্ত হাতে বেঁধে নিলাম কোমরে। একজন পথচলতি কনস্টেবলকে ডেকে থামিয়ে বললাম, 'তালুকদারসাবকে এক্ষুনি ডেকে আনো—কন্ট্রোল রুমে গেছেন।'

তালুকদার একটু পরেই এল। বলল যে, কলটা ট্রেস করা যায়নি। খুনি লাইন কেটে দিয়েছে। ওকে বললাম, 'জলদি একটা জিপ রেডি করতে বলো! এক্ষুণি আমাদের ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ছুটতে হবে। ওখানে একটু আগেই একটা খুন হয়েছে। সুরেশ অন্য কাজে ওখানে গেছে। তুমি আমার সঙ্গে একটু চলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রিলিফ দিয়ে দেব।'

'আমি তা হলে বস্‌কে রিপোর্ট করে আসি।' বলে তালুকদার বেরিয়ে যাচ্ছিল,

BanglaBook.org

ওকে বললাম, ল্যাব, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফটোগ্রাফার, সবাইকে খবরটা দিয়ে দিতে। ও ঘাড় নেড়ে অদৃশ্য হল দ্রুতপায়ে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ও তালুকদার রওনা হয়ে পড়লাম।

চুমকির মতো সাদা আলো ছেটানো কালো রাস্তার বুক চিরে আমাদের জিপ ছুটে চলল তীরের গতিতে। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, সাদা-পোশাক ডিটেকটিভ দুজনের চোখে ধুলো দিয়ে সাতান্ন নম্বর বাড়িতে কেমন করে ঢুকল লিলির হত্যাকারী। নিজের একমাথা সাদা চুল সে লুকোল কেমন করে?

অন্তর্দৃশ্য

আটটার কিছু আগে সুরেশ নন্দা পৌঁছল নায়ারদের বাড়ির কাছাকাছি। বাইরের সাদা-পোশাক লোক দুজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল সাতান্ন নম্বরে সন্দেহজনক কেউ ঢোকেনি। হ্যাঁ, তারা সবসময় লক্ষ রাখছে এবং তৈরি আছে। তখন সুরেশ নন্দা ঢুকে পড়েছে গলিতে। কনস্টেবল জায়গামতো ছিল না। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এল। তাকে সতর্ক থাকতে বলে তিনতলায় রওনা হল সুরেশ। লিলির ঘরের দরজায় যে আছে তার সঙ্গেও একবার কথা বলে নেওয়া দরকার। কিন্তু তিনতলা পর্যন্ত ও উঠতে পারল না। দোতলাতেই থামতে হল।

দোতলায় ডানদিকের ফ্ল্যাটের দরজায় তিন জন সুসজ্জিতা মেয়ের ভিড়। বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। সেখান দিয়ে আলো ঠিকরে পড়েছে সিঁড়ির চাতালে। সুরেশ অনুমান করল, এই তিন জনই হয়তো এ-বাড়ির বাসিন্দা। লিলি জনসনের ফাইল থেকে ওদের নাম পাওয়া গেছে : ডলি বেনসন, চন্দা সুখানি ও কবিতা সেন। কে কোন জন তা সুরেশ নন্দা জানে না। তবে দেখল, একমাত্র শাড়ি পরা মেয়েটি বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিচ্ছে এবং 'মেরি! মেরি! কী হল? দরজা খোল, দেরি হয়ে যাচ্ছে!' ইত্যাদি বলে চিৎকার করছে। অন্য দুজন—ম্যাক্সি ও গাউন পরিহিতা—পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

সুরেশ নন্দাকে দেখেই ওরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। লক্ষ করলে বোঝা যায়, আতঙ্কের হালকা পরত ওদের চোখে-মুখে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

শাড়ি-সুন্দরীই উত্তেজিত স্বরে সুরেশকে সব ঘটনা এক নিশ্বাসে বলে গেল। শুনে কুঁচকে গেল সুরেশের ভুরু। ওদের সরিয়ে সে নিজে গিয়ে দাঁড়াল দরজায়। কান পেতে শুনল। ভেতর থেকে রেডিয়ো কিংবা টিভি চলার শব্দ ভেসে আসছে। না, শব্দটা টিভিরই : কিছুক্ষণ শোনার পর সিদ্ধান্তে এল সুরেশ। কিন্তু টিভি দেখতে-দেখতে কেউ কি ঘুমিয়ে পড়ে? শক্তিশালী হাতে কাঠের দরজায় পুলিশি ভঙ্গিতে আঘাত করল সুরেশ। চিৎকার করে উঠল, 'মিস মেরি! ওপেন আপ! পুলিশ!' উত্তরে টিভির আওয়াজ স্তব্ধ হল। কেউ সুইচ ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে টিভি সেট। কিন্তু তার পরেও সব চুপচাপ। দরজা কেউ খুলছে না।

চিৎকার চেঁচামেচিতে তিনতলার কনস্টেবল নেমে এসেছিল নীচে। সুরেশকে

BanglaBook.org

দেখেই লম্বা সেলাম জানাল। সুরেশ তাকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে সামান্য পিছিয়ে এল। এক ভয়ঙ্কর ক্যারাটে সাইড কিক বসিয়ে দিল সবুজ দরজায়।

একইসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। প্রচণ্ড আঘাতে দরজা ভেঙে পড়ল এবং সারা বাড়ির আলো নিভে গেল মুহূর্তে।

লোডশেডিং।

মেয়ে তিনজন ভয়ে চিৎকার করে ছুটে পালাল নিজেদের ফ্ল্যাটে। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে।

জমাট অন্ধকারে সুরেশের চোখ অন্ধ হয়ে গেল। যেন টন-টন আলকাতরা কেউ ঢেলে দিয়েছে দৃষ্টিপথে। অতি সন্তর্পণে সে ভেতরে পা বাড়াল। দরজার ভাঙা কাঠের তক্তাগুলো হাত ও পায়ের আঘাতে সরিয়ে দিল সামনে থেকে। কনস্টেবলকে বলল সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকতে।

ঘরের ইতিহাস ও ভূগোল, দুটোই সুরেশের অজানা। হাতড়ে-হাতড়ে এগোতে লাগল ও। বারকয়েক ডাকল মেরি কৃষ্ণমূর্তির নাম ধরে। কোনও সাড়া নেই। মেরির কোনও বিপদ হয়নি তো? হঠাৎই কীসে যেন ধাক্কা খেয়ে ও পড়ে গেল মেঝেতে। উঠে বসে হাতে অনুভব করে দেখল, একটা সোফা। এমনসময় খুব কাছে, কারও ঘন নিশ্বাসের শব্দ ওর কানে এল।

'কে?' প্রশ্ন করল সুরেশ।

কোনও উত্তর নেই।

ও চেঁচিয়ে সিঁড়ির কনস্টেবলকে বলল আলোর ব্যবস্থা করতে। ইস্, টর্চ লাইটটা সঙ্গে আনা উচিত ছিল ওর।

ঠিক তখনই একটা জমাট কালো ছায়া যেন নিঃসাড়ে বেরিয়ে গেল ভাঙা দরজা দিয়ে। সুরেশ ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না। রিভলভার ওর হাতে উঠে এলেও গুলি ছুড়তে দ্বিধা করল ও। কারণ, লক্ষ্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে দরজার দিকে ছুটে এল সুরেশ নন্দা। কনস্টেবলের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল। সে ততক্ষণে বাড়ির বাইরে এসে দ্বিতীয় কনস্টেবল ও সাদা-পোশাক পুলিশ দুজনকে দোতলার রহস্যময় ঘটনার খবর দিয়ে ফেলেছে। তারপর ছুটে গেছে আলোর ব্যবস্থা করতে।

এদিকে জটিল সিঁড়ি হাতড়ে একতলায় নেমে এসেছে সুরেশ। দুজনকে সদর দরজায় দাঁড়াতে বলে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে ও আবার ছুটে গেছে ওপরে। একটু পরেই দুটো লণ্ঠন নিয়ে প্রথম কনস্টেবল ছুটে এসেছে। ইতিমধ্যে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়ে বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মেয়েরা আবার দেখা দিয়েছে। ওদের সঙ্গে দুটো লণ্ঠন ও একটা মোমবাতির আলো—হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্তই।

আলো নিয়ে সুরেশ আবার ঢুকেছে মেরির ফ্ল্যাটে। পিছন-পিছন কৌতূহলে ভিড় করে ঢুকে পড়েছে মেয়ের দল।

মেরিকে প্রথম দেখতে পেল ডলি বেনসন এবং সেই মুহূর্তেই তিনটে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় সাতান্ন নম্বর বাড়ি কেঁপে উঠেছে থরথর করে। কান ঝালাপালা করে দেওয়া সেই মিলিত চিৎকার চলেছে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। ততক্ষণে চিৎকার করে ওদের গলা চিরে গেছে।

BanglaBook.org

একতলার দুজন পাহারাদার কাউকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেনি। শুধু অপেক্ষা করেছে ধৈর্য ধরে। তারপর আকস্মিকভাবেই কানে এসেছে ওপর থেকে ভেসে আসা বুকফাটা আর্ত-চিৎকার। একাধিক নারীকণ্ঠের। সুতরাং আর অপেক্ষায় না থেকে তারা দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে। হাট করা সদর দরজাটার কথা কেউ খেয়ালও রাখেনি।

একতলায় নেমে সে 'স্টোর'-এর দরজাটা খোলা পেয়েছিল। সুতরাং অন্ধকারেই নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়েছে। নাকে এসেছে ব্লিচিং পাউডার ও ন্যাপথলিনের গন্ধ। তারপর কান পেতে শুনেছে ব্যস্ত পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে এই ঘর থেকে। কারণ লোডশেডিংয়ের আগে স্টোরে যারা কাজ করছিল, তারা হয়তো কাজ ফেলে আলোর সন্ধানে গেছে। লণ্ঠন বা মোমবাতি নিয়ে আবার এখনই ফিরে আসবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সদর দরজার সকলেই ছুটে চলে গেল ওপরে। সুতরাং অন্ধকারে চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে এল সে। চোখের জ্বালাটা আবার বাড়তে শুরু করেছে। টেলিফোন। একটা টেলিফোন খুঁজে বের করতে হবে তাকে। তারপর সে ফোন করবে।

কাঁচা গলি ছেড়ে বড়রাস্তায় এসেও অন্য নষ্ট মেয়ে তিনটের চিল-চিৎকার সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

মনে হয়, মেরি কৃষ্ণমূর্তিকে ওরা খুঁজে পেয়েছে।

এগারো

পরিবর্তনটা আজ চোখে লাগার মতো। অন্ধকার পথে হাতছানি দেওয়া আলেয়ার মতো ইতস্তত চলে বেড়াচ্ছে আলোর শিখা। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বুক ও পেট চিরে ফেলছে আমাদের জিপ গাড়ির হেডলাইট। আমার দুর্বিনীত মন থেকে-থেকেই চিৎকার করে উঠছে : লোডশেডিংয়ের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। হঠাৎই দেখি আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। ড্রাইভারকে গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে রাখতে বলে আমি ও তালুকদার প্রায় ছুটেছি অকুস্থল লক্ষ্য করে।

এই অন্ধকারেও কিছু লোকের ভিড় গলিতে কিলবিল করছে। কোনওরকমে পথ করে সাতান্ন নম্বরের দরজায় পৌঁছে মোতায়েন কাউকে খুঁজে পেলাম না। তালুকদারকে সেখানে দাঁড়াতে বলে আমি ছুটলাম ওপরে।

অকুস্থলে সবাইকে পাওয়া গেল।

দুজন কনস্টেবল ও দুজন সাদা-পোশাক এক পাশে অপেক্ষা করছে। টেবিলের ওপর লণ্ঠন ও একটা মোমবাতি জ্বলছে। সুরেশ টর্চলাইট জ্বেলে মেঝেতে কী যেন পরীক্ষা করছে। আমি হাজির হতেই ও চমকে তাকাল, 'আপনি? খবর পেলেন কী করে?'

'সেই টেলিফোন—একটু আগেই ফোন করেছিল।' ক্লান্ত পরাজিত সুরে জবাব দিলাম। তারপর সুরেশের ইশারায় ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। টর্চের আলো অনুসরণ

BanglaBook.org

করে তাকালাম মেরির দিকে। ওদের যৌথ প্রচেষ্টায় কেনা টিভি সেটের সামনে ভাঙাচোরা 'দ' হয়ে গলায় গিটারের তার নিয়ে নগ্ন দেহে পড়ে আছে মেরি কৃষ্ণমূর্তি। মুখটা হাতে আড়াল পড়ায় ওকে এখন শরীর-সর্বস্ব মনে হচ্ছে। আমার লিলির কথা মনে পড়ল। মেরি, তোমারও দেরি হয়ে গেল।

ভাঙা দরজাটা আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম। সুরেশের কাছাকাছি মুখ এনে নিচু গলায় জানতে চাইলাম, 'কী ব্যাপার? তুমি কি দরজা ভেঙে ঢুকেছ নাকি?'

উত্তরে এক বিচিত্র কাহিনি শোনাল সুরেশ। খুনটা যখন হয়, সম্ভবত তখন সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

অন্য মেয়েদের কথা জিগ্যেস করতেই ও বলল, ওরা সামনের ফ্ল্যাটে আছে। খুব ভয় পেয়ে গেছে।

'এখানে কদ্দুর কী দেখলে?'

'ধস্তাধস্তির সেরকম কোনও চিহ্ন নেই। তবে এখনও ভালো করে কিছু পরীক্ষা করিনি, স্যার।' সুরেশ জবাব দিল, 'আলো ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছি।' তারপর হাতের টর্চটা দেখিয়ে বলল, 'এটা ডলিদের কাছ থেকে ধার করা। এতক্ষণ ধরে—।'

ওর কথায় বাধা দিয়ে কোনও পুণ্য ঘটনার মতো আচমকা জ্বলে উঠল বাড়ির সব আলো। লোডশেডিং উধাও হয়েছে। সুরেশকে বললাম, আমি ল্যাব-ফিঙ্গারপ্রিন্ট-ফটোগ্রাফার—সবাইকে খবর দিয়ে এসেছি। ওরা এখনই এসে পড়বে। ওকে তদন্তের পুরো চার্জ দিয়ে বললাম, আমি নায়ারদের সঙ্গে কথা বলতে ওপরে যাচ্ছি। উত্তরে সুরেশ ঘাড় নাড়ল ছোট্ট করে।

মলিন সবুজ দরজা বন্ধ ছিল। দোতলার এত হট্টগোলেও খোলেনি। একবার বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলেন অনিতা নায়ার। পরনে রঙ জ্বলে যাওয়া হালকা নীল ওভারঅল। বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। সদ্য পদচ্যুত কোনও মিলিটারি অফিসারের মতো অভিব্যক্তি অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ। নরম অস্পষ্ট গলায় আমাকে আহ্বান জানালেন তিনি : 'আসুন, ইন্সপেক্টর—।'

ঘরের ভেতরে পা দিলাম। একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসলাম।

ঘরের পরিবেশ একমাত্র পরিবর্তন, আমার সামনে, টেবিলে, একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা জ্বলন্ত লাল রঙের মোমবাতি। লোডশেডিং কেটে গেলেও বেচারার আগুন নেভানো হয়নি। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলাম।

অনিতা নায়ার দরজা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি এসে বসলেন, ক্লান্ত সুরে বললেন, 'এবার আমাদের না খেয়ে মরতে হবে, ইন্সপেক্টর বরাট। দিনের পর দিন বাড়িটার দুর্নাম এভাবে বাড়তে থাকলে, এ-বাড়িতে আর কেউ আসবে না। ইস, মেরি বেচারিও...।'

চোখের কোণে জল না দেখা দিলেও অনিতার মুখে ক্লিষ্টভাব ফুটে উঠেছে। বলিরেখার সংখ্যা যেন খুনের সংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে গেছে। শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে অনিদ্রিত বৃদ্ধের একটানা প্রলাপ। এবং তাতে বিলাপের সুরই প্রাধান্য পেয়েছে।

অবাক হলেও শান্ত গলায় জিগ্যেস করলাম অনিতাকে, 'আপনার স্বামীর সঙ্গে লিলি-মেরি ওদের যে একটা বাজে সম্পর্ক ছিল তা আপনি জানেন?' মনে আশা, যদি আসল ঘটনা জানা যায়।

BanglaBook.org

পলকের জন্যে কেঁপে উঠলেন অনিতা। চাপা ঠোঁটের ফাঁকে জবাব দিলেন, 'না—' একটু থেমে : 'কী বাজে সম্পর্ক?' আমাকে কি উলটে বাজিয়ে নিতে চাইছেন?

'মিস্টার নায়ারের সঙ্গে গোপনে একজন দেখা করতে আসত। তাকে কেউ দেখেনি। মেরি শুধু কথা শুনেছে।' অনিতার মনে খবরটা সিঞ্চনের সময় দিলাম : 'আপনি লোকটাকে চেনেন?'

'না, কাউকে দেখিনি—।'

'অজিত শুক্লা আপনার বান্ধবীর ছেলে? ওকে লিলি চাকরি দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ—আমিই বলেছিলাম।' সংক্ষিপ্ত ক্রমিক উত্তর। অথচ উনি বলেছিলেন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কেউ নেই ওঁদের।

'কাল্লুকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি।' এ-সংবাদের কোনও প্রতিক্রিয়া পেলাম না অনিতার কাছে। অতএব পরের অনুরোধটা করে ফেললাম, 'মিসেস নায়ার, আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই...।'

চশমাটা চোখ থেকে খুলে টেবিলে রাখলেন অনিতা। দু-হাতের তালু মুখে ঘষে ইশারায় সুদর্শন নায়ারের দরজাটা দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, '...একলা চলো রে...।' আমি বাধ্য ছেলের মতো নীরবে উঠে পা বাড়ালাম নায়ারের হসপিটাল-ঘরের দিকে।

বুকে চাদর ও চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে ছিলেন সুদর্শন নায়ার। অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে কী যেন বিড়বিড় করছেন। আমার পায়ের শব্দ ওঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না। কাছে গিয়ে বললাম, 'মিস্টার নায়ার, মেরি কৃষ্ণমূর্তি খুন হয়েছে একটু আগে। গলায় গিটারের তারের ফাঁস দিয়ে লিলির মতোই কেউ ওকে খুন করেছে—।'

প্রলাপ স্তব্ধ হল। চোখের ওপর থেকে ধীরে-ধীরে সরে গেল হাতের আড়াল। নায়ার মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন আমার দিকে। ওঁর চোখ এই মুহূর্তে সর্বহারা, এই ঘরটার চেয়েও বিষণ্ণ। নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে ওঁকে সময় দিলাম।

মিনিটখানেক পর দুর্বল স্বরে উনি উচ্চারণ করলেন, 'ইন্সপেক্টর?'

উত্তরে বললাম, 'মিস্টার নায়ার, মেরি কৃষ্ণমূর্তি মারা যাওয়ার আগে একটা বিচিত্র খবর দিয়েছিল আমাকে। দিন সাত-দশ আগে নাকি কেউ একজন দেখা করতে এসেছিল আপনার সঙ্গে। রাতে। তাকে আপনি উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, তার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনার কাছে সে মৃত। তার উপকারে-উপকারে আপনি ক্লান্ত—আরও অনেক কথা। সবই বাইরে থেকে শুনতে পেয়েছিল মেরি।' উৎকণ্ঠা ও সন্ত্রাসের লুকোচুরি নায়ারের শ্রান্ত মুখে : 'কে সেই লোক?'

দ্বিধা। আশঙ্কা। একরোখা ভাব। এই তিনটে অভিব্যক্তি পর্যায়ক্রমে খেলে গেল সুদর্শন নায়ারের ঘোলাটে চোখে। উনি নীরব রইলেন।

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম : 'নায়ার, আপনি ও আপনার স্ত্রী, দুজনে মিলে যেভাবে আমার সঙ্গে চালাকি করছেন তাতে অন্য কেউ হলে অন্য ব্যবস্থা নিত। কোনও প্যারালাইজড বুড়োকে থানায় নিয়ে গিয়ে পিঠের চামড়া তোলাটা আমার ধাতে আসে না। দিনের পর দিন একটার পর একটা মেয়ে এভাবে খুন হয়ে যাবে, তবু আপনি চুপ করে থাকবেন? চুপ করে থাকলেই কি সব গোপন থেকে যাবে?' মাথা নাড়লাম আমি : 'উহুঁ, মোটেই না। আপনাদের অনেক খবরই আমি জানি—' উত্তর দেওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ সময় দিলাম ওঁকে।

BanglaBook.org

কিন্তু সুদর্শন নায়ার তবুও নিশ্চুপ। দু-চোখে অতলান্ত দুশ্চিন্তার ছায়া। যেন ভীষণ দুরূহ কোনও জটিল হিসেব মনে-মনে মেলাতে চেষ্টা করছেন।

এবার ওঁকে আঘাত দিলাম। প্রশ্ন করলাম শান্ত স্পষ্ট স্বরে, 'অনিতা নায়ারকে কবে থেকে পুষছেন? ছবির বইয়ের মতো ওঁকেও কি কাল্লু জোগাড় করে দিয়েছিল?'

বজ্রপাতের শ্রেণীবিভাগ আমার জানা নেই। তবু মনে হল, এ-বজ্রপাত চরিত্রে তীব্র, পরিণতিতে ভয়ঙ্কর।

নায়ার কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসলেন। গায়ের চাদর খসে পড়ল কোমরের কাছে। ঘোলাটে চোখ উজ্জ্বল হতে চাইল। অথর্ব পেশি আকুল চেষ্টায় হয়ে উঠল কঠিন। তবু উনি চুপ করে রইলেন।

আমি অনুমানে ভর করে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলাম : 'লিলি-মেরি, ওদের নিয়ে কী নোংরামি আপনি করেছেন সবই আমরা জানি!'

তবু নিশ্চুপ।

'বেশ, আপনি যা ভালো বোঝেন—' গম্ভীর স্বরে বললাম, 'তবে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে যাই। খুনির কাছে এখনও তিনটে তার রয়েছে। একে-একে ডলি-চন্দা-কবিতাকে খুন করবে সে। টেলিফোনে আমাকে সে এ-কথা বলেছে। তখন এ-বাড়ি শ্মশান হয়ে যাবে। আপনি আর অনিতা একা বসে সেই শ্মশান পাহারা দেবেন।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে, 'যাওয়ার আগে একটা শেষ প্রশ্ন : রীনা নামে কাউকে চেনেন? খুনির কথা অনুযায়ী সে এই মেয়েটাকে গলা টিপে খুন করেছিল—।'

সবরকম প্রতিক্রিয়া একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুদর্শন নায়ারের চোখে-মুখে। তাঁর পেশি আবার শিথিল হল। চোখ হল ঘোলাটে। ভাঙা গলায় বারকয়েক বললেন, 'রীনা! রীনা!... ওঃ!' তারপর, 'আপনি কী করে জানলেন, ইন্সপেক্টর...ওটা এক পুরোনো অ্যাকসিডেন্ট...' কথার রেশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল। সুদর্শন নায়ার আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। মৃদু স্বরে বললেন, 'ইন্সপেক্টর বরাট, আমাকে একটু ভাবতে দিন। একটু একা থাকতে দিন। প্লিজ, লিভ মি অ্যালোন। প্লিজ...।'

সুদর্শন নায়ারের বয়েস এখন তিনশো পঁচাত্তর। ওঁকে দেখে আমার করুণা হল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। মনে দুশ্চিন্তার ঢেউ তোলপাড় করে চলেছে। রীনাকে চেনেন সুদর্শন? ওকে জড়িয়ে কি কোনও দুর্ঘটনা হয়েছিল? 'ওটা একটা পুরনো অ্যাকসিডেন্ট' এ-কথার মানে কী? এটুকু বুঝলাম, এসব প্রশ্নের উত্তর সুদর্শন নায়ারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। অন্তত এই মুহূর্তে।

অনিতা নায়ারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কানে এল, ভেতরের ঘরে আক্ষেপে-ভরা দুরন্ত প্রলাপে ভেঙে পড়েছেন সুদর্শন নায়ার। এই অনুতাপের অজানা কারণ আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

BanglaBook.org

অন্তর্দৃশ্য

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করলেন অনিতা নায়ার। চোখের চশমা এখনও টেবিলে বিশ্রামরত। সেইজন্যেই হয়তো সবকিছু ওঁর ঝাপসা লাগছে। পাশের ঘরে সুদর্শন নায়ারের প্রলাপ

এখন হা-হা বিলাপে পরিণত হয়েছে। শ্লথ পায়ে ভেতরের ঘর লক্ষ করে রওনা হলেন অনিতা। মানুষটা একেবারে ভেঙে পড়েছে।

সুদর্শন এখনও চোখে-মুখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছেন। অনিতা যে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন দেখতে পাননি। টের পেলেন অনিতার কান্না-ভেজা কণ্ঠস্বরে, 'আর কতদিন তোমার জন্যে আমাকে লোকের কাছে মিথ্যে বলতে হবে? কতদিন?' তারপর মুখে হাত গুঁজে ভাঙাচোরা স্বরে : 'সত্যি কোনওদিন চাপা থাকে? দ্য ট্রুথ স্পিল্‌স—অলওয়েজ...।'

ধীরে-ধীরে চোখ থেকে হাত সরালেন সুদর্শন। তাঁর শরীর যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ক্লিষ্টতা ছিনিমিনি খেলছে তাঁকে নিয়ে। বললেন নিচু পরদায়, 'স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি অনেক অন্যায় করেছি, নিতা। আজ...আজ কারও কাছেই আর কিছু গোপন রাখব না...' একটু থেমে বারদুয়েক ঢোক গিলে : '...আচ্ছা, কাউকে বলে একজনকে একটু খবর দেওয়া যাবে?'

'কানু হয়তো রাস্তায় আছে। পুলিশ ওকে ছেড়ে দিয়েছে। ও যেতে পারে।' মুখে প্রশ্ন ফুটিয়ে : 'কিন্তু কাকে এখন খবর পাঠাবে তুমি?'

'এখন নয়, এখন নয়,' আত্মগতভাবে বললেন নায়ার, '...আগে নীচের তলায় পুলিশি ঝামেলা কমে আসুক...তারপর। আরও রাত হোক। লেট ডার্কনেস প্রিভেইল। তখন...তখন আমি সবকিছুর বোঝাপড়া করব...হেস্তনেস্ত করব। আই উইল ফিনিশ দ্য হোল বিজনেস! বাই গড, আই উইল!' এবার দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুলেন, সুর্দশন, বিলাপের সুরে বলতে লাগলেন, 'রীনা! ওঃ, রীনা...তুমি জানো না, সেদিন কী বীজ তুমি পুঁতেছিলে...ওঃ..।'

স্তব্ধ অনিতা চিত্রকরের শিল্পকলা হয়ে দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে। এতদিনেও সুদর্শন নায়ারকে চিনে উঠতে পারেননি তিনি। বুঝতে পারেননি, ওঁর ওই শীর্ণ পাঁজরে কত দুঃখ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বন্দি হয়ে রয়েছে।

বারো

বিছানায় শুয়ে পড়লেও মনটা আমার বিক্ষিপ্ত ও বহুমুখী সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য চিন্তায় দাপাদাপি করছে। বারবারই চোখের সামনে ভেসে উঠছে মেরি কৃষ্ণমূর্তির বিষণ্ণ মেঘলা মুখ। এবং সুদর্শন নায়ারের আঁকিবুকির ঘন বুনটে ঠাসা মুখমণ্ডল। মনে হচ্ছে, এই নৃশংস হত্যা-রহস্যের প্রধান চাবিকাঠি রয়েছে তাঁর কাছে। অথচ যে-কোনও কারণে হোক, তিনি ঠোঁট বন্ধ করে বসে আছেন।

রুটিন তদন্তে ও প্রাথমিক ইন্টারোগেশানে আমি যতটা সম্ভব সুরেশকে সাহায্য করে এসেছি। ওকে বলেছি, সাতান্ন নম্বর বাড়ি ঘিরে সাদা পোশাকে চব্বিশ ঘণ্টা ওয়াচ রাখতে। মেরি কৃষ্ণমূর্তির ক্ষেত্রে খুনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে, এবারে যেন কোনওরকমেই সেটা পেরে না ওঠে। বিপদের ভয় এখন আরও বেড়ে উঠেছে। অতএব সন্দেহভাজন কোনও লোককেই যেন রেহাই না দেওয়া হয়। ওকে আরও বলেছি,

BanglaBook.org

কোনওরকম প্রয়োজন হলেই আমাকে বাড়িতে ফোন করে খবর দিতে—যত রাতই হোক না কেন।

হয়তো সেই কারণেই আমার মন বিক্ষিপ্ত। শরীর ক্লান্ত হলেও ঘুম আসছে না। অবচেতন মনের কোণে ক্ষীণ আশা : এখনই সুরেশের ফোন আসবে।

রাত ঠিক সাড়ে দশটায় ওর টেলিফোনটা পেলাম।

নিমেষে বিছানা ছেড়ে আমি উঠে পড়েছি এবং টেলিফোন তুলে নিয়ে সাড়া দিয়েছি। ও-প্রান্ত থেকে সুরেশ নন্দা চাপা গলায় বলল, 'থিঙ্ক উই গট হিম, বস্! এক্ষুনি একবার চলে আসবেন?'

'তাই নাকি! কী ব্যাপার?'

'এইমাত্র একটা লোককে আমরা সাতান্ন নম্বরে ঢুকতে দেখেছি। সবাইকে বলা আছে বাড়ির কোনও ফ্ল্যাটে কেউ ঢুকলে বাধা না দিতে।'

'চিনতে পারলে লোকটাকে?'

'না। চোখে চশমা। মাথায় কাপড়ের টুপি। অনবরত রুমালে মুখ ঘষছিল। এ ছাড়া অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায়নি। আপনি চলে আসুন তা হলে—কুইক!'

'আসছি,' টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

পোশাক পরে তৈরি হয়ে ০.৩৮ পুলিশ স্পেশালটা শোল্ডার হোলস্টারে গুঁজে নিতে আমার সময় লাগল পনেরো সেকেন্ড। ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসে আমার বুলেট টু-হুইলারে চড়ে বসলাম। স্টার্ট দিলাম। ছোট্ট করে বললাম, 'উড়িয়ে নিয়ে চল।' রাতের নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত করে আমার সিঙ্গল সাইলেন্সার লাগানো বুলেট হাওয়ার গতিতে ছুটে চলল।

কে এসেছে সাতান্ন নম্বর বাড়িতে? সে কি ফ্ল্যাটের কোনও 'গেস্ট'? না কি সেই রহস্যময় ব্যক্তি—যার সঙ্গে নায়ারকে কথা বলতে শুনেছিল মেরি? এত রাতে সে কেন এসেছে নায়ারদের ফ্ল্যাটবাড়িতে? এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই আগন্তুককে আমরা চিনি না। আমাদের তালিকায় এর নাম নেই।

হয়তো অকুস্থলে পৌঁছলেই সব প্রশ্নের জবাব পাব।

BanglaBook.org

অন্তর্দৃশ্য

কলিংবেল থাকা সত্ত্বেও দরজায় কেউ সতর্ক ভঙ্গিতে নক করল পরপর দু-বার। একটু থেমে আরও দু-বার। বাইরের ঘরে আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন অনিতা নায়ার। চমকে উঠলেন নক করার শব্দে। তা হলে কি সে এল?

আধঘণ্টা আগে কানুকে ডেকে এনেছেন মিসেস নায়ার, পৌঁছে দিয়েছেন সুদর্শনের ঘরে। সুদর্শন কানুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চেয়েছেন। বেরিয়ে এসেছেন অনিতা। চুপিচুপি কী কথা হয়েছে দুজনে, তা শুনতে পাননি। শুধু অপেক্ষা করেছেন বাইরের ঘরে। একটু পরেই বেরিয়ে এসেছে কানু। হাতে একটা চিরকুট। মিসেস নায়ারকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলে ও বেরিয়ে গেছে ফ্ল্যাট ছেড়ে। তারপর থেকে রাজ্যের উৎকণ্ঠা নিয়ে

প্রতীক্ষায় থেকেছেন অনিতা। বুকের ভেতরে প্রাণান্তকর শব্দ তুলে ছুটে চলেছে হৃৎপিণ্ড। আর শুনতে পেয়েছেন সুদর্শনের বিলাপ মেশানো হাহাশ্বাস।

এতক্ষণে ওঁদের প্রতীক্ষা শেষ হল।

চেয়ার ছেড়ে ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন অনিতা। তারপর শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেলেন দরজা খুলতে।

সতর্ক ও ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সে ঢুকে পড়ল ঘরে। দরজাটা নিজেই বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। চাপা কর্কশ স্বরে বলল অনিতাকে, 'আলোটা নিভিয়ে দিন। আর...দরজা খুলবেন না...।'

অনিতা অবাক চোখে তাকে দেখলেন। আগন্তুক তাঁর অচেনা। চোখে চশমা, সরু কাঁচাপাকা গোঁফ...স্মৃতির মণিকোঠা অনেক হাতড়েও এরকম কোনও মুখের আদল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিরুত্তাপ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে অনিতার দিকে একপলক দেখল সে। হাতের নখ কাটতে লাগল দাঁতে। তারপর রওনা হল সুদর্শন নায়ারের ঘর লক্ষ্য করে।

অনিতার কৌতূহলী চোখ তাকে অনুসরণ করল শেষ পর্যন্ত। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে আবার স্থবিরের মতো বসে রইলেন তিনি।

সুদর্শন নায়ার আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে। আসন্ন কোনও দ্বৈরথের জন্যে যেন প্রস্তুত করে রেখেছেন নিজেকে।

আগন্তুক ঘরে ঢুকতেই ওঁদের চোখাচোখি হল। যেন দুটো ঠান্ডা ইস্পাতের বর্শায় নীরব সংঘর্ষ হল। সুদর্শন নায়ারের ঘোলাটে চোখের বয়েস এখন অনেক কমে গেছে। ফুটে উঠেছে একরোখা ভাব।

এইভাবেই পল-অনুপল কেটে যায়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নীরব।

অবশেষে সে মুখ খুলল, 'এত রাতে...চিঠি দিয়ে...ডেকে পাঠিয়েছ কেন?...জানো না, এখানে আসতে এখন কত বিপদ?' তার দু-চোখ সিঁদুরের মতো লাল। চোখের কোল ফুলে উঠেছে। চশমার কাচে প্রতিফলিত হয়েছে ঘরের একমাত্র নগ্ন বাল্‌ব। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগল আবার। বলল, 'শুধু তুমি ডেকেছ বলেই এসেছি...তোমার বিপদে...।'

কঠিন স্বরে তাকে বাধা দিলেন নায়ার, 'আমার কথা তুমি তা হলে শুনবে না?'

ঘরের একমাত্র চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল সে : 'তোমাকে...তোমাকে এই বিপদের মাঝে ফেলে আমি যাই কী করে?'

নায়ার শব্দ করে সংক্ষিপ্ত হাসলেন। বললেন তাচ্ছিল্যের সুরে, 'বিপদ? কীসের বিপদ?'

মাথা নিচু করল সে। অস্ফুট স্বরে বলল, 'সে তো তুমি...জানো...।'

'লিলি জনসনের পর মেরি কৃষ্ণমূর্তি খুন হল—' নায়ারের কথায় কোনও অনুযোগের সুর নেই। শুধু যেন সত্যের পুনরাবৃত্তি।

চেয়ারের ওপর শরীরটা মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল। দু-হাতে মুখ ঢাকল ঝুঁকে পড়ে : 'ওরা... ওরা খারাপ মেয়ে ছিল। তোমাকে...তোমাকে স্ট্রিপটিজ করে দেখিয়েছিল। তোমাকে খারাপ করে দিচ্ছিল। আমি নিজে দেখেছি। এ-বাড়ির...এ-বাড়ির সবক'টা মেয়েই খারাপ। দ্য হোল লট!' একটু থেমে মুখ তুলল সে, বলল, 'তিনটে এখনও বাকি।'

BanglaBook.org

সুদর্শন নায়ারের ধৈর্য ক্রমশ নিঃশেষ হচ্ছিল। গলার স্বর উঁচু পরদায় তুলে বললেন, 'কতবার তো বলেছি, আমার ভালো-খারাপ তোমাকে দেখতে হবে না! রীনার বেলাতেই হয়তো তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতাম, কিন্তু পালিয়ে গিয়ে তুমি নিজের প্রাণ বাঁচালে। তা ছাড়া—তা ছাড়া, আমিও স্নেহে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।' নায়ার বড়-বড় শ্বাস নিয়ে এখন হাঁফাচ্ছেন ঃ 'কিন্তু তুমি আবার কেন ফিরে এলে আমার কাছে? আমাকে ধ্বংস করতে?'

'না, তোমাকে বাঁচাতে। এইসব নোংরা মেয়েগুলোর হাত থেকে বাঁচাতে। রীনার বেলায় যেমন...বাঁচিয়েছিলাম।'

পাগলের মতো হেসে উঠলেন সুদর্শন। দুরন্ত রাগে তাঁর জীবনীশক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে। হাসতে-হাসতেই বললেন, 'কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই না। এতবার বলেছি, তবু সে-কথা তোমার কানে ঢোকে না? এই দ্যাখো—' বালিশের পাশে ব্যস্তভাবে হাতড়াতে লাগলেন সুদর্শন। অবশেষে খুঁজে পেলেন চটি বইগুলো। সেগুলো উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'দ্যাখো, এগুলো কী!' চেয়ারে বসা লোকটিকে দেখিয়ে একে-একে ছবিগুলো মেলে ধরতে লাগলেন ঃ 'এগুলো আমি রোজ দেখি। রেলিশ করি। আমার দারুণ লাগে। তুমি পেরেছ আমাকে বাঁচাতে? সিলি একসেনট্রিক কিড!'

চশমা পরা শরীরটা কেঁপে উঠল সর্পস্পৃষ্টের মতো। ঠোঁট দুটো থরথর কেঁপে উঠল কিছু বলতে। যেন অনেক চেষ্টায় ডুকরে উঠল, 'আই...আই ওয়ান্টেড টু সেভ য়ু...।'

'সেভ মি মাই ফুট!' থুতু ফেলার মতো কথাগুলো ছিটিয়ে দিলেন সুদর্শন নায়ার। একই সঙ্গে হাতে ধরা বইগুলো অধৈর্য ক্রোধে অবিশ্বাস্য তীব্রতায় ছুড়ে মারলেন তাকে লক্ষ করে। পাখা ঝাপটে তীর-বেঁধা পাখির মতো বইগুলো উড়ে গিয়ে আঘাত করল তার মুখে-বুকে-হাতে। তারপর ছিটকে পড়ল মেঝেতে। বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠা খুলে গিয়ে প্রকাশিত হল এক অশ্লীল চিত্র-প্রদর্শনী।

ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসে ঠিকরে আসা লাল চোখ নিয়ে সেগুলো দেখল সে। এক বিচিত্র জান্তব কান্নায় ডুকরে উঠল। আবার মুখ ঢাকল দু-হাতে। কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'তা হলে...তা হলে আমি হেরে গেছি! তোমাকে আমি বাঁচাতে পারিনি! ভালো রাখতে পারিনি! ওঃ...আই কুড্‌ন্ট বিলিভ ইট! তুমি—তুমি এইসব বই দ্যাখো...কে তোমাকে এসব বই দেখতে শিখিয়ে তোমার সর্বনাশ করেছে? বলো! তোমাকে বলতেই হবে!' এবার সে দু-হাত দু-পাশে ঝুলিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখমুখ এখন বিকৃত বীভৎস। প্রতিটি পেশি পাথর। সে আবার প্রশ্ন করল ভাঙা কর্কশ গলায়, 'কে শিখিয়েছে, বলো? তুমি না বললে আমি—আমি—মিসেস নায়ারকে জিগ্যেস করব। আই উইল আস্ক ইওর ওয়াইফ!' মুখে তার বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

ছোট্ট ঘরে সুদর্শন নায়ারের উন্মত্ত হাসি উথাল-পাথাল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাঁর হলদে দাঁত এক হিংস্র চরিত্র এনে দিল সেই হাসিতে। তার অবাক চঞ্চল অশ্রুলিপ্ত চোখের সামনে নায়ার হেসেই চললেন। হাসতে-হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কে আমার ওয়াইফ? অনিতা? দ্যাট্‌স দ্য বিগ জোক! ও আমার বিয়ে করা বউ নয়। রক্ষিতা। এ-বাড়ির খারাপ মেয়েগুলোর ম্যাডাম। শি ইজ

BanglaBook.org

জাস্ট অ্যানাদার প্রসটিটিউট—লাইক দেম!' আবার হাসতে শুরু করলেন সুদর্শন নায়ার : 'এবারে বুঝেছ, আমাকে বাঁচানো তোমার কর্ম নয়? আমি ছবির বই দেখি, স্ট্রিপটিজ দেখি, বেশ্যা নিয়ে ঘর করি—আমি যে নিজেই খারাপ হয়ে যেতে চাই! খারাপ হয়ে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পেতে চাই।' সুদর্শনের স্বর এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চোখ হয়ে এসেছে ঘোলাটে। বিরক্ত স্বরে বললেন, 'রীনার বেলায় তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি। লিলির বেলাও চুপ করে থেকেছি। কিন্তু মেরির ঘটনার পর দেখলাম তোমাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। অ্যান্ড দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং! আরও জেনে রাখো, ওই খারাপ মেয়েগুলোর কোনও দোষ নেই, সব দোষ আমার। সুতরাং আর কারও ভালো তোমাকে করতে হবে না। এখন বেরিয়ে যাও, কোনওদিন আর এখানে এসো না। আর যেন তোমার মুখ না দেখতে হয় আমাকে। লিভ মি অ্যালোন অ্যান্ড গেট লস্ট ফ্রম মাই লাইফ।... এইজন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।' তারপরই খুব সহজ গলায় বললেন, 'দাও, ওই বইগুলো তুলে আমার হাতে দাও। অনেকক্ষণ ভালো করে দেখা হয়নি—।'

বিরক্তি ও ক্লান্তির ফলেই শেষ কথাগুলো বলতে-বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সুদর্শন নায়ার। সেই কারণেই খেয়াল করেননি কখন সে একজোড়া কালো দস্তানা হাতে পরে নিয়েছে। এবং সেই দস্তানা পরা হাতে উঠে এসেছে একটা সরু গিটারের তার।

সুদর্শন প্রথম দেখতে পেলেন সাদা পরচুলাটা। তার বের করতে গিয়ে যেটা আগন্তুকের অসাবধানে পকেট থেকে খসে পড়েছে মেঝেতে—অশ্লীল ছবির বইগুলোর পাশে।

চোখ তুলে তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন সুদর্শন নায়ার। মাথার কাপড়ের টুপিটা এখন সে খুলে ফেলেছে, ঝুঁকে পড়ে তুলে নিয়েছে সাদা পরচুলাটা। মাথায় ঠিকমতো পরে নিয়েছে। তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ কুঁচকে শব্দ করে থুতু ফেলেছে মেঝেতে পড়ে থাকা ছবির বইগুলোর ওপর।

দস্তানা পরা হাতের পিঠ দিয়ে সে চোখের জল মুছে নিতে চাইল। মুখে ফুটে উঠল স্থির প্রতিজ্ঞা। গিটারের চার নম্বর তারটা টানটান হয়ে গেল দুই বলিষ্ঠ হাতের শক্তিতে। ভাঙা কর্কশ স্বরে চিবিয়ে-চিবিয়ে সে বলে উঠল, 'ও, সব তা হলে ওই চারচোখো মাগীটার কাণ্ড! গাছের গোড়া না কেটে এতদিন আমি শুধু ডালপালা ভেঙে এসেছি! কোথায় অনিতা, তোমার বেশ্যারানি?' পিছনে ফিরে তাকাল সে। এবং চোখাচোখি হল অনিতা নায়ারের সঙ্গে।

কৌতূহল অনেক আগেই অনিতা নায়ারকে টেনে এনেছে সুদর্শনের ঘরের দরজায়। তারপর থেকে দাঁড়িয়ে যেসব কথা তিনি শুনেছেন তাতে নিজের কানের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। সুতরাং গিটারের তার হাতে সাদা-চুল লোকটা যখন তাঁর দিকে আগুন-চোখে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, তখন অনিতা বিস্ময়ে নিথর, নিশ্চল।

সে যখন আহত হিংস্র চিতার মতো অনিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি প্রতিরোধহীন, স্তম্ভিত। ভাবতেই পারছেন না, এ-ঘটনা সত্যি-সত্যিই তাঁর জীবনে ঘটছে।

BanglaBook.org

অনিতা নায়ারের চশমা চোখ থেকে ছিটকে পড়ল। প্রচণ্ড শব্দে দুটো শরীর আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

সুদর্শনের চোখের সামনেই শুরু হল ধস্তাধস্তি। চিৎকার।

সুদর্শনের প্রাথমিক বিমূঢ় ভাবটা গেল অনিতার বীভৎস আর্তনাদে। বিগত পনেরো বছরের সুদীর্ঘ সহ-বাসের পর তিনি দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, নিজের প্রাণ বাঁচাতে অনিতার পক্ষে এমন তীব্র চিৎকার করা সম্ভব। পাগলের মতো বালিশের আশেপাশে হাতড়াতে লাগলেন সুদর্শন। ভাঙা গলায় আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট! আই সে, স্টপ ইট!'

সমস্ত হুড়োহুড়ির শব্দ ছাপিয়ে তিনি শুনতে পেলেন ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজায় অবিশ্বাস্য দ্রুত ছন্দে অনেকগুলো হাত একসঙ্গে ধাক্কা মারছে ।

শরীরের সবরকম ত্রৈবশক্তি জড়ো করে আবার চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'স্টপ ইট! হেল্প! হেল্প!'

দরজার ধাক্কা পাগল-করা লয়ে বেড়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কোল্ট অটোমেটিকটা খুঁজে পেলেন সুদর্শন। তাঁর চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত, চুল এলোমেলো।

অনিতার চিৎকার এখনও থামেনি, তবে গলার স্বর অনেক কর্কশ, পুরুষালী হয়ে গেছে। চেতনায় ফিরে আপ্রাণ শক্তিতে যুঝে চলেছেন তিনি। হাঁ করে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন।

গায়ের চাদর সমেত বিছানা থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়লেন সুদর্শন নায়ার। একটা ভোঁতা শব্দ হল। রিভলবারটা ছিটকে গেল হাত থেকে। কোনওরকমে মাটি আঁকড়ে এগিয়ে সেটা আবার ডান হাতের মুঠোয় ফিরে পেলেন তিনি। আলুথালু পোশাকে শুধু হাতের জোরে হামা দিয়ে সরীসৃপের মতো যুযুধান দুই শরীরের আরও কাছে এগিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে অনিতা নায়ারকে চিৎ করে ফেলে সে উঠে বসেছে ওঁর বুকে। চোখের নকল চশমা খুলে পড়ে গেছে। ভেঙেও গেছে শরীরের চাপে। মাথার পরচুলা সরে গিয়ে আংশিক প্রকাশিত। অনিতার মুখে থুতু ছিটিয়ে সে বলল, 'য়ু বিচ! কী সাহস! আমার বাবাকে নষ্ট করিস!... হাউ ডেয়ার য়ু স্পয়েল মাই ড্যাড! তোকে—।'

কথা শেষ হল না। সে ছিটকে গিয়ে সশব্দে পড়ল হাত তিনেক দূরে মেঝেতে। কারণ, কানফাটানো শব্দে ঘর কাঁপিয়ে গর্জে উঠেছে সুদর্শনের হাতের কোল্ট অটোমেটিক। গুলি গিয়ে লেগেছে সরাসরি তার বুকে। কালো জামাটা ভিজে উঠেছে রক্তে। কাঁচাপাকা নকল গোঁফ ঘামে ও ধস্তাধস্তিতে সরে গেছে বাঁ-চোয়ালের ওপর। সাদা পরচুলা খসে পড়েছে মেঝেতে। এখন তাকে আরও স্পষ্ট চিনতে পারলেন সুদর্শন নায়ার। লিলি জনসন, মেরি কৃষ্ণমূর্তি ও তাঁর স্ত্রী রীনা নায়ারের হত্যাকারী, তাঁর একমাত্র সন্তান—বর্তমানে যার নাম অজিত শুক্লা।

অনিতা নায়ারের চিৎকার থেমে গিয়ে এখন শুধু অস্ফুটে হেঁচকি তুলছেন তিনি। শরীরটা থেকে-থেকে কাঁকুনি দিয়ে উঠছে। দু-চোখে শূন্য দৃষ্টি।

রিভলভার ফেলে দিয়ে 'নিতা! নিতা!' বলে ডাকতে-ডাকতে হামাগুড়ি দিয়ে

BanglaBook.org

এগিয়ে গিয়ে ওঁর শুয়ে থাকা বিধ্বস্ত দেহটা আগলে ধরলেন সুদর্শন। ধোঁয়ায় চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। চোখ জ্বলছে বারুদের গন্ধে।

দরজায় ধাক্কা দেওয়ায় শব্দ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হয়ে একসময় বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল কাঠের দরজা। শোনা যাচ্ছে, চিৎকার ও কথাবার্তার সঙ্গে অনেকগুলো ভারী পায়ের শব্দ ছুটে আসছে সুদর্শনের ঘর লক্ষ্য করে...।

যবনিকাপাত

দরজা ভেঙে পড়তেই উন্মুক্ত রিভলভার হাতে ঘরে ঢুকলাম আমি ও সুরেশ। পেছনে দুজন কনস্টেবল।

বন্ধ দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে ভেতরের সব কথাই প্রায় শুনতে পেয়েছি। অবাক হলেও ভাবিনি নাটকের শেষ দৃশ্য এই পরিণতি ডেকে আনবে। তা ছাড়া, পুরোনো দরজার প্রতিরোধ-ক্ষমতা আমাদের অপ্রস্তুত ও দেরি করে দিয়েছে।

বাইরের ঘরটা অন্ধকার। সংক্ষিপ্ত আদেশে একজন কনস্টেবলকে আলো জ্বালতে বলে আমরা তিনজন ছুটে গেলাম সুদর্শন নায়ারের ঘর লক্ষ্য করে—নাটকের প্রকৃত মঞ্চে।

ঘরের দৃশ্য নিঃসন্দেহে করুণ।

সুদর্শন নায়ার অসংবৃত পোশাকে ও চেহারায় অনিতা নায়ারের বিবশ শরীরের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছেন। এবং অদৃষ্টপূর্ব আবেগে আকুল হয়ে হাউহাউ করে কাঁদছেন ছোট শিশুর মতো। বিছানার ময়লা চাদর ও কয়েকটা অশ্লীল ছবির বই মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। বইয়ের খোলা পাতায় রক্তের ছিটে।

সুদর্শন ও অনিতা নায়ারের কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে অজিত শুক্লা। মুখটা হাঁ করা। দু-চোখ নির্বাক বিস্ময়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে। ঠোঁটের কোণে বিজ্ঞাপনের হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে রক্তের রেখা। দস্তানা পরা দু-হাতে গিটারের তারটা এখনও শিথিল ভঙ্গিতে ধরা রয়েছে। বুকের ওপর এক বিশাল ক্ষত। কাউকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, সে মারা গেছে।

ঘরের অবস্থা ভদ্রস্থ করতে কনস্টেবল দুজন আমাদের সাহায্য করল। গায়ে মাথায় জল দিয়ে মিনিটদশেকের মধ্যেই মিসেস নায়ারকে সুস্থ করে তুলল সুরেশ নন্দা। নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

আমি সুদর্শন নায়ারকে পরিপাটি করে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। রিভলবার ও চাদর মেঝেতেই পড়ে রইল। চাদরে রক্তের দাগ লেগেছে।

সুরেশকে বললাম, 'ডক্টর সকসেনা, ল্যাব—সবাইকে খবর দাও। ইমার্জেন্সি। আমি এ-দিকটা সামলাচ্ছি।'

সুরেশ নীরবে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থেকে ক্ষীণ স্বরে অনিতার কথা জিগ্যেস করলেন সুদর্শন। বললাম, উনি পাশের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'মিস্টার নায়ার, অজিত

BanglaBook.org

শুক্লা এত রাতে আপনার কাছে এসেছিল কেন?'

'আমারই দোষ, ইন্সপেক্টর।' মাথার চুলে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'আমিই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সাবধান করে দেওয়ার জন্যে।'

আমি চুপ করে রইলাম। সুদর্শন নায়ারকে বলতে সময় দিলাম।

'বিজয় আমার একমাত্র সন্তান, ইন্সপেক্টর।' আমার মুখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে সুদর্শন বললেন, 'হ্যাঁ, ওকেই আপনারা অজিত শুক্লা বলে জানতেন। লিলির ওপর যে-বিকৃত সুযোগ আমি নিয়েছি, তারপর যদি বলতাম, আমার ছেলেকে একটা চাকরি দিতে হবে, তা হলে ও কখনওই হয়তো দিত না। সেই কারণেই বিজয়কে নতুন নামে, অনিতার বান্ধবীর ছেলে, এই পরিচয়ে লিলির কাছে সুপারিশ করল অনিতা নিজে। কী একটা গল্পও যেন বানিয়ে বলেছিল, ঠিক মনে নেই। তারপর সোনা ট্রাভেল্‌স-এ চাকরিটা ওর হয়ে গেল...' সুদর্শন নায়ার থামলেন।

আমি চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বিজয় নায়ার এখনও ছাদের দিকে অপলকে তাকিয়ে। হঠাৎই মনে হল, বড় অদ্ভুত পরিবেশে আমি ও সুদর্শন একটা মৃতদেহ আগলে বসে আছি।

মৃত বিজয়ের দিকে একনজর তাকিয়ে অসংলগ্ন স্বরে আবার বলতে শুরু করলেন নায়ার, 'আপনি আজ আমাকে রীনার কথা জিগ্যেস করেছেন, ইন্সপেক্টর। কোত্থেকে আপনারা জানলেন বলতে পারি না—।'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'বিজয় নায়ার প্রতিটি খুনের পর টেলিফোন করত লালবাজারে। রীনার কথা ও-ই আমাদের বলে। রীনাকে ও গলা টিপে খুন করেছিল, সে-কথাও বলেছে।'

'ওঃ...বলেছে সে-কথা...আমার জীবনে সেটা এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।' কপালে একটা হাত রাখলেন সুদর্শন নায়ার। শীর্ণ বুক ঠেলে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। বললেন, 'রীনা ছিল আমার স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী। বিজয়ের মা। ও ছিল কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। আনন্দ, ফুর্তি, পার্টি—সোজাকথায় বেপরোয়া জীবন খুব পছন্দ করত। সেই তুলনায় আমি ছিলাম সাদাসিধে মুখচোরা। সারাদিন নিজের ব্যবসা নিয়ে থাকতাম। রীনা কিন্তু ধীরে-ধীরে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এনে দশ বছরের ছেলের সামনেই মদ খাওয়া থেকে শুরু করে সবরকম বেলেল্লাপনা করত। আমি অনেকবার বলেছি, অন্তত ছেলেটার মুখ চেয়ে এসব নোংরামি যেন ও না করে, কিন্তু আমার কথা ও কানেই তুলত না। হেসে উড়িয়ে দিত। আমি দিন-রাত বিজয়কে আগলে লুকিয়ে থাকতে চাইতাম। নিজেরই বাড়িতে থাকতাম চোরের মতো। ছোট্ট বিজয় আমার কষ্ট বুঝত, আমাকে ছেলেমানুষী সান্ত্বনা দিত। আমার চোখে জল এসে যেত, ইন্সপেক্টর।'

চোখ মুছলেন সুদর্শন নায়ার। হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাস নিয়ে জল খেলেন। তারপর, 'বিজয় ক্রমে যুবক হল, আর আমার প্যারালিসিসের প্রাথমিক লক্ষণগুলো পায়ে, হাঁটুতে ক্রমে দেখা দিল। সেইসময় একদিন রীনার উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে বিজয়ের সঙ্গে আমার প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হয়। ও আমাকে বলে রীনার আচরণের ব্যাপারে প্রোটেস্ট করতে। নইলে ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে শাসায়। বিশ্বাস করুন, ইন্সপেক্টর, বিজয় ছিল আমার বেঁচে থাকার একমাত্র উপলক্ষ, একমাত্র কারণ। ও যদি

BanglaBook.org

আমাকে ছেড়ে চলে যায়, তা হলে...' কয়েকবার ঢোক গিললেন সুদর্শন। মুখে অতীতের যন্ত্রণা ফুটে উঠল। বললেন, 'তাই, সেইদিনই রাতে রীনাকে একা পেয়ে প্রতিবাদ করলাম, ওর আচরণের সমালোচনা করলাম। উত্তরে ও ঝুঁকে এল এই পঙ্গু মানুষটার কাছে—' নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকালেন : 'বিদেশি মদের গন্ধ নিশ্বাসে ছড়াতে-ছড়াতে বলল, "তোমার জীবন শেষ হয়ে গেছে, সুদর্শন। কিন্তু আমি তো এখনও ফুরিয়ে যাইনি! তুমি তোমার ওই ন্যাকা ছেলেকে কোলে নিয়ে চুপটি করে বসে থাকো। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না—"

'আমি বললাম, "বিজয় তোমার ছেলে। ওর মুখ চেয়ে অন্তত...।" আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে খিলখিল করে হেসে রীনা বলেছে, "কে আমার ছেলে? দ্যাট ক্রিচার? হুঃ, আমার কোনও ছেলে নেই।" আমি বললাম, "আমাকে এত যন্ত্রণা দিয়ে তোমার কী লাভ?" উত্তরে ও বলেছে, "যন্ত্রণা তো দিইনি। তোমার অক্ষমতাকে আমি করুণা করি। আমার এই রূপ-যৌবন তুমি ব্যবহার করতে পারো না। তাই যারা পারে, তারা করছে। অবশ্য স্বামী হওয়ার সুবাদে দেখতে চাইলে দেখতে পারো—সে-অধিকার তোমার একশোবার আছে।" এই কথা বলে একে-একে সব পোশাক খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়েছে রীনা। বারকয়েক ঘুরপাক খেয়ে বলেছে, "লাইক ইট?" তারপর হাই তুলে পাশের ঘরে রওনা হতে-হতে বলেছে, "যাই, ও-ঘরে সুদীপ্ত আবার হয়তো ইমপেশেন্ট হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দেবে।" সুদীপ্ত—ওর তখনকার বয়ফ্রেন্ড।'

পার্চমেন্ট কাগজের মতো মুখের চামড়ায় হাত ঘষলেন সুদর্শন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'একটা জিনিস আমি টের পাইনি। বিজয় তখন বাড়িতে ছিল, জেগে ছিল। আমার সঙ্গে রীনার কথাবার্তা সবকিছু ও শুনতে পায়, দেখতে পায়। তারপর... তারপর সেই রাতেই, সুদীপ্ত চলে যাওয়ার পর, গলা টিপে রীনাকে খুন করে বিজয়। পাশের ঘরে শুয়ে ধস্তাধস্তির শব্দ আমি শুনেছিলাম, কিন্তু উঠে গিয়ে বাধা দিতে পারিনি এই পঙ্গু শরীরটার জন্যে। আর চিৎকার করে লোক জড়ো করতে পারিনি বিজয়ের প্রতি স্নেহের বশে। মাকে খুন করে ও সেই রাতেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পুলিশকে আমি ওর কথা কিছু বলিনি...এখন বুঝতে পারছি, কত বড় ভুল সেদিন করেছি।

'তারপর থেকে ওর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। মাঝে-মধ্যে খেয়ালখুশিমতো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। বারবার বলত, আমাকে খারাপ মেয়ের সংস্পর্শে ও থাকতে দেবে না। আমাকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে। এটা ওর কর্তব্য। এই কথাগুলো শুনে-শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বেঁচে থাকার ইচ্ছে তখন আমার পুরোপুরি চলে গেছে।

'মাস ছ'য়েক আগে হঠাৎই ও এসে বলল, একটা চাকরি চাই। অনিতার কাছে ওর আসল পরিচয় আমি গোপন রেখেছিলাম। অনিতাকে বললাম, লিলিকে রিকোয়েস্ট করতে। সেই সূত্রে প্রথম লিলির সঙ্গে বিজয়ের পরিচয় হয়। বিজয়ের কথাবার্তা, ব্যবহার এমনিতে খুবই ভদ্র। ভেতরের গোলমালটা বোঝার উপায় নেই। চাকরি পাওয়ার পর লিলি ওকে বারণ করেছিল এ-বাড়িতে আসতে। তাই যখনই ও আসত, একটা টুপি, নকল গোঁফ আর চশমা লাগিয়ে আসত। একদিন লিলি আমার ঘরে ছিল...সে-সময় বিজয় হঠাৎ ঘুরে ঢুকে পড়ে...।'

BanglaBook.org

সুদর্শন নায়ারকে বাধা দিয়ে বললাম, 'তারপর সবই আমাদের জানা...তবে আপনাকে একটা ফর্মাল স্টেটমেন্ট দিতে হবে। সুরেশ নন্দা এলে, সেটা ও নিয়ে নেবে। আর রিভলভারটা সিজ করা হবে...ওটার সত্যিকারের কোনও দরকার নেই আপনার।'

বিষণ্ণ হাসলেন সুদর্শন নায়ার, 'ইন্সপেক্টর, ওই রিভলভার দিয়ে গত পাঁচ বছর ধরে আমি সুইসাইড করতে চেয়েছি। পারিনি। সাহসে কুলোয়নি। কিন্তু আজ অনিতাকে বাঁচাবার মুহূর্তে আমার হাত কাঁপেনি। নিজের ছেলেকে আমি খুন করেছি, নিজের ছেলেকে আমি খুন করেছি—।'

আমি উঠে গিয়ে সুদর্শন নায়ারের থরথর দেহে হাত রাখলাম। ঘরের উৎকট বিকর্ষক দুর্গন্ধ এই মুহূর্তে আর টের পাচ্ছি না।

সুদর্শন নায়ার কান্নাভাঙা স্বরে বললেন, 'বিজয়, হাউ কুড য়ু নো? অনিতা আমার বিয়ে করা বউ নয়, কিন্তু ওকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। সত্যিই তো, কী করে তুই বুঝবি, একটা রক্ষিতাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ছেলেকে গুলি করতে আমার হাত কাঁপবে না? হাউ কুড য়ু নো?' বড়-বড় শ্বাস নিতে তাঁর শীর্ণ বুকের খাঁচা প্রাণপণে ওঠানামা করছে।

যন্ত্রণায় ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন সুদর্শন। চোখের কোণ থেকে জলের ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

দরজায় শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি, সুরেশ নন্দা দলবল নিয়ে ফিরে এসেছে। ওকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি সব সামলাও, আমি চললাম। ঘুমে আমার দু-চোখ ঢুলে আসছে—।'

বেরিয়ে আসছি, হঠাৎই সুরেশ পিছু ডাকল।

ঘুরে তাকিয়ে দেখি, মেঝেতে পড়ে থাকা সাদা পরচুলাটা ও দু-আঙুলে তুলে নিয়েছে। ভুরু কুঁচকে বলল, 'অজিত শুক্লা সাদা রঙের পরচুলা মাথায় দিত কেন বলুন তো? নিজেকে জজসাহেব ভাবত?'

'উঁহু—' হেসে বললাম, 'শুক্লা বোধহয় কালার ব্লাইন্ড ছিল।'

বেরিয়ে আসতে-আসতে শুনলাম ওরা সবাই জোর গলায় হেসে উঠেছে।

রাস্তায় এসে বাইকে স্টার্ট দিলাম। মনে-মনে বললাম, খারাপ মেয়েগুলোর আত্মা এবার শান্তি লাভ করুক।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তীরবিদ্ধ

এক

কথাগুলো শুনে বিশ্বাস করতে মন চাইল না। কিন্তু জানি, এই ভয়ঙ্কর সত্যি মিথ্যে হওয়ার নয়।

আমার পা দুটো হঠাৎই নির্জীব হয়ে গেল। বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা শুরু হল একটা।

সুনয়নার সঙ্গে ঠিক কতদিন আগে আলাপ হয়েছিল তা হয়তো বলতে পারব না, তবে আলাপের দিনটা ভোলার নয়।

এমনিতেই খুব ভোরে ওঠা আমার অভ্যেস। মা রাতে ছোলা ভিজিয়ে রাখে। সকালে হাত-মুখ ধুয়ে সেটা অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। তাতে দাঁতের ব্যায়ামটা মন্দ হয় না। তারপর ট্র্যাক-স্যুট পরে পায়ে কেড্‌স গলিয়ে চলে যাই দেশবন্ধু পার্কে। সেখানে বড় মাঠটাকে ঘিরে মাঝারি তালে চারপাক দৌড়ই। তারপর কিছুক্ষণ খালি হাতে কসরত। আর সবার শেষে দ্রুতগতিতে পঞ্চাশ মিটার বা একশো মিটার দূরত্ব বারকয়েক দৌড়ে ফেলি। অবশ্য সব ক'টা দৌড়ের ফাঁকে-ফাঁকেই খানিকক্ষণ করে বিশ্রাম নিই। তা নইলে আমার এই পঁয়ত্রিশ পেরোনো বয়েসে হয়তো দেশবন্ধু পার্কেই দেহ রাখতে হত।

না, দৌড়নোটা আমার নেশা কিংবা পেশা নয়। বরং বলা যেতে পারে একরকমের অভ্যেস। খুব ছোট বয়েসেই ভোর-দৌড়ে আমার হাতে-খড়ি হয়েছিল। আমার এই অভ্যেস শুরু করিয়েছিলেন বাবা। তখন আমরা দিল্লির গ্রেটার কৈলাস পার্ট-টু-তে থাকতাম।

বাবা শখের দূরপাল্লার দৌড়ে নাম দিতেন। অনেকবার কাপ-মেডেলও জিতেছেন। বুড়োবয়েস পর্যন্ত তাঁর এই অভ্যেস ছিল। তারপর একটা দৌড়ে নাম দিয়ে ট্র্যাকের ওপরেই স্ট্রোক হয়ে মারা যান। তার কয়েকবছর পরে আমি মাকে নিয়ে দিল্লি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি।

কিন্তু দৌড়ের অভ্যেস আমাকে ছেড়ে যায়নি। এখনও যখন ভোরবেলা দেশবন্ধু পার্কে দৌড়ই, মনে হয়, বাবা আমার পাশে-পাশে দৌড়চ্ছেন। পরনে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি, নীল হাফ-প্যান্ট, আর পি টি. শু। শীতের সময়ে গেঞ্জির ওপরে নীল রঙেরই একটা প্যারাশুট জ্যাকেট পরে নিতেন। কিন্তু আমি, বেশ মনে আছে, পনেরো-ষোলো বছর বয়েস পর্যন্তও কোট গায়ে দৌড়তাম।

সেদিনটা বেশ মনে পড়ে। দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে নিত্যকার চারপাকের কোটা শেষ করে সবে খালি হাতের কসরত শুরু করেছি, নজর পড়ল একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা ছেলের দিকে। আমার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দিব্যি আমাকে নকল করে ব্যায়াম করার চেষ্টা করছে।

সময়টা ছিল হেমন্তের শেষ। শীতকাল ঠিক শুরু না হলেও ভোরবেলাটায় বেশ শীত করে। আর গাছের পাতার ভাঁজে দুধের সরের মতো কুয়াশা জমে থাকে। বয়েস

BanglaBook.org

বেড়ে ওঠার পর থেকে এবং কলকাতাবাসী হয়ে পড়ার পর আমার শীতকাতুরে স্বভাবের উন্নতি হয়েছে। তাই ট্র্যাক-স্যুট দিয়েই শীতকে নিরস্ত করতে পারি। তা ছাড়া, ছোটাছুটির পর তো দিব্যি ঘেমে যাই। সেইজন্যেই বাচ্চাটার পোশাক এবং আচরণ দেখে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

এমনিতেই ছেলেটার বেশ ফরসা নাদুসনুদুস গালফোলা ভোম্বল চেহারা, তার ওপর মাংকি ক্যাপ, গলায় মাফলার, আর গায়ে কোট।

ওকে দেখে আমার নিজের ছোটবেলায় কথা মনে পড়ে গেল। তবে এ দেখছি আমার চেয়েও এককাঠি সরেস। আমি ব্যায়াম থামিয়ে ওর কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। ও তখন কোমরে হাত রেখে মাথা পাশে হেলিয়ে যতটা সম্ভব নামানোর চেষ্টা করছে— মানে, একটু আগেই যে-ব্যায়ামটা আমি করছিলাম।

আমি ওর কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটা তাড়াতাড়ি সোজা হতে গিয়ে পা পিছলে বেসামাল হয়ে শিশির-ভেজা ঘাসের ওপরে পড়ে গেল। তারপরই হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনওরকমে উঠে আমার দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে 'দিদি! দিদি!' বলে চিল-চিৎকার করতে-করতে দে ছুট। ওর ফুটবলের মতো গোল চেহারাটা যেভাবে ছুটে যাচ্ছিল তা দেখে আমি বেশ জোরেই হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেই হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছিল হলদে ট্র্যাক-স্যুট পরা জোড়া-বিনুনি করা একটি মেয়েকে দেখে।

বেশ খানিকটা দূরে দুটো ঝুপসি গাছের নীচে স্কিপিং করছিল মেয়েটি। ছিপছিপে প্রাণবন্ত চেহারা। পেশাদার অ্যাথলিটের মতো নির্ভুল পা ফেলে স্কিপিং করছে। লাফের তালে-তালে জোড়া বিনুনি দুটো এদিক-ওদিক ছিটকে যাচ্ছে বারবার।

ভোরবেলায় যারা দেশবন্ধু পার্কে আসে, তাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখ-চেনা। সুতরাং বুঝতে পারলাম, মেয়েটি আজই প্রথম এখানে এসেছে। আর বাচ্চা ছেলেটিও।

হলদে ট্র্যাক-স্যুট পরা মেয়েটির কাছে পৌঁছে বাচ্চাটা সোজা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে কীসব বলতে লাগল। বিচ্ছুটা বোধহয় আগেভাগেই আমার নামে নালিশ করে রাখছে দিদির কাছে। দেখলাম, স্কিপিং থামিয়ে মেয়েটি ছেলেটিকে সঙ্গে করে এগিয়ে আসতে লাগল আমার কাছে।

আমি কোনও অপরাধ করিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লাম। কী করব বা কী বলব সেটা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই কেমন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

চটপটে পা ফেলে মেয়েটি আমার কাছে এগিয়ে এল। এবার ওকে কাছ থেকে ভালো করে দেখলাম।

মাঝারি রঙ। সুন্দর স্বাস্থ্য। ডান ভুরুর ওপরে একটা ছোট্ট আঁচিল। চোখ দুটো ভাসা-ভাসা। নাক একটু চাপা। ঠোঁট ভরাট। চিবুকের রেখা তেজি। আর বয়েস কত হবে? বড়জোর চোদ্দো কি পনেরো।

ও প্রথমেই 'হ্যালো' বলে হাসল। তারপর বাচ্চাটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'বনি আপনার সঙ্গে কী অসভ্যতা করেছে বলুন তো?'

BanglaBook.org

কিশোরীটির সপ্রতিভতা আমাকে অবাক করছিল। তার ওপরে যেখানে অভিযোগ আশা করেছিলাম সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে পালটা অভিযোগ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আমাকে!

বনি দিদির পিছনে লুকিয়ে উঁকি মেরে আমাকে দেখছিল। আমি হেসে ফেললাম, বললাম, 'না, কোনও অসভ্যতা করেনি। ও আমার দেখে-দেখে ব্যায়াম করছিল। আমি নাম জিগ্যেস করতেই সোজা ছুট লাগিয়েছে আপনার কাছে।'

মেয়েটি ঘুরে ভাইয়ের মাথায় একটা আলতো চাঁটি মারল। বলল, 'বদমাশ কাঁহাকা!'

আমি বললাম, 'আপনার ভাই তো দেখছি আমার থেকেও শীতকাতুরে।'

মেয়েটি হাসল : 'ও ব্বাবা, ওকে চেনেন না! ক্যালকাটা বলে এত কম। দিল্লিতে তো এর সঙ্গে একটা বাড়তি সোয়েটার আর চাদর। তবু ওর ভোরবেলা বেরোনো চাই।'

'আপনারা কি দিল্লি বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল কিশোরী। হাসি আর থামেই না। দেখি, বনিও মজা পেয়ে হাসছে।

আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

ওরা যখন হাসছিল তখন দূরের কারখানার শেডের পিছন থেকে সূর্য উঠে পড়ল। পার্কের পুবদিকের দিকের গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল প্রথম কিরণ। লক্ষ করলাম, পার্কের পিচের রাস্তায় পায়চারি করা দুজন বয়স্ক মানুষ আমাদের দিকে দেখছে।

হাসি থামিয়ে মেয়েটি বলল, 'দিল্লি বেড়াতে যাব কী? দিল্লিতেই তো আমরা ছিলাম এতদিন। ড্যাডি ট্রান্সফার হয়ে ক্যালকাটায় এসেছে, তাই আমরাও দিল্লির পাট চুকিয়ে এখানে এসে উঠেছি। মাত্র তিন দিন হল, আজ ক্যালকাটায় আমার ফোর্থ মর্নিং। আর এই পার্কটায় ফার্স্ট।'

আমি এবারে জানালাম যে, আমিও এককালের দিল্লিওয়ালা মেছো বাঙালি। শুনে আবার একপ্রস্থ হাসি। তারপর মেয়েটি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'তব্ তো বন্ গয়ি বাত। মিলাইয়ে জনাব হাথ।'

আর সঙ্গে-সঙ্গে স্কিপিং রোপটা ডানহাত থেকে বাঁ-হাতে চালান করে দিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। অত্যন্ত সহজভাবে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আমার নাম সুনয়না—সুনয়না আচার্য। আপনার?'

সুনয়নার চঞ্চল স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার আমাকে ক্রমশ আরও অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল। ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'অতীন দত্ত। বাগবাজারে থাকি।'

সুনয়না বলল, 'জানেন, দিল্লিতে আমার আটচল্লিশজন বন্ধু ছিল। আর ক্যালকাটায় এসে সবে এই একজন হল।

আমি হেসে বললাম, 'আর তো মাত্র সাতচল্লিশটা বাকি। সে দেখতে-দেখতে হয়ে যাবে।'

ও বলল, 'ও. কে., আপনি আপনার এক্সারসাইজ করতে থাকুন, আমিও আমার স্কিপিং শেষ করি। সিক্স ফর্টি থ্রি-র মাথায় বনিটা আমাকে থামিয়ে দিয়েছে। এখনও থ্রি ফিফটি সেভেন!'

BanglaBook.org

ব্যস। 'কাম, বনি' বলে ভাইকে ডেকে নিয়ে ছটফটে পায়ে ওর স্কিপিংয়ের জায়গার দিকে চলে গেল সুনয়না। একবারও পিছন ফিরে দেখল না। যদি দেখত তা হলে দেখতে পেত আমি তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আমি একটু পরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং শুরু করলাম।

নরম রোদ উঠে পড়েছে। ভ্রমণকারীরা বা স্বাস্থ্যপ্রেমীরা একে-একে ফিরে যাচ্ছে। দুধের ক্যান হাতে ঝুলিয়ে টুথব্রাশ দাঁতে ঘষতে-ঘষতে এক ভদ্রলোক পার্কের পুকুরের রেলিং ধরে হেঁটে আসছেন। পরনে আলোয়ান আর লুঙি। রোজই ওঁকে দেখি। এই সময়েই যান। আর চলার পথের সব জায়গায় টুথপেস্টের সাদা থুতু ফেলতে-ফেলতে হাঁটেন। ইনি নিখোঁজ হয়ে গেলে খুঁজে বের করতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। টুথপেস্টের গন্ধ শুঁকে পুলিশ-কুকুর দিব্যি ওঁর হদিশ করতে পারবে।

আমার আর মন বসছিল না। ঘাসের ওপরে পড়ে থাকা তোয়ালেটা নিয়ে আলতো করে ঘাড়-গলা মুছে নিলাম। দেখলাম, দূরে হলদে ট্র্যাক-স্যুট তখনও তিড়িং-তিড়িং করে লাফাচ্ছে। আর তার খুদে অনুচর এবারে দিদিকে অনুকরণ করে তালে-তালে লাফানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু কাঁহাতক আর বেহায়ার মতো অপেক্ষা করা যায়। তা ছাড়া, অপেক্ষা করার বয়েসটাও কি আর আছে?

বাড়ি ফেরার পথে আমার চোখের সামনে একটা হলদে ট্র্যাক-স্যুট ঘাসের ওপরে সর্বক্ষন লাফাতে লাগল।

সেটাই ছিল আমাদের প্রথম আলাপের দিন।

স্নান করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। মা রান্নাঘর থেকে ডেকে বলল, 'তুই কি সকাল-সকাল বেরোবি?'

আমি জানি, মা এ-কথা বলবে। কারণ ঘড়িতে আজ সবে ন'টা। অন্যদিন এগারোটার আগে আমি স্নানই করি না।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে ছোট্ট করে 'হুঁ' বললাম। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বাঁ-পাজরের নীচে লম্বা-লম্বা কাটা দাগগুলো আজ বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। অনেকদিন আগে ওগুলো সেরে গেছে, কিন্তু আজ, এখন, যেন জ্বালা করতে লাগল। মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎই যেন জ্বালাটা জেগে ওঠে। তা ছাড়া, একই সঙ্গে চোখে পড়ল কপাল এবং গালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজগুলো। এগুলো গোপন করার কোনও উপায় আমার জানা নেই।

মাথা আঁচড়ানো শেষ হতে চিরুনিটা দেখলাম। বেশ কয়েকটা চুল উঠে এসেছে। তার মধ্যে তিনটে পাকা চুল। বাঁ-হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো আবার ঘেঁটে দিলাম। পাকা চুলগুলো ঠিক কোন জায়গায় ক'টা আছে দেখতে চাইলাম। আছে জানি, কিন্তু এত! বুক থেকে বাতাস বেরিয়ে এল। মুখের চামড়ার মতো মনের ভেতরটাতেও ভাঁজ পড়েছে কি?

জামা-কাপড় পরে নিয়ে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গেলাম। সামনের রাস্তা দিয়ে

BanglaBook.org

বোধহয় একটা লরি চলে গেল। রাস্তাটায় অনেকগুলো খানাখন্দ। তাই বেশ ভালোরকম ঝাঁকুনির আওয়াজ হল।

মা একপাশে আসন পেতে দিল। আমি বসলাম। মা থালায় ভাত বাড়তে-বাড়তে বলল, 'তরকারিটা এখনও হয়ে ওঠেনি। তুই খেতে থাক, আমি বরং দুটো আলু ভেজে দিই।'

আমি বললাম, 'আজ মাঠে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। ওরা তিনদিন হল দিল্লির পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে।' একগ্রাস ভাত মুখে দিয়ে বললাম, 'আমাদেরই মতো।'

দেখলাম কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে-নাড়তে মায়ের মুখটা চকচকে হয়ে উঠল।

কলকাতায় আমরা চলে এসেছি আজ প্রায় ছ'বছর। কিন্তু তবুও মা কলকাতাকে ঘর বলে ভাবতে পারে না। দিল্লির নাম শুনলে স্মৃতিবিধুরতার শিকার হয়ে যায়। বাবাকে মনে পড়ে যায় যে! আর আমার মনে পড়ে যায় সুধার কথা।

মা সঙ্গে-সঙ্গে একগাদা প্রশ্ন শুরু করে দিল। কী নাম, কোথায় থাকে, বাবা কী করে, দিল্লিতে কোথায় থাকত, এইসব।

আমি খেতে-খেতেই মাকে বললাম যে, নাম ছাড়া আপাতত আর কিছুই জানি না। কাল যদি পার্কে দেখা হয় তা হলে নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

আমার কথা বলার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মা বেশ বিরক্ত হল। বলল, 'অন্তু, তোর না কোনও কিছুতেই কোনও কৌতূহল নেই। তোর কিচ্ছু জানতে ইচ্ছে করে না?'

আমি মাথা নিচু করে খেতে-খেতেই জবাব দিলাম, 'না, মা, ইচ্ছে করে না। জানার অনেক কষ্ট।' তখন আমার বাবার কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সুধার কথা।

আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। ডালটা তেতো লাগছিল। মা পাতে আলুভাজা দিল। ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা করলাম। তারপর দু-তিনটে টুকরো মুখে দিলাম। একটা তেতো স্বাদ টের পেলাম। অতিকষ্টে খাওয়া শেষ করলাম। আড়চোখে দেখলাম, মা স্টোভের সামনে বসে আমাকে দেখছে।

উঠে কলতলায় মুখ ধুতে যাওয়ার সময় বললাম, 'বেরোচ্ছি—ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।'

মা কোনও কথা বলল না।

হঠাৎই মনে হল, ক'বছর আগেও মা অনেক কথা বলত। দরাজভাবে মিষ্টি হাসত। এমনকী আমার সঙ্গে ইয়ার্কি-ঠাট্টাও করত। তখন আমরা গ্রেটার কৈলাসে ছিলাম। আর বাবাও বেঁচে ছিলেন।

BanglaBook.org

দুই

পরের দিন পার্কে আবার সুনয়নার সঙ্গে দেখা।

কাকভোর। কুয়াশা। নির্জন মাঠ। হিমে ভেজা ঘাস। তারই মধ্যে হলদে ট্র্যাক-স্যুট খুদে বনিকে নিয়ে আমার আগেই হাজির। হালকা চালে জগিং করছে। আমাকে

দেখে হাত তুলল। আমিও হেসে হাত দেখালাম। তারপর যে যার নিত্যকার ব্যায়াম মনোযোগ দিলাম।

কুয়াশা ক্রমশ ফিকে হচ্ছিল। পার্কে লোক বাড়ছিল। আমি মাঝে-মাঝেই ওদে আর বনিকে দেখছিলাম। কলকাতার ভোরে ওদের কি বেমানান লাগছে?

প্রায় সোয়া ঘণ্টা পর ও দৌড়, স্কিপিং, পি-টি, সব শেষ করে আমার কাছে এল

আমি তখন পি-টি করছিলাম। মাথা ঝুঁকিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্ট করছি, ওর গলা পেয়ে চমকে মাথা তুললাম।

'আরে! আপনি তো একদম বুড়্ঢা হয়ে গেছেন! ফিফ্‌টি পার্সেন্ট চুল সফেদ

মাথার পাকা চুলগুলোর ওপরে ভীষণ রাগ হল। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম বললাম, 'সবাইকে বুড়ো হতে হয়। আর বনি তো চুল পাকার আগেই শীতের পোশাকে জবুথবু।'

সুনয়না বেণি ঝাঁকিয়ে বলল, 'জবুথবু! মানে?'

'মানে জড়সড় হয়ে থাকে, নড়তে-চড়তে চায় না।'

'ওঃ, ঠিক বলেছেন।' সুনয়না হাসল খিলখিলিয়ে। ভাইয়ের হাত ধরে টান মে মাংকি ক্যাপে ঢাকা মাথায় ছোট্ট চাঁটি মারল।

আমার মনে পড়ল মায়ের কথা। তাই জিগ্যেস করলাম, 'দিল্লিতে কোথায় থাকতে আপনারা?'

'কাল্‌কাজিতে।' সুনয়না বলল। ওর ডানহাতে একটা সিনথেটিক ব্যাগ ছি লাল-সাদা ডোরা কাটা। সেটা হাতবদল করে ডানহাতটা মুখে বুলিয়ে নিল। তার আবার বলল, 'ওখানে ফাইন ছিলাম। কিন্তু বাবার বদলি হল। তাই মজবুর হ ক্যালকাটা...।'

এরপর সুনয়না গড়গড় করে দিল্লির প্রশংসার ফিরিস্তি শুরু করল।

আমি ওকে দেখছিলাম। মুখে এক অদ্ভুত সরলতা। কথায় নিয়মমাফিক অবাঙ্ টান। কিন্তু শুনতে যেন আরও ভালো লাগে।

সুনয়নার 'রেলগাড়ি' আমাকে জানিয়ে দিল, ওর 'ড্যাড' ন্যাশনাল থার্মাল পাওয় কর্পোরেশনের নেহেরু প্লেসের অফিসে কাজ করতেন। ওর মা খুব ভালো 'দহিবড়া' বানা ও নিজে হিন্দি গানের পোকা। ওর কাছে প্রায় দুশো ক্যাসেট আছে। ওর ভাই বনি সবাই কপি করতে ভালোবাসে। ক্যালকাটায় ওরা আপাতত 'ফড়িয়াপুকুর' না কী যেন না সেখানে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছে। তবে ওর বাবা শিগগিরই একটা বাড়ি কিনবে ওরা তখন শিফ্‌ট করে যাবে। ওর বাবা আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় কিন্তু ত একটা চুলও এখনও পাকেনি। কিন্তু আমি কী করে বুড়্ঢা হয়ে গেলাম সেটা ওর ভী জানতে ইচ্ছে করছে।

কথা বলতে-বলতে—অথবা বলা ভালো, সুনয়নার একতরফা কথা শুনতে শুনতে—আমরা এগোচ্ছিলাম পার্কের গেটের দিকে। গেটের বাইরে এসে রাস্তার ওপারে একটা চায়ের দোকান আঙুল তুলে দেখালাম। জিগ্যেস করলাম যে, চা খেতে ওর আপ আছে কি না।

ও সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, 'চা! ফার্স্ট ক্লাস! জানেন, আমাদের স্কুলের ইংলি

BanglaBook.org

মিস বলত, আ মর্নিং ইজ মিনিংলেস উইদাউট আ কাপ অফ টি। অবশ্য জানি না, এখন ক্যালকাটার স্কুলের ইংলিশ মিস কী বলবে। তবে ড্যাডি বলে, সব নেশাই খারাপ।'

আমার হাসি পেয়ে গেল। এত কথা বলতেও পারে মেয়েটা।

রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। আমি সুনয়না আর বনির হাত ধরলাম। রাস্তা পেরিয়ে যখন চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন বনি হঠাৎ-ই গম্ভীরভাবে বলল, 'আমাদের বাড়িতে লালি আছে।'

আমি চমকে ওর দিকে তাকালাম। তখন বনি একটা অদ্ভুত মুখ করে দিদিকে বলল, 'তুই সবার কথা আঙ্কলকে বললি, লালির কথা বাদ দিলি কেন?'

ফুটপাথের ওপরেই সুনয়না বনিকে একটা চুমু খেল। বলল, 'সাচ্চি বাত। লালি আমাদের ল্যাপ ডগ। সাদা ধবধবে, দারুণ সুইট। জানেন, দিল্লি থেকে আসার সময়ে ওর টিকিট লেগেছে! আমাদের বাড়িতে এলে আপনাকে দেখাব। লাভ্‌লি-লাভ্‌লি লালি।'

চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আর ও চা নিলাম। বনি আমাদের দেখতে লাগল।

চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে নিয়ে সুনয়না বলল, 'টু মাই নিউ ফ্রেন্ড, বুড্‌ঢা জনাব।' বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী।

আমি বললাম, 'আমার পাকা চুলগুলো তোমার এত ভালো লেগে গেছে?' এইটুকু একটা ইস্কুলে-পড়া মেয়েকে 'আপনি'-'আপনি' করে বলতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

সুনয়না হাসতে-হাসতে বলল, 'আপনি কিছু মনে করলেন না তো? বলুন, বুড্‌ঢা জনাব নামটা খারাপ?'

'মোটেই না। বরং দারুণ চমৎকার।'

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে সুনয়না গড়গড় করে ওর নিজের, বনির, লালির এবং ওর মা-বাবার যাবতীয় ইতিহাস বলে যেতে লাগল।

আর আমি শীতের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলাম, ওর কথা শুনতে লাগলাম, আর আমার বয়েসের গাড়িটা ক্রমশ পিছন দিকে ছুটে যেতে চাইছিল।

ঠান্ডা বাতাস কোথা থেকে ভেসে এল। সুনয়নার লম্বাটে কপালের ওপরে কয়েকটা চুল নড়ে উঠল। তারপর...।

BanglaBook.org

স্পষ্ট মনে আছে, এইভাবেই ওই পরিচয়ের সুন্দর দিনগুলো শুরু হয়েছিল। তারপর দিনগুলো আরও সুন্দর হয়েছে। অনেক বেশি স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিল ওই আলাপ। সুনয়না-বনি অনেকবার এসেছে আমাদের বাড়িতে। আমিও গেছি ওদের বাড়িতে। আলাপ হয়েছে ওর বাবা জগদীশ আচার্যের সঙ্গে আর ওর মা প্রভাবতীদেবীর সঙ্গে। এমনকী লালিকেও একটু-আধটু ভালোবেসে ফেলেছি।

আর সুনয়না? ওই মেয়েটা যে কী না পারে জানি না। আমাকে এই প্রায় দেড় বছর সময়ের মধ্যে ও পুরোপুরি 'বুড্‌ঢা জনাব' বানিয়ে ফেলেছে। আর মায়ের সঙ্গে সবসময় খালি দিল্লির গল্প।

আমাদের বাড়িতে ওর যখন তখন অবাধ গতিবিধি। যেমন হুট-হাট আসে, তেমনই

হুট-হাট চলে যায়। ভোরবেলা পার্কে আমার একদিন কামাই হলেই পরদিন কামাইয়ের 'দরখাস্ত' দেখতে চায়। আর যদি ও নিজে কামাই করে তা হলে পরদিন এসে ওর প্রথম কথাই হবে 'স্যরি, বুড়্ঢা জনাব, কাল আসতে পারিনি—।'

এইভাবে আমাদের দুটো পরিবারের সম্পর্ক জট পাকাতে-পাকাতে কখন যেন সুতোর মাথাগুলো হারিয়ে গিয়েছিল। আমিও ক্রমে ভুলে যাচ্ছিলাম দিল্লির কথা, বাবার কথা, সুধার কথা। ঠিক এইরকম একটা সময় একদিন ভোরবেলা পার্কে সুনয়না গরহাজির হতেই আমি কী ভেবে সেদিন সন্ধেয় কাজ থেকে ফেরার পথে ওদের ফড়িয়াপুকুরের বাড়িতে গেলাম।

তখনই জগদীশবাবু আমাকে বললেন, গতকাল সন্ধে থেকে সুনয়না আর লালিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ ওদের কিডন্যাপ করেছে।

আমি চারপাশে তাকিয়ে বসার একটা জায়গা খুঁজছিলাম। খুব বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছিল না।

মিস্টার আচার্য সেটা আঁচ করলেন। ওঁদের কাজের লোক হরিনন্দন একগ্লাস শরবত হাতে ঘরে ঢুকছিল, মিস্টার আচার্য তাকে বললেন, 'শরবতটা দত্ত সাবকে দাও। আর ওই কোণের ডাইসটা নিয়ে এসো।'

ডাইস বলতে ফাইবার গ্লাসের তৈরি একটা ওলটানো বাক্স। তার সবুজ গায়ে লুডোর ছক্কার মতো বড়-বড় সাদা টিপ। হরিনন্দন ডাইসটা আমার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপরে নামিয়ে রাখল। নরম কার্পেট। কোনও শব্দ হল না। আমি বসে পড়লাম। আমার বুকের ভেতরে সুনয়না স্কিপিং করছিল। আর বনি গুনছিল : সিক্সটি ওয়ান, সিক্সটি টু, সিক্সটি...।

জগদীশ আচার্য গত বছরদেড়েক সময়ে আমাকে বেশ কয়েকবার দেখেছেন। তবে আমাকে দেখে তিনি কখনওই সহজ হতে পারেননি। বোধহয় বুঝতে চাইছিলেন, সুনয়নার সঙ্গে আমায় পরিচয়ের মধ্যে কোনও বিপদের গন্ধ রয়েছে কি না। ব্যাপারটা খুব ছোট্ট হলেও লক্ষ করেছি, ওঁদের বাড়িতে যখনই হাজির হয়েছি তখনই জগদীশ আমার বয়েসের কথাটা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। যেমন, একদিন, চায়ের কাপে সবে চুমুক দিয়েছি, জগদীশ সুনয়নাকে ডেকে বললেন, 'সুনি, মাম্মিকে বলো আঙ্কলকে বিস্কিট দিতে।' অন্য আর একদিন : 'মিস্টার দত্ত, যদি কিছু মনে না করেন, এই এত বয়েসেও কী করে আপনি শরীরটা এমন ফিট রেখেছেন, বলুন তো? রোজ দৌড়?' আবার একদিন : 'আমার থেকে আপনি কত ছোট হবেন? ম্যাক্সিমাম থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্স?'

সেইদিন আমি ঠাট্টা করে জবাব দিয়েছিলাম, 'ছোট কেন, হয়তো দু-এক বছরের বড়ই হব।'

জগদীশ খোঁচাটা হজম করে হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন। আর সুনি—মানে, সুনয়না—বলে উঠেছিল, 'সাচ্চি বাত, ড্যাডি। সেইজন্যেই তো আমি বুড়্ঢা জনাব বলে ডাকি।'

ওর কথায় আমার হাসি পেয়েছিল। মনে-মনে বলেছিলাম, আমাকে নিয়ে তোমরা এত ভয় পাও কেন?

একই সঙ্গে লক্ষ করেছি, সুনয়নাকে তেমনভাবে কখনও শাসন বা বকাঝকা করেন

BanglaBook.org

না জগদীশ। প্রভাবতীদেবীও তাই। কিন্তু তাই বলে হাসিখুশি মেয়েটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি মোটেই। বরং ওর চলাবলায় বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটাই ফুটে উঠত।

জগদীশ একটা সোফায় বসে ছিলেন। সামনের টেবিলে একটা অ্যাশট্রে, একটা খোলা প্যাড আর পেন, তার পাশেই সবুজ রঙের ডিজিটাল টেলিফোন। অন্য আর-একটা সোফা খালি ছিল, তবে তার ওপরে একটা খবরের কাগজ আর কিছু কাগজপত্র পড়ে ছিল। জগদীশ আমাকে সোফায় বসতে বলেননি—ডাইস দিয়েছেন। তবু বসতে পেরে শরীরটা একটু ধাতস্থ লাগছিল।

জগদীশের চোখের নীচ দুটো আজ বেশি ফোলা মনে হচ্ছে। ভারী গাল আরও ভারী লাগছে। দাড়ি কামাননি। খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওঁর আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ছিল, তবে তাতে টান দিচ্ছিলেন না, হাতের সিগারেট পুড়ছিল। লক্ষ করলাম, ওঁর সিল্কের পাঞ্জাবি ও পাজামায় ছাইয়ের গুঁড়ো।

মাথার ওপরে দুরন্ত গতিতে পাখা ঘুরছিল। হাওয়া উঠছিল ঝড়ের মতো। গত পরশু থেকে রোজ সন্ধেবেলা কালবৈশাখী হানা দিচ্ছিল কলকাতায়। আজই তার ব্যতিক্রম।

হরিনন্দন শরবতের প্রথম গ্লাসটা টেবিলে রেখে গিয়েছিল। এবারে দ্বিতীয় গ্লাস নিয়ে ঢুকল। জগদীশ পাঞ্জাবির হাতায় গালের ঘাম মুছলেন। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন। সেই অবস্থাতেই হরিনন্দনকে বললেন, 'বাহার কা দরওয়াজ্জা বন্ধ কর দো।' তারপর আমাকে বললেন, 'নিন, শরবত নিন।'

আমি এক চুমুকে শরবতের গ্লাস শেষ করে দিলাম। তারপর জগদীশ আচার্যের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

আমি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। একটু আগে যে-দুনিয়াটা টাল-মাটাল হয়ে গিয়েছিল এখন সেটা আবার থিতু হয়ে গেছে। সেইজন্যেই বোধহয় মনে হচ্ছিল, মিনিটকয়েক আগে বলা জগদীশের কথাটা মিথ্যে। সুনিকে কেউ কিডন্যাপ করেনি। কলকাতা দিল্লি নয়। কলকাতা অনেক নিরাপদ, এখানে জীবন শান্ত, উপদ্রবহীন।

জগদীশ মাথা তুললেন। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কাল বিকেলে ও লালিকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গিয়েছিল। অন্যদিন বনি সঙ্গে যায়, কাল যায়নি। আমিই মানা করেছিলাম। ওর একটু বোখার মতো এসেছিল। জেনারালি সুনি ছ'টা-সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে আসে। কিন্তু কাল যখন প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল তখন আমি হরিনন্দনকে পাঠালাম দেখতে। ও একটু বাদে ওয়াপস এসে বলল, দিদিকে কোথাও দেখতে পায়নি। তখন আমি ভাবলাম, হয়তো আপনাদের বাড়িতে গেছে। পরে আবার মনে হল, আজ পর্যন্ত কখনও এভাবে ও আমাদের না জানিয়ে কারও বাড়িতে যায়নি। তার ওপর লালিকে নিয়ে তো...নেভার।'

জগদীশ একটু সময় নিলেন। শরবতের গ্লাসে শব্দ করে বারকয়েক চুমুক দিলেন। পাখার বাতাসে জগদীশের পাতলা চুল উড়ছিল। আমি প্রভাবতী আর বনিকে খুঁজছিলাম। ওরা কি ভেতরের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে? নাকি কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে কোনও খোঁজখবর নিতে?

এমনসময় টেলিফোন বেজে উঠল। এবং জগদীশ যেন চমকে উঠলেন। শরবতের

BanglaBook.org

গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে তড়িঘড়ি ফোনটা আঁকড়ে ধরলেন। বললেন, 'হ্যালো—হু ইজ ইট?'

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। হাত দুটো নিজে থেকেই মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছিল। আর বুকের বাঁ-দিকটায় ওই কাটা দাগগুলো জ্বালা করছিল। নাকে আসছিল পোড়া গন্ধ—মাংস-পোড়া গন্ধ। কোথাও দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। আর তারই মধ্যে চিড়বিড় শব্দ হচ্ছিল। আগুনের জিভ পাগলের মতো লকলক করছিল। পাগলের মতো...।

জগদীশ তখন টেলিফোনে বলছিলেন, 'না, না, কাউকে বলিনি। কিসিকো ম্যায়নে নহি কহা।'

আমি সামনে ঝুঁকে বসলাম। কে ফোন করছে? কার ফোন?

জগদীশের ফরসা মুখে রক্ত এসে গিয়েছিল। কপালে ঘাম। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি মিশিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কথা বলছিলেন।

'ওকে কিছু করবেন না। আপ লোগোঁকা সারি শর্ত্ মুঝে মঞ্জুর হ্যায়। যা বলবেন তাই শুনব আমি। প্লিজ, ডোন্ট ডু এনিথিং টু মাই গার্ল। প্লিজ!'

আমি আর পারলাম না। উঠে গিয়ে জগদীশ আচার্যের হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিতে গেলাম। যে ফোন করছে তার কথা আমি শুনতে চাই। নিজের কানে। তারপর বিশ্বাস করব কলকাতা আর দিল্লির মধ্যে কোনও তফাত নেই।

জগদীশ বাঁ-হাতে মুঠো করে ফোন চেপে ধরে ছিলেন। ওঁর আঙুলের গাঁটগুলো সাদা দেখাচ্ছিল। আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে ডান হাতে এক ঝটকা মারলেন তিনি। আমি পড়ে গেলাম না। কিন্তু বেসামাল হয়ে পড়লাম। নিজেকে সামলাতে গিয়ে টেবিলে ভর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তাতেই শরবতের গ্লাস দুটো ছিটকে পড়ে গেল কার্পেটের ওপরে। শরবত ছড়িয়ে গেল তার পশমে। আর একটা বিশ্রী চিৎকার করে জগদীশ ঝটিতি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। লাইন কেটে গেল। এবং আমি ঠিকভাবে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই জগদীশ রাগ-থমথমে মুখে চেঁচিয়ে বললেন, 'য়ু ব্লান্ডারিং ফুল! সুনিকে মারতে চান আপনি? কিডন্যাপাররা ফোন করেছিল টার্মস্-কন্ডিশন্স জানাবার জন্যে। আর আপ—আপনে সারে কাম চৌপট কর দি! সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। ওঃ মাই গড!'

শেষদিকে নিজের কপাল চাপড়ে সোফায় এলিয়ে পড়লেন জগদীশ। চোখ বুজলেন। আর সম্ভবত তাঁরই চিৎকারে কোথা থেকে এসে উদয় হলেন প্রভাবতী, সঙ্গে হরিনন্দন।

আমি খুব বিব্রত বোধ করছিলাম। টেলিফোন ছিনিয়ে নিতে চাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি। হাজার হোক, জগদীশ সুনয়নার বাবা। আমি কে?

আর বসব না ভেবে পা বাড়াতে যাব, প্রভাবতী ভাঙা গলায় ডাকলেন, 'অতীন, দাঁড়াও—যেয়ো না।'

জগদীশ না পারলেও প্রভাবতী আমাকে অনেকটাই আপন করে নিয়েছেন। সুনয়না ও বনিকে নিয়ে দু-বার আমাদের বাড়িতেও গেছেন। মায়ের সঙ্গেও অনেক আলাপ করেছেন। কিন্তু আমাকে এবং সুনয়নাকে ঘিরে কোনও দুশ্চিন্তা ওঁর মনে যে দেখা দেয়নি সে-সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। কারণ উনি জানেন, আমার কাণ্ডজ্ঞান আছে। তবে এখনও কতটা আছে তা নিয়ে আমার নিজেরই মাঝে-মাঝে সন্দেহ জাগে।

BanglaBook.org

আমি ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। হরিনন্দন এসে শরবতের গ্লাস দুটো তুলে নিল। তারপর চলকে পড়া শরবত মোছামুছির চেষ্টা করে চলে গেল।

জগদীশ প্রশ্ন-ভরা চোখে প্রভাবতীর দিকে তাকালেন। প্রভাবতী বললেন, 'বনি ঘুমোচ্ছে।' তারপর আমাকে বললেন, 'বোসো।'

আমি বসলাম।

ঘরের ফ্লুওরেসেন্ট আলোয় প্রভাবতীর মাথার বেশিরভাগ চুলই চিকচিক করছিল। সুনয়নার কাছেই শুনেছি, উনি অবাঙালি। বিয়ের আগে প্রভাবতী যোশী ছিলেন। দিল্লির একটি সেন্ট্রাল স্কুলে পড়াতেন। বিয়ের পর কয়েকবছর চাকরি করেছিলেন, তারপর স্বেচ্ছা-অবসর নেন।

প্রভাবতীর চেহারায় ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোয়। তা সে উনি যে-কোনও পোশাকেই থাকুন না কেন। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। নাক তীক্ষ্ণ। চোখ শান্ত। চিবুকের রেখায় কেমন যেন আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া রয়েছে।

প্রভাবতী একটা লালপাড় শাড়ি পরেছেন। জমিটায় গোলাপি আর কালো চেক। শাড়ির আঁচল ডান কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলছে। ব্লাউজের হাতা দেখা যাচ্ছে—সাদা।

উনি কাছে এগিয়ে এলেন। কাগজপত্র রাখা সোফাটাকে খালি করে জিনিসগুলো টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর বসে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি বোধহয় শুনেছ, সুনিকে কে বা কারা চুরি করেছে। কাল সন্ধেবেলা। ওর সঙ্গে লালি ছিল...।'

জগদীশ চোখ খুলে প্রভাবতীকে একবার দেখলেন। তারপর ঘৃণা ও বিরক্তির নজরে আমার দিকে তাকালেন। আবার চোখ বুজলেন। ডানহাতটা বারবার কপালে ঘষতে লাগলেন।

প্রভাবতীকে বললাম যে, সুনয়না ভোরবেলা পার্কে দৌড়তে যায়নি বলেই আমি ওর খোঁজ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু তারপরই কিডন্যাপিংয়ের কথা শুনে আমার সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। আরও বললাম যে, মিস্টার আচার্যের হাত থেকে টেলিফোন কেড়ে নিয়ে কথা শোনবার চেষ্টা করতে চেয়েছি বলে আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রভাবতী সব শুনলেন। তারপর বললেন, 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের অবস্থাও যে কীরকম তা নিশ্চয়ই তুমিও বুঝতে পারছ। এখানে আমাদের আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই। কলকাতা আমাদের কাছে প্রায় বিদেশ। এখানে আমাদের শত্রুও কেউ আছে বলে মনে হয় না। আর আমার স্বামী এমন কিছু বিরাট বড়লোক নয়। আমাদের এই ভাড়া বাড়ির বেশিরভাগ জিনিস কোম্পানি দিয়েছে। আর চাকরি ছাড়া উনি আরও কয়েকটা কোম্পানির ইকনমিক কনসালট্যান্ট। তার জন্যে বেশ কিছু আয় হয়। সত্যি বলতে কী, খানিকটা টাকার জন্যেই আমরা গড়িয়াহাটের একটা বাড়ি এখনও কিনে উঠতে পারছি না। আরও হয়তো মাসছয়েক লাগবে। আর তারই মাঝে এই সাঙ্ঘাতিক ঘটনা—!'

প্রভাবতী কথা বলেন খুব সুন্দর করে ধীরে-ধীরে। বাংলা কথায় অবাঙালি টান যে এত শ্রুতিমধুর হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। যে-কোনও শ্রোতাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবে ওঁর অতি সাধারণ কথাও। আমিও শুনছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে অবাক

BanglaBook.org

লাগছিল। জগদীশ আচার্যের মতো উনি ভেঙে পড়েননি। চোখ আর চোখের কোল দেখে কান্নাকাটি তেমন একটা করেছেন বলেও মনে হল না। আসলে প্রভাবতী হয়তো অনেক সমঝদার। জানেন, এখন চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি করলে শরীরের শক্তি ও বুদ্ধি ক্ষয় হবে। তাতে সুনয়নার বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

জগদীশ প্রথমে যে-কথাগুলো শুরু করেছিলেন, প্রভাবতী গুছিয়ে সংক্ষেপে তার পুরো বৃত্তান্তটা আমাকে শোনালেন।

গতকাল বিকেলে সুনয়না লালিকে নিয়ে দেশবন্ধু পার্কে বেড়াতে গিয়েছিল। ও সাধারণত সাড়ে ছ'টা পৌনে সাতটায় ফিরে আসে। কিন্তু কাল আসেনি। ওঁরা প্রথমে খুব একটা দুশ্চিন্তা করেননি। কারণ কলকাতায় এসে সুনি যে বছরদেড়েক সময় পেয়েছে তারই মধ্যে স্কুলে এবং পাড়ায় বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ফেলেছে। ফলে ওঁরা ভেবেছেন, কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গেছে হয়তো। কিন্তু রাত যখন প্রায় আটটা বেজে গেল তখন ওঁরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং হরিনন্দনকে পাড়ায় কাছাকাছি দু-একজন বন্ধুর বাড়িতে খোঁজ করতে পাঠালেন। ও ফিরে এসে বলল যে, সুনি ওদের কারও বাড়িতেই যায়নি। তবে ওদেরই একজন, স্বাতী—সুনির সঙ্গে প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুলে ইলেভেনে পড়ছে—বলেছে যে, সুনিকে ও পার্কে লালিকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল।

এ-কথায় ওঁরা আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কলকাতায় ওঁরা যে-ক'দিন আছেন তাতে একমাত্র আমাদের পরিবার, আর এ-বাড়ির বাড়িওয়ালা রীতেশ মজুমদারের সঙ্গেই ওঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

এ ছাড়া জগদীশবাবু প্রায় বিশ বছর দিল্লিতে থাকায় ওঁর কলকাতার পুরোনো সব বন্ধুবান্ধবই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু ওঁর এক ভাই বেলেঘাটায় থাকতেন—তবে তাঁর সঙ্গেও নতুন করে কোনও যোগাযোগ হয়নি। অল্পবয়েসেই কোনও একটা কারণে ওঁদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর তার কয়েকমাস পরেই জগদীশ দিল্লিতে পাড়ি দিয়েছিলেন ভাগ্য-অন্বেষণে।

যাই হোক, লোকবল একেবারেই না থাকায় ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। যখন ওঁরা ভাবছেন যে, লোকাল থানায় যোগাযোগ করবেন ঠিক তখনই একটা ফোন এল। রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা হবে। জগদীশবাবুই ফোন ধরেছিলেন। টেলিফোনে অচেনা গলার একটা লোক বলল যে, সুনয়না ওদের কাছে আছে। পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও দরকার নেই, কারণ তা হলে ওরা সুনয়নার গলা কেটে মুণ্ডুটা জগদীশ আচার্যকে পাঠিয়ে দেবে।

জগদীশ আচার্য সোফাতে গা এলিয়ে চোখ বুজে একইভাবে বসেছিলেন। প্রভাবতী দেবীর শেষ কথাগুলো শোনামাত্রই একটা গোঙানি বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে। চোখে হাত চেপে মাথা ঝাঁকালেন বারদুয়েক। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

প্রভাবতী সেদিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ও খুবই ভেঙে পড়েছে। আজ অফিস যায়নি। ক'দিন বোধহয় যেতে পারবে না।'

লক্ষ করলাম, চশমার কাচের আড়ালে প্রভাবতীর চোখের কোণ চিকচিক করছে।

BanglaBook.org

উনি শব্দ করে একবার শ্বাস টানলেন। তারপর বললেন, 'আমরা ভয়ে পুলিশে খবর দিইনি। এ ছাড়া সেই লোকগুলো এ-ও বলেছে যে, বাড়ির লোক ছাড়া বাইরের কেউ যেন সুনয়নার খবর না জানতে পারে। কিন্তু কাউকে না বলেও যে আমরা পারছি না।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিলাম। ঢোক গিলছিলাম বার বার। আমার মাথার ভেতরে একটা হলদে ট্র্যাক-স্যুট লাফাচ্ছিল। লাফাতে-লাফাতে কাছে এগিয়ে আসছিল। তখনই দেখলাম, ওটার গায়ে বিশ্রীভাবে রক্তের ছিটে লেগে রয়েছে।

যখন মনে হল যে, আমার মুখের ভাব অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে তখন মুখ তুলে প্রভাবতীর দিকে তাকালাম। বললাম, 'লোকগুলো কী চায়?'

প্রভাবতী চশমাটা ঠিক করে একবার স্বামীকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'কাল যখন ওরা প্রথম ফোন করে, তখন বলেছিল পরে আবার ফোন করে কথা বলবে। আজ সকালে ওদের দ্বিতীয় ফোন এসেছিল। আমরা ভেবেছিলাম ওরা হয়তো এবারে সব বলবে, কিন্তু বলেনি। শুধু আমাদের সাবধান করেই ফোন ছেড়ে দেয়। ও হ্যাঁ, আর-একটা কথা বলেছিল—কী একটা জিনিস আমাদের কাছে পাঠাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু আমরা পাইনি।'

প্রভাবতী স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ওঁর স্বর বারবার ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। চোখের কোণে জল জমতে-জমতে এবারে একটা রুপোলি রেখা গাল বেয়ে নেমে এল। প্রভাবতী আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন জলের রেখা। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'একটু আগে যে-টেলিফোনটা এসেছিল সেটাই তিন নম্বর ফোন।'

জগদীশ অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম কথা বললেন, 'ওরা টার্মস্ অ্যান্ড কন্ডিশন্স বলতে যাচ্ছিল।'

ওঁর কথার ধরনে আমার হঠকারী আচরণের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হল। প্রভাবতীর মুখ দেখে মনে হল, উনি সেটা অনুভব করেছেন। স্বামীকে বললেন, 'এক্ষুনি ওরা আবার ফোন করতে পারে। করলে অতীনকে ফোন দিয়ো। যদি ওরা ভাবে বাইরের কোনও লোককে আমরা এর মধ্যে ডেকে এনেছি তা হলে বলবে, অতীন আমার ভাই—আমাদের রিলেটিভ।'

জগদীশ মাথা নীচু করে ঘাড় নাড়লেন দু-বার। আর ঠিক তখনই টেলিফোনটা বিশ্রী শব্দ করে বেজে উঠল।

জগদীশ মুহূর্তে পালটে গেলেন। তাঁর হতাশ মুখে চকিতে ভয় আতঙ্ক ইত্যাদি ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে নিলেন। লক্ষ করলাম, হাত কাঁপছে।

টেলিফোনের শব্দ শোনামাত্রই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। পা দুটোয় কোনও অজ্ঞাত শিরা দপদপ করছিল। জগদীশ ফোনে ইনিয়ে-বিনিয়ে কীসব বলে আমাকে ফোন দিলেন। ফোন নেওয়ার সময় দেখলাম, প্রভাবতীর ব্যক্তিত্ব অথবা শান্তভাব অনেকটাই মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু জননীর উৎকণ্ঠা।

আমি ফোনে কথা বললাম, 'হ্যালো—!'

ওপাশ থেকে একটা ভারি অথচ খসখসে গলা ভেসে এল : 'আপনি কে বলছেন?'

আমি ছোট্ট করে বললাম, 'রিলেটিভ—।'

কিছুক্ষণ ও-প্রান্ত চুপ। তারপর : 'কিসিকো খবর তো নহি কিয়া হ্যায়?'

BanglaBook.org

'নহি।' বুঝতে পারছিলাম, হিন্দি কথায় বাঙালি টান রয়েছে।

পরের কথাটা ভেসে এল বাংলাতেই : 'কাল সকালে একটা জিনিস পাবেন। ওটাতে...।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'সুনয়না কেমন আছে? ওকে ফোন দিন, ওর সঙ্গে কথা বলব।'

লোকটা বলল, 'বুরবাক কাঁহাকা! সেটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। কাল সকালে যে-জিনিসটা পাবেন সেটা দেখলেই সব মালুম হবে।'

'কী জিনিস?' নিজের মনেই উলটোপালটা ভাবলাম। বুক দুরদুর করে উঠল। মাথার চুল কেটে পাঠাবে ওরা? নাকি হাতের আংটি? অথবা, হাত বা পায়ের আঙুল—ওপড়ানো নখ? নাকি স্রেফ মুক্তিপণের চিঠি? দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'সুনয়নার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে দিন।'

একটা অস্পষ্ট শব্দ পেলাম। হঠাৎই শোনা গেল হিন্দি গানের সুর। বোধহয় রেডিয়ো বাজছে ঘরে। অথবা টিভি চলছে।

'ড্যাডি!' সুনয়নার গলা শুনতে পেলাম। ও ফুঁপিয়ে কাঁদছে : 'ড্যাডি!'

আমি বললাম, 'সুনি, কেমন আছ? তোমাকে কোনও কষ্ট দিচ্ছে না তো?'

কয়েক সেকেন্ড ও চুপ করে রইল। বোধহয় বুঝতে পারল, জগদীশ আচার্য নয়, আমি কথা বলছি। আর তারপরেই ও হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'বুড্ঢা জনাব, ফর গড্স সেক সেভ মি। ওরা যা চায় দিয়ে দাও। আমি আর পারছি না। ম্যায় পাগল হো যাউঙ্গি। আমাকে এক্ষুনি এখান থেকে নিয়ে যাও। বচালো মুঝে, বুড্ঢা জনাব...।'

শেষদিকে সত্যিই ও পাগলের মতো কাঁদছিল। তারই মধ্যে কেউ বোধহয় ওকে টেনে সরিয়ে নিল।

'বুড্ঢা জনাব...বচালো...।'

আমি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলাম। সুধার কথা মনে পড়ল কেন জানি না। দিল্লির শীতের রাতে আমার চোখের সামনে একটা গাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছিল। নাকে আসছিল মাংস-পোড়া গন্ধ। বাঁ-দিকের পাঁজরের নীচে এক অসহ্য জ্বালা।

প্রভাবতী আমার পিঠে হাত রাখলেন। সামান্য চাপ দিলেন। দেখলাম, ওঁর চোখেও জল। আর জগদীশ মাথায় হাত রেখে বসে আছেন।

টেলিফোনে লোকটা তখন কথা বলছিল, 'আগেও অনেকবার বলেছি, এখনও বলছি—এ-খবর কাউকে জানাবেন না। অবশ্য জানাতে পারেন, তাতে ক্ষতি নেই—বরং আপনাদের লাভই হবে। বাড়িতে বসে-বসেই এই মেয়েটার মুড্ডুটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এখন রাখছি—কাল সকালে ওই জিনিসটা পাওয়ার পর আবার ফোন করব। ও. কে.।'

ও-প্রান্তে লাইন কেটে গেল। আমি ফোন ধরে তখনও দাঁড়িয়ে। যেন শুনতে পাচ্ছি সুনির গলা : 'বুড্ঢা জনাব! বুড্ঢা জনাব!' ও দূর থেকে কুয়াশা ভেদ করে হলদে ট্র্যাক-স্যুট পরে ছুটতে-ছুটতে আসছে আর আমার নাম ধরে চিৎকার করছে।

প্রভাবতী আবার আমাকে ছুঁতেই আমি চমকে উঠলাম। ফোন নামিয়ে রাখলাম।

BanglaBook.org

ডাইসে বসলাম আবার। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে বললাম, 'কাল সকালে ওরা একটা জিনিস পাঠাবে, তারপর ফোন করে কথা বলবে। আর কাউকে কিছু জানাতে বারণ করেছে।'

জগদীশ মাথা তুললেন। বললেন, 'সুনি—সুনি কেমন আছে?'

আমি বললাম 'ভালো আছে—এখনও।'

প্রভাবতী বললেন, 'ওদের ডিমান্ড কিছু জানাল?'

জগদীশ আপনমনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'সকালে যখন ওরা ফোন করেছিল তখন সুনির সঙ্গে দু-চারটে বাতচিত করতে অ্যালাউ করেছিল। মাই বেবি ওয়াজ ক্রাইং—ভীষণ কাঁদছিল বিটিয়া।'

আমি জগদীশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রভাবতীর দিকে তাকালাম। ওঁর প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'এখনও ডিমান্ড কিছু জানায়নি। জানাবে কাল সকালে ওই জিনিসটা পাওয়ার পর।'

জগদীশ ও প্রভাবতী প্রায় একইসঙ্গে জিগ্যেস করলেন, 'কী জিনিস?'

'এখনও বলেনি। কাল পেলেই জানা যাবে। কাল সকালে আমি আসব।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দরজার দিকে এগোলাম।

প্রভাবতী আমাকে অনুসরণ করলেন।

দরজার কাছে এসে দরজা খুললাম। ঘুরে প্রভাবতীকে দেখলাম। বললাম, 'সুনি ভীষণ কাঁদছিল। বলছিল, ওদের সব দাবি মেনে নিয়ে ওকে সময় থাকতে ফিরিয়ে আনতে।'

প্রভাবতীর কান্নায় এবারে শব্দ হল। বললেন, 'অতীন, তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আর পুলিশে খবর দিতে সাহস হচ্ছে না আমার । তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। কাল সকালে এসো।'

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর বললাম, 'অন্তত আজকের রাতটা সুনির যেন নিরাপদে কাটে।'

প্রভাবতী বিড়বিড় করে বললেন, 'ভগওয়ান উসকি রক্‌শা করেগি।'

আমার চোয়াল শক্ত হল। ভগবান! হাঃ, ভগবান! সেই শীতের রাতে নির্জন রাস্তায় ভগবান কোথায় ছিল? যখন মাংস-পোড়া গন্ধে চাণক্যপুরীর রাস্তা ম'ম' করছিল তখন কোথায় ছিল ভগবান? সুধার চিৎকার কি তাঁর কানে পৌঁছেছিল? তেতো হাসি পেল আমার। ভগবান ক্ষমতাবানের পকেটে থাকেন—এই আমার বিশ্বাস।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। পিছনে জগদীশ আচার্যের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম।

সিঁড়ি নেমে সদর পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই কালবৈশাখীর গন্ধ পেলাম। গত কয়েকদিনের তুলনায় আজ দেরি করে ঝড় উঠল। রাস্তার ধুলো আর কাগজের টুকরো ঝোড়ো বাতাসে পাক খেতে শুরু করেছে। পথচারীরা মাথা নিচু করে চোখ আড়াল করে হাঁটছে। আমি ঝড়ের মধ্যেই জোর কদমে চলতে শুরু করলাম। মাথা দপদপ করছে, চোখে অসহ্য জ্বালা। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছিলাম, নিরাপত্তার দেওয়াল ভেঙে পড়ে কলকাতাটা কেমন যেন ধীরে-ধীরে দিল্লি হয়ে যাচ্ছে।

তারই মধ্যে একটা মিষ্টি গলা টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে 'বুড়্‌ঢা জনাব! বুড়্‌ঢা জনাব!' বলে গলা ফাটিয়ে আমাকে ডাকছিল।

BanglaBook.org

তিন

বাড়িতে ফেরার পথে মায়ের কথা মনে পড়ল। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। মা চিন্তা করবে।

বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি, যা ভেবেছি তাই। মা দরজায় দাঁড়িয়ে। তখনও ঝড় থামেনি। কিন্তু তবুও মা দরজা ছেড়ে ভেতরে যায়নি। এই এক স্বভাব। হাজার বারণ শুনবে না।

আমাকে দেখেই মা ভেতরে ঢুকল। ঢুকতে-ঢুকতেই বলল, 'এত রাত করলি? কোথায় ছিলি? অফিসে?'

আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললাম, 'অফিসে না, সুনয়নাদের বাড়িতে। চলো, একটু পরে সব বলছি।'

আমাদের মাথা গোঁজার জায়গাটা জরাজীর্ণ হলেও মন্দ নয়। ছোট-ছোট দুটো ঘর, একটা রান্নাঘর, আর ছোট্ট একটা বারান্দা মতন—কোনওরকমে দেড়জন দাঁড়াতে পারে সেখানে। আর বাথরুম ভেতর দিকে একটা আছে, তবে সেটা আরও দু-ঘর ভাড়াটের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করতে হয়।

অন্যদিন এই ঘরে ফেরামাত্রই আমি একটা আশ্বাস অথবা নির্ভরতা খুঁজে পেতাম। আজ ভয় করল। দেওয়ালের পলেস্তারা-খসা জায়গাগুলোকে অন্যদিন প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে কল্পনা করতে পারি, আজ সেগুলোকেই দাঁত-নখ বের করা জন্তুর মতো দেখাল।

ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে কলতলায় গেলাম মুখ-হাত ধুয়ে নিতে। মা পিছন থেকে বলল, 'দেরি করিস না। খাবার বাড়ছি।'

রাতের খাওয়া আমরা একসঙ্গে খাই। তা না হলে মা না খেয়ে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। আজ এক্ষুনি খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু উপায় নেই।

কলাপাতায় ভাত বেড়েছে মা। আমি তাকাতেই বলল, 'তপনের মা কাল আসবে না বলে গেছে। ওর ছোট মেয়েটাকে কুকুরে কামড়েছে। কাল হাসপাতালে নিয়ে যাবে।'

মায়ের বয়েস হচ্ছে। এখন বাসন-কোসন মাজতে কষ্ট হয়।

আমি চুপচাপ খেতে বসলাম। খেতে বসে খুব একটা কথা বলছিলাম না। শুধু মাকে বললাম, 'আজ আর ছোলা ভিজিয়ো না। কাল মাঠে যাব না।'

মা চোখ ফিরিয়ে আমাকে দেখল। কিছু বলল না। খাওয়া শেষ করে ওঠার সময় শান্তভাবে মাকে বললাম, 'কাল সন্ধেবেলা সুনয়নাকে কারা যেন কিডন্যাপ করেছে।'

মা চমকে উঠে খাওয়া থামিয়ে বলল, 'কিডন্যাপ মানে?'

আমি বললাম, 'চুরি, গুম—।'

মায়ের মুখ থেকে একটা অস্বাভাবিক শব্দ বেরিয়ে এল। প্রাচীন মুখে ভয় ও আশঙ্কার দাগ আঁকিবুকি কাটল। মাকে অনেক বুড়ি দেখাল। আমি হাত-মুখ ধুতে কলতলায় গেলাম। ফিরে এসে গামছায় হাত মুছছি, শুনলাম মা বলছে, 'কলকাতাতেও শান্তি নেই।'

সেই মুহূর্তে ঠিক কার কথা মা ভাবছিল কে জানে! বাবার কথা, না সুধার কথা?

ঘরে ঢুকে ছোট্ট খাটে পাতা ছোট্ট বিছানায় বসলাম। সুনি যখনই আমাদের বাড়িতে এসেছে তখনই এই বিছানায় বসেছে। ঘরে একটা চেয়ারও আছে। কিন্তু ওর মতে অবসর বিনোদনের সময়ে শুতে-বসতে বিস্তারা, আর কাজের সময়ে কুর্সি। ওর সঙ্গে কে তর্ক করবে! আমার বা মায়ের সে-এলেম নেই।

BanglaBook.org

একদিন ও মায়ের কাছে দিল্লির গল্প শুনছিল আর থেকে-থেকেই মাথা নাড়ছিল। হেন কোনও জায়গা নেই যা ও চেনে না। হেন কোনও মানুষ নেই যে ওর অথবা ওর কোনও বন্ধুর আত্মীয়ের পরিচিত নয়। এ ছাড়া ওর নিজের বকবকানি তো ছিলই। হয়তো কোনও একটা উদ্ভট গল্প মাকে শোনাতেই মা বলল, 'কী যে বলো, এ হতে পারে না।'

সঙ্গে-সঙ্গে চুল ঝাঁকিয়ে নিজের টুঁটি টিপে সুনি বলত, 'সাচ্চি মওসি, পুছিয়ে বুড়্ঢা জনাবকো।'

ওর রকমসকম দেখে মা-ও মজা পেত। হাসত। আমার খুব ভালো লাগত। কারণ মাকে খুব কম সময়েই ইদানীং হাসতে দেখি। দিল্লিকে মা কিছুতেই ভুলতে পারে না।

এইভাবেই মাসছয়েক আগে একদিন দিল্লির ফটো সুনিকে দেখাচ্ছিল মা। অনেক পুরোনো অ্যালবাম। তাতে নানান ছবি। দেখতে-দেখতে একটা ফটোয় চোখ আটকে গেল সুনির। চোখ বড়-বড় করে বলল, 'বাব্বাঃ, কী সুন্দর দেখতে! একেবারে ফিল্মি হিরোইন। ইয়ে কওন মওসি?'

আমি তখন ঘরের লাগোয়া একটুকরো বারান্দায় দাঁড়িয়ে শীতের বাতাস টের পাচ্ছিলাম। ছবির অ্যালব্যাম যখনই মা খুলেছে তখনই জানি আজ কিছু-না-কিছু একটা হবেই। দিনটা রবিবার। ফলে সামনের বড়রাস্তায় গাড়ির যাতায়াত কম। সন্ধে নেমেছে। তারই মধ্যে ওদিকের ফুটপাতে শালপাতা, কাঠ আর রবারের টুকরো জ্বলে উঠেছে। চাদর মুড়ি দেওয়া কয়েকটা মানুষ আগুনের জ্বলজ্বলে শিখায় হাত সেঁকছে। ওদের শরীরে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে উত্তাপ।

আমি তাকিয়ে ছিলাম সামনে। কিন্তু মায়ের উত্তরের জন্যে কান পেতে মনোযোগ রেখেছি পিছন দিকে।

সুনি আবার জিগ্যেস করল, 'আরে বলো না, মওসি, এই হাসিনা কে?'

মা তখনও চুপ করে ছিল। ফলে সুনিকে আর পরের কথাগুলোর জন্যে দোষ দেওয়া যায় না। ও ফস করে বলে উঠল, 'বলো না কে, বুড়্ঢা জনাবের বউ?' বলেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ওর পরনে লাল-সাদা খোপ-খোপ নকশা-কাটা শালোয়ার-কামিজ। তার ওপরে হলদে উলের কার্ডিগান। ওর মা প্রভাবতী বুনে দিয়েছেন।

সুনির হাসি শুনছিলাম, আর বুকের বাঁ-দিকে পাঁজরের ঠিক নীচে কোনও জন্তুর ধারালো দাঁত বসে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। ফুটপাথের ধুনির আগুন জলচর সাপের মতো লিকলিকিয়ে বাতাস চাটছে। আর একটা পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। আমার মাথার ভেতরে কেউ বরফের কিউব ঢুকিয়ে দিচ্ছিল একটা-একটা করে।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। পিঠে ঠান্ডা বাতাসের ছুঁচ ফুটছে।

ঘরের সাদা আলো মায়ের বিহ্বল চোখে পড়েছে। চোখ চিকচিক করছে। আর সুনয়না মায়ের চোখ দেখে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, 'ওর নাম সুধা। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ। সুধা আমার ওয়াইফ—ছিল।'

আমার কথা বলার ঢঙ সুনির মুখ থেকে সব হাসিখুশি এক পলকে শুষে নিয়েছিল। মা তাড়াতাড়ি বলল, 'ও-সব কথা থাক, অন্তু। সুনি, চুপচাপ ব্যয়ঠো। তোমার জন্যে আলু-বড়া আর আদা-চা তৈরি করছি।'

অন্য সময় হলে কাজিল সুরে সুনি বলে উঠত, 'কটাকট, মওসি, কটাকট!' কিন্তু এখন কিছু বলল না। শুধু আমাকে দেখতে লাগল।

মা শাড়ির আঁচল চোখে ঘষে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। আর সুনি খোলা অ্যালবামের পাতায় সুধার রঙিন ছবি উদোম করে আমার দিকে চেয়ে বসে রইল। লক্ষ করলাম, ওর সুন্দর চোখ সামান্য তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে। আর রঙিন ছবিতে সুধা হাসছে।

একটু পরে ও বলল, 'সরি, বুড্ঢা জনাব। আমি তোমাকে হার্ট করতে চাইনি। ফরগিভ মি।'

আমি মাথার চুল ঘাঁটলাম। এই মেয়েটার কী দোষ! এত নিষ্পাপ সুন্দর এই মেয়েটা! আমার বয়েস যদি পনেরোটা বছর কম হত! কিংবা মাথার পাকা চুলগুলো ফিরে পেত তাদের যৌবনের রঙ! কিন্তু জানি, এ হয় না। নিয়তিকে বদলাতে পারে কে? তিরাশি সালের সেই শীতের রাতটাকে কি আমি বদলাতে পেরেছিলাম? নাকি বুঝতে পেরেছিলাম, পালিকা বাজারের সেই নাম-না-জানা ছেলেটা এইভাবে ঘুরিয়ে দেবে আমার জীবনের বাঁক। এইভাবে বাঁকাচোরা করে দেবে জীবনের সরলরেখা।

সুনি আবার বলল, 'বুড্ঢা জনাব, আই সেইড আই অ্যাম সরি।'

আমি আর থাকতে পারলাম না। ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর শ্যাম্পু করা চুলে আলতো হাত রেখে বললাম, 'সুধার কথা শুনলে তুমি কষ্ট পাবে।'

আশ্চর্য! ওইটুকু পুঁচকে মেয়েটা ফস করে বলে উঠল, 'তাই বলে তোমার কষ্ট আমি জানতে পারব না? তুমি না আমার ক্যালকাটার প্রথম বন্ধু! পার্কের প্রথম দিনটা মনে আছে? আমি কিন্তু ভুলিনি। অব্ ফরমাইয়ে কেয়া রায় হ্যায় জনাবকা।'

আমি বিছানায় বসে পড়ে বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, সব বলব, তবে এখানে নয়—পার্কে। ওসব কথা মা শুনতে পেলে আবার দুঃখ পাবে, কান্নাকাটি করবে।'

সুনি চুপ করে গিয়েছিল তারপর। অ্যালবামটা নিঃশব্দে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল বিছানার একপাশে। সেদিন আমাদের আড্ডা আর জমেনি।

পরদিন ভোরবেলা দেশবন্ধু পার্কের কুয়াশায় হাঁটতে-হাঁটতে ওকে সব খুলে বলেছিলাম। বনি আর লালিও ছিল ওর সঙ্গে। ওরা খেলা করছিল মাঠে। ছুটোছুটি করছিল। আর আমরা পার্কের পুকুর ঘিরে চক্রাকারে হাঁটছিলাম ...হাঁটছিলাম। চোখে পড়ল পিচের রাস্তার ওপরে টুথপেস্টের টাটকা চিহ্ন—একটু আগেই ভোরবেলার সেই ভদ্রলোক হেঁটে গেছেন এই পথ দিয়ে আর নিজের চিহ্ন রেখে গেছেন চলার পথে।

আমার চলার পথে ছড়িয়ে রয়েছে রক্তের ফোঁটা। সেই চিহ্ন মাড়িয়ে বুকের ভেতর পা ফেলে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম ১৯৮৩ সালের দিকে। দিল্লির দিকে। সেই ভয়ঙ্কর শীতের রাতের দিকে। সুনয়নার শরীর থেকে ভেসে আসা হালকা সুগন্ধ চাপা পড়ে যাচ্ছিল পেট্রল আর পোড়া গন্ধে। আমার মনে পড়ল পালিকা বাজারের কথা।

কনট সার্কাসে পালিকা বাজার এমন একটা মার্কেট যেখানে ঢুকলে মনে হয় কোনও পাতালপুরীর প্রাসাদে প্রবেশ করেছি—অন্তত আমার তাই মনে হত। সেদিন বিকেলে অফিস ছুটির পর পালিকা বাজারে গিয়েছিলাম। সুধাকে আসতে বলিনি। ওর তখন সাত

মাস চলছে। বেশি ধকল ডাক্তারের বারণ। নইলে ওকে আগে থেকে বলে রাখতাম, আর ও ছুটির মুখে আমার অফিসে এসে হাজির হত। আমার অফিসটা কনট সার্কাসের মুরারকা বিল্ডিংয়ের চারতলায়। প্লাজা সিনেমা হলটার পাশেই। অনেকদিন এইভাবে আমরা সিনেমা দেখেছি, রেস্তোরাঁয় খেয়েছি, কিংবা পালিকা বাজারে শপিং করেছি। কিন্তু মাস তিনেক হল, এই নিয়মটা তাকে তুলে রেখেছি। তা ছাড়া, মা-ও আপত্তি জানাত মাঝে-মাঝে।

পালিকা বাজার থেকে কয়েকটা জিনিস কেনার ছিল। আমার একটা সোয়েটার, একটা বেডশিট, আর ভালো চায়ের একটা প্যাকেট। চায়ের ব্যাপারে মা বেশ খুঁতখুঁতে। তাই আর কোনও কারণে না হলেও এই চায়ের জন্য দু-সপ্তাহ অন্তর-অন্তর আমাকে পালিকা বাজারের গয়াল টি শপ-এ আসতে হয়।

সেদিন চায়ের প্যাকেট কিনে সবে গয়ালের দোকান ছেড়ে এগোচ্ছি, একটা ছেলে আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে জোর কদমে সামনের দিকে চলে গেল। পালিকা বাজারে এমনিতেই প্রায় সবসময় ভিড়। তার ওপর থরেথরে দোকান আর প্যাঁচালো অলিপথের গোলকধাঁধা। প্রথম-প্রথম তো আমার সবকিছু গুলিয়ে যেত। এক দরজা দিয়ে বেরোতে চাইলে বেরিয়ে পড়তাম ঠিক তার উল্টো দিকের দরজা দিয়ে। সুতরাং ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, পথ গুলিয়ে যাওয়া, এসবই পালিকা বাজারে খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু প্রথম ধাক্কার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগল দ্বিতীয় ধাক্কা খাওয়ার পর। ছেলেটা সামনের ভিড়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। আমি সেদিকে আর নজর না দিয়ে বিভিন্ন দোকানে সাজানো বেডশিট কিংবা সোয়েটার দেখতে শুরু করেছি, হঠাৎই পিছন থেকে তিন-চারজন লোক আমাকে রুক্ষভাবে ধাক্কা দিয়ে হুড়মুড় করে সামনে এগিয়ে গেল।

আমি বিরক্ত হয়ে লোকগুলোকে দেখলাম : গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, ফুলহাতা সোয়েটার, কোট; মাথায় কোঁকড়া চুল, টাক, তেল মেখে পাট করে আঁচড়ানো চুল।

তিনজনকেই ঠাহর করতে পারলাম। দেখলাম, অন্যান্য দু-চারজন লোকও বিরক্ত হয়ে ওদের দিকে তাকাল। লোকগুলো কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই চলে গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে একটা ফোয়ারা-শরবতের দোকানে দাঁড়িয়ে পটাটো চিপ্‌স আর শরবত খাচ্ছি, দেখি সেই ছেলেটা—যে প্রথমে আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল। ওকে ঠিক চিনতে না পারলেও ওর হন্তদন্ত ভাবটা একইরকম ঠেকল। বাজারের লোকজনকে প্রায় কনুই দিয়ে ঠেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। চোখে চশমা, পরনে স্যুট, আর হাতে একটা অ্যাটাচি। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ হবে। ছেলেটা কি রাস্তা গুলিয়ে পালিকা বাজারে ঘুরপাক খাচ্ছে? নাকি...।

একটু পরেই চোখে পড়ল সেই তিনজন লোককে। ওরাও একই দিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। শরবতের দোকানে টেপরেকর্ডারে বড্ড গরম করা মিউজিক বাজছিল। ব্যাগি প্যান্ট-শার্ট পরা কয়েকটা ছেলে-মেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে চিপ্‌স-এর টুকরো মুখে ফেলছিল, আর মিউজিকের তালে-তালে শরীর দোলাচ্ছিল। কোনওদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। লোক তিনটে যাওয়ার সময়ে ওদের একজনকে ধাক্কা দিয়েছিল। ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে 'হেই, ব্লাইন্ড বাস্টার্ড' বলে চিৎকার করে গালাগাল দিল। তিনজনের শেষ জন ঘুরে ছেলেটাকে দেখল। লোকটার পেটানো চেহারা। কালো মুখ চকচক করছে। আমি

BanglaBook.org

ভাবলাম, এই লাগল বুঝি। কিন্তু না। লোকটা আবার ঘুরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওর মুখের ভাবটা যেন 'হাতে সময় থাকলে মজা দেখিয়ে দিতাম'।

এর মিনিট দশ-পনেরো পরে আবার ওই চারজনকে আমি দেখলাম। ছেলেটা এখন প্রায় দৌড়চ্ছে। আর ওর পিছনের লোকগুলোও তাই।

আমার কেমন যেন কৌতূহল হল। সোয়েটার আর বেডশিট পরে কেনা যাবে। আমি ওদের অনুসরণ করলাম।

ওই লোকগুলো নির্ঘাত ছেলেটাকে তাড়া করেছে, আর প্রাণ বাঁচাতে ছেলেটা ঢুকে পড়েছে পালিকা বাজারের ভিড়ে। ভিড়ের মধ্যে ওদের হারিয়ে ফেলে আমি তিন নম্বর গেটের সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাথা উঁচু করে ওদের খুঁজে পেতে চাইলাম। না, চোখে পড়ল না। যখন প্রায় ধরেই নিয়েছি যে, আর ওদের দেখতে পাব না, এমন সময় দেখি ছেলেটা তিন নম্বর গেটের দিকেই দৌড়ে আসছে।

আমার যে কী হল, ওকে কস করে জিগ্যেস করে বসলাম, 'ভাইসাব, মামলা কেয়া হ্যায়? ম্যায় কুছ মদদ কর্ সক্তা হুঁ?'

ছেলেটা মাথা ঝাঁকিয়ে পিছনে একবার তাকাল। তারপর ওর হাতের অ্যাটাচি কেসটা ঝটিতি ধরিয়ে দিল আমার হাতে। তারপর বলল, 'জলদি ভাগ যাইয়ে! ব্যাগমে হামারা পতা হ্যায়। কল্ আকে মুঝে ইয়ে ব্রিফকেস দে যানা। মেরি মদদকে লিয়ে লাখ লাখ শুক্‌রিয়া।'

ব্যাস, ওইটুকুই। ছেলেটা দুটো করে সিঁড়ির ধাপ টপকে বেরিয়ে গেল তিন নম্বর গেট দিয়ে।

তার একটু পরেই দেখি সেই লোক তিনটে ভিড় ঠেলে প্রায় ছুটে আসছে। আমি একপাশে সরে গিয়ে একটা দোকানের শো-কেস দেখতে লাগলাম। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। এই শীতেও ঘামের রেখা গড়িয়ে যাচ্ছে গলা থেকে পায়ের দিকে। বুকের ভেতরে গরম লোহা পিটছে কেউ। আগুনের ফুল্‌কি ঠিকরে যাচ্ছে চারদিকে।

লোকগুলো সিঁড়ি উঠে গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতেই হাতে-পায়ে যেন সাড় ফিরে পেলাম। কৌতূহল ছাপিয়ে গেল ভয়কে। ধীরে-ধীরে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। হাতের ব্রিফকেসটা বেশ ভারী লাগছে। কী আছে এতে? টাকা? গয়না?

পালিকা বাজার থেকে বেরিয়ে এলাম সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে। খাটো রেলিঙ দিয়ে ঘেরা উদ্যান বলা যায়।

আকাশ অন্ধকার। মাঠে লোকজন প্রায় নেই। কনট সার্কাসের নানান রঙিন আলো চোখে পড়ছে। গাড়ির স্রোত এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে। শীতের বাতাস আমার মুখের চামড়ায় ছুঁচ ফোটাল।

কিন্তু কোথায় গেল ওরা?

ঠিক তখনই চোখে পড়ল মাঠের শেষপ্রান্তে একটা জটলা। সেই তিনজন লোক ঘিরে ধরেছে চশমা পরা ছেলেটাকে। কী যেন করছে ওকে। কোনও অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে?

হঠাৎ দেখি ছেলেটা একটা চিৎকার করে মাঠের রেলিঙ টপকে ছুটতে শুরু করল। লোক তিনটে তেমন ব্যস্ততা দেখাল না এবার। ওদের মধ্যে একজন একটা সিটি বাজাল

BanglaBook.org

জোরে। ছেলেটা রাস্তা পেরিয়ে লোদি রোডের দিকে দৌড়চ্ছিল। কোথা থেকে ছুটে এল হালকা রঙের একটা অ্যামবাসাডর। প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারল ছুটন্ত ছেলেটাকে। ছেলেটা ছিটকে উঠে গেল শূন্যে। ওর শরীরটা কল-কাটা ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে প্রায় হাত দশেক দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। অনেকগুলো গাড়ি একসঙ্গে ব্রেক কষল। বিশ্রী শব্দ হল। তার ঠিক পরমুহূর্তেই অ্যামবাসাডর গাড়িটা বুলেটের মতো ক্ষিপ্র গতিতে ওই জটলা থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তার ওপরে চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেল লোদি রোডের দিকে।

সন্ধে প্রায় সাতটার কাছাকাছি। রাস্তায় লোকজন খুবই কম। তবুও ওই ছেলেটিকে ঘিরে কিছু লোক ভিড় করেছে দেখলাম। ছেলেটি নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই। ওইরকম বীভৎস ধাক্কার পর কোনও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। পুরো ঘটনাটা ছবির মতো আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আর হঠাৎই ভয় ঘিরে ধরল আমাকে। কী আছে এই ব্রিফকেসের ভেতরে?

তাড়াতাড়ি চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। না, সেই তিনটে ষণ্ডামার্কা লোককে আর চোখে পড়ছে না। আমাকে ওরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেনি। বুঝতে পারেনি যে, ছেলেটি ওর ব্রিফকেস তুলে দিয়েছে আমার হাতে।

এখন কী করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সামনেই একটা অটো-রিকশা পেয়ে তাতে উঠে পড়লাম। প্রথমে বাড়ি যাওয়া যাক। তারপর দেখা যাবে।

চওড়া রাস্তায় অটো হু-হু করে ছুটছিল। ঠান্ডা বাতাস আরও তীব্র হয়ে আমার চোখে-মুখে এসে ঝাপটা মারছিল। বাড়ির দিকে যেতে-যেতে ওই দুর্ঘটনাটা বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। যেন একই সিনেমা স্লো মোশনে বারবার দেখছি।

বাড়িতে ফিরে মায়ের হাতে চায়ের প্যাকেটটা দিয়ে সোজা চলে গেলাম নিজের ঘরে।

সুধা কী একটা বই পড়ছিল চেয়ারে বসে। আমাকে দেখেই জানতে চাইল সোয়েটার আর বিছানার চাদর এনেছি কি না। আর প্রায় তক্ষুনি ওর নজর পড়ল আমার হাতের ব্রিফকেসটার ওপরে। বুঝতে পারল ওটা আমার নয়। আমি ওটা বিছানার পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম।

আমি সুধার চোখ দেখলাম। তারপর বিছানায় গা ছেড়ে বসে পড়লাম। সুধার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে চার বছর। এরই মধ্যে আমরা পরস্পরের অনেক না-বলা কথা বুঝতে শিখে গেছি। ওর মুখ দেখে বুঝলাম, কোনও গোলমাল আঁচ করতে পেরেছে। আমি বললাম, 'চুপচাপ বসে থাকো। আমি হাত-মুখ ধুয়ে এসে সব বলছি। মা যেন কিছু টের না পায়।' সুধা বড়-বড় চোখ করে আমার চলে যাওয়া দেখল।

হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢোকার পথে দেখলাম, মা ঠাকুরের ফটোর সামনে চোখ বুজে বসে। মা এমনিতেই ঠাকুরের ভক্ত। গত বছরে বাবা হার্টফেল করার পর থেকে আরও বেশি।

সুধাকে সব খুলে বললাম। বললাম, ছেলেটা কী বীভৎসভাবে মারা গেছে।

আমার কথা শোনার পর ও ব্রিফকেসটার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন একটা শঙ্খচূড় ফণা তুলে ঠান্ডা চোখে ওকে দেখছে। ও চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'ওর ভেতরে কী আছে?'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'এখনও জানি না।' এটার জন্যেই কি ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল? অ্যাক্সিডেন্ট নয়—মার্ডার।

আমি ব্রিফকেসটার কাছে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। সুধা চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। কী আছে এর ভেতরে? আমার বুকের ভেতরে আবার শুরু হয়ে গেছে গরম লোহার পিটুনি। ব্রিফকেসটা তুলে বিছানায় রাখলাম। দু-দিকের লক টিপতেই ডালা খুলে গেল। আমি ঢাকনাটা খুলে ফেললাম। অজান্তেই শ্বাস টানলাম শব্দ করে। একটা চাপা শব্দ বেরিয়ে এল ঠোঁট চিরে।

ব্রিফকেসের ভেতরে থরেথরে সাজানো পলিথিলের ছোট-ছোট প্যাকেট। প্যাকেট ভর্তি সাদা গুঁড়ো—নুনের মতো। হেরোইন। ড্রাগ। স্ম্যাক।

সামনা-সামনি না হলেও সিনেমায় এরকম প্যাকেট দেখেছি। সুধাও দেখেছে। সেইজন্যেই ও ভয়ার্ত চোখে খোলা ব্রিফকেসটা দেখছে। ব্রিফকেসের ভেতরে ওই প্যাকেটগুলো ছাড়াও কিছু কাগজপত্র ছিল, আর দুটো ডট পেন, একটা ক্যালকুলেটর, একটা চশমার খাপ। এ ছাড়া, চার চৌকো প্লাস্টিকের আবরণে ঢাকা রয়েছে একটা ভিজিটিং কার্ড। নামটা পড়লাম : বিনোদকুমার শুক্লা, রিয়্যাল এস্টেট এজেন্ট। তার নীচেই রয়েছে পুরোনো দিল্লির করল বাগের একটা ঠিকানা।

সুধার শরীর আমাকে স্পর্শ করল। টের পেলাম, ও কাঁপছে। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। বললাম, 'কাল ওই ঠিকানায় গিয়ে দেখব? হয়তো ছেলেটার মা-বোন-ভাই-বউ সবাই ওর ফেরার আশায় বসে থাকবে। এই দুর্ঘটনার খবরটা ওদের জানা দরকার।'

সুধা আমার হাত খামচে ধরল, তারপর কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ল বিছানায়। হোঁচট খাওয়া গলায় বলল, 'না! তুমি এক্ষুনি পুলিশে যাও! নইলে ওই বদমাইশ লোকগুলো তোমাকে ছাড়বে না!'

আমি সুধাকে এই বলে আশ্বস্ত করলাম যে, সে-ভয় নেই, কারণ লোকগুলো আমাকে দেখলেও চিনতে পারবে না, আর আমার ঠিকানাও ওরা জানে না।

এমনসময় মা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে চায়ের কাপ। বলল, 'তোর চা করতে একটু দেরি হয়ে গেল। সুধা, তুমি আধকাপ খাবে নাকি? এ-সময়ে তো বেশি চা খাওয়া ভালো নয়। অন্তু, তুই—।'

মা বিছানার ওপরে খোলা ব্রিফকেসটা দেখতে পেয়েছে ততক্ষণে। আমি আর সুধা দু-একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মাকে সব কথা খুলে বললাম। যতটা আশা করেছিলাম মা ততটা ভয় পেল না। শুধু বলল, 'তুই থানায় খবর দিয়ে সব কথা পুলিশকে খুলে বল।'

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পরদিন ওই কালান্তক ব্রিফকেস নিয়ে গ্রেটার কৈলাস পুলিশ স্টেশনে গেলাম। সেখানকার অফিসার মোহন সিং অরোরাকে সব ঘটনা খুলে বললাম এবং ব্রিফকেসটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে হালকা হলাম। অরোরা আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন সৎ নাগরিকের দায়িত্ব পালন করেছি বলে। আরও বললেন, ভয়ের কিছু নেই। পুলিশ আমার ওপরে লক্ষ রাখবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁরা এই ড্রাগ গ্যাংকে কব্জা করতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। আমার নাম-ধাম অফিসের ঠিকানা,

BanglaBook.org

ফোন নম্বর, ইত্যাদি লিখে নিয়ে তিনি বললেন, প্রয়োজনে আমাকে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে। তখন যেন পুলিশকে আমি সাহায্য করি। তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে থানা থেকে উৎফুল্ল মনে বেরিয়ে এলাম। বুকের ওপর থেকে একটা বিশাল পাথর যেন সরে গেছে। অফিসে যখন রওনা হলাম তখন গোটা দিল্লি শহরে আমার চেয়ে সুখী মানুষ আর কেউ ছিল না।

কিন্তু তার পরদিনই অফিসে একটা টেলিফোন এল।

ফোন ধরতেই ও-প্রান্ত থেকে ভারী গলায় কেউ আমার নাম জিজ্ঞাসা করল : 'অতীন দত্ত?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কথা বলছি।' মনে করলাম, অরোরা বুঝি থানা থেকে ফোন করেছেন। কিন্তু পরের কথাটাই আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিল।

'কল্ পুলিশমে সিরফ একঠো ব্রিককেস জমা কিয়া? সালা, পুরা পেটিকা মাল কাঁহা গিয়া?'

আমার শরীরের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল পলকে। কী করে জানতে পারল ওরা যে আমি পুলিশের কাছে বিনোদকুমারের ব্রিফকেসটা জমা করেছি? আর পুরো পেটি মালের আমি কী জানি? থাকলে বিনোদের করল বাগের বাড়িতেই থাকবে।

সে-কথাই বললাম টেলিফোনে।

ও-প্রান্তের রুক্ষ স্বর হাসল খারাপভাবে। টেনে-টেনে বলল, 'দত্তবাবু, বেকালতু বাতে ফায়দা নেই। সিরফ বোলো, হাঁ ইয়া না।'

আমি ভয়ে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। মোহন সিং অরোরার কথা মনে পড়ল। কাল উনি আমাকে প্রশংসা করেছিলেন সৎ নাগরিকের কর্তব্য পালন করেছি বলে। আরও বলেছিলেন, পুলিশ আমার ওপরে নজর রাখবে। কোনও ভয় নেই। কিন্তু—।

ও-প্রান্তে কথা শুনতে পেলাম। ভারী গলার মালিক পাশে দাঁড়ানো কাউকে বলছে : 'নখরা করছে। হারামি কা লাশ খালাস কর দো।'

উত্তরে খুব আলতো গলা শোনা গেল : 'উঁহু, আই উইল গিভ হিম আ প্রাইজ কর বিয়িং আ গুড সিটিজেন। সালা সৎ নাগরিককা বচ্চা!'

আমার মুখে থুতু জমছিল। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেকরকমভাবে নিজের অন্যায় স্বীকার করলাম। বললাম, 'এরকম গল্‌তি আর কখনও হবে না। সত্যিই আমি এর বেশি কিচ্ছু জানি না।' আমার প্রায় কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

আমার অবস্থা দেখে টেলিফোনের কাছাকাছি বসে যে-দুজন অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, রঞ্জন আদবানি আর রামানন্দ ভাসিন, তারা উঠে এল। ওদের মধ্যে রঞ্জন আদবানির বয়েস অল্প। সে-ই জিগ্যেস করল, 'হোয়াটস রঙ, মিস্টার দত্ত? কুড উই হেল্প য়ু?'

লক্ষ করলাম, প্রৌঢ় রামানন্দ ভাসিন অবাক হয়ে আমার মুখের অবস্থা দেখছে। আমি এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ-ব্যাপারে তৃতীয় কারও কাছে মুখ খোলা ঠিক হবে না। তাই মাথা নেড়ে বললাম, 'নাথিং সিরিয়াস।' ওরা আবার ফিরে গেল নিজেদের সিটে।

BanglaBook.org

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে শান্ত স্বরে কেউ বলে উঠল, 'দত্তবাবু, ইট ওয়াজ ইওর লাস্ট চান্স। গুড বাই—।'

লাইন কেটে গেল হঠাৎ। আর তখনই একটা কথা আমার মাথায় খেলে গেল—যেটা এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। সঙ্গে-সঙ্গে নির্জন রাতের কোনও শ্মশানে যেন ঘন-ঘন বাজ পড়তে লাগল।

ওরা আমার অফিসের ফোন নম্বর জানল কী করে?

আমার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। কী করব এখন? মোহন সিং অরোরার কাছে যাব? আমার মাথার ভেতরে নাগরদোলা ঘুরছিল বনবন করে। ফোন রেখে কোনওরকমে নিজের সিটে ফিরে এলাম। রঞ্জন ও রামানন্দ এখনও আমাকে দেখছে। আমি দু-হাতে মাথা রেখে চুপ করে বসে রইলাম। আমার চোখের সামনে বিনোদ শুক্লার স্যুট পরা দেহটা লাট খাচ্ছে শূন্যে।

ছুটির পর ভীষণ ভয়ে-ভয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। মাকে চেষ্টা করেও এসব কথা বলতে পারলাম না। তবে রাতে বিছানায় শুয়ে সুধাকে সব বললাম। ও অনেক আগেই আমার হাবভাব লক্ষ করেছিল, কিন্তু ভেবেছে সেসবই পরশুর ভয়ঙ্কর ঘটনার জের।

আজকের টেলিফোনের কথা শোনার পর সুধাও ভয় পেল। বলল, 'কাল ভোরে তুমি আর দৌড়তে বেরিয়ো না। বলা যায় না কখন কী হয়। ওরা অফিসের খবর যখন পেয়েছে তখন নিশ্চয়ই বাড়ির ঠিকানাও জেনে ফেলেছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার মনটা খাঁচায় বন্দি খ্যাপা জন্তুর মতো ছুটোছুটি করছিল। পাগল হয়ে যাব বুঝি! কী করি এখন!

পরদিন সকালে থানায় গেলাম মোহন সিং অরোরার সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে শুনলাম, উনি কোথায় একটা রেইডে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তখন ভাবলাম অফিস থেকে ওঁকে ফোন করব।

অরোরা টেলিফোনে আমাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলেন। বললেন, কোনওভাবেই যেন ভেঙে না পড়ি। গ্যাংটাকে গারদে ভরতে অন্তত দিন সাত-দশ দরকার। প্রয়োজনে পুলিশ অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবে। আমার কি বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসানো দরকার?

আমি বললাম, না, তার দরকার নেই। কারণ সেই পাহারায় যে কতটুকু উপকার হবে তা সবাই জানে। অরোরাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

সারাটা দিন কাজে খুব একটা মনোযোগ দিতে পারলাম না। বিকেল যখন প্রায় পাঁচটা, তখনই ফোনটা এল।

ফোন ধরতেই কালকের ভারী গলার লোকটা হাসল। বলল, 'দত্তবাবু, ইরাদা বদ্‌লা কেয়া?'

আমি আবার পুরোনো কথাই বললাম। অনেক অনুনয় বিনয় করলাম। উত্তরে অন্য কেউ টেলিফোনটা নিয়ে ঘেন্না মেশানো স্বরে বলল, 'সালা আবভি বনতা হ্যায়। কোটি টাকার মাল হজম করে ন্যাকা সাজছে। তু কেয়া হ্যায় রে? আপনি বিবিকা ভি কুছ খয়াল নহি হ্যায়?' টেলিফোনে লোকটা হাসল টেনে-টেনে। বলল, 'রাত দশটায় চাণক্যপুরীতে চলে আসুন, দত্ত সাব। চাণক্য হোটেলের কাছে দাঁড়াবেন। আমরা আপনাকে

BanglaBook.org

চিনে নেব। তারপর আড়ালে কথা হবে। ও হ্যাঁ, ওখানে আপনার বিবির সঙ্গেও দেখা হবে—।'

সুধা! আমি কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই বাধা দিয়ে ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'না, না, আপনাকে কোনও তক্‌লিফ করতে হবে না। আপনার বিবিকে আমরাই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসব।'

মনে আছে, সেই মুহূর্তে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। সহকর্মীরা ছুটে এসে ভিড় জমাল আমার কাছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারলাম না। বুকের ভেতরে বোবা কান্না।

সুধা! সুধা!

গলা ছাপিয়ে ওঠা কান্না চাপতে চেষ্টা করলাম। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে অবসন্ন হয়ে বসে পড়লাম। এ কোন ভয়ঙ্কর খেলায় জড়িয়ে পড়লাম আমি। কাউকে কিছু বলতে পারছি না, শুধু নিজের বুক ফেটে মরছি।

রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম, সুধা নেই। মা বাবার ফটোয় একটা মালা পরাচ্ছিল। প্রতি বৃহস্পতিবারেই পরায়। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুধার কথা মাকে জিগ্যেস করলাম। মা বলল যে, এই কিছুক্ষণ আগে ও সাবিত্রী সিনেমা হলের কাছে গেছে। হলের লাগোয়া স্টেশনারি দোকান থেকে একটা প্যাকেট চানাচুর আর চিপ্‌স কিনতে। এক্ষুনি ফিরে আসবে। তা ছাড়া, এ-সময়ে ওর একটু হাঁটাহাঁটির প্রয়োজন।

মায়ের কথা শুনছিলাম, আর আমার বুকের ভেতরে ঝড়টা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছিল। কী করে মাকে বলি যে, সুধা এক্ষুনি আর ফিরবে না।

আমি জামা-কাপড় না ছেড়েই আবার বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। রওনা হলাম থানার দিকে। আমার বুকের ভেতরে ঝড় থেমে গেছে। এখন সেখানে ঢুকে পড়েছে একটা বাঘ। দাঁত-নখ দিয়ে খুশি মতো খুবলে খাচ্ছে আমার ফুসফুস-হৃৎপিণ্ড-পাকস্থলী।

মোহন সিং অরোরা হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে তাঁর হাসি মিলিয়ে গেল। আমাকে একপাশের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, দত্তবাবু?'

আমি ওঁকে সব বললাম। আমার গলা বুজে যাচ্ছিল বারবার। ঘরের জানলা দিয়ে একটুকরো আকাশে গুটিকয়েক তারা দেখা যাচ্ছিল। ওগুলো ঝাপসা হয়ে গেল।

অরোরা কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে জিগ্যেস করলেন, 'সত্যি, ম্যাকের পেটির কথা আপনি কিছু জানেন না?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনিও আমাকে অবিশ্বাস করছেন?'

অরোরা এবারে খুব খুঁটিয়ে আমার মুখ দেখলেন। কয়েকমিনিট সময় কেটে গেল। তারপর বললেন, 'আই অ্যাম হেল্পলেস, মিস্টার দত্ত। আপনার বিবির লাইফ রিস্ক। আমার মনে হয় না, এ-ক্ষেত্রে পুলিশের কিছু করাটা ঠিক হবে। আপনি বরং আজ রাতে চাণক্যপুরীতে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করুন। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

অরোরার উপদেশ আমাকে অবাক করছিল। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। কী করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

ঘরে আমরা একাই ছিলাম। অরোরা আমার খুব কাছে সরে এলেন। পিঠে হাত

BanglaBook.org

রেগে চাপা গলায় বললেন, 'পেটির মালটা ওদের দিয়েই দিন না, মশাই, তাহলে তো সব প্রবলেম সলভ হয়ে যায়। কেন বেহুদা বিবিটাকে খোয়াচ্ছেন?'

আমি সাপের ছোবল খেয়ে চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। সাপটা তখনও ফণা দুলিয়ে হিসহিস করছে। আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে লাগল। মনে পড়ল, ফোনে ওরা বলেছিল সব মিলিয়ে কোটি টাকার মালের খেলা। সুতরাং এই ছকের মধ্যে পুলিশ অফিসারের দাবার ঘুঁটি হতে অসুবিধে কোথায়! আমার শরীর কাঁপছিল থরথর করে।

অরোরা তখন মুচকি হাসছেন। আর এতক্ষণের জটিল অঙ্কটা এখন দিব্যি জট ছাড়িয়ে মিলে যেতে লাগল। আমার অফিসের টেলিফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা, তারপর...।

হঠাৎই আমার হাসি পেল। সালা, সং নাগরিককা বচ্চা! একটা ঠান্ডা লোহার দেওয়ালে আমি ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছিলাম। ইচ্ছে করছিল অরোরাকে নিয়ে...।

অরোরা আবার বললেন, 'শৌচ লিজিয়ে, আপকি বিচার হ্যায়...আপ্‌হিকা বিবি হ্যায়, ভাই...।'

আমি ঘরের চারপাশটা একবার দেখলাম। কেউ নেই। শুধু নিরেট চারটে দেওয়াল হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

অরোরা আমাকে থানার সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আরও অনেকবার কানের কাছে হিসহিসিয়ে পুরোনো কথাগুলো বললেন। ওঁর চোখ চকচক করছিল।

আমি পাথরের মতো ভারী জিভ নিয়ে বেরিয়ে এলাম শীতের রাস্তায়। ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে সাতটা। আর মাত্র আড়াই ঘণ্টা।

বাড়ি ফিরে মাকে কীসব বলেছিলাম মনে নেই। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম অন্ধকার পথে। পাগলের মতো এ-পথ ও-পথ ঘুরে অটো, বাস, ট্যাক্সি বদল করে ঠিক ন'টার সময়ে হাজির হলাম হোটেল চাণক্যর কাছে।

হোটেলের দরজায় আলোর জৌলুস, কিন্তু সামনের চওড়া রাস্তাটা কিছুটা দূরে গিয়েই ঘন অন্ধকার। রাস্তার ধারে ঝুপসি গাছের সারি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে শীতের বাতাসে কাঁপছে। হাড়-কাঁপানো শীতে আমার হাত-পাও কাঁপছিল। কিন্তু, কই, কেউ নেই তো! অবশ্য এখনও আসার সময় হয়নি ওদের।

রাস্তায় পায়চারি করে, গাছতলায় দাঁড়িয়ে, একটা ঘণ্টা অতিকষ্টে কাটালাম। তার ঠিক পরেই চাদর মুড়ি দেওয়া একটা লোক এসে হাজির হল আমার কাছে। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'অতীন দত্ত?'

আমি সম্মতি জানাতেই আমাকে ডেকে নিয়ে চলল লোকটা। হোটেল চাণক্য থেকে ক্রমেই আরও দূরে, আরও দূরে চলে যাচ্ছিলাম আমরা। মাথার ওপরে কালো আকাশে তারার সংখ্যা বাড়ছিল।

মিনিট দশ-পনেরো হাঁটার পর একটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল। রাস্তার বাঁ দিকে কয়েকটা গাছের পিছনেই ফাঁকা জায়গাটা। অন্ধকারে কেউ টর্চ জ্বালল সেদিক থেকে। চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটা আমাকে দাঁড়াতে বলল। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কালো ছায়ার মতো চার-পাঁচজন লোক এসে ঘিরে ধরল আমাকে। চারটে হাত পেশাদারি ভঙ্গিতে আমার শরীর সার্চ করল। অন্ধকারের মধ্যেই কেউ একজন জিগ্যেস করল, 'পেটিকা মাল কাঁহা?'

আমি আবার সত্যি কথাটাই ওদের বলতে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার চুলের

BanglaBook.org

মুঠি চেপে ধরল কেউ। ঘাড়টা টেনে পিছন দিকে বেঁকিয়ে ধরল। তারপর একই প্রশ্ন আবার।

আমি উত্তর দিচ্ছিলাম আর তার পাশাপাশি যথেচ্ছ ঘুষি-চড়-লাথি পড়ছিল আমার গায়ে, পিঠে, মুখে, পেটে।

রাস্তা দিয়ে কোনও গাড়ি যাচ্ছে না। আর এই ঠাণ্ডা রাতে পথচারী ব্যাপারটাই অবাস্তব। ফলে আমার যন্ত্রণার চিৎকার কেউই শুনতে পাচ্ছিল না—একমাত্র ওই লোকগুলো ছাড়া।

আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, কেউ আমাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল। সেই প্রথম আমার মুখ দিয়ে সুধার নামটা বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, 'যা, ও আউরতকো লে কে আ।'

তখন আর-একজন বলল, 'আর দু-মিনিট বস, পারমিন্দার সবে কাজে লেগেছে। রোটি বনানেমে থোড়া জাদা টাইম লগ্‌তা হ্যায় উস্‌কো।'

দু-তিনজন হেসে উঠল এই কথায়।

ঠিক তক্ষুনি টর্চের আলোটা জ্বলে উঠল। আলোটা এপাশ-ওপাশ ঘোরালো কেউ। তখন দেখতে পেলাম, জায়গাটা পুরো ফাঁকা নয়। কয়েকটা পুরোনো গাড়ি পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তার মধ্যে একটা ম্যাটাডোর ভ্যানও চোখে পড়ল।

ভ্যানের ওপরে গিয়ে স্থির হল টর্চের আলো। আলোকরশ্মির সূক্ষ্ম সুতোগুলো আমার চোখের সামনে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মাথা দপদপ করছিল অসহ্যরকম। দেখলাম, ভ্যানের দরজা শব্দ করে খুলল। একটা লোক নেমে এল। তারপর সে পিছন ফিরে টেনে নামালো একটা মেয়েকে। আলোর রেখা ওর শরীর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তাতেই আমি ওর আধখোলা শাড়ির রঙটা চিনতে পারলাম।

সুধা!

ও যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। কাতরাচ্ছিল। মাথার চুল ছত্রভঙ্গ। শরীরও।

সুধা, আমার সুধা!

ওই তো, বেনারসী পরে আমার মুখোমুখি বসে রয়েছে ফুটফুটে মেয়েটা। চোখগুলো কী গভীর! আমার বেনিয়মী জীবনে সুন্দর এক শাসন হয়ে উঠেছে ও। ওকে স্কুটারে বসিয়ে নিয়ে গেছি কত জায়গায় : আগ্রাঘর, প্রগতি ময়দান, কুতুব মিনার, লাল কেল্লার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড। মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। বাতাসে ওর চুল উড়ছে, চোখের পালক কাঁপছে। আর আমি দেখছি ওকে।

বাড়ির খোলা বারান্দায় বসে আছি রাতের আঁধারে। চাঁদ-তারা দেখতে-দেখতে ও গানের কলি গেয়ে উঠেছে : 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে...।' জানি, সে-কথা আমার 'নীরব নয়নে' ফুটে উঠেছিল। আমি হেসে উঠেছি। ওর কাছে নিজেকে লুকোতে পারিনি কখনও। ও সবসময়েই আমার না-বলা কথা বুঝে নেয়।

আমি ভোরবেলা দৌড়তে যাই। সুধা বলত, 'আমিও যাব—।'

'পাগল নাকি!'

'ওসব জানি না, আমিও দৌড়ব—।' ও জেদ ধরত।

এই নিয়ে তিনদিন আমার ভোরে দৌড়নো বন্ধ। ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি, লড়াই। শেষে রফা হয়েছিল অদ্ভুত। ও দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি আমাদের

BanglaBook.org

বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে পাক দিয়ে যাব। যতবারই বাড়ির সামনে দিয়ে যাব, ততবারই ওর দিকে তাকাতে হবে, দেখতে হবে ওকে।

অগত্যা তাই। এই শর্ত মেনে নিয়েই বেরোতাম কাক-ভোরে। তবে ছুটতে-ছুটতে চলার সময়ে ওপরে মুখ তুলে তাকিয়ে বারান্দায় দাঁড়ানো সুধাকে দেখতে বেশ লাগত। আমাকে দেখে ও মুখ টিপে-টিপে হাসত দূর থেকে। আর আমি বহু দূর থেকেই ওর শাড়ির রঙ দেখে ওকে চিনে ফেলতাম।

এখনও সেই শাড়ির রঙ দেখেই চিনতে পারলাম।

সুধা!

আমি বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। কারণ পিঠে, শিরদাঁড়ার ঠিক নীচে, প্রচণ্ড জোরে কেউ একটা লাথি কষিয়ে বলে উঠল, 'চিল্লাও, জি ভরকে চিল্লাও! শায়েদ কোই আকে তুম্‌হে বচালে।'

আমার মুখে টক স্বাদ উঠে এল। না, কেউ আমাকে বাঁচাতে আসবে না।

তখন তিনটে ছায়া আমার কাছ ঘেঁষে এল। একজন বলল, 'বউটা এখনও বেঁচে আছে, তবে পেটের বাচ্চাটার কথা বলতে পারছি না। বল্‌, পেটির মালটা কোথায় লুকিয়েছিস।'

আমি বুঝতে পারলাম, আর কোনও লাভ নেই। ওরা আমাদের শেষ করে দেবে।

সুধাকে কেউ বোধহয় আমার কথা বলে থাকবে। আর তখনই টর্চের আলোটাও এসে পড়ল আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরে। তক্ষুনি এক বীভৎস চিৎকার করে উঠল ও। কিন্তু চিৎকারটা মাঝপথে হঠাৎ কেটে গেল। একটা বিশ্রী 'ওঁক' শব্দ তুলল সুধা। কেউ কি ওর পেটে লাথি মারল? অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ওদের আলোচনা শুনতে পাচ্ছিলাম টুকরো-টুকরো ভাবে। ওরা নতুন কোনও উপায় ভাবছে। তারপর একসময় লোকগুলো চাপা হেসে উঠল। একজন বলল, 'দত্তবাবু, অব্‌ আখরি মওকা। আব্‌ভি সৌচিয়ে—।'

আমি কোনও কথা বলতে পারছিলাম না। বিনোদকুমারের দেহটা শূন্যে বনবন করে লাট খাচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম, গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ।

এমনসময় ওরা অশ্রাব্য খিস্তি করে আমার সোয়েটার-জামা-প্যান্ট সব টেনে-টেনে খুলতে লাগল। টর্চের আলোটা এদিক-ওদিক ঘুরছিল। সুধাকে চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে একজন। ও তখনও কাতরাচ্ছে।

রক্ত হিম করা ঠান্ডা লক্ষ-লক্ষ ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ হয়ে আমার গায়ে হুল ফোটাতে লাগল। শরীরের সাড় মিলিয়ে যেতে লাগল অস্বাভাবিক দ্রুততায়। ওদের হাতে আমার দেহটা এলোপাথাড়ি লোফালুফি হচ্ছিল যেন। তারই মধ্যে দেখলাম, সুধাকে ধাক্কা দিয়ে আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হল ভ্যানের মধ্যে।

আকাশে চাঁদ অনেকক্ষণ ছিল না। এইবার একটুকরো দেখা গেল। ভ্যানের দরজাটা দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে সপাট লাথিতে ফেলে দেওয়া হল ইট-পাথরের টুকরোয় ভরা মাটিতে। একজন বলল, 'সালা, পুলিশে গিয়েছিল রিপোর্ট লিখাতে।' আর একজন হেসে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'রমেশ, কান্‌পুরিয়াঠো দে হম্‌কো। সালা, সং নাগ্‌রিককা বচ্চা!'

BanglaBook.org

আমার বাঁ-পাশের লোকটা বোতাম টিপতেই টর্চের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল কানপুরিয়ার ফলা।

আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখছি। কোনও প্রতিবাদ নেই, চিৎকার নেই। রাতের ভয়ঙ্কর শীত আমাকে চেটেপুটে খাচ্ছে—খাচ্ছে। ওদের কথাবার্তা ডাকাডাকি কানে আসছে। নামগুলো শুনতে পাচ্ছি, পারমিন্দার, অজিত, রমেশ, লোধা, বস্....মোট ক'জন ওরা?

এমনসময় আমার বাঁ-পাঁজরের নীচে কেউ ছুরি চালাল। বারবার। তবে গভীরভাবে নয়, কিন্তু জ্বালা করতে লাগল। হু-হু ঠান্ডা বাতাস পলকে জমাট করে দিল রক্ত। একজন জুতো দিয়ে আমার কপাল চেপে ধরল। আর-একজন কী যেন নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিল কাটা জায়গায়।

আশ্চর্য! এতক্ষণ যে-শরীরটাকে আমি অকেজো মনে করেছিলাম সেই অসাড় শরীরটা ভয়ঙ্করভাবে ছটফট করতে লাগল—মৃগী রোগীর মতো। একটা তীব্র ভাঙা চিৎকারও বেরিয়ে এল। আর আমাকে ঘিরে লোকগুলো হাসছিল। একটু আগের বলা কথাটা আমার কানে বাজছিল : 'সালা, সং নাগরিককা বচ্চা!'

তখনই পেট্রলের গন্ধ পেলাম। ঝাপসা চোখে দেখলাম, দুজন লোক ভ্যানটার গায়ে পেট্রল ঢালছে। বেশ কয়েক টিন পেট্রল ওরা খালি করে দিল এইভাবে। তারপর একজন আমার গায়ে শব্দ করে থুতু ছিটিয়ে বলল, 'অবভি বোল, পেটিকা মাল কাঁহা গিয়া?'

আমি কোনওরকমে কাতরে উঠলাম, 'জানি না। ভগবান কি কসম, মুঝে কুছ নহি মালুম!'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। শুধু পেট্রলের গন্ধ বাতাস ভারী করছিল।

তারপর আর একজন বলল, 'বস্, সালা পাগল হ্যায়। আপনি বিবিকা ভি খয়াল নহি হ্যায়।'

একটা ভারী গলা কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'লোধা, আগ লগা দে ভ্যানকো।' তারপর আমাকে লক্ষ করে বলল, 'যা সালা, ওই আগুনে শীত তাড়া গে।'

একটা আগুনের বিন্দু ছিটকে গিয়ে পড়ল ভ্যানটার গায়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল ভয়ঙ্কর আগুন। আমি চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু গলা থেকে শুধু কান্না মেশানো গোঙানি বেরিয়ে এল একটা। টের পেলাম, লোকগুলো এবারে চলে যাচ্ছে একে-একে। টর্চের আলো আর দেখা যাচ্ছে না। কারণ জ্বলন্ত ভ্যানের আলো রাতকে দিন করে দিয়েছে। আগুনের লিকলিকে শিখা খাড়াভাবে সাপের মতো নাচছে। নাচছে।

শীতের পোশাকে মুড়ি দেওয়া লোকগুলো ছুটে চলে গেল একটা ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে। আর তার একটু পরেই তিনটে মোটরবাইক সেখান থেকে বেরিয়ে এল। আগুনের লাল-হলদে আলো খেলে গেল ওদের গায়ে, মুখে, মাথায়। শান্ত নির্জন রাতে বিকট আওয়াজ তুলে মোটরবাইকগুলো ছুটে চলে গেল বড়রাস্তা ধরে।

আমি হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিলাম। বাঁ-পাঁজরের নীচে এখন আর ততটা জ্বালা করছে না। ঠান্ডা রাত সব অনুভূতি অসাড় করে দিয়েছে। একটু দূরেই ভ্যানটা পুড়ছে। শব্দ উঠছে চিড়বিড়-চিড়বিড়। কী একটা ফাটার শব্দ হল। তারপরই সুধার চিৎকার আমি শুনতে পেলাম।

BanglaBook.org

ওই চিৎকারটা এক নতুন শক্তি দিল আমাকে। মাটিতে কয়েক পাক গড়িয়ে কোনওরকমে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর একটু-একটু করে উঠে বসতে লাগলাম। কিন্তু কয়েকবারের চেষ্টায় বুঝলাম, ঠান্ডায় অসাড় শরীর আমাকে উঠতে দেবে না। তখন শরীরটাকে গড়িয়ে নিয়ে গেলাম ভ্যানের কাছাকাছি। সুধা তখনও চিৎকার করছে।

আগুনের তাপ বোধহয় আমাকে ক্ষমতা জোগাল। কারণ এইবারে অনেক চেষ্টায় উঠে বসতে পারলাম, দাঁড়াতেও পারলাম কোনওরকমে। শীত-তাড়ানো ভয়ঙ্কর আগুন আমাকে সতেজ করে তুলছিল, আর ভ্যানের ভেতরে বন্দি সুধা একটু-একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমি বেঁকেচুরে বিচিত্রভাবে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। তারপর জ্বলন্ত ভ্যানটাকে ঘিরে সার্কাসের সঙের মতো লাফাতে লাগলাম। কিন্তু গলা দিয়ে সেরকম কোনও আওয়াজ বেরোল না।

ঠিক তখনই একটা তীব্র পোড়া গন্ধ নাকে এল। গাড়ির ভেতর থেকে অসহ্য যন্ত্রণার এক শেষ চিৎকার শুনতে পেলাম। আমার চোখে জল এল। গালের ওপরে গড়িয়ে পড়তে লাগল। গাড়ির মধ্যে ছোটখাটো বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছিল মাঝে-মাঝেই। এইবার হঠাৎই একটা জোরালো বিস্ফোরণ গাড়িটাকে চুরমার করে দিল। বিস্ফোরণে ছিটকে পড়া নানান টুকরো চারপাশে ছড়িয়ে জ্বলতে লাগল, পুড়তে লাগল। আর মাংস-পোড়া গন্ধ আমার গলা টিপে ধরতে চাইল।

বুকের বাঁ-দিকের জ্বালাটা আবার শুরু হয়ে গেছে। আগুনের আলো আমার উলঙ্গ শরীরে নানান নকশা কাটছে। কালো ধোঁয়া শীতের রাত ঠেলে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে চারিদিকে।

আমি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম। নিজের কানেই সে চিৎকার ভারী অদ্ভুত লাগল। আর তার পরক্ষণেই আমার মাথার ভেতরে কেউ যেন রাইফেল ফায়ার করতে লাগল। একবার, দু-বার, তিনবার—বারবার। আমি আর পারলাম না। টাল হারিয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। মাথার ভেতরে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। জ্ঞান হারানোর আগে শেষবারের মতো দেখেছিলাম, মরা চাঁদ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে আরও মলিন হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

পরে শুনেছি, সকালবেলা কারা যেন আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে চাণক্যপুরীর ক্যাপিটাল নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেয়।

ঘটনাটা নিয়ে পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু আমি ওদের কোনও কথারই ঠিকঠাক জবাব দিতে পারিনি। তখনই পুলিশের সন্দেহ হয় এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে আমার মাথায় নাকি গোলমাল দেখা দিয়েছে।

কথাটা বোধহয় সত্যি, কারণ শরীর সেরে ওঠার পর সেই রাতের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আমাকে তেমন কোনও কষ্ট দিত না। সবকিছুই কেমন মেনে নিতে শিখে গিয়েছিলাম। আমাকে লাজপত নগরের এক মেন্টাল হোমে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। আমার অফিস থেকে ট্রিটমেন্টের সব খরচ দিয়েছিল। মা খাবার নিয়ে আমাকে দেখতে আসত। আমরা চুপচাপ পরস্পরকে দেখতাম। মা খুব কাঁদত। আর আমি অবাক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

এইভাবে একটানা সাত মাস ট্রিটমেন্টের পর আমি ছাড়া পেলাম। মনে আছে,

BanglaBook.org

ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় আমার সুধার কথা স্পষ্টভাবে মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল বিনোদকুমার শুক্লার কথা, মোহন সিং অরোরার কথা, পারমিন্দার, অজিত, লোধা, রমেশ আর বসের কথা। সেইসঙ্গে মনে পড়ত না-জন্মানো শিশুটার কথা।

আমি হটহাট করে নাকের কাছে মাংস-পোড়া গন্ধ পেতাম, পেট্রলের গন্ধ পেতাম, কিন্তু ডাক্তাররা আমার কথায় তেমন আমল দিত না।

হোমে শেষ দুটো মাস আমার কান্না পেত। তখন মা আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি পেয়েছিল। আমরা চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকতাম। আর চোখের জল নিজের খেয়ালখুশি মতো গড়িয়ে যেত।

হোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমার ইচ্ছা-অবসরের দরখাস্ত মঞ্জুর করল কোম্পানি। দিল্লির পাততাড়ি গুটিয়ে আমরা দুজনে চলে এলাম কলকাতায়। মনে পড়ে, দিল্লি ছেড়ে আসার সময় অদ্ভুত একরকম দুঃখও হয়েছিল আমার। আর মা ভীষণ কান্নাকাটি করছিল। বাবার কথা মনে পড়ছিল বোধহয়।

আমি সেদিন ভোরে আবার দৌড়তে বেরিয়েছিলাম। ভোরের ফাঁকা রাস্তায় ছুটতে-ছুটতে মনে হচ্ছিল সুধা দূরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বাবা আমার পাশে-পাশে দৌড়চ্ছে। কী যেন বলছে। বাবার ঠোঁট নড়ছে। কিন্তু কোনও কথাই আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমার মাথার ভেতরে রেলগাড়ির ঝমাঝমের মতো শুধু বাজছে : 'সালা, সং নাগরিককা বচ্চা! সালা, সং নাগরিককা বচ্চা...'

কলকাতায় এসেছি আজ প্রায় ছ'বছর, কিন্তু এখনও সেই রাতটা আমার বড় মনে পড়ে। আর হঠাৎ-হঠাৎ আমি পোড়া গন্ধ পাই, পেট্রলের গন্ধ নাকে আসে, আর বুকের বাঁ-দিকটায় জ্বালা করে। অসহ্য জ্বালা...।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমি পুরোপুরি সেরে উঠেছি তো?

সুনয়নাকে যখন সব কথা বলা শেষ হয়েছে ঠিক তক্ষুনি বনি লালিকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল আমাদের কাছে। বনির হাতে একটা অপরূপ কলাবতী ফুল। ফুলটা ও আমার হাতে দিয়ে বলল, 'উইথ লাভ, আঙ্কল।'

আমি চোখ মুছে ফুলটা ওর হাত থেকে নিলাম। সূর্য উঠেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। তার কিরণ এসে পড়েছে ফুলের গায়ে।

সুনির দিকে তাকিয়ে দেখি, ও আমাকেই দেখছে। ওকে কখনও এমন শান্ত চুপচাপ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমরা পার্কের খরগোশের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। লালি খাঁচার দিকে তেড়ে-তেড়ে যাচ্ছিল আর কচি গলায় 'ইয়াপ' 'ইয়াপ' করে আওয়াজ করছিল। বনিও ওর সঙ্গে-সঙ্গে খাঁচা ঘিরে ছুটছে। ফুলটা হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। নাকে আসছে পুকুরের জলের গন্ধ। বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতার ঝালর কাঁপছে।

সুনি বলল, 'বুড্ঢা জনাব, পুরোনো কথা সব ভুলে যাও। স্টার্ট আ নিউ লাইফ। লাইফ ক্যান বি বিউটিফুল—তোমার হাতের ওই ফুলটার মতো সুন্দর হতে পারে।'

আমি বললাম, 'সুনি, তুমি দিল্লিকে ভালোবাসো, কিন্তু আমি পারি না। মনে পড়ে, কতদিন দিল্লি আর কলকাতা নিয়ে বহেজ করেছি তোমার সঙ্গে? তুমি বলো দিল্লি বেটার, আর আমি বলেছি, না, কলকাতা ভালো। এবার বুঝেছ, কেন?'

BanglaBook.org

সুনি আমার হাত থেকে ফুলটা নিয়ে বলল, 'বুঝেছি। আজ থেকে আমি ক্যালকাটার দলে, ঠিক আছে? ক্যালকাটায় কত ভালো-ভালো জিনিস রয়েছে—এই ফুল, গাছপালা, পুকুর, অ্যান্ড য়ু, বুড়ঢা জনাব। আর দিল্লির চেয়ে ক্যালকাটা অনেক সেফ, তাই না?'

আমি হেসে ফেললাম। বুকের বরফটা গলে যাচ্ছিল, আস্তে-আস্তে। বললাম, 'হ্যাঁ, ক্যালকাটা অনেক নিরাপদ। এখানে তোমার কোনও ভয় নেই।'

সুনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কেন ভয় থাকবে? তুমি থাকতে ভয় কী? কেয়া, সচ্ কহা ম্যায়নে?'

আমি কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখলাম। তারপর বললাম, 'সচ্।'

সঙ্গে-সঙ্গে ফুলটা আকাশে ছুড়ে দিয়ে সুনি চেঁচিয়ে উঠল, 'তব্ তো বন্ গয়ি বাত, মিলাইয়ে জনাব হাথ।' বলে আমার ডানহাতটা ওর নরম চেটোয় বন্দি করে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল। ছুটন্ত বনি চমকে দিদির দিকে তাকাল। লক্ষ করলাম, পার্কের বেঞ্চিতে বসা দুজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের পাগলামি দেখছে।

চার

এখন, অন্ধকার ঘরে বসে, সুনির কথাগুলো মনে পড়ছিল। আর কলকাতা-দিল্লি দুটো শহর ওলটপালট হয়ে গুলিয়ে যাচ্ছিল। ক্যালকাটা দিল্লির চেয়ে অনেক সেফ, অনেক নিরাপদ। হুঃ! আমাদের কারও নিরাপত্তা নেই। কলকাতা-দিল্লিতেও নেই কোনও তফাত।

এখানেও রয়েছে পারমিন্দার, অজিত, রমেশ, লোধা, বস্ আর—হয়তো বা মোহন সিং অরোরা। সুনয়না বলেছিল, লাইক ক্যান বি বিউটিফুল। জীবন অনেক সুন্দর হতে পারত। যদি আমার বুকের বাঁ-দিকটায় এই মুহূর্তে জ্বালা না করত, নাকে সেই বিশ্রী মাংস-পোড়া গন্ধটা না আসত, তা হলে জীবন অনেক সুন্দর হতে পারত। অনেক সুন্দর।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করেছি। অপেক্ষা করেছি কখন সকাল হবে, কখন। কারণ কাল সকালেই তো লোকগুলো কী একটা জিনিস পাঠাবে জগদীশ আচার্যকে। ঠিক করলাম, অফিসে ক'দিন ছুটির একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দেব, আর সময় করে আমার অফিসের সহকর্মী সুশান্ত তালুকদারকে একটা খবর দেব। ওর এক কাকা লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে আছেন বলে শুনেছি। তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে যদি কিছু করা যায়।

সকালে মা সুনয়নার ব্যাপারে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আমি ভালো করে জবাব দিতে পারলাম না। মা বাবার ফটোয় মালা দিচ্ছে দেখে মনে পড়ল, আজ বৃহস্পতিবার। আমি তৈরি হয়ে বেরোনোর সময়ে মাকে বললাম যে, সুনিদের বাড়ি যাচ্ছি।

মা বিড়বিড় করে বলল, 'কোথাও শান্তি নেই। তুই দেখ, যদি ওকে বাঁচাতে পারিস। ওর কপাল যেন সুধার মতো না হয়।'

আমি মায়ের বিষণ্ণ মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছে, ছ'বছর আগেকার ঘটনাটা কেউ যেন আবার প্রথম থেকে শুরু করেছে। ঠিক একই সিনেমা

BanglaBook.org

দু-বার দেখার মতো। শুধু স্থান-কাল-পাত্র বদলে গেছে।

সুনিদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দরজায় বসানো কলিংবেলের বোতামে চাপ দিলাম।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর দরজা খুলল হরিনন্দন। ওর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। আমি জিগ্যেস করলাম বাবু আছেন কি না। ও খুব অস্পষ্ট গলায় বলল, বসবার হলঘরে সবাই আছেন।

আমি ভেতরে ঢুকতেই হরিনন্দন দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। লাল-কালো নকশা-কাটা ম্যাট পাতা। দু-পাশের দেওয়ালে কিকে গোলাপি ডিসটেম্পার। একটা শৌখিন ক্যালেন্ডার ঝুলছে সেখানে। জুন মাসের তারিখের ওপরে অমরনাথের বরফের ছবি। ক্যালেন্ডারের ঠিক ওপরেই একটা সুন্দর ছাঁদের দেওয়াল ঘড়ি। কোয়ার্টজ। তাতে দশটা প্রায় বাজে।

সামনেই ডানদিকে বসবার ঘরটা। সেখান থেকে কিছু চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। আমি জুতো-পরা পা ম্যাটে ঘষে নিলাম। আর তক্ষুনি বসবার ঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, 'না! হাত দিয়ো না ওতে!'

মেয়ের গলা। নিশ্চয়ই প্রভাবতী। হরিনন্দন আমাকে পাশ কাটিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। হয়তো বলেছে যে, আমি এসেছি। কারণ, পরক্ষণেই বসবার ঘরের দরজায় হাজির হলেন প্রভাবতী। মাথার চুল কাল রাতের মতো পরিপাটি নেই। ব্যক্তিত্বের বেশ কিছুটা উধাও হয়ে সেখানে দাগ কেটেছে আতঙ্কের বলিরেখা। আমাকে দেখেই উত্তেজিত চাপা গলায় বললেন, 'অতীন, সেই জিনিসটা এসেছে। আমি ওদের হাত দিতে মানা করেছি। তুমি একটু দ্যাখো।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিষ্টি সুরে দশটার ঘণ্টা শুরু হয়ে গেল দেওয়াল ঘড়িতে।

আমি বসবার ঘরে ঢুকলাম। প্রভাবতী আমার পিছনে। আর সামনে হরিনন্দন, জগদীশ আচার্য এবং তৃতীয় এক অপরিচিত ব্যক্তি। ওদের সকলেরই নজর ঘরের প্রায় মাঝখানে রাখা ছোট টেবিলটার দিকে।

টেবিলে সবুজ টেলিফোনের পাশে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ। আর তার একটা কোণা ঢেকে বসানো রয়েছে বাদামি কাগজে মোড়া একটা ছোট প্যাকেট—মাপে কোনও বইয়ের মতোই হবে।

জগদীশ হরিনন্দনকে ভেতরে যেতে বললেন। প্রভাবতী আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দস মিনট পহেলে ইয়ে প্যাকেট আয়া।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কে দিয়ে গেল?'

জগদীশ বললেন, 'জানি না। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে হরিনন্দন দরজা খুলেই দেখে প্যাকেটটা দরজার কাছে পড়ে আছে। আর কেউ সেখানে নেই।'

আমি জিগ্যেস করলাম, আর কোনও টেলিফোন এসেছিল কি না। তাতে জগদীশ মাথা নেড়ে জানালেন, আসেনি।

প্রভাবতী আমাকে বসতে বললেন। তারপর স্বামীকে লক্ষ করে বললেন, 'অতীনের হাতে পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। ও-ই প্যাকেটটা খুলে দেখুক কী আছে ওতে।'

টেবিলটাকে ঘিরে আমরা বসলাম। জগদীশের পরনে গেঞ্জি আর পাজামা। আজ দাড়ি-টাড়ি কেটে বেশ সাফসুতরো। আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'মিস্টার

BanglaBook.org

দত্ত, এই আমার ভাই, নগেন। আর নগেন, ইনি মিস্টার অতীন দত্ত—আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। এইটি থ্রি পর্যন্ত দিল্লিতে ছিলেন।'

নগেন আচার্য আমাকে নমস্কার করল। আমিও প্রতিনমস্কার জানালাম। জগদীশের সঙ্গে তার ভাইয়ের কী একটা ব্যাপারে দেড়-দু-যুগ আগে মনকষাকষি হয়েছিল—অন্তত কাল প্রভাবতী সেইরকমই বলেছিলেন। তা হলে হঠাৎই আজ সকালে সে কেমন করে বেলেঘাটা থেকে এসে হাজির?

নগেন আচার্যের মুখটা সরু, গালে চাপদাড়ি, ফরসা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, পরনে টেরিকটের প্যান্ট-শার্ট—একটু বেশি রঙচঙে। গায়ের জামাটা ঢোলা হলেও স্বাস্থ্য যে সাধারণ নয় সেটা টের পাওয়া যায়। বয়েস চল্লিশের এধার-ওধার।

প্রভাবতী আমার পাশে একটা ডাইস নিয়ে বসেছিলেন। আমার হাতে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন, 'খোলো—।'

লক্ষ করলাম, জগদীশ ঘামছেন। আর নগেনের মুখে কোনও ভাবের লেশমাত্র নেই। যেন মোমের মুখ।

আমি সুনির কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা তুলে নিলাম। ওটা নেড়ে দেখলাম এপাশ-ওপাশ। সামান্য ঢকঢক শব্দ হল। ওঁরা তিনজনেই আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছিলেন।

আমি এবারে আঠা দিয়ে লাগানো কাগজের মোড়কটা ছিঁড়তে শুরু করলাম।

মোড়কের আবরণ ছিঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা ভিডিও ক্যাসেট, আর একটা ছোট্ট পুরিয়া—বাদামী কাগজে মুড়ে সুতো দিয়ে বাঁধা।

ক্যাসেটটা উলটে-পালটে একবার দেখলাম। অতি সাধারণ—আর পাঁচটা ক্যাসেটের মতোই। ওটা টেবিলে রেখে পুরিয়ার সুতোর বাঁধন খুলতে লাগলাম। সুতো ছাড়িয়ে যখন কাগজের ভাঁজ খুলছি তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

পুরিয়া ফেলে আমি টেলিফোন তুললাম।

'হ্যালো।'

'মাল মিল গয়া?' রুক্ষ কর্কশ গলা।

'হ্যাঁ।' আমি জবাব দিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর : 'ক্যাসেটটা চালিয়ে ভালো করে দেখুন। আপনার লড়কির খবর পাবেন। আর লড়কিকে পেতে গেলে কী করতে হবে তাও বলা আছে। ক্যাসেটটা দেখা হয়ে গেলে প্যাক করে ফেলবেন আবার। তারপর রাতে শোওয়ার সময়ে ওটা ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে দেবেন। যা-যা বললাম তার একচুল এধার-ওধার হলে বক্‌রি জবাই হয়ে যাবে। সমঝে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

তখন ও-প্রান্ত জিগ্যেস করল, 'পুরিয়াটা খুলেছেন?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'না।' কিন্তু তার আগেই প্রভাবতীর চিৎকার আমার কানে ছুঁচ বিঁধিয়ে দিল।

চোখ ফিরিয়ে দেখি প্রভাবতী পুরিয়াটা খুলে ফেলেছেন। তার ভেতরে তুলোয় জড়ানো একটা তেকোনা মতো জিনিস। তার গায়ে কালো-কালো ছোপওয়ালা লোম।

BanglaBook.org

ওটা যে লালির কান সেটা বুঝতে আমার কয়েক লহমা সময় লাগল। প্রভাবতী কিন্তু দেখামাত্রই চিনতে পেরেছেন। কানের গোড়ায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। তুলোটার গায়েও ছিটেফোঁটা রক্তের দাগ। পুরিয়াটা প্রভাবতীর কাঁপা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। কানটা পড়ল কার্পেটের ওপরে।

আমি টেলিফোনে হাসির শব্দ পেলাম। বুঝলাম, ও-প্রান্তের লোকটা প্রভাবতীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে।

টেলিফোনের চাপে আমার কান ব্যথা করছিল। কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম, স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। কোনওরকমে জিগ্যেস করলাম, 'সুনয়না কেমন আছে?'

হাসি থামিয়ে লোকটা বলল, 'ভালো—এখনও পর্যন্ত। যাকগে, ক্যাসেটটা দেখুন জলদি। আমরা রাতে আবার ফোন করব। আবার ওয়ার্নিং দিচ্ছি—পুলিশে যেন কোনও খবর না যায়। আমরা রাত-দিন আপনাদের বাড়ির ওপরে নজর রেখেছি। গুড বাই—।'

আমি টেলিফোন রাখতেই জগদীশ জানতে চাইল, 'কী খবর, অতীনবাবু? আমার বাচ্চি কেমন আছে?'

আমি বললাম, 'বলল তো ভালো। এখন এই ক্যাসেটটা দেখার ব্যবস্থা করুন। এতেই সব খবর পাবেন।'

নগেন আচার্য সোফা ছেড়ে উঠে এল। মেঝে থেকে লালির কানটা দু-আঙুলে ধরে তুলল। তারপর আপনমনেই বলল, 'এটা ফেলে দিয়ে আসছি।'

আমি ওকে বাধা দিলাম। বললাম, 'না। পুলিশ এ থেকে কোনও সূত্র পেলেও পেতে পারে।'

জগদীশ ঘাম মুছে আমার দিকে তাকালেন। অবাক হয়ে বললেন, 'পুলিশ? পুলিশ এর মধ্যে আসছে কোত্থেকে?'

আমি বললাম, 'আমরা নিজেরা এ-ব্যাপারটাকে সামলাতে পারব না। ইট মে বিকাম টু বিগ ফর আস।'

জগদীশ উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্তভাবে হাত ছুড়লেন। বললেন, 'দত্ত সাবে, আপকা দিমাগ তো ঠিক হ্যায়! পুলিশে খবর করলে ওই শয়তানগুলো সুনিকে খতম করে দেবে। প্রভা, তুম্‌হি সমঝাও ইন্‌কো—।'

প্রভাবতী আমার পিঠে হাত রাখলেন। টের পেলাম, এখনও ওঁর হাতের কাঁপুনি বন্ধ হয়নি। বললেন নরম গলায়, 'অতীন, তুমি চাও না সুনি সহি-সলামত ফিরে আসুক?'

আমি ওঁর দিকে ফিরে তাকালাম। চাই। একশোবার চাই। আর চাই বলেই পুলিশের কথা বলছি।

প্রভাবতীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমি। ছ'বছর আগের সেই শীতের রাতটা আবার ফিরে না আসে, কেবল সেই ভয়টাই পাচ্ছিলাম।

নগেন তখনও দু-আঙুলে কানটা ধরে দাঁড়িয়ে। অপছন্দের চোখে আমাকে দেখছিল। এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে দৌড়ে এসে ঢুকল বনি। ওর পেছনে-পেছনে কুড়ি-বাইশের এক সুশ্রী তরুণী। বনি তার নাগাল এড়িয়ে সোজা চলে এল মায়ের কাছে। বলল, 'মাম্মি, দিদি কোথায়? এখনও আসছে না কেন?'

BanglaBook.org

প্রভাবতী ওর মাথাটা গায়ের কাছে টেনে নিয়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'দিদি তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তুমি ঘরে যাও। আশাদিদির সঙ্গে খেলা করো গিয়ে। এ-সময়ে দুষ্টুমি করতে নেই।'

বনির পেছনে-পেছনে আসা মেয়েটি বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। হাত দুটো কোলের কাছে জড়ো করা। মুখ নামানো নীচের দিকে। প্রভাবতী ওর দিকে তাকালেন। বললেন, 'আশা, ঠিক্‌সে খয়াল রাখ্‌খো বনিকা। এখন যেন এদিকে না আসে। সমঝি?'

আশা মাথা নাড়ল। মিনমিনে গলায় বনিকে ডাকল। ঠিক তখনই অধৈর্য নগেন বলে উঠল, 'কানটা তাহলে কী করব? ফেলে দেব?'

বনি সে-কথায় মায়ের শাড়ি থেকে মুখ তুলে কাকার দিকে দেখল। দেখল তার হাতে ধরা কানটা। তখন সে অবাক হয়ে এগিয়ে গেল কানটার কাছে। কয়েক পলক জিনিসটা দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'ইয়ে তো লালিকা হ্যায়!'

এ-কথা বলেই বনি কাঁদতে শুরু করল ভেউভেউ করে। প্রভাবতী ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। কোলে তুলে নিলেন। তারপর আশাকে ডেকে নিয়ে ভেতরের ঘরে যেতে-যেতে বলে গেলেন, 'তোমরা যা ভালো বোঝো করো। আমি আর পারছি না।'

নগেন কানটা নিয়ে চলে গেল জানলার কাছে। ওটা ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর টেবিলের কাছে এসে ভিডিও ক্যাসেটটা তুলে নিয়ে বলল, 'এটা চালিয়ে দেখা যাক।'

আমি তখনও বনির কান্না শুনতে পাচ্ছি। বুক শুকিয়ে কাঠ। একটু জল পেলে ভালো হত।

জগদীশ মুখ নামিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। আমি জিগ্যেস করলাম, 'ভি. সি. আর. কি আপনার আছে, না ভাড়া করতে হবে?'

জগদীশ ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'ও-হ্যাঁ, আমার নিজেরই আছে। ওই তো—'

কথাটা বলে ঘরের ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা বুককেসের দিকে এগিয়ে গেলেন জগদীশ। আধুনিক ধাঁচের বুককেস। তাতে বেশিরভাগই ফিন্যান্স ও ইকনমিক্সের বই। তার মাঝে চৌকো রঙিন টিভি। টিভি-র ঠিক নীচে একটা ড্রয়ারের মতো ছিল। সেটা টানতেই ভি. সি. আর.-এর ফ্রন্ট প্যানেলটা দেখা গেল।

নগেন ক্যাসেটটা নিয়ে ভি. সি. আর.-এর কাছে গেল। আমি ঘরের বড় জানলা দুটোর পরদা টেনে দিলাম।

জগদীশ এলোমেলোভাবে হাত-পা নাড়ছিলেন। আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করছিলেন। মেঝে থেকে বাদামি রঙের পুরিয়ার কাগজটা তুলে টেবিলে রাখলেন। তখনই ওঁর গেঞ্জির ভেতর থেকে একটা লকেট বেরিয়ে এল বাইরে।

লকেটটা সোনার—ছোট্ট একটা ত্রিভুজ। তার মধ্যে মিনে করে ত্রিশূল আঁকা। ওঁর গলার সোনার চেনটা অনেক আগেই লক্ষ করেছি, কিন্তু লকেটটা আজ প্রথম দেখলাম।

নগেন ভি. সি. আর. ও টিভি চালু করতেই জগদীশ চেঁচিয়ে প্রভাবতীকে ডাকলেন। আর হরিনন্দনকে ডেকে বললেন, তিনি না বলা পর্যন্ত হরিনন্দন, আশা বা রান্নার লোক

BanglaBook.org

এ-ঘরে যেন না আসে।

হরিনন্দন চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রভাবতী ঘরে এলেন। এসেই দরজাটা টেনে দিলেন। ঘরটা আবছা অন্ধকার হয়ে গেল। আর তখনই ক্যাসেটের প্রথম ছবিটা দেখা গেল টিভি-র পরদায়।

নগেন ফিরে এসে সোফায় বসল। জগদীশ অন্য সোফাটা টিভি-র দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বসলেন। টেনশন কাটাতে একটা সিগারেট ধরালেন। প্রভাবতী পিছনে একটু পাশে ডাইসের ওপরে বসলেন। আমি ভি. সি আর. থেকে হাত ছ'য়েক দূরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।

ছবি অস্পষ্ট হলেও ব্যাপারটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। ছবির শুরুতেই দেখা গেল একটা ঘর। বেশ আধুনিক ঢঙে সাজানো। ঘরের দেওয়ালে নানান রঙিন ক্যালেন্ডার ও পোস্টার। সাউন্ডট্র্যাকে একটা ঝিরঝির আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে কোনও হিন্দি গানের কলি শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎই সেটা থেমে গিয়ে একটা ভারী খসখসে গলা শোনা গেল :

'জগদীশ আচার্য, যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনার মেয়ে সুনয়না আচার্য আমাদের কব্জায় রয়েছে। একটু পরেই ওকে দেখতে পাবেন। ওর মুক্তিপণ হিসেবে আমাদের দাবি দশ লাখ টাকা। সেই টাকাটা আমাদের কাল রাত বারোটার মধ্যে চাই। যদি টাকা দিতে দেরি হয় তা হলে প্রতিদিনই আপনার মেয়ের একটু করে ক্ষতি হবে। আর দিনপিছু বাড়তি খরচ বাবদ পনেরো হাজার টাকা করে জুড়ে দেবেন। এইভাবে বড়জোর তিনদিন আমরা দেখব। তারপর...।'

কথা থেমে গেল এবং তার ঠিক পরেই ঘরের মধ্যে একটা লোক ঢুকল। লোকটার পরনে খাকি পোশাক। অনেকটা পুলিশি উর্দির মতো। আর মুখে পাতলা ওড়নার মতো একটা কাপড় জড়ানো। লোকটা মাপে খাটো, তবে স্বাস্থ্যবান। ঘুরে ক্যামেরার দিকে একবার তাকাল, তারপর এগিয়ে গেল ঘরের ডানদিকের কোণে। নিচু হয়ে কী একটা তুলে নিল মেঝে থেকে। তারপর ক্যামেরার দিকে সটান ফিরে তাকিয়ে জিনিসটা আমাদের দেখাল।

একটা ভারী চপার। আলো ঠিকরে পড়ছে তার গা থেকে।

এমনসময় 'ইয়াপ' 'ইয়াপ' চিৎকার শোনা গেল। প্রভাবতী চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'লালি!'

একটু পরেই প্রমাণিত হল প্রভাবতীর অনুমানে কোনও ভুল নেই। আর-একটা লোক ক্যামেরার বাঁ-পাশ থেকে ঢুকে পড়ল ঘরে। তার পোশাক প্রথমজনের মতোই, তবে চেহারা অনেক লম্বা আর রোগা। লোকটার ডানহাতে ঝুলছে লালি। সে নিষ্ঠুরভাবে কুকুরটার ঘাড় খিমচে ধরেছে।

এইবারে ক্যামেরা সামান্য নিচু হল। দেখা গেল, মেঝের ওপরে বসানো রয়েছে একটা চপার ব্লক। মাংস কাটার জন্যে ব্যবহার করা হয় যেরকম গাছের গুঁড়ি অনেকটা সেইরকম। তবে এর চেহারাটা চৌকো—খাটো টুলের মতো।

প্রভাবতী শ্বাস টানলেন জোরে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। নগেন ও জগদীশকে দেখলাম। নগেন নির্বিকার। কিন্তু টিভি-র ছবির আলোয় জগদীশের কপালে জমে থাকা ঘামের বিন্দুগুলো চকচক করছে। ওঁর হাতের

BanglaBook.org

সিগারেট লাল চোখ হয়ে জ্বলছে।

এরপরে যা আশা করেছিলাম তাই হল। লোক দুটো চপার ব্লক ঘিরে বসল—আমাদের দিকে মুখ করে। তারপর দ্বিতীয়জন লালিকে প্রায় আছড়েই ফেলল কাঠের টুকরোটার ওপরে, আর প্রথমজন হাতের চপারটা শূন্যে তুলে মনের আনন্দে কোপাতে শুরু করল। লালির 'ইয়াপ' 'ইয়াপ' চিৎকার থেমে গেল। রক্ত ছিটকে গিয়ে লাগল লোক দুটোর মুখ ঢাকা ওড়নায় আর খাকি পোশাকে। একটু পরেই ক্যামেরা ক্লোজআপে চপার ব্লকটাকে দেখাল : ছিন্নভিন্ন রক্তমাংসে মাখামাখি।

জগদীশ মাথা চাপড়ে ডুকরে উঠলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভোঁতা শব্দ কানে আসতেই পাশে তাকিয়ে দেখি প্রভাবতী কাত হয়ে পড়ে গেছেন কার্পেটের ওপরে। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

জগদীশ কখন যেন সিগারেট ফেলে দিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে উঠে প্রভাবতীর কাছে এগিয়ে গেলেন। আমি লম্বা পা ফেলে টিভি-র কাছে গিয়ে সুইচ অফ করে দিলাম।

নগেনও উঠে পড়েছিল। বলল, 'দাদা, তুমি বউদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। ক্যাসেটে এরপরে আরও কী আছে কে জানে!'

প্রভাবতীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন জগদীশ। আমাকে লক্ষ করে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, এক মিনিট। আমি ওকে চোখে-মুখে জল দিয়ে শুইয়ে দিয়ে আসি। ওঃ, আমি যে কী করব...উফ্, আর পারছি না...।'

দরজা ঠেলে জগদীশ চলে যেতেই ঘরে আমি আর নগেন একা। নগেন পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। আমাকে সাধল না। কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে যেন বাতাসেই মন্তব্য ছুড়ে দিল : 'লোকগুলো প্রফেশন্যাল—পুরোপুরি পেশাদার। পুলিশ এদের সঙ্গে এঁটে উঠবে না।'

আমি কোনও জবাব দিলাম না। মুখে ওড়না ঢাকা ওই লোকগুলোর চেহারার সঙ্গে অজিত, পারমিন্দার, লোধা বা রমেশের কোনও মিল আছে কি?

নগেন আবার বলল, 'দিল্লি থেকে চলে এলেন কেন? কলি হয়ে?'

আমি ছোট্ট জবাব দিয়ে বললাম, 'না, অন্য ব্যাপার—।'

নগেন আমার মুখে কী দেখল কে জানে। আর কিছু জিগ্যেস করল না। একমনে সিগারেট টানতে লাগল। আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ করছিল। ক্যাসেটে এরপর কী আছে?

এমনসময় জগদীশ ফিরে এলেন। রীতিমতো হাঁফাচ্ছেন। বসবার ঘর থেকে ভেতরে যাওয়ার দরজাটা টেনে দিয়ে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, স্টার্ট। কওন জানে ইয়ে বদমাশ লোগ মেরে বাচ্চিকে সাথ কেয়া কিয়া হ্যায়...।'

নগেন চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিল। দাদাকে একবার দেখল। তারপর টিভি-র দিকে মনোযোগ দিল। জগদীশ আগের জায়গাতেই গিয়ে বসলেন। আর একই সঙ্গে আমি ভি. সি. আর. চালু করলাম।

কিছুক্ষণ পরদায় হিজিবিজি। তারপর রক্তাক্ত চপার ব্লক। এবং তার কয়েক সেকেন্ড পরেই ক্যামেরা ঘরটাকে দেখাল। ঘর খালি। ঠিক তখনই আগের সেই ভারী খসখসে

BanglaBook.org

গলা শোনা গেল : 'কুকুরের একটা কান আপনাদের পাঠিয়েছি যাতে আপনারা আমাদের হালকা ভাবে না নেন। আপনারা আমাদের কথায় ঠিক কতটা গুরুত্ব দেবেন সেটা আপনাদের কাজকম্ম দেখেই টের পাওয়া যাবে। তখন, সেরকম বুঝলে, আপনার মেয়ের হাত-পা-কান-নাক যা-হোক কিছু একটা কেটে পাঠাব। এখানে আপনাদের মেয়ে ভালোই আছে। আগে ওকে দেখুন, তারপরে জানাচ্ছি দশ লাখ টাকাটা কখন কীভাবে আমাদের পৌঁছে দেবেন।

ঘরের দুটো দেওয়ালের জোড় একটু ফাঁক হল যেন। আর তখনই বুঝলাম, এতক্ষণ যেটাকে আমরা ঘর বলে ভেবেছি সেটা আসলে কোনও ঘর নয়। হালকা প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে সিনেমার ঢঙে একটা ঘরের সেট তৈরি করা হয়েছে যেন। আর আমাদের বোকা বানাতে সেই পলকা দেওয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের ক্যালেন্ডার আর পোস্টার।

টিভি-তে ঘরের ছবিটা সামান্য কাঁপছিল। রেডিয়োতে বোধহয় কোনও বাজনা বাজছে—তার শব্দ ভেসে আসছে। এ ছাড়া কয়েকজনের অস্পষ্ট কথাবার্তা আর রাস্তা দিয়ে ছুটে চলা গাড়ির আওয়াজও শোনা গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছিটকে এসে ক্যামেরার নজরে হাজির হল সুনয়না—সুনি। মনে হয়, পিছন থেকে কেউ একজন ওকে ধাক্কা মেরে সামনে ঠেলে দিল।

ওকে দেখে পাথর হয়ে গেলাম। কী চেহারা হয়েছে ওর! মুখ মলিন। চোখের কোলে কালি। মাথার চুল অপরিপাটি। মুখের তেজী হাসিখুশি ভাব কোথায় মিলিয়ে গেছে। ওর শরীর থেকে যাবতীয় প্রাণরস যেন শুষে নিয়েছে কেউ।

জগদীশ আচার্য কোঁপানো স্বরে বললেন, 'সুনি—মেরি বাচ্চি!'

নগেনের চোখ টিভি-র পরদায় স্থির।

আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠতে লাগল। গরমের মধ্যে যেন শিউরে উঠলাম শীতে। টিভি সেটটা হয়ে গেল পুরোনো সেই ভ্যান। আর সুনিদের বসবার ঘরটা হয়ে গেল চাণক্যপুরীর নির্জন পোড়ো জমি। অতি কষ্টে দু-বার ঢোক গিললাম। আর তখনই সুনির পোশাকের ছেঁড়া জায়গাগুলো আমার চোখে পড়ল।

জগদীশ থেকে-থেকেই অস্পষ্টভাবে যন্ত্রণাকাতর শব্দ করছিলেন। এখন সুনিকে দেখে তাঁর যন্ত্রণার শব্দও থেমে গেল।

সুনয়নার পরনে বেগুনি-সাদা ডোরাকাটা আধুনিক ছাঁদের স্কার্ট ও হাতকাটা ব্লাউজ। তার বেশিরভাগ জায়গাই এখন ছেঁড়া। ক্যামেরার ডান পাশ থেকে রক্তমাখা চপার হাতে বেঁটে লোকটা ঢুকে পড়ল টেলিভিশনের ছবিতে। আর ওকে দেখেই সুনি আর্ত স্বরে গুঙিয়ে উঠল, 'ছোড় দো মুঝে! ভগওয়ানকে লিয়ে ছোড় দো মুঝে!'

ভয়ঙ্কর লোকটা চপারটা তুলে আমাদের দিকে দেখিয়ে কী যেন বলল। আর তখনই উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিশেহারা চোখে আমাদের দিকে তাকাল সুনয়না। ওর সুন্দর দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ড্যাডি, বচানো মুঝে। ইয়ে লোগ মুঝে মার ডালেঙ্গে। সেভ মি, ড্যাডি!'

সুনির গাল বেয়ে জল পড়ছিল। ঠিক তখনই আর-একটা লোক ঢুকে পড়ল ঘরে। পরনে খাকি পোশাক, মুখে ওড়নার আড়াল। লোকটা সুনির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের

BanglaBook.org

লোকটা চপারটা সামান্য উঁচিয়ে ধরল। আর পিছনের লোকটা সুনিকে জাপটে ধরে জোর করে ওর গালে চুমু খেল। সুনির চোখে-মুখে উলঙ্গ আতঙ্ক। একটা হাত সামনে ছুড়ে দিয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'বুড়্ঢা জনাব। বচালো মুঝে, বুড়্ঢা জনাব!'

আমার মাথার ভেতরে চাণক্যপুরীর আগুনটা জ্বলে উঠল লকলক করে। মাংস-পোড়া গন্ধটা সমস্ত চেতনা অবশ করে দিতে লাগল। আর চোখের সামনে একটা উলঙ্গ লোক একটা আগুনের কুণ্ড ঘিরে আদিম নাচ নাচছিল।

একই সঙ্গে মাথার ভেতরে রাইফেলের ফায়ারিং-এর শব্দ হচ্ছিল। আর নিষ্ঠুর হাতে টান মেরে-মেরে স্নায়ুতন্তুগুলোকে কেউ যেন ছিঁড়ে ফেলছিল। ওগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

আমার মুখ থেকে একটা অচেনা চিৎকার বেরিয়ে এল।

জগদীশ চোখ ঢেকে ফেলেছিলেন। চমকে আমার দিকে তাকালেন। নগেনও অবাক হয়ে আমাকে দেখল। আমার সঙ্গে সুনির সম্পর্কের অঙ্কটা মেলাতে চাইল।

ততক্ষণে টিভি-র পরদা থেকে সবাই সরে গেছে। ঘর খালি। খসখসে গলাটা আবার কথা বলে উঠল : 'এবারে মন দিয়ে শুনুন। যা-যা বলব তার যেন একচুল এদিক-ওদিক না হয়। একশো টাকার নোটের একশোটা বান্ডিল খবরের কাগজে মুড়ে প্যাকেট করে নেবেন। তারপর সেগুলো ভরে নেবেন বাজারের একটা বড় থলেতে। এইভাবে মালটা রেডি করে অপেক্ষা করবেন। কাল বিকেল থেকে রাতের মধ্যে যে-কোনও সময়ে আমরা ফোন করব। ঠিক তক্ষুনি কোনও লোক মারফত মালটা নিয়ে জায়গামতো পাঠিয়ে দেবেন। জায়গার নাম আর সময় আমরা টেলিফোনেই বলব। একটা কথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি : পুলিশে কোনওরকম খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। করলে কী হবে সে তো জানেন। মনে রাখবেন, আমরা চব্বিশ ঘণ্টা আপনার বাড়ির ওপরে নজর রাখছি। গুড বাই, জগদীশ আচার্য। এখন এই ভিডিও ক্যাসেটটা কী করতে হবে মনে আছে তো?'

কথা শেষ হল। আর ঘরের ছবিটা হঠাৎই মুছে গেল টিভি-র পরদা থেকে। আলোর হিজিবিজি ফুটে উঠল সেখানে। সেইসঙ্গে শুরু হল বিশ্রী ঘরঘর শব্দ।

আমি রবারের পায়ে হেঁটে টিভি-র কাছে গেলাম। সুইচ অফ করে দিলাম। তারপর ফিরে এসে একটা ডাইসের ওপরে ক্লান্তভাবে বসে পড়লাম।

নগেন উঠে গিয়ে জানলা-দরজা খুলে দিল। জগদীশ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে ছিলেন, সেইভাবেই বসে রইলেন।

আমার মাথার ভেতরে জ্বালা করছিল, অদ্ভুত একটা দপদপানিও শুরু হয়ে গেছে। জলতেষ্টায় বুক শুকিয়ে কাঠ। ফুসফুসের বাতাস যেন ফুরিয়ে আসছে।

আমরা তিনজনে কতক্ষণ ওইভাবে বসে ছিলাম জানি না। হঠাৎই বাইরের কোয়ার্জ দেওয়াল ঘড়ির সুরেলা আওয়াজ শুনতে পেলাম। তার একটু পরেই টুং-টাং করে বারোটার ঘণ্টা বাজল। আশ্চর্য, এগারোটার ঘণ্টা কখন বেজে গেছে আমরা টেরই পাইনি।'

আমি সুনির কথা ভাবছিলাম। হঠাৎই সুধার গলা শুনতে পেলাম। ও খুব শান্ত ছিল। কম কথা বলত। সুধা এখন আমার দিকে তাকিয়ে বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল। ওর চোখে রাগ। ও বলল, 'এইভাবে বসে থাকলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারবে?' আর তার

BanglaBook.org

ঠিক পরেই সকালে শোনা মায়ের কথাটা প্রতিধ্বনি তুলল : 'তুই দেখ, যদি ওকে বাঁচাতে পারিস। ওর কপাল যেন সুধার মতো না হয়।'

আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সুধার নীরব তিরস্কার আমি আর সইতে পারছিলাম না।

জগদীশ আচার্যের কাছে গিয়ে বললাম, 'মিস্টার আচার্য, এখন বসে থাকার সময় নয়, কাজ করার সময়। কী করবেন কিছু ঠিক করলেন?'

জগদীশ মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই নগেন সোফা ছেড়ে আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। ও কখন যেন আর-একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটের তামাক পোড়া গন্ধ আমার অসহ্য লাগে। এখনও লাগছিল। নগেন বলল, 'ঠিক করার আবার কী আছে? আমরা টাকা মিটিয়ে দেব। সুনয়নাকে আমরা সুস্থ অবস্থায় ফেরত চাই।'

জগদীশ তড়িঘড়ি ভাইকে সায় দিলেন। বললেন, 'হাঁ, হাঁ—সুনিকে সহি-সলামত ফেরত চাই আমি।'

আমি বললাম, 'যদি টাকা নিয়েও ওরা সুনিকে শেষ করে দেয়? তখন?'

'কেন? ওকে খতম করবে কেন?'

নগেনের ন্যাকামি আমাকে বিরক্ত করল। ওর সঙ্গে জগদীশের পুরোনো কাজিয়া মিটল কেমন করে? আমি বিরক্তি চেপে শান্ত গলায় বললাম, 'সুনি ওদের চিনে ফেলেছে। ওদের ডেরা চিনে ফেলেছে। ও বেঁচে থাকলে ওদের বিপদ হতে পারে। ওরা পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারে।'

'পুলিশ! পুলিশ এর মধ্যে আসছে কোত্থেকে?' ভাঙা রেকর্ডের মতো সেই পুরোনো কথাটাই আবার বললেন জগদীশ।

নগেন ভুরু কুঁচকে আমার চোখে তাকাল। জগদীশকে লক্ষ করে পরের কথাগুলো বলল বটে, তবে আমার চোখ থেকে চোখ সরাল না : 'দাদা, আমার মনে হয় আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপারে বাইরের লোককে জড়ানো ঠিক হচ্ছে না।'

আমি ওর খোঁচা সহ্য করলাম। আমার চেয়ে সুনির কষ্ট অনেক-অনেক বেশি।

নগেন থামল না। আরও বলল, 'মিস্টার দত্ত, আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। বেলা অনেক হয়েছে। এবারে আপনি আসতে পারেন।'

আমি জগদীশের দিকে তাকালাম। জগদীশ আবার মাথা ঝুঁকিয়ে বসে। আমার শরীরে একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, এ এক ম্যারাথন দৌড়। জিতি বা না জিতি, দৌড় আমাকে শেষ করতেই হবে।

টিভি-র কাছ থেকে হাত চারেক দূরে একটা সুদৃশ্য টেবিল। টেবিলে সুনি আর বনির ফটো। সুনির পরনে শাড়ি। কপালে টিপ। ওকে অনেক বড় দেখাচ্ছে। এই ফটোটা কলকাতায় তোলা। প্রথম বছরে পুজোর সময়। আমিই তুলেছি। ওকে আর বনিকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম ঠাকুর দেখাতে। ওরা খুব খুশি হয়েছিল।

আমি সুনির ফটোর কাছে এগিয়ে গেলাম। ফটোটা হাতে তুলে নিলাম। বুড়টা জনাব, বচালো মুঝে! ওদের সবার সামনে এই ফটোটায় চুমু খেতে ইচ্ছে করছে আজ। এর আগে অনেকদিন এই ঘরে এসেছি, এই ফটো দেখেছি, কিন্তু এরকম উথাল-পাথাল হয়নি মনটা।

BanglaBook.org

পলকে আমার পাকা চুলগুলো কাঁচা হয়ে যাচ্ছিল। বয়েসটা পেছনে গড়াচ্ছিল গড়গড় করে।

নগেন আমার কাছে এগিয়ে এসেছে আবার। হাতে এখনও সিগারেট। পোড়া গন্ধ নাকে আসছে।

'মিস্টার দত্ত, এবারে আপনি আসতে পারেন।'

আমি ফটোটা টেবিলে রেখে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। স্পষ্ট টের পেলাম, নগেন ভয় পেয়েছে। মাথার মধ্যে আমার কী যে হল, ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলাম নগেনের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট। তারপর নগেনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে সেটা ধীরে-ধীরে চেপে ধরলাম আমার বাঁ-হাতের তালুতে।

জগদীশ অব্যক্ত একটা চিৎকার করে উঠলেন। নগেনের মুখ শুকিয়ে সাদা। আমার হাতের তালু থেকে কি পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে? ফোস্কা পড়েছে?

আর ঠিক তখনই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রভাবতী। সঙ্গে বনি। আমাকে দেখে ওরা দুজনেই চিৎকার করে উঠল। প্রভাবতী বলে উঠলেন, 'কী হচ্ছে, অতীন। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

আমি হাসলাম। আমার মাথার ভেতরে অন্তঃসত্ত্বা সুধা জীবন্ত পুড়ে যাচ্ছিল একটু-একটু করে। বললাম, 'ভাবি, সুনিকে আমি ফিরিয়ে আনতে চাই।' নিভে যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে দিলাম।

প্রভাবতী কেঁদে ফেললেন আমার কথায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব কোথায় কোন সেফ ডিপোজিট ভল্টে জমা পড়ে গেছে। এখন ওঁর শরীরে শুধু একটা 'মা' পড়ে আছে।

বনি আমাকে ডাকল, 'আঙ্কল!'

আমি হাত বাড়াতেই বনি ছুটে এল আমার কাছে। বলল, আঙ্কল, মুঝে মেরা দিদি লা দো।'

আমি বনিকে জাপটে ধরলাম। ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম।

জগদীশ স্ত্রীকে একবার দেখলেন। জিগ্যেস করলেন, 'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

প্রভাবতী চশমা সরিয়ে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'অতীনকে তোমরা আর বিরক্ত কোরো না।'

সব শেষে নগেনকে লক্ষ করে বললেন, 'দেবরজি, আপনি স্নান সেরে নিন। আমরা অতীনের সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই।'

নগেন দাদার দিকে একবার দেখল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর চলে গেল ঘর থেকে।

প্রভাবতী আশাকে ডাকলেন। আশা এলে ওকে বললেন, 'বনির খাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

আমি বনিকে ছেড়ে দিলাম। ও করুণ মুখে মাকে, বাবাকে, আমাকে একবার দেখল। তারপর আশার সঙ্গে চলে গেল।

আমি প্রভাবতীকে বললাম যে, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু ঠান্ডা জল পেতে পারি কি?

BanglaBook.org

জগদীশ হরিনন্দনকে ডাকলেন। হরিনন্দন এসে ঠান্ডা জল দিতে বললেন। প্রভাবতী তার সঙ্গে কিছু মিষ্টির নির্দেশও জুড়ে দিলেন। দুঃখ করে বললেন যে, সকাল থেকে যা চলেছে তাতে ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত মনে রাখার উপায় নেই।

আমি তখন বললাম, 'ভাবিজি, এবারে কাজের কথায় আসা যাক। আপনারা কি ওই লোকগুলোর কথা মতো দশ লাখ টাকা ওদের পৌঁছে দেবেন?'

জগদীশ আচার্য এবারে একটা অদ্ভুত কথা বললেন, 'অত টাকা তো আমার নেই। সাউথে একটা ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি কেনার চেষ্টা করছি। আমার কাছে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বড়জোর তিন-চার লাখ হবে।'

তাজ্জব হয়ে গেলাম আমি। এই লোকটা কাল থেকেই বলছে কিডন্যাপারদের মুক্তিপণ মিটিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কোনওভাবেই পুলিশে যেতে চাইছে না। অথচ এখন বলছে টাকা নেই। তা হলে সুনিকে বাঁচাব কেমন করে?

আমার হতভম্ব মুখ-চোখ দেখে প্রভাবতী ব্যাপারটা বুঝলেন। জগদীশকে বললেন, 'তা হলে কালকের মধ্যে দশ লাখ টাকা তুমি কোত্থেকে জোগাড় করবে? মেয়েটাকে বাঁচাবে কী করে?' শেষদিকে প্রভাবতীর গলার স্বর চিরে গেল।

জগদীশ তখন বললেন, 'প্রভা, ভয় পেয়ো না। এই টাকার কথা ভেবেই আমি সাতসকালে নগেনের কাছে গেছি। পুরোনো ঝগড়া-ঝামেলা ভুলে ওর কাছে হাত পেতেছি। ও এখন বড় বিজনেসম্যান—ওর কাছে অনেক টাকা। ও বলেছে এ-ব্যাপারে যা লাগবে দেবে—অবশ্য ধার হিসেবে। পরে ধীরে-ধীরে শোধ করে দিলেই হবে।'

টুকরো-ছবির-বাঁধায় এবারে নগেন আচার্যের ছবির টুকরোটা খাপ খেয়ে গেল। সত্যি, বিপদ মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলে। বিশ বছরের পুরোনো তেতো সম্পর্ক সুনির জন্যেই মিঠে হয়ে গেল।

হরিনন্দন ঘরে এসে ঢুকল। হাতে জলের গ্লাস আর মিষ্টির প্লেট। গ্লাসের গায়ে হিম পড়েছে। প্লেট আর গ্লাস টেবিলে রেখে ও চলে গেল। প্রভাবতী বললেন, 'খেয়ে নাও, অতীন।'

আমি আগে আধগ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে নিলাম। তারপর প্লেটের দিকে হাত বাড়ালাম। তেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে খিদেও পেয়েছিল।

জগদীশ বললেন, 'কিন্তু টাকাটা কে দিয়ে আসবে?'

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, 'আমি।'

জগদীশ আমাকে দেখলেন, স্ত্রীকে দেখলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি তা হলে কাল বিকেলে আসবেন, মিস্টার দত্ত। আই অ্যাম রিয়েলি গ্রেটফুল টু য়ু।'

জগদীশ বোধহয় উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি ওঁকে ইশারায় বসতে বললাম। তারপর জিগ্যেস করলাম, 'সুনির কোনও লাভার ছিল?'

উত্তর দিলেন প্রভাবতী, 'যদ্দুর জানি, ছিল না। এখানে ওর বন্ধুবান্ধব অনেক। দিল্লিতেও অনেক ছিল। কিন্তু প্রেমিক বলতে যা বোঝায়, সেরকম কিছু আছে বলে আঁচ পাইনি।'

'ওর বন্ধুবান্ধবদের কখনও জিগ্যেস করেননি?'

'সেরকম প্রয়োজন হয়নি। তা ছাড়া, তুমিও তো ওর বন্ধু। তুমি কি কিছু টের পেতে না? ও যেরকম মুখ-আলগা মেয়ে—।'

BanglaBook.org

প্রভাবতীর কথায় যুক্তি আছে। সুনির যদি কখনও মনে হয়, ও যে-কাজ করছে সেটা অন্যায় নয়, তা হলে গলা কাটিয়ে সে-কথা সবাইকে বলে বেড়াবে। মা-বাবাকেও গ্রাহ্য করবে না। আর আমাকেও বোধহয় বলত : 'বুড্ঢা জনাব, জানতে হো, ম্যায়নে কিসিকো দিল দে দিয়া!'

আমি আপনমনেই বললাম, 'তা হলে ওকে কিডন্যাপ করার একমাত্র কারণ টাকা।'

জগদীশ যেন চমকে উঠলেন এ-কথায়। বললেন, 'হ্যাঁ—তাই তো মনে হচ্ছে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'লোকগুলো দশ লাখ টাকা চাইল কেন? ওরা কি আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর করেনি? ওরা জানে না, এত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আপনার নেই?'

জগদীশ একটু যেন বিব্রত হলেন। বললেন, 'কে জানে। ইয়ে লোগ কেয়া শৌচতে হ্যায়, কেয়া সমঝতে হ্যায়—।'

প্রভাবতী আবার যেন নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমার মনে হয়, ওরা এটুকু জেনেছে যে, দশ লাখ টাকা নিজের না থাকলেও লোন নেওয়ার ক্ষমতা আছে। কোম্পানি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—আমাদের বিপদ হলে এরা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। বাঁ-হাতের তালুটা জ্বালা করছিল। মনে হল, সুনির ঘরটা আমার একবার দেখা দরকার। একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। এ ছাড়া, ওর বন্ধু স্বাতীর সঙ্গেও একবার কথা বলতে হবে।

গ্লাসের বাকি জলটুকু একঢোকে শেষ করে দিয়ে বললাম, 'ভাবিজি, বিকেলে আমি আসব। আপনারা সাবধানে থাকবেন। যদি এর মধ্যে কোনও টেলিফোন আসে ভালো করে সব শুনবেন। ওরা যা বলবে রাজি হয়ে যাবেন। আমি বিকেলে এসে সব শুনব।'

জগদীশ আচার্য বললেন, 'আমি এখন স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে নগেনকে নিয়ে বেরোব। টাকাগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর দু-একজন বন্ধুর সঙ্গেও একটু দেখা করব। প্রবলেমটা নিয়ে আলোচনা করব, পরামর্শ নেব। আমার মাথা আর কাজ করছে না।'

জগদীশকে গেঞ্জি আর পাজামা পরা অবস্থায় কেমন বিচিত্র লাগছে। মাথার চুল এমনিতেই কম। সেগুলো এখন অগোছালো, এলোমেলো। বুকের কাঁচা-পাকা চুলের মাঝে সোনার চেনটা চকচক করছে। চোখজোড়া চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করছে। ফোলা গাল আরও ভারী। চোখের নীচেও কোলা ভাব।

আমি জগদীশকে বললাম, 'ওই ক্যাসেটটার একটা কপি করে রাখবেন?'

জগদীশ প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'না। ওরা জানতে পারলে আমার লাডলিকে খতম করে দেবে!'

আমি সে-কথা গ্রাহ্য না করে প্রভাবতীকে বললাম, 'ক্যাসেটটার একটা কপি থাকলে ভালো হয়। ওরা তো আর জানতে পারছে না।'

প্রভাবতী আস্তে করে মাথা হেলালেন।

আর তখনই দেখলাম, ঘরের দরজায় নগেন দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুল ভেজা। হাতে চিরুনি। মাথা আঁচড়াচ্ছিল বোধহয়।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'বিকেলে হরিনন্দনকে নিয়ে আমি একটু স্বাতীদের বাড়িতে যাব। ওকে দু-একটা কথা জিগ্যেস করব। এখন আসি।'

BanglaBook.org

ওরা তিনজন নিথর হয়ে রইল। আমার চলে যাওয়া দেখল।

রাস্তায় পা দিয়ে ঠিক করলাম সুশান্তর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করব। পুলিশের সাহায্য ছাড়া এই জাল কেটে আমরা বেরোতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

আকাশে মেঘের গর্জন শোনা গেল। মুখ তুলে দেখি, পশ্চিমের কোণে সামান্য মেঘ জমেছে। রাতের দিকে কি আবার কালবৈশাখী ঝড় উঠবে?

সুনি তখনও আমার বুকের ভেতরে কান্নাকাটি করছিল।

পাঁচ

বিকেলে একবার দেশবন্ধু পার্কে গেলাম।

পাতা-ঝরার কাল পেরিয়ে এখন সবুজের শুরু। কৃষ্ণচূড়ার গাছে ফুলে ফুল। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

আমি পুকুরের কাছটায় ঘোরাফেরা করছিলাম। সাঁতার কাটার পুকুর। তবে বিভিন্ন সুইমিং ক্লাবের ছেলেরা ছাড়াও বাইরের লোকজন স্নান করে, কাপড় কাচে, হাতছিপ ফেলে মাছ ধরে। এখন জলে সাঁতার কাটছে ক্লাবের ছেলেরা। জল ছিটকে উঠছে। রোদে চিকচিক করছে জলকণা। পুকুরকে ঘিরে অনেক বাচ্চাকাচ্চা ও অভিভাবকের ভিড়। এ ছাড়া পার্কের রাস্তায় অনেক পথচারী। প্রায় সমস্ত বেঞ্চই ঠাসাঠাসি। ঝালমুড়ি, ফুচকা, বাদাম বিক্রি হচ্ছে। দূরে মাঠে ফুটবল খেলছে কয়েক দল ছেলে। সিমেন্ট বাঁধানো স্লিপে সড়সড় করে ওপর থেকে নীচে নামছে কচি ছেলেমেয়েরা। ওদের চেঁচামেচি হইহই সবই স্বাভাবিক—রোজকার মতো। শুধু তফাতের মধ্যে সুনি নেই। এই পার্কের বিকেলের পড়ন্ত রোদ ওর সুন্দর মুখকে আর ছুঁতে পারছে না। কখনও পারবে কি না কে জানে!

মনে পড়ছিল, হেলে পড়া সূর্য দেখে সুনি বলত, 'বুড়ঢা জনাব, সূর্য ওঠা আমার দারুণ লাগে, তবে সূর্য ডোবার সময়টা—আঃ, লা-জবাব! বলো, তোমার কোনটা ফেবারিট?'

আমি হেসে বলেছি, 'সান-সেট!' আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর সেই পুরোনো কথা : 'তব্ তো বন্ গই বাত, মিলাইয়ে জনাব হাথ!'

এবং হাতে হাত মেলানো। তারপরই ও গড়গড় করে শুরু করত ভারতের কোন-কোন জায়গায় ও সূর্যাস্ত দেখেছে : লালকেল্লায়, তাজমহলে, টাইগার হিলে, ডাল লেকে...এরকম আরও অসংখ্য নামী-অনামী জায়গায়। সূর্যাস্ত নিয়েও কেউ এত কথা বলতে পারে!

হাঁটতে-হাঁটতে পার্কের দক্ষিণ দিকের দরজার কাছে এসে পড়েছিলাম। চারপাশটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, মঙ্গলবারে ঠিক কোন জায়গা থেকে লোকগুলো সুনিকে কিডন্যাপ করেছে। ওরা নিশ্চয়ই জানত যে, সুনি প্রতিদিন বিকেলে পার্কে বেড়াতে আসে। কিন্তু ভোরবেলাতেও তো ও দৌড়তে আসত। মনে হয়, ওরা ভোরবেলা কিডন্যাপ করার চেষ্টা যে করেনি তার কারণ, ভোরবেলা অন্য লোকেদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভোরবেলা পার্ক ফাঁকা থাকে। অথচ বিকেলে এই দুরন্ত কোলাহলে কে

BanglaBook.org

কার দিকে খেয়াল রাখে! তাই বিকেলবেলাটাই ওরা বেছে নিয়েছিল। হায় রে বিকেল!

পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ছিল ধীরে-ধীরে। আমি সুনিদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সন্ধে হলেই হরিনন্দনকে নিয়ে একবার স্বাতীদের বাড়িতে যাব। হয়তো নতুন কিছু জানতে পারব না, কিন্তু তবুও ওর সঙ্গে কথা না বললে আমি স্বস্তি পাব না।

সুনিদের বাড়িটা সেন মহাশয়ের মিষ্টির দোকানের লাগোয়া গলির ভেতরে। ওদের বাড়িওয়ালা রীতেশ মজুমদার বেশ বনেদি লোক মনে হয়। পুরোনো ধাঁচের সিং-দরজাওয়ালা চারতলা বাড়ি। একতলায় একটা কম্পিউটারের ট্রেনিং স্কুল। বাইরের দেওয়ালে বিশাল সাইনবোর্ড। তাতে স্কুলের গুণপনার নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন। প্রায়ই দেখি, কচি-কচি ছেলেমেয়েরা রঙিন পোশাকে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো জটলা করে স্কুলের দরজায়। আজও রয়েছে। ওদের দেখলে মনে হয় আবার ছোট হয়ে যাই।

সুনিদের দোতলার ফ্ল্যাটে যাওয়ার দরজাটা আলাদা। নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার জন্যে রীতেশ মজুমদার কম্পিউটার-স্কুলটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুনিদের ফ্ল্যাট ছাড়িয়ে চওড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে তেতলার দিকে। সেখানে, সিঁড়ির মুখে, একটা দশাসই কোলাপসিবল্ দরজা বসানো। রীতেশ মজুমদার সাবধানী লোক।

কলিংবেলের শব্দে দরজা খুললেন প্রভাবতী। পরনে বাদামি আর সবুজে ছাপা সুতির শাড়ি। আঁচল ডান কাঁধের ওপর দিয়ে ফেলা। দুপুরের তুলনায় ওঁকে আরও বেশি শুকনো দেখাচ্ছে। চোখের কোলে ছায়া। চশমার কাচের জন্যে চোখ ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। আমাকে দেখে প্রভাবতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এসো, অতীন—।'

আমি ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'হরিনন্দনকে ডাকছি। তোমাকে স্বাতীদের বাড়িতে নিয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'এখন না, পরে। আগে...সুনির ঘরটা আমি একবার...দেখতে চাই।'

আমরা বসবার ঘরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। প্রভাবতী একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। ওঁর কি এতে পুরোপুরি সায় নেই? আমি প্রভাবতীর তাকানোটা গায়ে মাখলাম না। এখন এসব সূক্ষ্ম পছন্দ-অপছন্দকে গ্রাহ্য করা যায় না।

সুতরাং আমরা বসবার ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে ঢুকলাম।

অন্দরের অলিপথের মুখে পায়ের চটি খুলে রাখলাম। জিগ্যেস করলাম, 'মিস্টার আচার্য নেই?'

প্রভাবতী চশমার ডাঁটি ছুঁলেন একবার। বললেন, 'না। সেই দুপুরে দেবরজির সঙ্গে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। বলে গেছে, রাত হবে।'

কয়েক পা এগিয়েই ডাইনিং স্পেস। বোঝা যায়, পুরোনো আমলের বাড়িতে এটা ছিল অন্দরের উঠোন মতো। বাড়ির মেয়েরা দুপুরবেলায় পানের বাটা সামনে নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পরচর্চায় সময় কাটাত। এখন রূপবদলের কালে কার্পেট-ঢাকা হয়ে ডাইনিং স্পেসের চেহারা নিয়েছে। এর সামান্য ডানদিকে সুনির ঘর।

সুনির ঘর মানে সুনি এবং বনির ঘর। এ-ঘরে আমি আগে বারকয়েক এসেছি। সুনিই ধরে নিয়ে এসেছে। ওর টেপ বাজিয়ে গান শোনানোর জন্য, অথবা সিলভেস্টার

BanglaBook.org

স্ট্যালোনের কোনও নতুন পোস্টার দেখানোর জন্যে, এমনকী স্কুলের দু-একটা অঙ্ক কষার জন্যেও।

ঘরটা বেশি বড় নয়। পশ্চিমে দুটো জানলা—গ্রিল বসানো। তার বাঁ-দিক ঘেঁষে খাটো বিছানা। তাতে একজোড়া বালিশ। বিছানায় ফটোজিনিক প্রিন্টের চাদর। গাছপালা, নদী, এবং অস্ত যাওয়া সূর্য। সান-সেট। ব্লাডি সান-সেট! সব সূর্যই কি একভাবে অস্ত যাবে?

বিছানার চাদর প্রায় মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো। খাটের নীচে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। প্রভাবতী পাখার সুইচ অন করে বিছানায় গিয়ে বসলেন। আমাকে দেখতে লাগলেন। লক্ষ করলাম, এবার ওঁর চোখ ছলছল করছে। জানলা দিয়ে শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে ওঁর বাঁ-গালে। প্রভাবতীর বয়েস বেড়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে।

আমি সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। দু-জানলার মাঝে র‍্যাম্বো ক্রসবো হাতে দাঁড়িয়ে। মাথায় ফেট্টি বাঁধা। তার ঠিক নীচেই ইমরান খান এবং বরিস বেকার। তবে র‍্যাম্বোর চেয়ে ওরা মাপে ছোট। ডানপাশে সুনির পড়ার টেবিল। তাতে স্তূপাকার বই-খাতা। হয়তো বনিরও কিছু বই মিশে আছে সেখানে। টেবিলের ওপরে দেওয়ালে ছুটছে ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার। ঠোঁটে লিপস্টিক, হাতে সুচারু নখ। ছুটছে। ছুটছে।

ঘরে আরও যা-যা আছে তার ফিরিস্তি সহজে শেষ হওয়ার নয়। আয়না, টেবিল-ল্যাম্প, চেয়ার, টুল, টেপরেকর্ডার, পলিথিনের বল, নানান খেলনা, বইয়ের তাক, জামা-ভরতি একটা আলনা। তার ডানকোণে সুনির হলদে ট্র্যাক-স্যুট ঝুলছে।

আমি ঘরের প্রতিটি জিনিস উলটে-পালটে দেখতে লাগলাম। কী খুঁজছি তা আমি নিজেই জানি না। অথচ বিচিত্র এক শক্তি আমাকে দিয়ে এই খামখেয়ালি কাজগুলো করাতে লাগল। প্রভাবতী বিষণ্ণ চোখে আমাকে দেখতে থাকলেন। আর আমি নির্লজ্জ হানাদারের মতো সুনয়নার সবরকম গোপনীয়তায় নাক গলাতে লাগলাম। মিনিট দশেক পরেই ঘরে ঢুকল বনি। গায়ে নীল-সাদা গেঞ্জি আর একটা গাঢ় নীল হাফপ্যান্ট। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা একটা মাদুলি। চোখে কাজল-টানা। আমাকে দেখেই বনি জিগ্যেস করল, 'কী হল, আঙ্কল, দিদিকে খুঁজে পেলে?'

আমি বললাম, 'এখনও পাইনি। খুঁজছি। এসো, তুমি আমাকে হেল্প করবে এসো।'

বনির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল আশা। প্রভাবতী ওকে চায়ের জল বসাতে বললেন, ওঁরা জানেন, চা আমার পছন্দ।

বনির কাছেই শুনলাম যে, ওর এখন বিকেলে পার্কে যাওয়া বারণ। তাই ও আশাদিদির সঙ্গে ছাদে খেলা করছিল।

আমি সব জিনিসপত্র হাঁটকাতে লাগলাম আর বনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগল। যেমন, টেবিলের নীচে একটা বাক্সের মধ্যে একটা নাইলনের স্কিপিং রোপ পাওয়ামাত্রই বনি জানাল যে, ওটা ওদের পাড়ার স্পোর্টস পয়েন্ট থেকে কেনা, দাম পড়েছিল পঁয়তিরিশ টাকা।

এইভাবে নানান জিনিস ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আমি একসময়ে পৌঁছে গেলাম আলনার কাছে।

লক্ষ করলাম, প্রভাবতীর মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠেছে। আমি নির্বিকারভাবে

BanglaBook.org

সুনির জামা-কাপড়গুলো ঘাঁটতে শুরু করলাম। অন্তর্বাসগুলোও বাদ দিলাম না। জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়ে দেখলাম। একটা এন. পি. চিউইংগামের প্যাকেট পেলাম। তবে শুধু ওইটাই।

সব শেষে চলে এলাম খাটের কাছে। মেঝেতে বসে পড়ে বিছানার চাদরটা তুলে দিলাম ওপরে। প্রভাবতী বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। আমি উঁকি মারলাম খাটের নীচে। পুরোনো জুতোর বাক্স, জুতোর সাদা কালি, একজোড়া বাতিল কেড্‌স্‌, একটা বড় ট্রাঙ্ক, আর-একটা ছোট বাক্স। ছোট বাক্সটার গায়ে অন্তত কয়েক রঙের রঙিন কাগজ সাঁটা বলে মনে হল।

বনিকে বলতেই ও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল খাটের তলায় এবং বাক্সটা টেনে নিয়ে এল বাইরে। এনেই বলল, 'এতে হাত দিয়ো না, আঙ্কল। দিদি গুস্‌সা করবে। দেখছ না, কী লেখা!'

সত্যিই দেখলাম, বাক্সের ওপরে বড়-বড় করে ইংরেজিতে লেখা : 'সুনির বাক্স। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এতে সুনি ছাড়া অন্য কারও হাত দেওয়ার অধিকার নেই।'

বাক্সটা আদতে একটা স্যুটকেস। তার ওপরে সুনয়নাই হয়তো রঙিন কাগজের টুকরো সেঁটে দিয়েছে। তারপর ওপরের ওই ছেলেমানুষী লেবেলটা লাগিয়ে দিয়েছে। লেবেলের ঠিক পাশেই লাগানো রয়েছে ওর একটা বাচ্চা বয়েসের ফটোগ্রাফ।

আমি প্রভাবতীকে জিগ্যেস করলাম, 'ওই ট্রাঙ্কে কী আছে?'

প্রভাবতী একটু যেন চমকে গেলেন। উনি হয়তো সুনির বাক্স নিয়ে কোনও প্রশ্ন আশা করেছিলেন। সামান্য থতমত খেয়ে বললেন, 'পুরোনো কাঁসার বাসন। আমার মায়ের। দিল্লি থেকে অনেক কষ্ট করে নিয়ে এসেছি। টাকার দামের চেয়ে স্মৃতির দামটাই বেশি।'

আমি বললাম, 'ভাবিজি, কিছু মনে করবেন না—সুনির বাক্সটা খুলছি।'

প্রভাবতী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'খোলো—। সুনিকে ফিরে পাওয়ার জন্যে অনেক কিছু আমি মেনে নিতে রাজি আছি।'

আমি বনিকে বললাম, 'বনি, আমি এই বাক্স খুললে তোমার দিদির একটুও গুস্‌সা হবে না।'

বনি ঘাড় কাত করল।

আমি বাক্সের ডালা খোলামাত্রই আশা ঘরে ঢুকল চা-বিস্কুট নিয়ে। আমি ওর হাত থেকে প্লেট দুটো নিয়ে সুনির বাক্সের পাশে মেঝেতে রাখলাম। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলাম। সুন্দর সুগন্ধী চা। চায়ের গন্ধের চেয়ে টাকার গন্ধটাই বোধহয় বেশি। আশা প্রভাবতীকে কিছু একটা বলব-বলব করেও চলে গেল।

এইবার সুনির 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'-র ঢাকনা খুললাম। লক্ষ করেছিলাম, প্রভাবতীর ফরসা মুখ থমথমে হয়ে গেছে। যেন নতুন কোনও সর্বনাশের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

আমি বাক্সের ডালা খুলতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রভাবতী। শব্দ করে শ্বাস টেনে বনিকে বললেন, 'বনি, তুমি আশাদিদির কাছে যাও।'

বনি কিছুটা অবাক হয়েই চলে গেল। প্রভাবতী এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা

BanglaBook.org

ভেজিয়ে দিলেন।

আমি বাক্সের কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম।

সুন্দর করে ভাঁজ করা একটা ছোট্ট জামা। বাচ্চা মেয়েদের ফতুয়ার মতো। হালকা গোলাপির ওপরে ছোট-ছোট লাল-নীল ফুল। সময়ের আঁচে রঙ বিবর্ণ, ময়লা। জামার পাশে একটা রুপোর লকেট—খুদে চেনের সঙ্গে বাঁধা।

আমি লকেটটা তুলে ভালো করে দেখলাম। রুপোর রঙ কালচে হয়ে গেছে। তবে তা হলেও জিনিসটা যে খাঁটি সেটা বোঝা যায়। লকেটের ওপরে খোদাই করে ইংরেজি 'এস' অক্ষরটা লেখা রয়েছে। তার গায়ে নানান কারুকাজ।

লকেটটা আবার রেখে দিলাম বাক্সে। তারপর তুলে নিলাম বাক্সে রাখা কতকগুলো পুরোনো ফটোগ্রাফ।

সব ফটোতেই সুনি রয়েছে। ছোটবেলা থেকে শুরু করে নানান বয়েসের ছবি। আমার চোখের সামনে একটা ফুল ফুটে উঠছে যেন ধীরে-ধীরে।

প্রভাবতী বিছানায় এসে বসলেন, বললেন, 'মেয়ের খেয়াল। খুশি মতো ফটো জমিয়ে রাখে।'

আমি ততক্ষণে ফটোগুলো রেখে বাক্সের শেষ জিনিসটা তুলে নিয়েছি।

একটা খাম। তার চারিদিকে রঙিন আলপনা। কাঁচা হাতের কাজ। কিন্তু পরিশ্রম দেখে আন্তরিকতার ছোঁওয়াটুকু টের পাওয়া যায়। খামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হলদে হয়ে যাওয়া একটা চিরকুট।

প্রভাবতী আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে লাগলেন। আর আমি অতি সন্তর্পণে চিরকুটের লেখাগুলো পড়তে লাগলাম। ইংরেজিতে লেখা ছোট্ট চিঠি। চিঠিটা লেখা হয়েছে দিল্লির বরাখাম্বা রোডের 'সাহারা' নামের একটি অনাথ আশ্রমের অধিকর্তাকে।

মাননীয় মহাশয়,

এই শিশুটি আমার মেয়ে। সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া ওকে মানুষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই আপনাদের আশ্রমে ওকে রেখে গেলাম। যদি কোনওদিন আমি প্রতিষ্ঠিত হই, তা হলে সেইদিন আপনাদের কাছে আসব ওকে ফিরিয়ে নিতে। আশা করি, আপনারা আমার এই শিশুটিকে গ্রহণ করবেন, কারণ ও সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। আর-একটা কথা, আমি ওর নাম রেখেছি সুনয়না। ধন্যবাদ নেবেন।

আপনারই একান্ত—
শিশুটির হতভাগ্য মা।

BanglaBook.org

চিঠিটা পড়া শেষ হলে আমি প্রভাবতীর দিকে তাকালাম। প্রভাবতীর গাল বেয়ে জল পড়ছে। অন্য সময়ের মতো উনি আর অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করছেন না।

আমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। চোখের সামনে ভেসে উঠল চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা হাত-পা ছোড়া একটা শিশু। গায়ে লাল-নীল ফুলওয়ালা জামা, আর গলায় রুপোর লকেট। কাঁদছে চিৎকার করে।

আমি চিঠিটা সাবধানে আবার ঢুকিয়ে রাখলাম খামের মধ্যে। তারপর খাম বাক্সে রেখে বাক্সটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম খাটের তলায়। সুনির বাক্স। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যেই যত দুঃখ-কষ্ট লুকিয়ে থাকে।

প্রভাবতী বিছানার চাদরটা আবার ঠিক করে দিলেন। আমি চা-বিস্কুটের প্লেট তুলে নিয়ে সুনির টেবিলের এককোণে রাখলাম। তারপর চেয়ারে বসে বললাম, 'ভাবিজি, আমাকে সুনির গল্পটা প্রথম থেকে বলুন।'

প্রভাবতী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। চশমা সরে গিয়েছিল। সেটা ঠিকভাবে বসিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওকে আমরা নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসি।'

আমি চুপ করে রইলাম। বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। এতক্ষণে ওই লোকগুলো সুনিকে নিয়ে কী করছে কে জানে!

প্রভাবতী জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। সেইভাবেই তাকিয়ে থেকে বললেন, 'একাত্তর সালে আমাদের প্রথম সন্তান জন্মাতে গিয়ে মারা যায়। তখন আমার অবস্থা হল পাগলের মতো। বাচ্চার সাধ সকলেরই থাকে। আমারও ছিল। কিন্তু প্রথমবারেই ওরকম একটা আঘাত পাব ভাবিনি। তা ছাড়া, ডাক্তার আমাকে বলেছিল, অন্তত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে সুস্থ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তখন সবদিক বিচার করে উনি দত্তক নেওয়ার কথা ভাবেন। "সাহারা" অনাথ আশ্রমের নাম আমরা আগেই শুনেছিলাম। সেখানে গিয়ে সুনয়নাকে দেখে আমাদের পছন্দ হয়। ওর বয়েস তখন তিন-সাড়ে তিন মাস। সেখানে ফর্ম ভর্তি করে, চিঠি-চাপাটি করে কোর্টের কাগজপত্রে সই করে আমরা সুনয়নাকে দত্তক নিই। তারপর থেকে ও আমাদেরই মেয়ে।'

আমি বিস্কুটে কামড় দিলাম। তেতো লাগল।

প্রভাবতীর কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল। উনি থামতেই আমি বললাম, 'আর সুনির বাক্সের ওই জিনিসগুলো?'

'ওগুলো অনাথ আশ্রম থেকে আমাদের দিয়েছিল। ওদের নিয়ম অনুযায়ী অনাথ শিশুর কোনও জিনিসই ওরা রাখে না। তবে ওগুলো যে আমরা নিয়েছি সে-রেকর্ড ওদের কাছে আছে।'

'সুনি সব জানল কেমন করে?'

প্রভাবতী আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বিষণ্ণভাবে হাসলেন। বললেন, 'অতীন, তুমি যা ভাবছ সেরকম কিছু নয়। ওর জানার ব্যাপারটার মধ্যে নাটকীয় কোনও ঘটনা নেই। ওর বয়েস যখন আট-সাড়ে আট বছর হয়েছে তখনই আমরা ওকে সব খুলে বলেছি। আর জিনিসগুলোও ওকে দিয়েছি। এতে মনে হচ্ছে, ভালোই হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা ও স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। তা না হলে একদিন-না-একদিন তো জানতে পারতই।'

আমি সুনির কথা ভাবলাম। সব জিনিসই ও কেমন সহজ-স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে।

প্রভাবতীকে জিগ্যেস করলাম, 'ওর আসল মা কখনও কোনও খোঁজ করেনি? ওকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেনি?'

'না, সরাসরি আমাদের কাছে কোনও খোঁজ করেনি। আমরা শুধু "সাহারা" থেকে

BanglaBook.org

বছরে একটা করে চিঠি পাই। ওরা দত্তক নেওয়া শিশুদের বছরে একবার করে খবর নেয়। ওদের নিয়ম। আর আমরাও তার উত্তর দিই।'

'এ-বছরে চিঠি পাননি?'

'পেয়েছি। জানুয়ারি মাসে। ওঁর কলকাতার অফিসে চিঠিটা এসেছিল। তার উত্তরও উনি দিয়েছেন।'

আর কিছু আমার জানার ছিল না। সুনি কখনও এই দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটা আমাকে বলেনি। হয়তো ওর কাছে ঘটনাটা তেমন উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি।

প্রভাবতী বললেন, 'তুমি হয়তো লক্ষ করেছ, আমরা সুনিকে কখনও তেমনভাবে শাসন করি না। তার কারণও এইটাই। ও কখনও যেন আমাদের শাসনে মনে আঘাত না পায়। আমাদের পর না ভাবে।' একটু থেমে প্রভাবতী জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা অতীন, তুমি এত কথা জানতে চাইছ কেন? সুনি চুরি যাওয়ার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?'

আমি হাই তুললাম, হঠাৎই ঘুম পাচ্ছিল। বললাম, 'না, এমনিতে কোনও সম্পর্ক নেই। ওগুলো দেখে কৌতূহল হল, তাই জিগ্যেস করলাম।'

কার সঙ্গে কোথায় কী সম্পর্ক সেকি সহজে বলা যায়!

বিনোদকুমার শুক্লার সঙ্গে সুধার কী সম্পর্ক ছিল?

কিংবা ড্রাগের সঙ্গে আমার?

প্রভাবতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কোয়ার্টজ ঘড়িতে মিষ্টি সুরে সাতটা বাজতে শুরু করল। উনি বললেন, 'তোমাকে আবার চা করে দিই? ওই চা-টা তো জুড়িয়ে গেল—!'

আমি বিস্কুট দুটো শেষ করলাম। তারপর নিজেকে এবং প্রভাবতীকে অবাক করে দিয়ে ঠান্ডা চায়ের কাপ তুলে নিলাম। এবং একঢোকে চা-টা শেষ করে দিলাম।

প্রভাবতী অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখলেন। সকালে হাতের চেটোয় সিগারেট নেভানোর সময়ে নগেন আচার্যর চোখেও এই ধরনের দৃষ্টি আমি দেখেছিলাম।

আমি বললাম, 'ভাবিজি, হরিনন্দনকে এবারে ডাকুন। ওকে নিয়ে একটু স্বাতীদের বাড়িতে যাব।'

প্রভাবতী উঠে গেলেন ওকে ডাকতে। আমিও সুনির ঘরে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হরিনন্দনকে সঙ্গে করে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময়ে প্রভাবতীকে জিগ্যেস করে জানতে পারলাম, ভিডিও ক্যাসেটটার কোনও কপি উনি করেননি। কারণ জগদীশ ভীষণভাবে আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, ওরা যেমন-যেমন বলেছে ঠিক সেইভাবে ক্যাসেটটা প্যাকেট করে ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে রেখে দেবেন। সুনিকে ওঁরা অক্ষত অবস্থায় ফেরত চান।

আমি তখন অন্য চিন্তা করছিলাম। স্বাতীর কাছ থেকে নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তারপরই সুশান্ত ভালুকদারের বাড়িতে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে। পুলিশের সাহায্য ছাড়া আর এগোনোটা ঠিক হবে না।

প্রভাবতীকে বললাম যে, পরদিন বিকেলে আমি আসব। টাকাটা যেন ওঁরা ঠিক মতো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন।

BanglaBook.org

হরিনন্দনকে নিয়ে রাস্তায় যখন পা দিলাম, তখন দেখি টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আবহাওয়া অনেকটা ঠান্ডা। কিন্তু তাতে বুকের বাঁ-দিকের জ্বালাপোড়াটা কমছিল কই?

ছয়

চিৎপুর আর লালবাজারের ক্রসিংয়ের কাছাকাছি একটা মাঝারি চা-মিষ্টি ইত্যাদির দোকানে বসেছিলাম আমরা। আমি, আমার অফিসের বন্ধু সুশান্ত তালুকদার, আর লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সুশীল দত্তচৌধুরী।

দত্তচৌধুরী সম্পর্কে সুশান্তর কীরকম কাকা হন। আগে বাংলাদেশে ছিলেন—অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে। একাত্তরের যুদ্ধের পর এ-দেশে চলে আসেন। সুশান্তর মা-বাবা আটচল্লিশ সালে ভারতে চলে এসেছিলেন। সুশান্তর জন্ম কলকাতায়। তবে যশোরে সুশান্তদের পরিবার সুশীলবাবুদের পাশাপাশিই থাকত। ভদ্রলোক সুশান্তর বাবার পিসতুতো ভাই। সম্পর্কটা রক্তের বিচারে দূরের হলেও পাশাপাশি থাকার জন্যে ওদের দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেক বেশি। সুশীলবাবুরা একাত্তরে যখন জন্মভূমি ছেড়ে চলে আসেন তখন সুশান্তদের বাড়িতেই উঠেছিলেন। প্রায় মাসতিনেক ছিলেন। পরে উনি পুলিশে চাকরি পান এবং বিভিন্ন পদোন্নতি এবং বদলির পর এখন লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে এসেছেন বছরদুয়েক। থাকেন বিজয়গড়ে। তবে সুশান্তদের বেনেপুকুরের বাড়িতে মাঝে-মাঝে যাতায়াত করেন।

চা ও সিঙাড়া খেতে-খেতে দত্তচৌধুরীই পুরোনো সব কথা বলছিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে, শ্যামবর্ণ রং, ছোট করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল, পান খাওয়ার অভ্যেস আছে, মুখের চামড়ায় একটা তেলতেলে ভাব আর কথায়-কথায় নাক কোঁচকানোর মুদ্রাদোষ লক্ষ করার মতো। দত্তচৌধুরী কলকাতায় এসেছেন প্রায় দেড়যুগ, কিন্তু তবুও ওঁর কথায় যশোরের টান স্পষ্ট।

কাল সন্ধেবেলা হরিনন্দনকে নিয়ে স্বাতীদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। স্বাতীর সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু তাতে নতুন কিছু জানা যায়নি। স্বাতী বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের নতুন জিমনাসিয়ামের কাছে সুনিকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একবার দেখেছিল। ওর সঙ্গে লালিও ছিল। সুনির পরনে বেগুনি আর সাদা ডোরাকাটা একটা পোশাক ছিল। স্বাতীর বাবা-মা আমার জিজ্ঞাসাবাদকে ভালো চোখে দেখছিলেন না। বরং স্বাতীর মুখে 'জানি না', 'দেখিনি', 'কী করে বলব?' এই গোছের উত্তর জুগিয়ে দিচ্ছিলেন, আর আমাকে পালটা প্রশ্ন করছিলেন : আমি কে? আচার্যদের সঙ্গে কী সম্পর্ক? সুনয়নার কী হয়েছে? কারও সঙ্গে ইলোপ করেছে? ইত্যাদি। শেষে আমি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছি ওদের বাড়ি থেকে।

হরিনন্দনকে ছেড়ে দিয়ে আমি রওনা হয়েছিলাম সুশান্তর বাড়ির দিকে।

ঘটনাটা পর-পর ভাবতে গিয়ে আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। অনেকগুলি জায়গায় খটকা লাগছিল। কিডন্যাপাররা যেদিন সুনিকে কিডন্যাপ করে সেদিন বনি ওর সঙ্গে

BanglaBook.org

পার্কে বেড়াতে যায়নি। প্রভাবতী বলেছেন, বনির শরীর ভালো ছিল না। কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ চাইল এক লাখ দু-লাখ নয়—দশ লাখ টাকা! একজন চাকরি করা মানুষ যে সহজে এই টাকা জোগাড় করতে পারবে না এ-কথা কি কলকাতার কিডন্যাপাররা জানে না? সে যাই হোক, জগদীশ আচার্যের ক্ষেত্রে সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে নগেন আচার্য। সে টাকা ধার দেবে দাদাকে—যে-দাদার সঙ্গে তার বিশ বছর যোগাযোগ ছিল না। জগদীশই আজ সকালে ভাইয়ের শরণাপন্ন হয়েছেন। সত্যিই, স্নেহ অতি বিষম বস্তু!

কিডন্যাপাররা ভিডিও ক্যাসেট পাঠিয়েছে জগদীশকে। ওরা কি জানত জগদীশের কাছে ভি. সি. আর রয়েছে? অবশ্য না থাকলে সেটা ভাড়া করেও নিয়ে আসা যেত। কিন্তু যেভাবে ওরা নির্দেশ ইত্যাদি দিয়েছে তাতে মনে হয়, জগদীশ আচার্য সম্পর্কে অনেক খবরই ওরা রাখে, আর সত্যিই হয়তো চব্বিশ ঘণ্টা নজরও রেখেছে ওঁর বাড়ির ওপরে।

সবশেষে দশ লাখ টাকা। কাল বিকেলের আগে যদি পুরো টাকাটা জোগাড় না হয়? ক্যাসেট দেখে যা মনে হয়েছে তাতে লোকগুলো কথামতোই কাজ করবে হয়তো। শুক্রবারের পর বড়জোর দুটো দিন ওরা দেখবে, তারপর সুনিকে হয়তো...।

সুশান্তর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফেরার পর নিজেকে অনেক হালকা লাগছিল। সুশীল দত্তচৌধুরী অনেক বেশি পেশাদারি ভঙ্গিতে এই ঘটনার মোকাবিলা করতে পারবেন। এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে-বলতেও সেই ধারণাটাই জোরদার হচ্ছিল।

সুশান্তকে অফিস থেকে কয়েক ঘণ্টার ছুটি করিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আর আমার একটা সাতদিনের ছুটির দরখাস্তও করে এসেছি অফিসে। আজ বিকেলে যদি কিডন্যাপারদের ফোন আসে তা হলে আমি চাই, পুলিশের কেউ তখন থেকেই এর সঙ্গে জড়িয়ে থাক। আমার সে-আশা বোধহয় পূর্ণ হবে। অন্তত দত্তচৌধুরী সেরকমই আশ্বাস দিলেন।

রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত ট্রাম-বাস-গাড়ি চলাচল করছে। ট্রামের ঘড়ঘড়, গাড়ি ও বাসের উৎকট হর্নের শব্দ, আর ইঞ্জিনের গর্জন—আমার কানে প্রায় তালা লাগার জোগাড়। তারই মধ্যে গলা চড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। কিছুক্ষণ সাধারণ গল্পগুজবের পর দত্তচৌধুরী আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইলেন।

আমি প্রথম থেকে সবটাই খুলে বললাম ওঁকে। আরও বললাম, কাল সারাটা রাত আমি সুনিদের বাড়ির কাছাকাছি পাহারায় ছিলাম। কিন্তু কাউকেই ওদের বাড়িতে ঢুকতে দেখিনি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। অথচ আজ সকালে ওদের বাড়িতে যেতেই শুনলাম, কিডন্যাপারদের নির্দেশ মতো ভিডিও ক্যাসেটটা প্যাকেট করে ওঁরা রাতে দরজার বাইরে রেখে দিয়েছিলেন এবং আজ ভোরবেলা হরিনন্দন দরজা খুলে দেখে, ওটা নেই।

কথাটা শুনে দত্তচৌধুরী কিছুক্ষণ আমাকে দেখলেন। তারপর সুশান্তকে বললেন, 'ভাইপো, তুমি এবার অফিসে যাও। অতীনবাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তোমার দেরি হয়ে যাবে। তবে চিন্তা নাই—তোমার বন্ধু যখন, তখন তোমার সুশীলকাকুর জান কবুল। এদিকে কী হয়-না-হয় তোমারে খবর দেব।'

সুশান্ত আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে চলে গেল। ও দত্তচৌধুরীকে আমার সম্পর্কে কতটা বলেছে জানি না। আমার দিদির দুর্ঘটনার কথা ওকে সংক্ষেপে একসময় বলেছিলাম।

সুশান্ত চলে যেতেই দত্তচৌধুরীর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। এতক্ষণের অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ভাবটা হুস্ করে যেন মিলিয়ে গেল। সেখানে চলে এল কর্তব্যপরায়ণ

BanglaBook.org

একটা পেশাদার মানুষ। আমাদের চা-সিঙাড়ার পাট চুকে গিয়েছিল। উনি পকেট থেকে পানের ডিবে বের করে একটা পান মুখে গুঁজে দিলেন। জড়ানো গলায় আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'পান-সিগারেট কিছু চলে না বুঝি?'

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'না।'

তখন দত্তচৌধুরী 'নারানবাবু' বলে কাউকে হাঁক দিলেন। দেখি খোদ কাউন্টারের লোকটি কাঁচুমাচু মুখে তাঁর সামনে এসে হাজির। বুঝলাম, সে দত্তচৌধুরীকে চেনে এবং তাঁর পরিচয় জানে। দত্তচৌধুরী বললেন, 'আমরা একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই। কোথায় বসলে সুবিধে হয়?'

নারানবাবু আমাদের নিয়ে গেল ভেতরদিকের একটা টেবিলের কাছে—দোকানের ময়রা-ঘরের ঠিক পাশে।

এখানে গাড়িঘোড়ার কোলাহল বেশ খানিকটা কম।

সেখানে আমরা দুজনে বসলাম মুখোমুখি। দত্তচৌধুরী এইবারে একটা ছোট ডায়েরি বের করলেন তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে আর সাদা শার্টের বুকপকেটে রাখা ডটপেনটাও বের করে নিলেন। তারপর আমাকে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করলেন এবং মাঝে-মাঝে কী সব নোট করতে লাগলেন ডায়েরিতে। ওঁর হাতের শিরা দেখা যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই মানুষটা সহজে মচকাবে না। আমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। সবাই গ্রেটার কৈলাসের মোহন সিং অরোরা নয়। আমার বাঁ-হাতে তালুর ফোস্কাটা কালই ফেটে গেছে। এখন জ্বালা করছিল।

সুনয়নার কিডন্যাপিংয়ের ঘটনাটা অন্তত বারতিনেক আমার কাছ থেকে শোনার পর এবং অন্তত একশোটা প্রশ্ন করার পর দত্তচৌধুরী পেন ও ডায়েরি পকেটে ফেরত পাঠালেন। নতুন একটা পান মুখে গুঁজে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপারটা আপনি অফিসিয়ালি রিপোর্ট করতে চাইছেন না?'

আমি একটু ইতস্তত করে জবাব দিলাম, 'আমি তাই চাইছিলাম—কিন্তু মেয়েটির মা-বাবা ভয়ে রাজি হচ্ছে না। সেইজন্যেই আপনার পরামর্শ আর সাহায্য চাইছি।'

দত্তচৌধুরী ছোট্ট করে শব্দ করলেন, 'হুঁম।' তারপর কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন। শেষে বললেন, 'টাকাটা ওরা জোগাড় করেছে?'

আমি বললাম, 'না, এখনও পর্যন্ত পুরো দশ লাখ হয়নি। সকালে শুনে এলাম জগদীশবাবু আর তাঁর ভাই মিলে লাখ ছয়েক টাকার ব্যবস্থা করেছেন। নগেন আচার্য বলল যে, বাকি চার লাখ টাকা সে কোত্থেকে যেন লোনের ব্যবস্থা করবে।'

'আপনি যে কাল সারারাত ওদের বাড়ির কাছাকাছি পাহারায় ছিলেন সেটা ওদের জানিয়েছেন?'

'না, বলিনি। তবে নগেন বলছিল যে, কাল রাত একটা-দেড়টা নাগাদ সে ওদের ফ্ল্যাটের দরজায় কারও পায়ের আওয়াজ পেয়েছে। ও ভয় পেয়ে কাউকে ডাকেনি, আর নিজেও বেরোয়নি।'

দত্তচৌধুরী আবার শব্দ করলেন, 'হুম!' তারপর বললেন, 'আজ বিকেলে কিডন্যাপারদের ফোন এল কি না আমি জানব কী করে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'আপনাকে আমি যেভাবে হোক খবর দিতে চাই।

BanglaBook.org

ওদের কথা শুনে মনে হয়েছে, খুব একটা বেশি সময় ওরা আমাদের দেবে না—যাতে আমরা কোনওরকম প্ল্যান আঁটতে না পারি। আপনি যদি রাজি থাকেন তা হলে দুপুর থেকে আমার বাড়িতে থাকতে পারেন। আমার বাড়ি বাগবাজারে। আচার্যদের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে মিনিট পনেরো-কুড়ির ব্যাপার। আমি বিকেল থেকে ওদের বাড়িতেই থাকব। কিডন্যাপারদের ফোন-টোন কিছু পেলেই বাড়িতে গিয়ে আপনাকে খবর দেব।'

দত্তচৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমার কথায় যে আকুলভাব ফুটে উঠছিল তার জন্যে আমার নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম যে, সুনিকে বাঁচাতে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি।

দত্তচৌধুরী চোয়াল নাড়ছিলেন। ওঁর শক্ত হাড় প্রকট হচ্ছিল নির্দিষ্ট সময় পরপর। হঠাৎই নাক কুঁচকে আপনমনে উনি বললেন, 'এটা বড় ঝুঁকির ব্যাপার। সিক্রেট মিশন-টিশন যা হোক বলে অফিস থেকে একটা গাড়ির স্পেশাল ব্যবস্থা করতে হবে। একটু অফিসিয়াল ছোঁয়া না রাখলে পরে...।'

একটা ট্রাম বিচ্ছিরি শব্দ করে চলে গেল। দত্তচৌধুরী ওটার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু অফিসিয়াল ছোঁয়া না রাখলে পরে আপনিই হয়তো ঝামেলায় পড়ে যাবেন। ধরুন, ওরা যদি শেষমেশ মেয়েটাকে মার্ডারই করে দেয়—তখন?'

আমি মুখ নিচু করে বসে রইলাম। সুনি হলদে ট্র্যাক-স্যুট পরে দু-হাত বাড়িয়ে আমার দিকে ছুটে আসছিল, আর 'বুড়ঢা জনাব! বুড়ঢা জনাব।' বলে চিৎকার করছিল। ওর হলদে ট্র্যাক-স্যুটে আমি রক্তের ছিটে দেখতে পেলাম আবার।

মুখ তুলে দত্তচৌধুরীর দিকে তাকালাম। বললাম, 'মেয়েটা মার্ডার হয়ে গেলে আর তো কোনও ঝামেলাই থাকছে না। সব গল্প শেষ। তখন জানব কলকাতা আর দিল্লির মধ্যে সত্যিই কোনও ফারাক নেই।'

দত্তচৌধুরী অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে আমাকে কয়েক সেকেন্ড দেখলেন। তারপর বললেন, 'সুনয়না মেয়েটার একটা ফটো আমাকে দিতে পারেন? আর ওদের দিল্লির ঠিকানা, 'সাহারা' অনাথ আশ্রমের ঠিকানা, জগদীশ আচার্যের বাড়ি আর অফিসের ঠিকানা, নগেন আচার্যের বাড়ির ঠিকানা—এ-সবই আমার চাই।'

আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। এগুলো এত সহজে কি পাওয়া যাবে?

দত্তচৌধুরী আমাকে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎই উঠে গিয়ে দোকানের বেসিনে পানের পিক ফেলে এলেন। তারপর বললেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে আপনি যেমন করে হোক বাঁচাতে চান। তা হলে আমার কয়েকটা কথা মন দিয়া শোনেন। এই দশ লাখ টাকার দেওয়ার ব্যাপারটা যে করে হোক দু-দিন দেরি করিয়ে দেন। আর ওই ছবি আর ঠিকানাগুলো আমাকে আজ রাতের মধ্যে দেন—যে করে হোক।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে দত্তচৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দত্তচৌধুরী জিভের ডগা দিয়ে দাঁতের কোনা খোঁচাচ্ছিলেন। বললেন, 'আপনিই তো বললেন, কিডন্যাপাররা বলেছে, টাকা দিতে দেরি হলে দিন পিছু পনেরো হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। দরকার হয় তাই দেবেন, কিন্তু তার আগে আমি একটু খোঁজখবরের সময় চাই। একটু ভাবতে চাই।'

BanglaBook.org

আমি চিন্তা জড়ানো গলায় বললাম, 'দু-দিন দেরি করলে ওরা সুনিকে নিয়ে কী করবে কে জানে...।'

দত্তচৌধুরী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দু-দিন না পারুন অন্তত একটা দিন যে করে হোক আমাকে দেন—।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে—দেখি।'

দত্তচৌধুরী নাক কোঁচকালেন। বললেন, 'আজকের মধ্যে আমাকে খবরগুলো দেন। তা হলে আজ রাতেই আমি অফিস থেকে টেলেক্স মেসেজ পাঠিয়ে খবর নেওয়ার কাজ শুরু করব। আমি সন্ধে ছ'টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত অফিসে থাকব। আপনি এই টেলিফোন নম্বরে ফোন করতে পারেন—।'

পকেট থেকে ডায়েরি আর পেন বের করলেন দত্তচৌধুরী। একটা পৃষ্ঠার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে একটা টেলিফোন নম্বর লিখলেন। চিরকুটটা আমার হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 'অতীনবাবু, এখন আপনার উপরেই সব নির্ভর করছে।'

আমি চিরকুটটা পকেটে রাখলাম। বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছিল। ছ'বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সুধা কোথা থেকে এসে কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

দত্তচৌধুরী আমাকে দেখছিলেন। আমি চোয়াল চেপে বললাম, 'টেলিফোনে হোক, অফিসে হোক—আপনাকে ঠিক খবর দেব। আপনি আমার বাড়ির ঠিকানাটা লিখে নিন।'

আমি বাঁ-হাতের চেটো মুখের কাছে এনে ফোস্কার জায়গাটায় কয়েকবার ফুঁ দিলাম। তারপর ঠিকানাটা দিলাম দত্তচৌধুরীকে।

দত্তচৌধুরী ঠিকানা লেখা শেষ করে ডায়েরি আর পেন পকেটে রাখলেন। উঠে বেসিনের কাছে গেলেন মুখ ধোওয়ার জন্যে। তারপর ফিরে এসে বললেন, 'অতীনবাবু, ভুলে যাবেন না, আমাদের খেলাটা আগুন নিয়ে। হাত পুড়তে পারে। বি ড্যাম কেয়ারফুল।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। আমরা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। দত্তচৌধুরী আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। আমি ওঁর খসখসে হাতের ছোঁয়ায় ভরসা পেলাম। সামনে লড়াই। গয়েরকানুনি জঙ্গ।

বিকেলে সুনিদের বাড়িতে যাওয়ার সময়ে স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, অস্থিরতা বাড়ছে। কাল সারা রাত ঘুম হয়নি, ফলে দুপুরের ঘুমটা বেশ গাঢ় হয়েছিল। মাকে বলে রেখেছিলাম তিনটে নাগাদ আমাকে ডেকে দেওয়ার জন্যে। মা বুঝতে পারছিল যে, আমার রোজকার নিয়মগুলো বেহিসেবি হয়ে যাচ্ছে। একবার শুধু জিগ্যেস করেছিল সুনিকে পাওয়া গেছে কি না। সে-নিয়ে আর কোনও কথা বলেনি। বরং বারবার আমাকে বলেছে, 'অন্তু, তোকে নিয়ে আমার ভয় হয়।' আমি জানি, মা পিন্টির কথা ভাবছিল। মায়ের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাচ্ছিল লাজপতনগরের মেন্টাল হোমের কথা। কাল রাতে যে বাড়িতে থাকব না সেটা মাকে বলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় যাব তা বলিনি। আজ ভোরে ছ'টা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরেছি, দেখি মা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ লাল।

মায়ের কথা ভাবতে-ভাবতেই সুনিদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলাম।

হরিনন্দন দরজা খুলল। বলল, 'আপ ব্যয়ঠিয়ে, মাজিকো খবর করতা হ।'

BanglaBook.org

বসবার ঘরটা আজ ভীষণ ফাঁকা ঠেকল। অথচ আসবাবপত্র সবই যেমন-কে-তেমন আছে।

পরপর তিনটে জিনিসের দিকে আমার নজর গেল : সবুজ ডিজিটাল টেলিফোন, কালার টিভি এবং সুনির ফটো।

টেলিফোনের কাছাকাছি একটা সোফায় গিয়ে বসলাম। টেবিলে আজকের খবরের কাগজ। জানি, ওতে সুনির গুম হওয়ার কোনও খবর নেই। কিন্তু তবুও প্রথম পৃষ্ঠার ওপরদিকে একটা ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহের ছবি আমি যেন দেখতে পেলাম।

প্রভাবতী কখন ঘরে এসেছিলেন টের পাইনি। আমার নাম উচ্চারণ করতেই আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। সময় বড় মক্কার, বড় শয়তান। মাত্র কয়েকঘণ্টায় মহিলার যাবতীয় শ্রী বনবাসে চলে গেছে। কবে ফিরবে কে জানে!

প্রভাবতীকে বসতে বললাম। উনি বসলেন। ভয়ের ছায়াটা গতকালও মুখের ওপরে আসা-যাওয়া করছিল। আজ আর করছে না। মুখের ওপরেই পাকাপাকি বাসা বেঁধেছে।

ওঁকে জিগ্যেস করে জানলাম, জগদীশ ও নগেন দুজনের কেউই বাড়িতে নেই। বোধহয় বাকি চার লাখের ব্যবস্থা করতে গেছে। দত্তচৌধুরীর কথাগুলো আমার মনে পড়ল। ওঁর দরকারি খবরগুলো প্রভাবতীর কাছেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রভাবতী কি এককথায় সেগুলো জানাবেন আমাকে? ওঁর মনে হয়তো একশোটা প্রশ্ন জেগে উঠবে।

হঠাৎই মনে হল, প্রভাবতী এই মুহূর্তে অনেক দুর্বল। ওঁর সারা শরীরে টেনশন। ওঁর আত্মরক্ষার চেষ্টা কিংবা প্রতিরোধ এখন তেমন জোরালো নয়। সুতরাং কিছু করতে হলে এখনই—জগদীশ বা নগেন এসে পড়ার আগেই।

আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি ঝটিতি ফোন তুলে নিলাম। প্রভাবতী বড়-বড় চোখে আমাকে দেখছেন।

'হ্যালো—।'

ও-পাশ থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ একটা ফোন নাম্বার বলল।

আমি বড় নিশ্বাস ছাড়লাম। রং নাম্বার। কিন্তু মুখে সে-কথা না বলে ফোনটা ধরে রইলাম। শুনতে পাচ্ছি ও-পাশের লোকটা বিরক্ত হয়ে একই কথা বারবার জিগ্যেস করছে। আমি কিছুক্ষণ ওর কথা শোনার ভান করে বললাম, 'না, না, বনি একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্চা! ওকে আপনারা রেহাই দিন। বলছি তো, আপনাদের সব শর্তে আমরা রাজি। বিলকুল মঞ্জুর হ্যায় হমে। প্লিজ, বনিকে কিছু করবেন না।'

প্রভাবতী উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। এদিকে টেলিফোনের লোকটা দু-চারটে ভদ্রগোছের গালাগাল দিয়ে ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড পরে আমিও ফোন ছেড়ে দিলাম।

তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলাম।

প্রভাবতী রুদ্ধ গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, অতীন?'

আমি কয়েকবার ঢোক গিললাম। রুমাল পকেটে রেখে সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে বসলাম। টেনশনের কাঁটা বিপদসীমার দিকে এগোতে লাগল। প্রভাবতীকে বসতে বললাম। উনি অন্য সোফাটায় বসলেন। আমি এবারে কথা বললাম।

'কিডন্যাপাররা ফোন করেছিল। বলছে, ওদের কথা অক্ষরে-অক্ষরে না শুনলে

BanglaBook.org

বনিকেও তুলে নিয়ে যাবে। অথবা দশ লাখ টাকার বদলে বনিকে চাইবে।'

প্রভাবতীর গলা চিরে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এল। সুনির সঙ্গে না থাকতে পারে, কিন্তু বনির সঙ্গে যে নাড়ির টান!

'এখন কী হবে তা হলে?'

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করার ভান করে বললাম, 'ভাবিজি, আপনাকে অনেকবার বলেছি, সুনিকে আমি সহি-সলামত ওয়াপস চাই। আপনার স্বামী বড় অবুঝ—একরোখা মানুষ। নগেনও খানিকটা তাই। আমি নিজে একটা মতলব ভেঁজেছি। তার জন্যে কয়েকটা খবর আমার দরকার—এক্ষুনি। ওগুলো না পেলে আমার আর কিছু করার নেই। এ-ব্যাপারটা থেকে আমি একেবারে হাত ধুয়ে ফেলব। এখন আপনি যা ভালো বোঝেন...।'

প্রভাবতী উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, 'কী খবর চাও তুমি, বলো—।'

আমি তখন কাগজ-কলম চাইলাম, এবং সুশীল দত্তচৌধুরীর চাওয়া সুনির ফটো এবং ঠিকানাগুলোর কথা বললাম।

স্পষ্ট দেখলাম, প্রভাবতী স্বস্তি পেলেন যেন। উনি মনে হয় অনেক সাঙ্ঘাতিক কিছু আশা করেছিলেন। হরিনন্দনকে ডাকলেন উঁচু গলায়। তারপর আমাকে বললেন, 'তুমি বোসো, হরিনন্দন কাগজ-কলম দিচ্ছে। আমি ভেতরের ঘরে যাচ্ছি—সুনির ফটো আর ঠিকানাগুলো নিয়ে আসি।'

হরিনন্দন নিঃশব্দে ঘরে এল। একটা সাদা প্যাড আর একটা নীল প্লাস্টিকের ডটপেন দিয়ে গেল আমার হাতে। যাওয়ার আগে থমকে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'বাবুজি, মিসিবাবাকা কুছ খবর মিলি কেয়া?'

আমি প্রৌঢ় মানুষটাকে দেখলাম। ও অনেকদিন সুনিদের কাছে আছে। সেই দিল্লি থেকেই। এর মধ্যেই ওর স্নেহ-মায়া-মমতার শিকড়-বাকড় সুনি ও বনির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা ভুলে যাই, আগাছাদেরও শিকড় থাকে। শুধু শিকড় দেখে আগাছা বলে তাদের চেনা যায় না। ওই একটি জায়গায় ওদের অহঙ্কার।

হরিনন্দনকে বললাম যে, এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও খবর নেই, তবে সুনয়না ভালো আছে। কাল-পরশুই ফিরে আসবে হয়তো।

মাথা ঝুঁকিয়ে হরিনন্দন চলে গেল। বাইরে থেকে কোয়ার্জ ঘড়ির একটা ঘণ্টা শোনা গেল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকালাম : সাড়ে চারটে।

প্রভাবতী তখনই ঘরে ঢুকলেন। হাতে কিছু কাগজপত্র। আমার কাছে এসে বসে পড়লেন সোফায়। বললেন, 'তাড়াতাড়ি লিখে নাও। ওরা হয়তো এখুনি এসে পড়বে।'

উনি হাতের কাগজ দেখে বলতে লাগলেন, আর আমি দ্রুত হাতে লিখে নিতে লাগলাম। সত্যিই যদি জগদীশ আচার্য এখন এসে পড়েন তাহলে প্রভাবতীকে মুশকিলে পড়তে হতে পারে।

ঠিকানা লেখা শেষ হতেই প্রভাবতী সুনির একটা রঙিন ফটো আমাকে দিলেন। কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানে তোলা। সুনি হাসছে। ফটোটা বুকপকেটে ঢুকিয়ে নিলাম।

প্রভাবতী বললেন, 'দেবরজির ঠিকানাটা আজ সকালেই ও লিখে নিয়েছে। কী বলছিল, টাকা জোগাড় করার ব্যাপারে হয়তো হরিনন্দনকে দিয়ে কোনও খবর পাঠাতে হতে পারে, তাই। তা না হলে এই ঠিকানাটা তোমাকে দিতে পারতাম না।'

BanglaBook.org

আমি ঠিকানা লেখা প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে চালান করে দিলাম। এই জরুরি কাজটা এত সহজে মিটে যাবে ভাবিনি। এগুলো পেলে দত্তচৌধুরী খুশি হবেন। কিন্তু এখনও আসল কাজটা বাকি : কিডন্যাপারদের মুক্তিপণ দেওয়ার ব্যাপারটা কমসে কম একটা দিন পিছিয়ে দেওয়া।

প্রভাবতী উঠে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে নিচু গলায় বললেন, 'এই ফটো আর ঠিকানাগুলো যে তোমাকে দিয়েছি সে-কথা ওকে বোলো না। আসলে সুনিকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। যখন আমার গলায় দড়ি দেওয়ার মতন অবস্থা হয়েছিল, তখন ও-ই আমাকে বাঁচিয়েছিল। ওর কাছে আমার অনেক দেনা। অবশ্য আমার স্বামীরও তাই। সুনি ঘরে আসার পরেই ওর পরপর দুটো প্রোমোশান হয়, আর ফিনান্‌শিয়াল কনসালট্যান্সির কাজটাও ও শুরু করে। সুনি আমাদের কাছে ভীষণ লাকি—।'

প্রভাবতী চশমা খুলে ফেললেন। কোনওরকম লুকোনার চেষ্টা না করেই আঁচলে চোখ মুছলেন। তারপর চলে গেলেন ঘর থেকে।

আমি এবার সত্যিকারের টেলিফোনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কখন ফোন করবে ওরা?

বসে-বসেই পুরো একটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। প্রভাবতী এর মধ্যে অতিথিসেবার ব্যবস্থা করেছেন। বনিও বারতিনেক ঘুরে গেছে ঘরে। হাতে কালো-সবুজ-হলদে রঙের প্লাস্টিকের খেলনা স্টেনগান। যখন যেদিকে খুশি তাক করে ফায়ার করে যাচ্ছিল বনি। আর বলছিল, 'চুন চুন কর্ মারুঙ্গা! চুন চুন কর্ মারুঙ্গা!'

ওকে দেখে খারাপ লাগছিল। বেচারা লালিকে বড্ড ভালোবাসত। হঠাৎই মনে হল, বনির সঙ্গে আমার কোনও তফাত নেই। আমিও ওরই মতো অসহায়। খেলনা স্টেনগান ছাড়া আর কিছুই চালাতে পারি না।

চায়ের কাপ শেষ করে যখন টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়েছি, ঠিক তখনই কলিংবেল বেজে উঠল। দেখলাম, আশা গেল দরজা খুলতে। পিছনে উদ্বিগ্ন প্রভাবতী।

একটু পরেই বসবার ঘরে ঢুকলেন জগদীশ আচার্য। সঙ্গে নগেন। ওদের দুজনের চেহারাই ঝোড়ো কাকের মতো। জগদীশের হাতে একটা নাইলনের সস্তা থলে। থলেটা প্রভাবতীর হাতে দিয়ে বললেন, 'বেডরুমে নিয়ে যাও। আমি একটু বাদে আসছি।'

আমার মুখোমুখি সোফায় বসলেন জগদীশ। দম নিতে লাগলেন। ওঁর গালে, গলায়, কপালে ঘাম। গায়ের জামাটাও অনেক জায়গায় ঘামে ভেজা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কতক্ষণ?'

আমি বললাম, 'এই তো—কিছুক্ষণ হয়েছে।'

জগদীশের মুখ দেখে বুঝলাম, আমার খোঁয়াটে উত্তরটা ওঁর পছন্দ হয়নি।

নগেন বসেনি। সিলিং ফ্যানের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে মুখটা ওপর দিকে তুলে হাওয়া খাচ্ছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'টাকার ব্যবস্থা হয়েছে?'

জগদীশ ইশারায় নগেনকে দেখিয়ে বললেন, 'বাকি চার লাখ টাকাটা ও-ই অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছে।'

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'আজ আমরা ওদের টাকা দেব না।'

ঘরে যেন বাজ পড়ল।

জগদীশ রুক্ষভাবে আমার দিকে তাকালেন। ওঁর গাল দুটো অনেক বেশি ফোলা লাগছে। নগেন আমার দিকে এক পা এগিয়ে এল।

জগদীশ বললেন, 'আর য়ু ম্যাড, মিস্টার দত্ত? আপকা দিমাক তো ঠিক হ্যায়! জানেন না, টাকা না পেলে ওরা সুনিকে কী করবে!'

আমি শান্তভাবে বললাম, 'আমার মাথা ঠিক আছে বলেই মনে হয়। আমি ভাববার জন্যে একটা দিন অন্তত সময় চাই। কারণ, টাকাটা যদি আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয় তা হলে তার মধ্যে অনেক রিস্ক আছে। আমাকে হিসেব করে চলতে হবে।'

নগেন একটা নোংরা শব্দ করে আমার খুব কাছে চলে এল। বলল, 'আমাদের মাথার ওপরে এমন বিপদ, আর আপনি সেই সুযোগে ব্ল্যাকমেল করছেন?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'ব্ল্যাকমেল নয়—সুনির ভালোর জন্যেই বলছি।'

নগেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'এটা আমাদের ফ্যামিলি ম্যাটার—এর ভালোমন্দ আমরা বুঝব। আপনি যদি না যান, আমি কিংবা দাদা তা হলে টাকা নিয়ে যাব। টাকা না পেলে ওরা আমরা ভাইঝিটার কী দশা করবে কে জানে!'

আমি বিপদের গন্ধ পেলাম। দত্তচৌধুরীর কথা মনে পড়ল : 'দু-দিন না পারুন অন্তত একটা দিন যে করে হোক আমাকে দিন—।'

সুতরাং আমি বললাম, 'সত্যি, আপনার মতো কাকা দেখা যায় না। যে-ভাইঝিকে এখনও পর্যন্ত কোনওদিন চোখেও দেখেননি তার জন্যে কত মায়া—!'

আমার কথায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া ছিল যথেষ্ট। জগদীশ রেগে গিয়ে কী একটা বললেন যেন—ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু নগেন অগ্নিশর্মা হয়ে হাত তুলল : 'য়ু ব্লাডি বাস্টার্ড!'

আমি এইটাই চাইছিলাম। মাথার মধ্যে টগবগ করে রক্ত ফুটছিল। সুনিকে এখনও উদ্ধার করতে না পারার ব্যর্থতা জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল বুকে। ফলে নগেনের মুখটা পলকে পারমিন্দার অথবা লোধার মতো হয়ে গেল। ওর হাতটা আমার মুখ লক্ষ করে এগিয়ে আসছিল, আমি দু-হাতে সেই আঘাত রুখলাম। শক্ত করে চেপে ধরলাম হাতটা। এমন মরিয়া হয়ে উঠলাম যেন হাতটা ছেড়ে দিলেই সুনিকে আর কোনওদিন আমি দেখতে পাব না।

নগেন হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করছিল। অন্য হাত দিয়ে আমার জামা খামচে ধরল। জগদীশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হচ্ছে, নগেন!' উঠে দাঁড়ালেন সোফা ছেড়ে।

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'এখনও থামুন!'

নগেন শুনল না। ওর মাথায় যেন ভূত সওয়ার হয়েছে।

তখন আমি এক ঝটকায় বসে পড়লাম সোফায়। নগেনকে হ্যাঁচকা টান মারলাম। আর একইসঙ্গে দুটো পা ওর পেটের কাছে চেপে ধরে ওকে টপকে দিলাম সোফার ওপর দিয়ে পেছনে।

নগেন ছিটকে পড়ল। ঘরের মেঝেতে কার্পেট থাকায় নগেনের ধরাশায়ী হওয়ার শব্দটা ভোঁতা শোনাল। আমার বিনোদকুমারের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

BanglaBook.org

প্রভাবতীর চিৎকার শুনতে পেলাম। কখন যেন ফিরে এসেছেন ঘরে। জগদীশও একটা সাবধানবাণী উচ্চারণ করে এগিয়ে আসছিলেন আমার কাছে। কিন্তু তারই মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেছে।

আমি আবার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। শরীর টানটান করে এবারে আমি নগেনের জন্য পুরোপুরি তৈরি। কিন্তু জগদীশ গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন নগেনকে। ও তখন উঠে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড় ঠিকঠাক করছে। জগদীশ বললেন, 'এখন এসব কাজিয়া নয়। আসলে সুনির কথা ভেবে আমাদের কারোরই আর মাথার ঠিক নেই। অতীনবাবু, কিছু মনে করবেন না। আমি নগেনের হয়ে অ্যাপোলোজাইজ করছি।'

আমি শরীর ঢিলে করলাম, বললাম, 'সরি, নগেনবাবু—।'

নগেন আমাকে দেখল। বোধহয় একটু আগের ঘটনাটা ও আমার মাথার পাকা চুলগুলোর সঙ্গে মেলাতে পারছিল না। কারণ দেখলাম, ওর চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। আমি এবারে পুরোনো কথাটা আর-একবার বললাম : 'আজ আমরা টাকা দিচ্ছি না।'

জগদীশ প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। প্রভাবতী ঠিক কার পক্ষ নেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। নগেনের চোখে-মুখে অসন্তোষ এবং রাগ, কিন্তু মুখে কথা নেই।

একসময় দেখলাম, প্রভাবতী স্বামীকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। নিচু গলায় কী যেন বললেন, আর তার পরেই জগদীশ কেমন যেন মিইয়ে গিয়ে আমার কাছে এসে নরম গলায় বললেন, 'অতীনবাবু, আমি আর ভাবতে পারছি না। আপনি যা ভালো বোঝেন করুন। শুধু আমার বাচ্চিকে ওয়াপস নিয়ে আসুন আমার কাছে। ওকে ছাড়া আমি...আমি...।'

আমার খারাপ লাগল। জগদীশের প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। ওঁকে আশ্বাস দিলাম মিছিমিছি। কারণ, সুনির নিরাপত্তার দায়িত্ব কেমন করে নেব আমি? তবে বুঝলাম না, প্রভাবতী স্বামীকে কী মন্ত্রে শান্ত করলেন। হয়তো এ-কথা বলে নিরস্ত করেছেন যে, এ-সময়ে আমার সঙ্গে মন কষাকষি হলে আমি পুলিশে খবর দিয়ে সুনির নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারি।

চুপচাপ কয়েকমিনিট কেটে গেল। তারপর জগদীশ প্রভাবতীকে ডেকে নিয়ে ভেতরের ঘরে রওনা হবেন, ঠিক সেই সময়ে প্রভাবতী বলে উঠলেন, 'ওঃ হো, বলতে একদম ভুলে গেছি। তোমরা আসার কিছু আগে ওই লোকগুলো ফোন করেছিল।'

জগদীশ চমকে উঠলেন। ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'ওরা মানে, কারা?'

'ওই যারা সুনিকে ধরে নিয়ে গেছে...।'

এবারে নগেনও চমকে উঠল সাপ দেখার মতো। আপনমনে বলল, 'ওরা ফোন করেছিল?'

জগদীশ জিগ্যেস করলেন, 'কী বলল ওরা?'

প্রভাবতী সব বললেন, ওঁর গলা কেঁপে যাচ্ছিল বারবার।

নগেন নির্বাক বিস্ময়ে ভাবিকে দেখছিল, আর জগদীশ অবিচলভাবে সব শোনার পর আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমি সরাসরি ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এইভাবে তাকিয়ে থাকতে পারলে অনেক মিথ্যেকে সত্যি করে দেওয়া যায়।

একসময়ে চোখ সরিয়ে নিলেন জগদীশ। কিন্তু ওঁর মুখের বিস্ময়ের ভাবটা

BanglaBook.org

পুরোপুরি গেল না। আর ভুরুতে সামান্য ভাঁজ থেকেই গেল। তিনি প্রভাবতীকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন ঘর থেকে।

তার কয়েক সেকেন্ড পরেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। নগেন প্রায় ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল। দু-একটা কথা বলল। তারপর ফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'মিস্টার দত্ত, ওরা ফোন করেছে। কী বলবেন বলুন—।'

আমি ওর কাছ থেকে টেলিফোন নিলাম। যতরকমভাবে সম্ভব অনুনয় বিনয় করে বললাম যে, দশ লাখ টাকা পুরোপুরি জোগাড় করে উঠতে পারিনি। তবে কালকের মধ্যে যে করে হোক ব্যবস্থা করবই। সুনির যেন কোনও ক্ষতি না হয়। একটা দিন সময় আমাকে ভিক্ষে দিন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

টেলিফোনে কথাবার্তা চলাকালীন জগদীশ এবং প্রভাবতী ঘরে এসে পড়েছিলেন আবার। জগদীশ আমার পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। আর প্রভাবতী দূরে। ওঁর মুখে কালো ছায়া।

টেলিফোনে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি একঘেয়েভাবে একটা দিন ভিক্ষে চাইছিলাম ওদের কাছে। এখন মাথা গরম করলে চলবে না। সুনি আছে ওদের কাছে।

শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি হল। তবে বাড়তি পনেরো হাজারের কথা মনে করিয়ে দিতে ভুলল না। আমি সুনির সঙ্গে একবার কথা বলতে চাইলাম। উত্তরে লোকটা ওকে নিয়ে একটা অশ্লীল মন্তব্য করল। তারপর কাল সন্ধেবেলা ফোন করবে জানিয়ে লাইন কেটে দিল।

জগদীশ বললেন, 'মিস্টার দত্ত, আপনি আমাদের জন্যে যা করছেন তা কোনওদিন শোধ করতে পারব না।'

মনে-মনে বললাম, না, যা করছি তা সবই সুনির জন্যে। সুনির জন্যে। আমার কাছে বারবার সাহায্য চেয়ে ও কাঁদছিল। ওর 'বুড়ঢা জনাব' ডাক আমাকে পাগল করে দিয়েছে।

এরপর আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম, এখন কী-কী কাজ আমাদের করতে হবে। প্রভাবতী, জগদীশ ও নগেন মিলে একশো টাকার বান্ডিলগুলো ভালো করে মুড়ে প্যাকেট করে রাখবেন। কাল সন্ধেবেলা ওদের ফোন এলে আমি টাকাটা নিয়ে জায়গা মতো দিয়ে আসব। জগদীশ একটা প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা করে রাখবেন আমার জন্যে।

নগেন সঙ্গে যেতে চাইছিল, আমিই বারণ করলাম। এসব কাজে বেশি লোক গেলে কাজ পণ্ড হতে পারে। জগদীশও বারবার আমাকে সাবধান করে দিলেন—টাকাটা দেওয়ার সময়ে কোনও ভুলচুক যেন না হয়। আর সুনিকে কখন কীভাবে ওরা ফেরত দেবে সেটা যেন আমি ভালো করে জেনে নিই।

ওঁদের ফ্ল্যাট ছেড়ে যখন চলে এলাম তখন সাতটা বেজে গেছে। লক্ষ করলাম, নগেন আচার্য এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমি ওকে আমল দিলাম না। এখন আমাকে লালবাজারে যেতে হবে। দত্তচৌধুরীকে সব খবরগুলো দেওয়া দরকার। আর তার সঙ্গে সুনির ফটো ও ঠিকানাগুলো।

ফড়িয়াপুকুরের মোড়ে এসে একটু দাঁড়াতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

সাত

রাত দশটা। গতকাল ভ্যাপসা গরম ছিল সারাটা দিন। আজও সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। সন্ধের মুখে বৃষ্টি শুরু হল। প্রথমে টিপটিপ। তারপরে ঝিরঝির। আর তারও পরে ঝমঝম।

আমাদের অ্যাম্বাসাডর সারকুলার রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। রাস্তায় জলের ফোঁটার খই ফুটছে। গাড়ি সামনের কাচ জলে ঝাপসা। ওয়াইপার জোড়া চেষ্টা করেও এঁটে উঠতে পারছে না। আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছি। দশ লাখ টাকার নোটের বান্ডিলগুলো একটা বড় নাইলনের থলেতে করে শোয়ানো রয়েছে পিছনের সিটে।

গাড়ির ড্রাইভারের নাম সুজিত। অল্পবয়েসি চটপটে ছেলে। মাথায় কোঁকড়া চুল, ফরসা কচি মুখ। জগদীশের কোনও চেনা গ্যারেজ থেকে ভাড়া করা হয়েছে গাড়িটা।

বিকেল চারটে থেকেই সেন মহাশয়ের মিষ্টির দোকানের কাছে গাড়ি নিয়ে মোতায়েন ছিল সুজিত। আর জগদীশ আগেভাগেই ওকে পনেরো লিটার তেল ভরে নিতে বলেছিলেন। কারণ কিডন্যাপাররা কোথায় কত দূরে দেখা করতে বলবে কে জানে!

ওদের টেলিফোন এসেছিল ঠিক ছ'টার সময়। আমরা সবাই দম বন্ধ করে ফোনটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

জগদীশ ফোন ধরলেন। চুল উসকো-খুসকো। গায়ে গেঞ্জি উলটো করে পরেছেন। সোনার চেন চকচক করছে। লকেটটা চোখে পড়ল না।

আজ কথায়-কথায় জগদীশ খিঁচিয়ে উঠছেন প্রভাবতীকে আর নগেনকে। হরিনন্দনকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন বসবার ঘরে না ঢুকতে। বনি বন্দি রয়েছে আশার জিম্মায়। স্তব্ধ ঘরে সিলিং ফ্যানের বেয়াড়া বেয়ারিং একনাগাড়ে চিকচিক শব্দ তুলছে। তারই মধ্যে টেলিফোনটা এল।

জগদীশ প্রাথমিক দু-চারটে কথা বলেই আমাকে ফোন দিলেন। বললেন, 'আপনি যাবেন, আপনিই ইন্সট্রাকশনগুলো ঠিকঠাক শুনে নিন। বি কেয়ারফুল। উই ক্যান্ট অ্যাফর্ড টু মেক এনি মিসটেক।'

প্রভাবতী বারবার চশমা খুলছেন আর পরছেন। নগেন টিভির কাছে দাঁড়িয়ে খানিকটা উদাসীনভাবেই আমাদের দেখছে। কালকের অপমানটা যে ও হজম করতে পারেনি সেটা ওর আজকের চালচলন দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

আমি টেলিফোনে 'হ্যালো' বলামাত্রই ও-প্রান্ত থেকে একটা খিস্তি ছুড়ে দিল কেউ। তারপর জানতে চাইল, 'রুপেয়া কা ইন্তেজাম হুয়া কেয়া?'

আমি বললাম যে, দশ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা রেডি আছে। কোথায় গিয়ে দিয়ে আসতে হবে জানতে পারলেই আমি গিয়ে দিয়ে আসব।

তখন ওরা 'একটু পরে ফোন করছি' বলে ফোন ছেড়ে দিল।

জগদীশ সোফায় বসে পড়েছিলেন। ওরা ফোন ছেড়ে দিতেই অস্থিরভাবে ছটফটিয়ে উঠলেন। নগেনও কেমন তাজ্জব হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। ওরা টাকা নেওয়ার সময় ও জায়গাটা যখন জানাবে তখন আমাদের বেশি

BanglaBook.org

সময় দেবে না। কারণ, যদি আমরা কোনও প্যাঁচ কষার চেষ্টা করি। সে-কথাই বললাম ওঁদের। ওঁরা কোনও মন্তব্য করলেন না।

আমার খুব গরম লাগছিল। সেইসঙ্গে টেনশন বাড়ছিল। গতকাল সব খবরই ঠিকঠাক পৌঁছে দিয়েছি দত্তচৌধুরীকে। উনি সঙ্গে-সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একের পর এক ট্রাঙ্ককল করেছেন, টেলেক্স মেসেজ আদান-প্রদান করেছেন। তারই মাঝে আমাকে বললেন, 'কাল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। চিন্তার কোনও কারণ নাই। আমি ওদের সহজে ছাড়ব না।'

আমি বললাম যে, আমি মাকে বলে রাখব। কারণ সে-সময়ে আমি হয়তো বাড়িতে নাও থাকতে পারি। তবে কিডন্যাপারদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর আমি যে করে হোক বাড়িতে এসে ওঁকে খবর দেব।

দত্তচৌধুরী আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছেন, 'য়ু আর এ ব্রেভ গাই। শাবাশ! সুশান্তর বন্ধুভাগ্য ভালো।'

রেস্তোরাঁয় দত্তচৌধুরীকে একরকম দেখেছিলাম। কিন্তু লালবাজারের বিভিন্ন ঘরে, বারান্দায় ভদ্রলোকের হাঁটা-চলা ও কথাবার্তা দেখে অবাক হয়ে গেছি। বুঝছি, দরকার পড়লে তিনি শক্ত হতে পারেন।

আমি যখন লালবাজার থেকে চলে আসি তখনও দেখি উনি টেলেক্স আর টেলিফোন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। অনুমান করলাম, উনি আমার খবরগুলো নিয়ে চুলচেরা অনুসন্ধান করবেন। কোনও পাথরকেই না-ওলটানো অবস্থায় রাখবেন না।

সুতরাং আমার টেনশন বাড়ছিল। কারণ দত্তচৌধুরী আমার বাড়িতে বসে অপেক্ষা করে-করে এতক্ষণে হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

আধঘণ্টা পরে আবার ফোন এল। আমি ফোন ধরলাম।। বললাম, 'সুনির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

একটু পরেই সুনির কথা শোনা গেল : 'মাম্মি!'

ওর কথা কেমন যেন জড়ানো।

আমি বললাম, 'সুনি, আমি—তোমার ক্যালকাটার ফার্স্ট ফ্রেন্ড।'

ও খুব ধীরে অস্পষ্টভাবে বলল, 'বুড্ঢা জনাব। তুম মুঝে নহি বচা সকতে। ইয়ে লোগ বহুত কামিনা হ্যায়। তুম ইন্‌সে নহি লড় সকতে, বুড্ঢা জনাব।। টেল ড্যাড, আই অ্যাম গন। আমি শেষ। টেল ড্যাড—।'

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'সুনি!'

সঙ্গে-সঙ্গে কোত্থেকে শালা সেই পুরোনো ভ্যানটা ফিরে এল। জ্বলছে, দাউদাউ করে জ্বলছে। আর তার আগুনের আলোয় দিল্লির সেই নিকম্মা হারামজাদা লোকটা ল্যাংটো অবস্থায় লাফাচ্ছে, নাচছে, কাঁদছে। ইচ্ছে হল, শুয়োরের বাচ্চার পাছায় গিয়ে এক লাথি কষিয়ে দিই। সালা, সৎ, নাগরিককা বচ্চা! কোই কাম কা নহি। সালা ভেড়ুয়া, নিখট্টু, ডরপোক কাঁহাকা!

আর কোনও কথা বলার আগেই ফোনটা কে যেন টেনে নিল সুনির হাত থেকে। তারপর কর্কশ গলায় বলল, 'পরে ফোন করছি।' এবং রেখে দিল।

নগেন আমার অবস্থা দেখে আমার কাছে এল। কী একটা বলল। আমি লাল

BanglaBook.org

চোখে ওর দিকে তাকালাম। চোখ জ্বালা করছে। বুকও। কোনও কথা বললাম না। নগেন অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়েই রইল।

জগদীশ আর প্রভাবতী বারবার সুনির কথা জিগ্যেস করছিলেন। আমি বললাম, 'ওরা বোধহয় সুনিকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াচ্ছে। ও—ওকে বোধহয় আর বাঁচানো যাবে না। বারবার বলছিল, টেল ড্যাড, আই অ্যাম গন।'

জগদীশ ডুকরে উঠলেন ঃ 'মেরি বাচ্চি!' আর প্রভাবতী কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে।

আমি চোখ মুছলাম। এই মেয়েটাই না আমাকে বুধবার বলেছিল, 'বচালো মুঝে, বুড়ঢা জনাব!' আর আজ—মাত্র তিনদিন পরে—ও বুঝে গেছে ওকে বাঁচানো আমার কর্ম নয়। হঠাৎই সেই মুহূর্তে সুধা এবং সুনির মুখ একে অপরে বারবার মিশে যাচ্ছিল।

সেই অবস্থায় আমরা চারটে ভাঙাচোরা মানুষ অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ওদের পরের ফোনটা যখন এল তখন রাত আটটা বেজে গেছে। ফোন বেজে ওঠামাত্রই আমি ফোন ধরলাম। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। সেই আগুন নেভানোর জন্যে কোনও উপায় খুঁজছিলাম। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু তাতে আগুন নিভছে কই?

এইবারে ওরা সব বলল। সি. আই. টি. রোডে ই. এস. আই. হসপিটালের সামনে পৌঁছতে হবে রাত ঠিক সাড়ে দশটায়—টাকা নিয়ে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই একজন লোক আসবে। এসে সুনির একটা ফটো দেবে—ওদের তোলা। সেটা দেখেই টাকাটা সেই লোকের হাতে দিয়ে দিতে হবে।

আমি বললাম যে, আমি গাড়ি নিয়ে যাব। গাড়ির নম্বরটা আগেই জগদীশ আচার্যের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম,সেটা ওদের বললাম। ওরা তখন বলল যে, কোনওরকম গোলমাল হলেই সুনির গলা কেটে ওরা মাথাটা জগদীশের নামে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেবে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'সুনিকে কখন ফেরত পাব?'

উত্তরে কর্কশ গলার মালিক জানাল, পরদিন বিকেলে সুনি বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এই সময়টুকুর মধ্যে ওরা টাকাটা ঠিকমতো গুনে নেবে, এবং আমরা কোনও গোলমাল করি কি না সেটা দেখবে। তারপর সুনিকে ছাড়বে।

আমি কাঠ হয়ে সব শুনলাম। বুকের টিপটিপ শব্দটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কী করে এই খবরটা আমি পৌঁছে দেব দত্তচৌধুরীকে? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুদ্ধিটা মাথায় খেলে গেল। ফোন নামিয়ে রেখে জগদীশকে লক্ষ করে বললাম, 'ওরা সবই বলল, তবে টাকা নিয়ে কোন জায়গায় যেতে হবে সেটা বলল না। আধঘণ্টা পরে আবার ফোন করবে। রাত সাড়ে দশটায় দেখা করতে বলছে।'

জগদীশ অতিরিক্ত টেনশনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু যেন অবাক চোখে আমাকে দেখলেন। নগেন হঠাৎ বলল, 'দাদা, আমাকে একটু বেরোতে হবে। বাড়ি যাব। একজনের আসার কথা আছে। তবে চিন্তা কোরো না। কাল সকালেই আমি আসব, খবর নেব।'

জগদীশ বিহ্বল চোখে ভাইকে দেখলেন। প্রভাবতী কোনওরকমে বললেন, 'দেবরজি, বৃষ্টি পড়ছে। একটা ছাতা নিয়ে যাবেন।'

BanglaBook.org

প্রভাবতী ছাতা আনতে গেলেন। নগেন ওঁর পেছন-পেছন বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল, 'ওদের সঙ্গে কেয়ারফুলি ডিল করবেন, মিস্টার দত্ত।'

আমি কোনও কথা বললাম না।

ওরা বেরিয়ে যেতেই আমি জগদীশকে বললাম, 'আমি একটু আসছি। ওদের সঙ্গে রাত সাড়ে দশটায় যদি দেখা করতে হয় তা হলে ফিরতে হয়তো রাত হয়ে যাবে—মা চিন্তা করবে। মাকে বলে আসি। তা না হলে মা সারারাত না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

জগদীশ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে ছিলেন, চোখ তুললেন। চোখ লাল। বললেন, 'এখন আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।'

আমি ওঁদের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। প্রভাবতী বা নগেনকে দেখতে পেলাম না। শব্দে বুঝলাম, বৃষ্টির তেজ আগের চেয়ে কমেছে। সিঁড়ি নামার জন্যে পা রেখেছি, ঠিক তখনই লোডশেডিং হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি সব অন্ধকার। তারই মধ্যে জল চিকচিক করছে। রাস্তার দু-পাশের নর্দমায় ঘোলা জল জমেছে। আর বৃষ্টি পড়ছে মাঝারি ঢঙে। আমি বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে শুরু করলাম। এক্ষুনি বাড়িতে গিয়ে দত্তচৌধুরীকে খবর দিতে হবে।

ট্রাম-রাস্তায় গাড়িঘোড়ার জট। ছাতা মাথার পথচারীর ভিড়। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো স্পষ্ট নজরে পড়ছে। বৃষ্টি। বৃষ্টি। পৃথিবী ঠান্ডা হচ্ছে।

আমি দৌড়তে-দৌড়তে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে গেলাম। বাবা আমার পাশে পাশে দৌড়চ্ছিল। তার পাশে সুধা। বাবা বলল, 'অন্তু, কোনওদিকে মন দিবি না—শুধু দৌড়, দৌড়। এ এক ভীষণ লম্বা দৌড়। ম্যারাথন।' বাবার চুল ভিজে। মুখ গড়িয়ে জল পড়ছে টপটপ করে।

তার পাশে সুধা চুপচাপ দৌড়চ্ছিল। পরনে শুধু ব্লাউজ আর শায়া। ওর মুখ গড়িয়ে রক্ত পড়ছিল একনাগাড়ে। আর টেলিফোনে একটা পাশবিক কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে চেঁচাচ্ছিল ক্রমাগত : 'সালা, সৎ নাগরিককা বচ্চা।'

বাড়িতে পৌঁছলাম হাঁফাতে-হাঁফাতে। এখানে লোডশেডিং হয়নি। দেখি, দরজার কাছেই একটা লাল মারুতি। ভেতরে ঢুকে গায়ের জামা খুলে ফেললাম। তারপর রান্নাঘরের কাছে টাঙানো দড়ি থেকে গামছা নিয়ে গা-মাথা মুছতে লাগলাম। ঠিক তখনই শোওয়ার ঘর থেকে মা বেরিয়ে এল। আমার ভিজে একসা শরীর দেখে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, 'ভদ্রলোক অনেকক্ষণ এসেছেন—চা দিয়েছি। তুই কি কিছু খাবি?'

আমি মাথা নাড়লাম, না।

আমি এখন সুনির কিডন্যাপারদের রক্ত খেতে চাই।

ঘরে ঢুকতেই সুশীল দত্তচৌধুরীকে দেখলাম। চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'খবর পেয়েছেন?'

আমি এক নিশ্বাসে সব বলে গেলাম। যে-গাড়ি নিয়ে আমি যাব তার নম্বরটাও বললাম। শুনে উনি বললেন, 'ব্যস, আর কোনও চিন্তা নাই।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কি ওদের পিছু নেবেন?'

দত্তচৌধুরী হাসলেন : 'পিছু নেওয়াটা আমাদের রুটিনমাফিক কাজ। কোনও ভয়

BanglaBook.org

নাই আপনার। ওরা জানতে পারবে না। আর মেয়েটার কোনও ক্ষতি হোক তা আমিও চাই না।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওরা রুথলেস—নৃশংস। অন্তত ক্যাসেটে যা দেখেছি। আপনি খালি হাতে একা ওদের পিছু নেবেন—যদি কিছু বিপদ হয়...!'

দত্তচৌধুরী চায়ের কাপে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমি একা নয়, গাড়িতে ড্রাইভার আছে—নৃপেন জানা। নৃপেন গাড়িও চালাতে পারে—হাত-পাও চালাতে পারে। আর—।'

দত্তচৌধুরী একটা নীল রঙের ঢোলা শার্ট পরেছেন আজ। সঙ্গে গাঢ় রঙের ঢোলা প্যান্ট। উনি জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা চৌকোনা কালো জিনিস বের করলেন। আর পকেট থেকে একটা মোটা নলের কুৎসিত রিভলবার। কালো জিনিসটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা ম্যাগাজিন। সাতাশ রাউন্ড গুলি ছোড়া যায়।' আর রিভলবারটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা স্নিসার মেশিন পিস্তল। এর ট্রিগার চেপে ধরে রাখলে অটোমেটিকভাবে পরপর গুলি বেরোতে থাকে। এক স্মাগলারের কাছ থেকে সিজ করেছিলাম। এখন আমাদের লিস্টেড আর্মস।'

দত্তচৌধুরী ওগুলো আবার ঢুকিয়ে রাখলেন যথাস্থানে। আমি তখন ওঁকে বললাম আমার মতলবটা। আর জগদীশ আচার্যের ফোন নম্বরটাও দিলাম।

'আপনি ঠিক ন'টার সময়ে এখানে কাছাকাছি কোনও দোকান-টোকান থেকে এই টেলিফোন নাম্বারে একটা ফোন করবেন। আমি ফোন ধরব। আমি যা হোক বানানো কথা বলে যাব। তারপর ফোন রেখে দেব।'

দত্তচৌধুরী বুঝলেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, 'তা হলে আপনি আর দেখি করবেন না। বেস্ট অব লাক। ও হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনার ইনকরমেশানের ওপরে বেস করে আমাদেরা এনকোয়ারি অনেকটা এগিয়েছে। মোটামুটি সাকসেসফুল বলা যায়। সময় হলে সব বলব।'

আমি ওঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। উনি আমার ভরসা। সুনির ভরসা। এখন শুধু ওঁর টেলিফোনটা ঠিকমতো পেলেই হয়। কারণ দত্তচৌধুরীর এই ফোনটা না পেলে আমি মুশকিলে পড়ে যাব। জগদীশ ওঁরা ভাববেন, কিডন্যাপারদের কাছ থেকে সব খবর জানার পর আমি কাউকে—সম্ভবত পুলিশকে—খবর দিতে গেছি। দত্তচৌধুরীর ফোনটাকেই আমি কিডন্যাপারদের শেষ ফোন বলে চালাব।

সুতরাং মাকে বলে আবার রওনা হলাম আচার্যদের বাড়ির দিকে। নতুন জামা পরে নিলাম। তার ওপরে প্যারাশ্যুট জ্যাকেট। জুতোটা বদলে হাফ বুট পরলাম। তারপর আবার ফিরতি দৌড়। এবারেও বাবা আর সুধা আমার পাশে-পাশে দৌড়চ্ছিল।

এরপর সবকিছুই মিটে গেছে ঠিকঠাক।

BanglaBook.org

রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। ই. এস. আই. হসপিটালের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় দশটা পঁচিশ। বৃষ্টির দাপটও প্রায় একইরকম। হাজার চেষ্টা করেও কোনও লাল মারুতি দেখতে পেলাম না। রাস্তায় গাড়ি কমে এসেছে। লোকজনও নেই বললেই চলে।

সুজিতকে বললাম, 'আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে।'

পৌনে এগারোটা নাগাদ বৃষ্টি ধরে এল। সুজিত ন্যাকড়া দিয়ে উইন্ডশিল্ডের ভেতরটা মুছে বাইরেটা মুছতে নামল। ঠিক সেইসময়ে দুটো লোক আমাদের গাড়ির কাছে এল।

অন্ধকারে ওদের চেহারা ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। একজন একটা ফটো বের করে জানলার কাচে টোকা দিল। আমি কাচ নামিয়ে দরজা খুললাম। লোকটা আমাকে ঠেলে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফটোটা আমার হাতে দিল। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে না। বোধহয় কোনও কারণে পাওয়ার কাট হয়েছে। ফলে ফটোটা আমি ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিলাম না। লোকটা পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে খট্ করে আগুন জ্বালল। তখনই সুনিকে আমি দেখতে পেলাম। ভিডিও ক্যাসেটে দেখা সেই বানানো ঘর। সুনি মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। দু-চোখে হতাশা। কীসের জন্য যেন অপেক্ষা করছে ও। ফটোতে আমার চোখ পড়তেই যেন বলল, 'তুম ইন্‌সে নহি লড় সক্‌তে, বুড্‌ঢা জনাব। এদের সঙ্গে তুমি লড়ে পারবে না।'

আমার হাত-পা শক্ত হল। লোকটার মুখ দেখলাম। অনেক পাপের ছাপ সেখানে। ঘন কালো রঙ। চোখ লাল। মুখ থেকে দেশি মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। ওর নাম কী? পারমিন্দার, অজিত, নাকি লোধা?

লোকটা ফটোটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল কর্কশ গলায়, 'রুপেয়া লায়া?' তারপর লাইটার নিভিয়ে দিল।

তখন লক্ষ করলাম, দ্বিতীয় লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সুজিতের খুব কাছে। সুজিত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমি প্রথমজনকে টাকার থলেটা দেখালাম। লোকটা আমাকে এক ধাক্কা মারল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে শিস দিল সঙ্গীকে লক্ষ করে। সে রাস্তার উলটো দিকে কাকে ইশারা করে যেন হাত নাড়ল। তখনই খেয়াল করলাম, অনেকটা দূরে দাঁড়ানো একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর স্টার্ট নিয়ে আমাদের গাড়ির কাছে আসছে। পিছনের দরজা খুলে টাকা ভরতি ভারী থলেটা বের করে নিল প্রথম লোকটা। থলের মুখ ফাঁক করে কাগজের মোড়ক ছিঁড়ে কী দেখল। এবং সন্তুষ্ট হল।

সাদা অ্যাম্বাসাডরটা আমাদের গাড়ির ঠিক পিছনে এসে লেগেছে। থলেটা ওরা চালান করে দিল ও-গাড়িটায়। আমি গলা বাড়িয়ে নম্বরটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। সেই সময়ে দ্বিতীয় লোকটা কাছে এসে হেসে বলল, 'ভাড়া করা গাড়ি। জ্যাদা সেয়ানা মত্ বনো।'

আমি বললাম, 'লড়কি কাল শামকো মিলেগি?'

লোকটা টেনে-টেনে বাংলায় বলল, 'একবারে সালার মগজে কিছু ঢোকে না। ফোনে কী বলেছিলাম মনে নেই? কে ধরেছিল ফোন?'

আমি কিছু বলার আগেই পিছন থেকে কেউ ওকে ডাকল, 'অ্যাই গোবিন্দ, জলদি আ।'

লোকটা পিছন ফিরে দেখল একবার। তারপর বাইরে দাঁড়ানো সুজিতকে বলল, 'এ ভেড়ুয়া, তু আকে ব্যরঠ যা ইস হারামিকা পাস। কোই হরকত করেগা তো হিসাব

BanglaBook.org

ঠিকানে লগা দুস্না, সমঝে?'

আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম। সুজিত গুটিগুটি আমার পাশে এসে বসল। ওর ফরসা মুখ রক্তহীন। দ্বিতীয় লোকটা, অর্থাৎ গোবিন্দ এবারে জামা-কাপড়ের আড়াল থেকে একটা চপার বের করল। তারপর ঝুঁকে পড়ে একে-একে গাড়ির সবক'টা চাকা ফাঁসিয়ে দিল।

আমি ভেবেছিলাম ওরা এবার চলে যাবে। কিন্তু না, গোবিন্দ চপার হাতে সুজিতের জানলার কাছে এল। তারপর দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে সুজিতের চুলের মুঠি চেপে ধরল বাঁ-হাতে। ডান হাতের চপার তুলল ওপরে।

সুজিত 'ওঁক' করে একটা শব্দ করল। ওর চোখ গোল-গোল। মুখ সাদা।

রাস্তা জনহীন। শুধু ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা। প্যারাশ্যুট জ্যাকেটে আমার গরম লাগছিল। বুকের চেনটা খুলতে যেতেই চপার হাতে গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠল, 'চুপ করে বোস!'

আমি হাত থামালাম। কখন চলে যাবে ওরা? কখন ছেড়ে দেবে সুনিকে?

ঠিক তক্ষুনি গোবিন্দ সুজিতের চুল ছেড়ে দিয়ে চপার চালাল।

চপারের উলটোদিক দিয়ে সুজিতের ঘাড়ে মারল। সুজিত 'আঃ' করে একটা শব্দ করল। তারপর আমার ঘাড়ের ওপরে ঢলে পড়ল। গোবিন্দ হাসল। চপারটাকে ঘুরিয়ে ধরল। ও-ই কি লাশিকে কুচিয়ে কিমা করেছে? ভিডিও ক্যাসেটে ওর মুখ দেখতে পাইনি। তবে চেহারার আদল, স্বাস্থ্য, আর চপার ধরা হাত অনেকটা বোধহয় মিলে যাচ্ছে।

আমি অনুনয় করে বললাম, 'টাকা তো দিয়ে দিয়েছি—এবারে আমাদের ছেড়ে দিন।'

গোবিন্দ আবার হাসল বীভৎসভাবে। ওর সাদা দাঁত দেখা গেল। ও সুজিতের চুল আবার ধরল মুঠো করে। তারপর চপার টেনে কেটে নিল একগোছা চুল। এবং হাসতে-হাসতেই সেই চুলের গোছা গুঁজে দিল আমার মুখে। বলল, 'লে, খা লে। চু চু—।'

আমার গা গুলিয়ে উঠল। নির্জন রাতের বৃষ্টি-ভেজা রাস্তাটা নিমেষে হয়ে গেল চাণক্যপুরী। গোবিন্দ সুপটু হাতে চপার টানল আমার প্যারাস্যুট জ্যাকেটের ওপরে। বলল, 'সাবধান, কোনও লাথঝোরি করলে খরচ করে দেব। আর ওই ছুঁড়িটাও খরচ হয়ে যাবে।'

জ্যাকেট আর ভেতরের জামা চিরে চপারের ফলা আমার বুক ছুঁয়েছে। বুকের বাঁ-দিকের পাঁজরে লম্বালম্বিভাবে জ্বালা করছে। পুড়ছে। জ্বলছে। ওঃ!

গাড়ির দরজা ঠেলে গোবিন্দ নেমে গেল। তার একটু পরেই পিছনের অ্যাম্বাসাডরটা স্টার্ট নিল এবং আমাদের গাড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে 'হুউ' বাঁক নিয়ে ছুটে চলল ভি. আই. পি. রোডের দিকে।

আমি থু-থু করে মুখে লেগে থাকা চুলের টুকরোগুলো ফেললাম। সুজিত বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি ওকে আস্তে করে ঠেলে দিলাম স্টিয়ারিং-এর ওপরে। বুকের জ্বালাটা অসহ্য হয়ে উঠছিল। রক্ত বেরোচ্ছে কি না কে জানে। পুরোনো ঘা খোঁচালে রক্ত পড়ে জানি। অনেক রক্ত পড়ে।

আমি গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লাম ভিজে রাস্তায়। দেখলাম এদিক-ওদিক।

BanglaBook.org

কেউ নেই। কোনও লাল মারুতি দাঁড়িয়ে নেই কোথাও। দত্তচৌধুরীর কী হল?

আমার সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। মাথার মধ্যে সেতার বাজাচ্ছিল কেউ। হঠাৎই সব ক'টা তার ছিঁড়ে গেল। আমি পাগলের মতো ছুটতে শুরু করলাম। যেন ভোরবেলায় দেশবন্ধু পার্কে দূরপাল্লার দৌড় দৌড়চ্ছি। অ্যাম্বাসাডরটা কোথায় গেল? কত জোরে ছুটছে গাড়িটা?

ছুটে কতটা পথ এগিয়েছি জানি না, হঠাৎই দেখি আমার পাশে-পাশে একটা লাল মারুতি ছুটছে। কে যেন ডেকে বলল, 'উঠে আসুন, দত্তবাবু—।'

দত্তচৌধুরীর গলা। ব্যস্ত। কঠিন। লোহার মতো।

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে গেল। আমি উঠে পড়লাম গাড়িতে। দরজা বন্ধ করে দিল ড্রাইভার—নৃপেন জানা। দত্তচৌধুরী বললেন, 'নৃপেন, টপ স্পিড।'

এক হ্যাঁচকা মেরে গাড়িটা গতি বাড়াল। জানলার বাইরে অন্ধকার নির্জন রাত হু-হু করে ছুটতে লাগল পিছন দিকে।

দত্তচৌধুরী আমাকে দম নেওয়ার সময় দিলেন। তারপর একটা ঠোঙা তুলে দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'একজোড়া মাটন রোল আছে—খেয়ে নিন। খালি পেটে দুশমনের সঙ্গে টক্কর নেওয়া যায় না।'

ভীষণ খিদে পাচ্ছিল আমার। সুতরাং ভদ্রতা ভুলে গিয়ে ঠোঙা খুলে খেতে শুরু করলাম। দত্তচৌধুরী কথা বলছিলেন, আমি শুনতে লাগলাম।

ন'টার কিছু পরেই দত্তচৌধুরী গাড়ি নিয়ে চলে এসেছেন ই. এস. আই. হসপিটালের কাছে। জায়গাটা ভালো করে দেখে নিয়ে হাসপাতালের উলটোদিকে কিছুটা দূরে একটা ছোট রাস্তার অনেকটা ভেতরে মারুতি গাড়ি পার্ক করেছেন। তারপর নৃপেনকে পাঠিয়েছেন উল্টোডাঙা-ভি. আই. পি. মোড়ের কাছে। একজন বা দুজন লোক বসে আছে এরকম সন্দেহজনক কোনও গাড়ি দেখলেই তার নম্বর টুকে নিতে বলেছেন, এবং এ-ও লিখে রাখতে বলেছেন গাড়িটা কোন রাস্তা দিয়ে এল। দত্তচৌধুরী নিজেও ঠিক সেই কাজটাই করছিলেন সি. আই. টি. রোড-কাঁকুড়গাছির মোড়ের কাছে। তখনই রাস্তার ধারের একটা স্টল থেকে হাফডজন মাটন রোল কিনে নিয়েছেন নিজেদের শরীরের কথা ভেবে—আর আমাকেও হিসেব থেকে বাদ দেননি।

এইভাবে ওঁরা পরিশ্রম করেছেন সওয়া দশটা পর্যন্ত। তারপর ফিরে এসেছেন ই. এস. আই. হসপিটালের কাছে। দত্তচৌধুরীর বিশ্বাস ছিল, দশ লাখ পনেরো হাজার টাকা কেউ পায়ে হেঁটে নিতে আসবে না। এবং গাড়িতে এলে সেই গাড়ি অপেক্ষা করবে হাসপাতালের কাছাকাছি। ওঁর যুক্তির প্রশংসা করতেই হয়। সুতরাং সওয়া দশটা নাগাদ হাসপাতালের কাছে এসে ওঁরা দেখেন একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর উলটোদিকের ফুটপাথ ঘেঁষে খানিকটা দূরে পার্ক করা রয়েছে। গাড়িটার নম্বর দেখে নৃপেন জানা বলেছে ওটা ভি. আই. পি. রোডের দিক থেকে এসেছে। পরের ঘটনা ওঁরা আড়ালে থেকে লক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। দত্তচৌধুরীর ধারণা, অ্যাম্বাসাডরটা ভি. আই. পি রোড ধরে এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে হয়তো যশোর রোডের দিকে যাবে।

অনেক দূরে দুটো লাল আলো ছুটে যাচ্ছিল। দত্তচৌধুরী বললেন, 'নৃপেন, হাই স্পিডে ওভারটেক করে বেরিয়ে যাও। আমরা ওদের আগে-আগে থাকব।'

BanglaBook.org

তারপর আমাকে বললেন, 'ওভারটেক করার সময় ওরা যেন আপনাকে বা আমাকে দেখতে না পায়। সিটে কাত হয়ে যাবেন।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। খালি ঠোঙাটা জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম। বৃষ্টি এখন আর নেই। জানলা দিয়ে জোলো বাতাস ঢুকছে ঝড়ের মতো। খেয়াল করলাম, দুটো গাড়ির দূরত্ব ক্রমশ কমছে। একসময় আমরা এগিয়ে গেলাম। সামনে। আমার বুকের কাছে দত্তচৌধুরীর হাতের খোঁচা লাগতেই 'উঃ' শব্দ করে উঠলাম। দত্তচৌধুরী জিগ্যেস করলেন, 'কী হল?'

অন্ধকারে উনি বোধহয় আমার চেরা প্যারাশুট জ্যাকেটটা খেয়াল করেননি। আমি ওঁকে সব বললাম। নৃপেন জানা গাড়ি চালাতে-চালাতেই বাঁ-হাতে গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা ছোট্ট টিনের বাক্স আমার দিকে এগিয়ে দিল। নিলাম। ফার্স্ট এইড বক্স। দত্তচৌধুরী পিছনের কাচ দিয়ে অ্যাম্বাসাডরটাকে লক্ষ করছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'চটপট ওষুধ লাগিয়ে নিন।' তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'যেমন করে হোক শালাদের ঠেক আমি বের করবই।'

একটা ছোট শিশির মুখ খুলে সেই ওষুধে তুলো ভেজালাম। তারপর বুকের বাঁ-দিকে চেপে ধরলাম। অসহ্য জ্বালা করে উঠল। সাত বছর আগে অজিত, রমেশ, লোধা, পারমিন্দার, বস্, ওরা কী যেন চেপে ধরেছিল আমার কাটা-ছেঁড়া জায়গাগুলোয়? এই মুহূর্তে সেই পুরোনো জ্বালাটা ফিরে এল। আমি চোখ বুজে দাঁত চেপে ছটফট করতে লাগলাম। বেঁচে থাকাটা কি এতই জরুরি?

বাড়িটার সামনে যখন এসে দাঁড়ালাম তখন রাত প্রায় পৌনে বারোটা। রাস্তার আলো টিমটিম করে জ্বলছে। তবে বেশিরভাগই অকেজো। জল জমে আছে এখানে সেখানে। কাঁচা ড্রেনগুলো জল থইথই। এই অকালবৃষ্টি গরমের মাঝে শান্তির প্রলেপ। কিন্তু আমার বুক জ্বালা করছিল। বাগুইহাটির মোড়ের কাছে এসে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়েছে অশ্বিনীনগরের দিকে। আমাদের গাড়িটা ওদের আগে-আগে ছুটলেও আমরা নজর সরাইনি ওদের ওপর থেকে। সুতরাং ভি. আই. পি. রোড ছেড়ে অ্যাম্বাসাডরটা যখন অশ্বিনীনগরের দিকে ঢুকে পড়ল, তখনই নৃপেন জানা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। বেআইনিভাবে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এল একই রাস্তায়। হেডলাইট না জ্বেলে অনেকটা তফাত রেখে চালাতে লাগল।

আমি দত্তচৌধুরীকে বললাম, 'আর এভাবে এগোবেন না। ওরা যদি দেখতে পায় তাহলে সুনিকে বাঁচানো যাবে না।'

দত্তচৌধুরী কী যেন বললেন নৃপেনকে। নৃপেন গাড়ি থামিয়ে দিল। তখন দত্তচৌধুরী আমাকে বললেন, 'ভাইপোর কাছে শুনেছি, আপনি দৌড়বাজ। মনে হয়, ওরা ঠেকের কাছাকাছি এসে গেছে। আপনি নেমে পড়ুন। দৌড়ে ওদের পিছন-পিছন যাওয়ার চেষ্টা করুন। আমরা গাড়ি নিয়ে অনেকটা তফাতে আসছি। ওদের গাড়ি থামলেই আপনি আমাদের আগে থাকতেই সাবধান করে দেবেন।'

আমি নেমে পড়েছি মারুতি থেকে। তারপর শুরু করেছি রাতের দৌড়। সুনির জন্যে।

BanglaBook.org

বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হয়নি। মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই অ্যাম্বাসাডর থেমেছে এবং গোবিন্দরা যে-বাড়িতে ঢুকল সেটা ভালো করে দেখে নিয়ে আমি আগাম খবর দিয়েছি নৃপেন জানাকে। তারপর অন্ধকার রাস্তায় ধূসর কালো ছায়া ফেলে আমরা চুপিসাড়ে পৌঁছে গেছি বাড়িটার কাছে। সাদা অ্যাম্বাসাডরটাকে সেখানে দেখতে পেলাম না। হয়তো কাজ সেরে চলে গেছে।

দত্তচৌধুরী মেশিন পিস্তলে ম্যাগাজিন ফিট করে নিলেন। তারপর সাবধানী পা ফেলে এগোলেন সবার আগে। তার পেছনে নৃপেন জানা। আর সবার শেষে আমি। আমার বুকে হাপর টানছিল কেউ।

জায়গাটাকে ঠিক বাড়ি বলা যায় না বোধহয়। কারণ, একতলা সম্পূর্ণ হয়ে দোতলা আধাআধি উঠেছে। চারিদিক খাড়া টিন দিয়ে ঘেরা। একটা বাঁশের ভারাও বাঁধা রয়েছে। কোথাও কোনও আলো চোখে পড়ছে না। একপাশে খানিকটা ফাঁকা জমিতে গাছের জঙ্গল। রাস্তার কমজোরি বাতি গাছের পাতায় পড়ে চকচক করছে। আর জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে।

পথে একটাও কুকুর চোখে পড়েনি। কিন্তু কোথা থেকে যেন কুকুরের ডাক ভেসে এল। ডাক নয়, কান্না।

উলটোদিকে সার বেঁধে কয়েকটা দোকান। তাদের ছাদনার নীচে কতকগুলো লোক ঘুমোচ্ছে। কোনও শব্দ নেই কোথাও।

টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকতেই আলো চোখে পড়ল। দত্তচৌধুরী চাপা গলায় বললেন, 'কেয়ারফুল।'

বাড়িটার একতলাটা প্রায় তৈরি। এমনকী জানলায় গ্রিল বসানোর কাজও শেষ। কিন্তু জানলাগুলোও টিন দিয়েই বোধহয় ভেতর থেকে ঢাকা। তারই ফুটো দিয়ে আলোর বিন্দু চোখে পড়ল। একতলার ঘরে কোথাও বাল্‌ব জ্বলছে। মনে হয়, রাস্তার আলোর তার থেকেই বেআইনিভাবে বিদ্যুতের লাইন টেনে নেওয়া হয়েছে বাড়িটায়।

আমরা পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গেলাম। কাজ চালানোর জন্যে একটা পুরোনো কাঠের দরজা অস্থায়ীভাবে বসানো হয়েছে। এবং দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

দত্তচৌধুরী নৃপেন জানার দিকে ফিরে ওপরে চোখ তুলে কী যেন ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে নৃপেন জানা বাঁশের ভারার কাছে চলে গেল এবং বনবেড়ালের ক্ষিপ্রতায় দোতলায় উঠে গেল সড়সড় করে। একটু পরেই অন্ধকারে ওকে আর ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

আমরা দেওয়াল ঘেঁষে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিটতিনেক পরেই চাপা 'খুট' শব্দ হল একটা। দরজা ফাঁক করে নৃপেন জানা বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে। ও চাপা গলায় বলল, দোতলা ফাঁকা। একতলায় পিছনের কোনার ঘর দুটোয় ওরা রয়েছে মনে হয়। কথার শব্দ আসছে। এ-দিকটায় কেউ নেই।

আমরা তিনজনে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। দেখলাম, ডান দিকের একটা ফাঁকা ঘরে আলো জ্বলছে। এই আলোটাই টিনের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়েছিল। আমরা বারান্দার সরু পথ ধরে এগিয়ে চললাম। ঘরের দেওয়ালে প্লাস্টার পড়েনি এখনও। মেঝেতেও সিমেন্টের পালিশ বাকি।

BanglaBook.org

খানিকটা এগোতেই কথাবার্তার শব্দ কানে এল। গলার স্বরগুলো কি চেনা লাগছে? একটা যে গোবিন্দর গলা তা বুঝতে পারলাম।

পাশাপাশি দুটো ঘর। দুটো ঘরেই আলো জ্বলছে। তবে ভোল্টেজ ডাউন থাকায় আলোর তেজ তেমন জোরালো নয়। ডান দিকের ঘর থেকেই কথাবার্তার শব্দ আসছিল। ঘরের জানলায় কোনও আড়াল নেই। দত্তচৌধুরী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক কোণ দিয়ে উঁকি মারলেন। আমি ওঁর পিছনে ছিলাম। একপাশে সরে গিয়ে গলা উঁচু করলাম।

ঘরে সুনি নেই শুধু গোবিন্দ আর ওর শাকরেদ রয়েছে। ওদের ডান পাশে দুটো বোতল আর একজোড়া গ্লাস। তার পাশেই পড়ে আছে ধারালো চপারটা। দেওয়ালের কয়েকটা পেরেকে তিনটে পুরোনো খাকি পোশাক ঝুলছে, আর তিনটে সাদা ওড়না। এ ছাড়া এককোণে কিছু বাসনপত্র, আর তার পাশে ভাঁড় এবং ঠোঙায় সম্ভবত খাবার রয়েছে। তার হাত তিনেক দূরে ভিডিও ক্যাসেটে দেখা সেই চপার ব্লকটা। ওটার ওপরে শুকনো রক্তের দাগ।

ওদের দুজনের মাঝখানে অসমান কালচে মেঝেতে পড়ে আছে টাকা ভরতি বড় থলেটা। গোবিন্দ দু-একটা প্যাকেট বের করে ছিঁড়ে দেখল। একশো টাকার নোট দেখা গেল। ওদের চোখ চকচক করছিল।

কিন্তু সুনি কোথায়?

নৃপেন জানা পাশের ঘরটার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আমিও সেদিকে গেলাম।

কিন্তু জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই অবাক হলাম।

ঘরের ভেতরে মেসনাইট বোর্ড দিয়ে আর-একটা চৌকোনা ঘরের মতো করা হয়েছে। সেই ঘরটার ভেতরে কেউ রয়েছে বলে মনে হল। কারণ খুটখাট শব্দ পাচ্ছিলাম। ওর ভেতরেই কি সুনি বন্দি রয়েছে? মনে পড়ল ভিডিও ক্যাসেটে দেখা নকল ঘরটার কথা। মনে পড়ে গেল সুনির আর্তচিৎকারের কথা : 'বুড়ঢা জনাব, বচাসো মুঝে!'

আমি কুঁজো হয়ে সাবধানে ঢুকে পড়লাম ঘরটায়। একটা আঁশটে গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল। আমার মনে পড়ল লালির কথা।

নৃপেন জানা পেছন থেকে আমার প্যারাশুট জ্যাকেটে টান মেরেছিল, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করলাম না। তখনই খেয়াল করলাম, দুটো ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটা দরজা রয়েছে। কিন্তু বাড়ির ভেতরের কোনও ঘরেই এখনও দরজার পাল্লা বসানো হয়নি। সুতরাং দরজা খোলা-বন্ধের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা পায়ের আওয়াজ চলে গেল ও-ঘরে। মনে হল, নকল ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। পার্টিশনের আড়াল থাকায় আমি লোকটাকে দেখতে পেলাম না। গোবিন্দরাও তা হলে মোট তিনজন? এ-দিকে আমরাও তিনজন। লড়াই যদি হয়, তা হলে হবে সমানে-সমানে।

আমি পার্টিশনের এককোণে গিয়ে জোড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম নকল ঘরে। আর তখনই সুনয়নাকে দেখতে পেলাম।

অনেকদিন পর যেন সূর্য উঠল, মেঘ সরে গেল, বন্ধ্যা গাছে ফুল ফুটল। কোথা থেকে ভেসে এল নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ। গোবিন্দর চপারের চিহ্ন ও জ্বালা পলকে মুছে গেল বুক থেকে।

আমি ভালো করে সুনিকে দেখতে লাগলাম। সুনি! সুনি! জগদীশ আর প্রভাবতী

BanglaBook.org

আকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন এই মেয়েটার জন্যে। আমিও।

সুনির মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখের নীচে কালি। গায়ের বেগুনি-সাদা ডোরাকাটা আধুনিক স্কার্ট আর ব্লাউজ মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা হয়েছে। মেঝেতে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে ও। ক্লান্ত। শ্রান্ত। ঘুমোচ্ছে। কিন্তু চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত হতাশা যেন ছায়া ফেলেছে স্থায়ীভাবে।

আমার বুক মুচড়ে উঠল। আজও কি একটা পুরোনো ভ্যানগাড়ি দাউদাউ করে জ্বলবে আর-একটা ডরপোক ভেড়ুয়া তাকে ঘিরে নিষ্ফল আক্রোশে উলঙ্গ হয়ে লাফাবে, নাচবে?

পার্টিশনের কাছ থেকে সরে আসতে গিয়ে চোখে পড়ল ঘরের এককোণে একটা ছোট পুরোনো টেবিলের ওপরে একটা কালো রঙের টেলিফোন। এই বাড়িতে ফোনের লাইন ওরা পেল কীভাবে? নাকি টেলিফোনটাকে দরকার মতো কোনও চালু লাইনের সঙ্গে জুড়ে নেয়?

এই প্রশ্নের উত্তর ভেবে ওঠার আগেই শুনতে পেলাম দত্তচৌধুরীর গলা : 'হুঁশিয়ার! য়ু আর আন্ডার অ্যারেস্ট!'

আমি পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম : গোবিন্দ আর তার সঙ্গী। ওরা তখনও টাকার থলে সামনে নিয়ে বসে আছে মেঝেতে। তাকিয়ে আছে ঘরের প্রথম দরজার দিকে, অর্থাৎ দত্তচৌধুরীর দিকে, যদিও ওঁকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। চোখে পড়ছে না নৃপেন জানাকেও।

চোখের পলকে চপারটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল গোবিন্দ। আর একই সঙ্গে ওর শাকরেদ একটা বোতল ছুড়ে মারল। অনেকগুলো শব্দ কানে এল : ভোঁতা সংঘর্ষের শব্দ, কাচ-ভাঙার ঝনঝন, সিমেন্টের ওপরে ধাতব কিছু ছিটকে পড়ার শব্দ। ব্যাপারটা ভালো করে দেখার জন্যে আমি আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলাম।

তখনই দেখলাম, দত্তচৌধুরীর ডানহাত রক্তাক্ত। মেশিন পিস্তল পড়ে আছে মাটিতে। নৃপেন জানা ঝুঁকে পড়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎই দু-ঘরের মাঝের দরজার পাশ থেকে কে যেন একটা লোহার রডের বাড়ি মারল ওর পিঠে।

গোবিন্দ আমার মুখে সুজিতের চুলের গোছা গুঁজে দিয়েছিল। যেমন করে গরু-ছাগল-ভেড়ার মুখে ঘাস গুঁজে দেয়। আমার বুকের বাঁ-দিকে চপার টেনেছে। তাই ওকেই আমি বারবার পারমিন্দার অথবা লোধার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিলাম। আমার পা দুটোয় কী যেন হল। মাথার নির্দেশের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আর রইল না ওদের। ফুলের গন্ধটা মিলিয়ে গিয়ে মাংস-পোড়া গন্ধ আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। আর ঘরটা কখনও হয়ে যাচ্ছে চাণক্যপুরী, আবার কখনও লাজপতনগরের মেন্টাল হোম।

আমার শীত করছিল। মুখের ভেতর টক স্বাদ। বুকের বাঁ-দিক জ্বলছে। সুতরাং ওই ছোট্ট ঘরের ভেতরে গোবিন্দকে লক্ষ করে কখন যে দূরপাল্লার তীব্র দৌড় শুরু করেছি খেয়াল নেই। চিৎকারও বোধহয় একটা করে থাকব। কারণ গোবিন্দরা চমকে আমার দিকে তাকাল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই আমার হান্টার শু-র লাথি সপাটে আছড়ে পড়ল গোবিন্দর রগে। আমার উরুসন্ধি পর্যন্ত তীব্র ঝাঁকুনি টের পেলাম। সুধা শায়া আর ব্লাউজ পরে অবাক চোখে এই ভেড়ুয়াটাকে দেখছিল।

BanglaBook.org

গোবিন্দ কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তাই আমার দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল ওর মাথার পিছনে। কুৎসিত শব্দ হল। সংঘর্ষের শব্দ সবসময় কুৎসিতই হয়।

ঠিক সেইসময় পেছন থেকে আমার পা ধরে কেউ টান মারল। পিঠের ওপরে দশ মন লোহা যেন ভেঙে পড়ল একইসঙ্গে। আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ঠিকরে পড়লাম ডান দিকে।

দত্তচৌধুরী কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেয়ে একলাথি মারলেন পায়ের কাছে পড়ে থাকা চপারটায়। ওটা ছিটকে এল হাতের কাছে। আমি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেই ওটা আঁকড়ে ধরলাম শক্ত মুঠোয়। তখন দেখলাম, সুধা ঠোঁট টিপে হাসছে। ব্যঙ্গের হাসি। অর্থাৎ, তোমার দ্বারা কিস্সু হবে না। পারমিন্দার 'রুটি' বানাবে, অজিত-লোধা ভ্যানে আগুন দেবে, একটা গর্ভবতী তরুণী জীবন্ত পুড়ে মরবে তিলে-তিলে, আর অতীন দত্ত নামের এক ডরপোক নিখুঁত ভেড়ুয়া সৎ নাগরিকরা বচ্চা ল্যাংটো হয়ে আগুন ঘিরে নাচবে, লাফাবে। ব্যস, তার বেশি কিছু নয়। ওই চপার মুঠো করে ধরা পর্যন্তই ধ্বজভঙ্গ লোকটার দৌড়। হুঃ!

কিন্তু সুধাকে অবাক করে দিয়ে ভেড়ুয়াটা চপার চালাল। ভারী অস্ত্রটা শূন্যে বাতাস কেটে ভয়ঙ্করভাবে নেমে এল গোবিন্দর শাকরেদের ওপরে। কোনও শব্দ হল না। শুধু দেখলাম চপারটা ওর কোমরের কাছে মাংস কেটে আটকে গেছে। হয়তো হাড় কেটে বসে গেছে।

আমি আধশোয়া অবস্থাতেই এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চপারটা খুলে এল আর ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। লোকটা কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। যন্ত্রণায় কোঁকাতে লাগল।

আমি চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। সেইজন্যেই শূন্যে থাকা অবস্থায় সবেগে নেমে আসা লোহার রডটাকে দেখতে পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শিরদাঁড়ার অসহ্য ব্যথা আমার স্বচ্ছন্দ গতিকে অনেক শ্লথ করে দিয়েছে। ফলে লোহার রডের আঘাতটা এসে পড়ল ডান কাঁধ আর বাহুতে। চপারটা খসে পড়ল হাত থেকে। একটা যন্ত্রণা তৈরি হয়ে ঢেউ খেলে ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। কিন্তু তখন আমার যন্ত্রণা অনুভব করার মতো মনের অবস্থা নেই। কারণ তৃতীয় লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি—এইমাত্র যে লোহার রড চালিয়েছে আমাকে লক্ষ করে। আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

নগেন আচার্য!

চাপদাড়িওয়ালা তীক্ষ্ণ মুখ এখন হিংস্র। চোখের নজর ক্রূর। ভয়ঙ্কর ক্রোধের নানান রেখা মুখের এখানে সেখানে।

ও আবার রড তুলল। কিন্তু মাটিতে পড়ে থাকা নগেন জানা পা চালাল। নগেন পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। আর শুরু হল হুটোপাটি।

দত্তচৌধুরী বাঁ-হাতে চেপে ধরেছিলেন ডানহাতের কাটা জায়গা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একইসঙ্গে একটু-একটু করে এগোতে চেষ্টা করছিলেন মাটিতে পড়ে থাকা মেশিন পিস্তলটার দিকে।

ঠিক এইরকম একটা অবস্থায় গোবিন্দ কখন যে উঠে দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা কেউই খেয়াল করিনি। আর খেয়াল করলেও কিছু করার ছিল না।

কিছুক্ষণ ধরে আমাদের যে-ধস্তাধস্তি ইত্যাদি চলছিল তার শব্দে নিশ্চয়ই সুনির

BanglaBook.org

ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকবে। কারণ ও পার্টিশন দেওয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে দু-ঘরের মাঝের দরজার কাছে। বোধহয় আমাকে দেখে চিনতেও পেরেছিল। তাই অবাক হওয়া সুরে আমাকে ডেকে উঠল : 'বুড়্ঢা জনাব!'

আমার বুকের ভেতরে তাজমহল ভেঙে পড়ল। গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। শুধু গলার স্বর ছাড়া এখন ওকে চট করে চিনে ফেলা মুশকিল। এই ক'দিনেই কঙ্কালসার হয়ে গেছে। শুধু ভোরবেলায় দেখা মিষ্টি মুখটা, ডান ভুরুর ওপরের সুন্দর আঁচিলটা, আর অস্বাভাবিক আকর্ষণে ভরা ঠোঁট জোড়া আমার চোখে পালটায়নি।

দত্তচৌধুরী বাঁ-হাতের নাগালে পেয়ে গিয়েছিলেন মেশিন পিস্তলটা। কিন্তু ডানহাতে সেফটি ক্যাচ টানার জোর না পেয়ে ওটা হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিলেন যুদ্ধকারী নগেনের মাথায়। ওর বোধহয় মাথা ফাটল। অন্তত শব্দটা সেরকমই শোনাল। আর নগেন নিশ্চল হয়ে গেল।

নৃপেন জানা সোজা হয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই গোবিন্দর হুঙ্কার আমরা শুনতে পেলাম : 'খবরদার!'

ও কোথা থেকে একটা করাতের দাঁতওয়ালা ভারী ছুরি বের করেছে। সুনির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চোখের নিমেষে। এবং একহাতে সুনির চুল মুঠো করে টেনে ধরে অন্য হাতে ছুরিটা চেপে ধরেছে ওর বাঁ-কানের ভেতরে।

গোবিন্দর সঙ্গী তখনও কাতরাচ্ছে মেঝেতে পড়ে। রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। টাকার থলেতে রক্ত লেগেছে। তার ওপরে মাছি বসছে। আঁশটে গন্ধটা বাড়ছে ক্রমশ।

দত্তচৌধুরী মেশিন পিস্তল ফেলে দিলেন। ধাতব শব্দ হল। মেঝেতে। নৃপেন জানা আক্রমণের ভঙ্গিতে স্থির। গোবিন্দর সাবধানবাণী ওকে ফ্রিজ শট করে দিয়েছে।

আমি উঠে বসলাম। অদ্ভুত চোখে সুনি আর গোবিন্দকে দেখলাম। চপারটা হাতের কাছেই পড়ে ছিল। সেটা হাতে তুলে নিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে গোবিন্দ চিৎকার করে উঠল, 'কোই আগে বঢ়েগা তো লড়কিসে হাত বো ব্যয়ঠেগা। খবরদার, কোই আগে বঢ়া তো—।'

আমি সাতবছর আগেকার ভেড়ুয়াটার কথা ভাবলাম। একটা অপদার্থ ভাঙাচোরা মানুষের কথা। সুধা অবাক চোখে আমাকে দেখছিল এতক্ষণ। এইবারে ব্যঙ্গের হাসি আবার ছড়িয়ে পড়ল ওর ঠোঁটে।

নৃপেন জানা বোধহয় হঠকারী কিছু করতে যাচ্ছিল। দত্তচৌধুরী ওকে ডেকে সাবধান করতে-না-করতেই গোবিন্দ ছুরি টেনে এক হ্যাঁচকায় সুনির চুলের গোছা কেটে ফেলল। সেটা মাটিতে ছুড়ে দিয়ে হেসে উঠল হিংস্রভাবে।

সুনি কোনওরকমে আর্তনাদ করে উঠল।

গোবিন্দ চেঁচিয়ে আমাকে বলল চপারটা ফেলে দিতে। কিন্তু আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু দেখছিলাম একটা ভ্যানের সামনে সুধাকে নিষ্ঠুরভাবে ধরে রয়েছে একটা কালো ছায়া। আর অন্ধকারে টর্চের আলোর রেখা কাটাকুটি খেলছে। শীতের বাতাস অসাড় করে দিচ্ছে রক্ত-মাংস।

গোবিন্দ আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ করল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সুনির ডান হাতের পাতার ওপরে কসাইয়ের মতো হিংস্র অথচ নিপুণ হাতে ছুরি চালাল। একবার—দু-বার—তিনবার। সুনি এবার বীভৎস আর্তনাদ করে উঠল। সে-আর্তনাদের মধ্যে একশো একটা

BanglaBook.org

বলির পাঁঠার যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল। স্পষ্ট দেখলাম, ওর দুটো আঙুলের ডগা খসে পড়েছে মেঝেতে। আর হাতের কাটা জায়গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে।

গোবিন্দ হাসছিল খলখল করে। আর সুনি 'বুড়ঢা জনাব' বলে গুঙিয়ে উঠল। তারপর অজ্ঞান হয়ে আচমকা টলে পড়ে গেল মেঝেতে। গোবিন্দ এর জন্য তৈরি ছিল না।

আমি চপার নিয়ে একলাফে পৌঁছে গেলাম গোবিন্দর কাছে। ও মুহূর্তের মধ্যে হাতের ছুরি বসিয়ে দিল আমার কাঁধে। একটা গরম লোহার শিক কেউ যেন ঢুকিয়ে দিল নৃশংসভাবে। সে-যন্ত্রণা বুঝিয়ে বলা যায় না। কিন্তু আমার মাথার ভেতরে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রণা বোধটাই অসাড় হয়ে গিয়েছিল হয়তো। কারণ আমি নির্বিবাদে গোবিন্দর ছুরি ধরা ডান হাতটা কনুইয়ের ওপর থেকে নামিয়ে দিলাম।

এক পলকের জন্য দেখলাম, আমার বাঁ-কাঁধের ওপরে বেরিয়ে থাকা ছুরির বাঁট আঁকড়ে ধরে রয়েছে গোবিন্দর ভৌতিক হাত।

পরক্ষণেই হাতটা খসে পড়ল সুনির বুকের ওপরে। একটু নড়ল বলেও মনে হল। তখন লক্ষ করলাম, সুধা অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমাকে দেখছে।

আমার কান্না পেল। সাত বছর আগে যে মোগা বুরবাকটা মরে গিয়েছিল চাণক্যপুরীর জমিতে সেই হতভাগা শুয়োরের বাচ্চাটা আজ বেঁচে উঠতে চাইছে। পারমিন্দার, অজিত, লোধা—সবক'টাকে আজ শেষ করব আমি। রক্ত দিয়েই শোধ হবে রক্তের ঋণ।

গোবিন্দ বোধহয় অন্য ধাতুতে গড়া। কারণ ওই অবস্থাতেই ও ছিটকে এল আমার দিকে। বাঁ-হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল আমার কাঁধ থেকে বেরিয়ে থাকা ছুরির বাঁট। কিন্তু আমি কিছু করে ওঠার আগেই নৃপেন জানা কাত হয়ে বাঁ-পায়ে এক ভয়ঙ্কর লাথি মারল ওর বুকে। গোবিন্দ সটান গিয়ে আছড়ে পড়ল মেসনাইট পার্টিশনের দেওয়ালে। নকল ঘরটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো।

আমি ক্রমশ পায়ের জোর হারিয়ে ফেলছিলাম। চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছিল। কিন্তু চপারটা তখনও ধরে রেখেছি শক্ত মুঠোয়।

দত্তচৌধুরী চিৎকার করে কী একটা বললেন। নগেন আচার্য সামান্য নড়াচড়া করতে শুরু করেছিল। তিনি বাঁ-হাতে চট করে স্মিসার মেশিন পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে পরপর দু-বার নগেনের মাথায় আঘাত করলেন। নারকেল ফাটার শব্দ হল। নগেন আবার স্থির হয়ে গেল।

আমি টলে পড়ে যাচ্ছিলাম, নৃপেন আমাকে ধরল। কাঁধ থেকে ছুরিটা টেনে বের করতে গেল। আমি যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। রক্তে সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। হাত-পা চটচটে। কিন্তু আশ্চর্য, ডরপোক ভেড়ুয়াটা যেন দম দেওয়া পুতুল। একটা মৃতদেহ বেঁচে উঠছে। এতদিন একটা লাশ চলে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আজ তার মধ্যে কেউ প্রাণ-ভোমরা ঢুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

আমি নৃপেন জানাকে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন!'

দত্তচৌধুরীর দিকে তাকাল নৃপেন।

আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন আমাকে! সবক'টাকে খতম করে দেব আমি। সব লাশকো খালাস কর্ দুন্দা। ছোড় দো মুঝে!'

BanglaBook.org

আমার আহত দেহ নিয়ে যখন দত্তচৌধুরী ও নৃপেন জানা হিমসিম খাচ্ছে সেই ফাঁকে গোবিন্দ কখন যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছিল। পার্টিশনের পোস্টার-ক্যালেন্ডার ইত্যাদিতে ওর দেহটা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেইসব আড়াল সমেতই ও এগিয়ে এসেছে। তারপর কোত্থেকে একটা পাইপগান নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরে অনেক কষ্টে একহাতে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে।

গোবিন্দর তাক নির্ভুল হওয়ার বিন্দুমাত্রও কারণ ছিল না। ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি লাগল নৃপেন জানার কোমরে। ও ধাক্কা খেয়ে টলে পড়ল দত্তচৌধুরীর ঘাড়ের ওপরে। আর আমিও অবসন্ন হয়ে পড়ে গেলাম সুনির ওপর।

সুনি। সুনি। ও চোখ বুজে রয়েছে। কিন্তু আমি ওর হৃৎপিণ্ডের শব্দ অনুভব করলাম।

গোবিন্দ গুলি ছোড়ার পর চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ওর ডান হাত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। ও বোধহয় দুর্বল হয়ে পড়ছিল খুব তাড়াতাড়ি। দত্তচৌধুরী নৃপেনকে সামলাচ্ছিলেন। আমি বুকে হেঁটে এগোতে লাগলাম গোবিন্দর দিকে। বাঁ-কাঁধটা অসাড় ঠেকছিল। কিন্তু বাকি দেহটা আমার কথা শুনছিল।

গোবিন্দ তখন সিলিং-এর দিকে চেয়ে আছে। চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে। আমি ওর খুব কাছে গেলাম। আমার বাঁ-হাতের চেটো রাখলাম ওর গলার ওপরে। গোবিন্দ চিৎকার করে উঠল। বাঁ-হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল আমার হাত। কিন্তু আমি শরীরের ভর দিলাম ওর সুস্থ হাতটার ওপরে। তারপর কাত হয়ে শুয়ে এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে চপার চালালাম। আমার সাত বছরের পুষে রাখা যন্ত্রণা গলা চিরে বেরিয়ে এল।

একই সঙ্গে গোবিন্দর গলা এবং আমার বাঁ-হাতের তিনটে আঙুলের ডগা বিচ্ছিন্ন হল। গরম রক্ত ছিটকে এসে লাগল আমার সারা মুখে। আমি বলতে চাইলাম, 'সুধা, দ্যাখো—চেয়ে দ্যাখো। মা—সুনি—তোমরা দ্যাখো—।' কিন্তু একটা অন্ধকার পরদা নেমে আসতে লাগল আমার চোখের ওপরে। অথচ টের পেলাম, সেই অবস্থাতেও আমি জানোয়ারের মতো একটানা চিৎকার করে চলেছি। প্রমাণ করতে চাইছি, একটা মড়া বেঁচে উঠেছে। বেঁচে উঠেছে!

আট

দু-দিন পর আমার নাকি জ্ঞান ফিরেছিল। সুনিরও তাই। দত্তচৌধুরী ও নৃপেন জানার চেষ্টায় আমরা দুজনে পৌঁছে গিয়েছিলাম পি. জি. হাসপাতালে। দত্তচৌধুরী লালবাজারে টেলিফোন করে জরুরি সাহায্য চেয়েছিলেন। তারপর চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই এলাকাটা ভরে গিয়েছিল পুলিশে। আহত নগেন আচার্য এবং গোবিন্দর শাকরেদকে পুলিশ-ভ্যান নিয়ে যায় পি. জি.-তে। আর দত্তচৌধুরী ও নৃপেন জানা অন্যান্য অফিসারের সাহায্য নিয়ে স্থানীয় এক ডাক্তারের কাছ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে নিয়েছিলেন। নৃপেন জানার আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। তবে ওকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালে যাওয়ার পথে পুলিশ টেলিফোনে প্রভাবতী ও জগদীশকে খবর দিয়েছিল। এবং ই. এস. আই. হাসপাতালের কাছ থেকে সুজিতকেও তারা উদ্ধার করে।

BanglaBook.org

গোবিন্দ সম্পর্কে খোঁজ নিতেই জানা যায়, সে একজন দাগী বিকারগ্রস্ত খুনে। একসময়ে একটা মাংসের দোকানে কসাইয়ের কাজ করত। ওর শাকরেদের নাম নিতাই, ওরফে নিতু। সে পুরোনো স্মাগলার। দু-দুটো খুনের মামলায় ফেরার ছিল।

সমস্ত হিসেব মোটামুটি মিলে গেলেও নগেন আচার্যের অঙ্কটা আমি মেলাতে পারছিলাম না। সে-কথা দত্তচৌধুরীকে বলতেই তিনি বললেন, 'আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি চলুন, সব বলব। দেখলেন তো, সামান্য একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে কত বড় দাঙ্গা হয়ে গেল।'

দত্তচৌধুরী বললেন যে, গোবিন্দর মৃত্যুকে তিনি 'আত্মরক্ষার তাগিদে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছেন' বলে চালিয়ে দিয়েছেন। ওর নামে যেসব রিপোর্ট রয়েছে তাতে বিশেষ কোনও ঝামেলা আর হবে না। তা ছাড়া, আমাদের আহত হওয়ার ব্যাপারটাও গোবিন্দর বিরুদ্ধেই যাবে। অন্যান্য অফিসারের সহযোগিতায় দত্তচৌধুরী কেস সাজাচ্ছেন। নৃপেন জানাও শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। তখন পুরোদমে কাজ শুরু হবে।

কথায়-কথায় দত্তচৌধুরী হেসে বললেন, 'জগদীশ আচার্য আর তাঁর স্ত্রী রোজই ওঁদের মেয়েকে দেখতে আসছেন। আর আপনারও খোঁজখবর নিচ্ছেন রোজ। আপনি সেরে উঠুন, মেয়েটা সেরে উঠুক, তখন একদিন চায়ের আসর বসানো যাবে ওদের বাড়িতে। কী বলেন?'

সত্যিই তাই হল। নগেন আচার্যের অঙ্কটা মেলানোর জন্যেই সাতদিন পরে রবিবার বিকেলে জগদীশ আচার্যের বাড়িতে আমরা জমায়েত হলাম। আমি শনিবার ছাড়া পেলেও সুনি ছাড়া পেয়েছে আজ সকালে। মা অনেকবার বারণ করেছিল। বলেছিল, 'এখন ক'টা দিন বিশ্রাম নে।' কিন্তু সুনি যে আজ অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরবে। আমি ওকে দেখতে যাব। ভীষণ ইচ্ছে করছে।

সন্ধের মুখে সুনিদের বাড়িতে গেলাম। চলার সময়ে বাঁ-কাঁধটা এখনও ব্যথা করে। বাঁ-হাতে এবং কাঁধে এখনও ব্যান্ডেজ। কলিংবেল বাজাতেই হরিনন্দন দরজা খুলে দিল। অবাক চোখে আমাকে দেখল। বলল, 'ক্যায়সা হ্যায়, বাবুজি?'

আমি বললাম, 'ভালো।' তারপর ভেতরে ঢুকলাম।

ঘরে সকলেই হাজির। দত্তচৌধুরী, জগদীশ, প্রভাবতী, একজন অচেনা ভদ্রলোক, এবং সুনি। সুনি একটা সোফায় এলিয়ে বসে হরলিক্সের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ডান হাতে ব্যান্ডেজ। আমাকে ঢুকতে দেখেই ম্লান হাসল। আমার বুকের ভেতরটা কেন জানি না হঠাৎই মোচড় দিয়ে উঠল। জগদীশ বারবার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন। প্রভাবতী কাছে এসে আমার হাত ধরলেন। উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, 'ভালো আছ তো, অতীন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম : 'হ্যাঁ।'

প্রভাবতী চোখের কোণ মুছে বললেন, 'তোমার জন্যেই সুনি ফিরে এল। কিন্তু আমি ভাবতেই পারছি না...দেবরজি...।'

আমি একটা ডাইসের ওপরে বসলাম। সুনিকে দেখলাম। ওর ফ্যাকাসে মুখে

BanglaBook.org

সামান্য গোলাপি আভা ফুটেছে। দত্তচৌধুরী পান চিবোচ্ছিলেন। ওঁর পাশে বসা অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন : প্রভাস ঘোষ। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। লালবাজার।

জগদীশ ও প্রভাবতীর সঙ্গে দত্তচৌধুরীর আগেই আলাপ হয়েছিল হাসপাতালে। পান চিবোতে-চিবোতে দত্তচৌধুরী জগদীশকে বললেন, 'মিস্টার আচার্য, এবারে তা হলে ছোট্ট আলোচনাটা সেরে ফেলা যাক, দত্তবাবুও এসে গেছেন। আর...ইয়ে...আপনার মেয়ে এখানে না থাকলেই ভালো হয়...। কারণ নগেনবাবু...।'

প্রভাবতী সুনিকে বললেন, 'তুই ভেতরে যা, পারবি, না আশাকে ডাকব?'

সুনয়না বিবর্ণভাবে হাসল। তারপর বলল, 'মাম্মি, ক্যায়সি বাত কর্ রহি হো? দিস ইজ গোয়িং টু বি মাই স্টোরি। আমার গল্প, আর আমিই শুনব না! ইমপসিব্‌ল!'

প্রভাবতী জগদীশের দিকে তাকালেন। জগদীশ যথাক্রমে দত্তচৌধুরী, প্রভাস ঘোষ এবং আমাকে দেখলেন। দত্তচৌধুরী নাক কুঁচকে বললেন, 'থাকলে থাকুক। আমাদের কোনও অসুবিধা নাই।'

দত্তচৌধুরী কথা বলতে লাগলেন। আমি সুনিকে দেখছিলাম। আর ও আমাকে।

'মিস্টার আচার্য, আপনার ভাই সম্পর্কে অনেকগুলো খারাপ মন্তব্য করতে হবে বলে আমি আগে থেকেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি।'

জগদীশ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দত্তচৌধুরীকে দেখছিলেন। শনিবার রাতের ঘটনা দত্তচৌধুরীর কাছে অনেকটাই শুনেছেন তিনি। দত্তচৌধুরী নাক কোঁচকালেন একবার। তারপর বললেন, 'গোটা গল্পটা সুনয়না আচার্যকে নিয়ে—যে-মেয়েটাকে প্রায় দেড় যুগ আগে দিল্লির বরাখাম্বা রোডের 'সাহারা' অনাথ আশ্রম থেকে আপনারা দত্তক নিয়েছিলেন। সুনয়নার আসল মা-বাবার পরিচয় আপনারা জানতেন না। জানতে চানওনি কখনও। কিন্তু নিয়তির এমনই রসিকতা যে, সুনয়নার মা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন আশ্রমের সঙ্গে। ভদ্রমহিলা তাঁর প্রথম যৌবনের সন্তানকে আশ্রমে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, সুনির জন্মদাতা পিতা নিজের ইচ্ছায় বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের সমাজ সুনয়নার মাকে বিপদে ফেলছিল বারবার। এক্সকিউজ মি—।'

দত্তচৌধুরী উঠে বাইরে গেলেন। বোধহয় পানের পিক ফেলে আসতে।

আমি সুনিকে দেখলাম। শান্তভাবে বসে রয়েছে। মায়ের কথা কি ভাবতে চেষ্টা করছে? প্রভাবতী কেমন অস্বস্তি আর আশঙ্কা নিয়ে চুপ করে বসে আছেন। ঘরের নিয়ন বাতি প্রতিফলিত হয়েছে ওঁর চশমার কাচে। জগদীশ একবার সুনিকে দেখলেন। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন। প্রভাস ঘোষ আগেও যেমন, এখনও তেমন—পাথরের আসবাব।

দত্তচৌধুরী ফিরে এলেন। বসলেন সোফায়। দু-বার গলা খাঁকারি দিলেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সুনয়নার মা দারুণ রূপসী ছিলেন। সেটা অবশ্য মেয়েকে দেখেই বোঝা যায়।' সুনয়নার দিকে তাকিয়ে দত্তচৌধুরী স্নেহের হাসি হাসলেন। 'যাই হোক, সুনয়নার মা আবার বিয়ে করলেন। আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙালি ব্যবসায়ীকে। সেখানে পেলেন অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। সুনয়নার খবর জানতে চেয়ে "সাহারা" থেকে আপনাদের কাছে প্রতি বছরে যেমন চিঠি আসত, ঠিক তেমনিই ওরা নিয়মিত গোপনে চিঠি পেতেন আমেরিকা থেকে। সুনয়নার মা লিখতেন।'

BanglaBook.org

'লিখতেন মানে?' আমি জিগ্যেস করলাম, 'এখন কি লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন?'

দত্তচৌধুরীর মুখে ছায়া নামল। জিভের ডগা দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে নিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এখন আর চিঠি লেখেন না। কারণ গত বছর ডিসেম্বরে তিনি মারা গেছেন।'

ঘরে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। সুনয়না হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে উঠে মুখ ঢাকল। ওর বোধহয় মনে পড়ে গেছে 'সুনির বাক্স'-র কথা, ওর 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'-র কথা।

দত্তচৌধুরীর গল্প শুনতে-শুনতে আমার অবাক লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম না, এর সঙ্গে সুনির কিডন্যাপিং অথবা নগেন আচার্যের সম্পর্ক কোথায়।

সুশীল দত্তচৌধুরী আবার শুরু করলেন : 'সুনয়নার মায়ের স্বামী তিন বছর আগে মারা যান। ফলে প্রায় দু-কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে পড়েন সুনয়নার মা। কারণ ওঁদের কোনও সন্তান হয়নি। তখন তিনি আমেরিকা ও ভারতের দুটি বিখ্যাত কার্মকে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করার জন্য। ভদ্রমহিলার উইল ছিল খুব সহজ। তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ সুনয়না—তাঁর মেয়ে। দিল্লির এক হাসপাতালের ডিসচার্জ রিপোর্ট, "সাহারা" অনাথ আশ্রমের ঠিকানা, আর সুনির ছোটবেলার একটা ছবিও তিনি দাখিল করেছিলেন তাঁর উকিল-কোম্পানির কাছে। সুতরাং ভদ্রমহিলার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ আইন মোতাবেক শেষ হয় মাস চারেকের মধ্যেই। তখন সুনয়নার খোঁজে উকিল-কোম্পানির চিঠি যায় "সাহারা"র। এবং তাঁরা সম্পত্তির ব্যাপারটাও লিখে জানায়। সেই খবরটাই "সাহারা"র কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় জগদীশ আচার্যকে। আর তখনই শুরু হয় খেলা—'

জগদীশ আচার্য এমন এক হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন যে, ঘরের সকলেই চমকে গেল।

'না! আমি কোনও খবর পাইনি!'

দত্তচৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। জগদীশের কাছে গেলেন। ওঁর ডানহাতে খানিকটা ওপরে এখনও ব্যান্ডেজ রয়েছে। শব্দ করে ঘরের মেঝেতে থুতু ফেললেন। বললেন, 'অ্যামন মেয়েখাকি বাপ দেখি নাই।'

জগদীশ চকিতে উঠে দাঁড়াতে গেলেন। বিশ্রীভাবে গালাগাল দিলেন দত্তচৌধুরীকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বাঁ-হাতের এক বিরাশি সিক্কার চড় জগদীশের ডান গালে গিয়ে পড়ল। মারলেন দত্তচৌধুরীই।

জগদীশের ভারী দেহটা ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপরে। প্রভাবতী চিৎকার করে উঠলেন। সেই সঙ্গে সুনিও। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সবকিছু কেমন জালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। জগদীশ খবর পেয়েছিলেন যে, সুনি কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হচ্ছে? দত্তচৌধুরীকে কিছু একটা বলতে যেতেই উনি হাত তুলে আমাকে চুপ করতে বললেন।

জগদীশ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে-ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর চোখের নজর এখন দাগী আসামীর। আমি আবার বসে পড়লাম সোফায়।

দত্তচৌধুরী প্রভাবতীকে বললেন, 'আমার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি, মিসেস আচার্য। কিন্তু গোটা গল্পটা আপনাদের জানা দরকার। আপনার স্বামী, জগদীশ আচার্য, আপনাদের পালিত মেয়ে সুনয়নাকে কিডন্যাপ করার জন্যে শতকরা একশো ভাগ দায়ী।'

জগদীশ গর্জে উঠলেন, 'মিথ্যে কথা! আমি এর কিচ্ছু জানি না! সত্যি বলছি।'

দত্তচৌধুরী এক ঝটকায় জগদীশের পাঞ্জাবি খামচে ধরলেন। দাঁতে দাঁত চেপে

BanglaBook.org

বললেন, 'আপনার জন্যে হাফডজন মানুষ মরতে বসেছিল। আমাদের জান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন আপনি। ইচ্ছে করলে এই ঘরে বসেই আমি আপনাকে আড়ং ধোলাই দিতে পারি। কিন্তু তাতেও আমার জ্বালা জুড়োবে না। ওই ফুলের মতো মেয়েটাকে আপনি খতম করে দেওয়ার মতলব করেছিলেন এ-কথা ভাবতেই আমার গা রি-রি করছে।' কথা শেষ হতে-না-হতেই জগদীশকে এক ধাক্কা মারলেন দত্তচৌধুরী। জগদীশ নিজের সোফায় গিয়ে পড়লেন। এবারে ওঁর চোখে ভয়ের ছায়া ফুটেছে। আর প্রভাবতী ও সুনির মুখে কষ্টের ছাপ।

দত্তচৌধুরী নিজের জায়গায় এসে বসলেন। লক্ষ করলাম, ওঁর হাত সামান্য কাঁপছে। কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'সুনয়না বড়লোক হয়েছে, এইখান থেকেই গল্পের শুরু। অতীনবাবুর কাছে আমি কতকগুলো ঠিকানা চেয়েছিলাম। সেগুলো মিসেস আচার্যর কাছ থেকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে আদায় করতে পেরেছিলেন তিনি। সেই খবরগুলো পেয়েই আমি "সাহারা" অনাথ আশ্রমে যোগাযোগ করেছিলাম। আর একই সঙ্গে আঁতিপাঁতি খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিলাম দুজন লোক সম্পর্কে : জগদীশ আচার্য আর নগেন আচার্য। কলকাতা-দিল্লি, কোথাও খোঁজ নিতে আমি বাকি রাখিনি। সবার প্রথমেই যে খবরটা আপনাদের দেব তা হল, নগেন জগদীশবাবুর ভাই নয়। ভাড়াটে গুণ্ডা। তবে ওর নাম নগেন। পদবী মণ্ডল। মোটামুটি তিনজন দাগীকে টাকার বিনিময়ে কাজে লাগিয়েছিলেন জগদীশবাবু। তাঁর নির্দেশে সেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এরাই কিডন্যাপ করেছিল সুনয়নাকে।'

সুনির হরলিক্স অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খালি গ্লাসটা ধরা ছিল ওর হাতে। ও ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে সেটা রেখে এল বড় টেবিলের এক কোণে—ওর ফটোর পাশে। ও সম্পূর্ণ নতুন চোখে জগদীশকে দেখছিল।

দত্তচৌধুরী পকেট থেকে পান বের করে মুখে দিলেন। নাক কুঁচকে পান চিবোতে-চিবোতে বললেন, 'অতীন দত্তকে জগদীশের পছন্দ হয়েছিল—অন্তত বলির পাঁঠা হিসাবে। তাই কড়া নজর রেখে অতীন দত্তর হাতে যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন জগদীশ। তিনি এবং নগেন মিলে সর্বক্ষণ পরিস্থিতির তদারকি করেছেন। এদিকে গোবিন্দ আর তার শাকরেদ নিতাই ওঁদের নির্দেশ মতো একটার পর একটা ফোন করে গেছে, ভিডিও ক্যাসেটও পাঠিয়েছে। ভিডিও ক্যাসেট ফেরত চেয়েছিল কিডন্যাপাররা। বলেছিল, রাতে ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে ওটা রেখে দিতে। সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। পরে সুযোগ মতো দরজা খুলে ওটা তুলে নিয়েছিলেন জগদীশ কিংবা নগেন। কিন্তু ওঁরা জানতেন না, ওঁদের বাড়ির সামনে সারারাত লুকিয়ে পাহারায় ছিলেন অতীনবাবু—কে ওই ক্যাসেটটা নিতে আসে সেটা দেখতে। কিন্তু কেউ আসেনি। আসার প্রয়োজন ছিল না। হয়তো এখন এই ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে সার্চ করলে ওই ক্যাসেটটা খোঁজে পাওয়া যেতে পারে।'

দত্তচৌধুরী মুখ মুছলেন। মাথায় হাত বুলোলেন একবার। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'এখন দুটো প্রশ্ন : হঠাৎ করে জগদীশবাবু অর্থলোভী হয়ে উঠলেন কেন, এবং টাকার অভাব যদি বা থাকবে তা হলে দশ লাখ টাকা উনি জোগাড় করলেন কীভাবে?

সুনয়নার সঙ্গে গত পনেরো-ষোলো বছরে কোনওরকম স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক কি গড়ে ওঠেনি? এর উত্তরে বলব, নিজেদের প্রথম সন্তান মারা যাওয়ার ঘটনাটাকে

জগদীশবাবু কখনওই বোধহয় সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাই সুনয়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক পাকাপাকি ভাবে তৈরি হতে পারেনি। এ ছাড়া, প্রভাবতী দেবী জানেন কি না জানি না, রেস-জুয়া ও অন্যান্য ফাটকাবাজির দাপটে জগদীশবাবুর মতো নামি ফিনান্সিয়াল কনসালট্যান্ট বর্তমানে দেনায় ডুবে আছেন। তাঁর পাওনাদারদের বেশিরভাগই দিল্লিতে। তবে ওরা যেমন এককথায় লাখ-লাখ টাকা ধার দিয়ে দেয়, তেমনি টুঁটি টিপে তা আদায় করার ক্ষমতাও রাখে। ওদের হাত অনেক লম্বা। সেই হাতগুলো গত কয়েক বছর ধরেই জগদীশবাবুর গলার খুব কাছে এসে থেমে ছিল। তবে এইবারে বোধহয় ওদের আর থামিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। ঠিক এইরকম একটা সময়ে "সাহারা" অনাথ-আশ্রম থেকে বিশেষ চিঠিটা জগদীশবাবুর কাছে আসে। সঙ্গে ল-ইয়ারদের নির্দেশ। যার মধ্যে সুনয়নার মায়ের ইচ্ছের কথা সংক্ষেপে বলা ছিল। জগদীশবাবু এবং প্রভাবতী দেবী সুনয়নাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তাই তাঁদের প্রতি সুনয়নার মায়ের কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উইলে এ-কথা স্পষ্টভাবেই লেখা রয়েছে যে, সুনয়নার অবর্তমানে সব সম্পত্তি পাবেন জগদীশবাবু ও প্রভাবতী দেবী। আর যদি সুনয়না বিয়ে করে থাকে তা হলে ওঁরা দু-লাখ টাকা পাবেন কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসেবে। এই অঙ্কের হিসেবটা জগদীশবাবুর খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন অতীন দত্তকে—যার সঙ্গে সুনয়নার একটু-আধটু বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে আমাকেই সবাই বারবার বেছে নেয় কেন! জগদীশ আচার্যকে দেখে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চাইছিল না দত্তচৌধুরীর সবকথা সত্যি।

দত্তচৌধুরী প্রভাস ঘোষকে চাপা গলায় কী যেন বললেন। এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এখন দেখলাম, ওঁর সোফার পাশে মেঝেতে একটা নীল রঙের কিট ব্যাগ রাখা আছে। প্রভাস ঘোষ ব্যাগ খুলে একটা ছোট প্যাকেট দত্তচৌধুরীর হাতে দিলেন। প্যাকেটটা খবরের কাগজে মোড়া। তার ওপরে গালার সিল। দত্তচৌধুরী প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললেন, 'এবারে বলি দশ লাখ টাকার কথা। বেশ মজার কথা। যে-টাকার থলে শনিবার অতীনবাবুর হাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল এটা তারই একটা বান্ডিল। নগেন, গোবিন্দ—ওদের প্রতি জগদীশবাবুর নির্দেশ ছিল সুনয়নার ওপরে খেয়ালখুশিমতো টরচার করার জন্যে এবং যদি থলেতে করে হিসেবমতো টাকা পাঠানো না হয়, তা হলে সুনয়নাকে যেন খতম করে দেওয়া হয়। একেবারে খতম।'

দত্তচৌধুরী প্যাকেটের মোড়ক ছিঁড়তে লাগলেন। ছেঁড়া শেষ হতেই আমরা চমকে উঠলাম। একশো টাকার নোটের মাপের সাদা কাগজের বান্ডিল একটা। দত্তচৌধুরী তেতো হাসলেন। বললেন, 'হুঃ! এরই নাম বোধহয় সাদা টাকা।'

প্রভাবতী এবারে আঁচলে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করলেন। সুনিরও চোখ ছলছল করছিল। ওরা দেখছিল, কী করে ওদের চোখের সামনে একটা মানুষ ধীরে-ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে।

দত্তচৌধুরী আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'এখন বোধহয় আপনি গল্পটা একটু-একটু আঁচ করতে পারছেন, অতীনবাবু? আপনাকে পুলিশে যেতে প্রথম থেকেই বারণ করেছেন জগদীশবাবু। যদি আপনি ওঁর কথা শুনতেন তা হলে গল্পটা এভাবে গুবলেট হত না।

BanglaBook.org

যে-থলেটা আপনি গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ওপরের দিকে পাঁচ-সাতটা আসল টাকার বান্ডিল ছিল। ব্যস। বাকিটা এই সাদা টাকা। এখন এই টাকার থলে পেয়ে কিডন্যাপাররা যদি সুনয়নাকে খুন করে ফেলত তা হলে খুব সহজেই বলির পাঁঠা হতেন আপনি। তখন জগদীশই বলতেন যে, আপনি থলে থেকে টাকা সরিয়ে নিয়েছেন এবং আপনার শয়তানির জন্যেই ওঁর মেয়েকে খুন হতে হল। আসলে জগদীশবাবু ভাবতে পারেননি, আপনার মতো একজন ছাপোষা লোক এইরকম পরিস্থিতিতে সুনয়নার জীবন বাজি ধরে পুলিশে যোগাযোগ করবে। আর তাতেই গোটা গল্পটা ওলটপালট হয়ে গেল।... আর শনিবার রাতটা ছিল অভীন দত্তের রাত।'

জগদীশ দু-হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসে ছিলেন।

দত্তচৌধুরী ওঁকে বললেন, 'মিস্টার আচার্য, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আপনার সম্পর্কে নগেন আর নিতাই যা বলার বলবে। মনে হয়, আপনার অপকর্ম প্রমাণ করতে আমাদের খুব একটা ঝামেলা হবে না, আর গল্পের খুঁটিনাটি অংশগুলোও আমাদের জানা দরকার। সেটা পুলিশ হাজতে থাকার সময়েই দাওয়াই দিয়ে আপনার কাছ থেকে বের করে নেব আমরা।'

জগদীশ চকিতে উঠে দাঁড়ালেন সোফা ছেড়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গে দত্তচৌধুরীও। কোথা থেকে একটা রিভলবার বের করে ফেলেছেন। পুরোপুরি সেরে-না-ওঠা ডান হাত দিয়ে সেফ্‌টি ক্যাচ টেনে বাঁ-হাতে সেটা তাক করলেন জগদীশের কপাল লক্ষ করে। ছোট্ট করে বললেন, 'খবরদার!'

প্রভাবতী ডুকরে উঠলেন। সুনি কেমন বিহ্বল চোখে জগদীশকে দেখছে।

দত্তচৌধুরীকে কয়েকমুহূর্ত দেখলেন জগদীশ। তারপর বললেন, 'আপনিই জিতলেন। এমনিতেও আমি আর বেশিদিন বাঁচতাম না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি...।'

জগদীশ হঠাৎ সুনির দিকে ঘুরলেন। আমাদের অবাক করে দিয়ে ওর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। তারপর উন্মুখ হয়ে দেখলেন ওকে। অনুনয়ের সুরে বললেন, 'সুনি, ডু য়ু বিলিভ দিস কক অ্যান্ড বুল স্টোরি? কেয়া তু সাচমুচ বিসওয়াস করতি হ্যায় কে ম্যায়নে তুঝে কিডন্যাপ করায়া? বোল্—।'

সুনি একপাশে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে লাগল। আমার মনে পড়ল ওর কথাগুলো : 'তুম মুঝে নহি বচা সকতে, বুড়্‌ঢা জনাব। ইয়ে লোগ বহত কামিনা হ্যায়। তুম ইন্‌সে নহি লড়্ সকতে—'

এখন সেই কামিনা লোকটা প্রাণভিক্ষা চেয়ে মেয়ের পায়ে মাথা কুটছে।

সুনি একটা হলদে-সবুজ ডোরাকাটা ম্যাক্সি পড়েছিল। তাতে নকশা করা দুটো বড় পকেট রয়েছে। ওর বাঁ-হাতটা ঢুকে গেল ম্যাক্সির বাঁ-পকেটে। তারপর কী একটা বের করে দেখাল জগদীশকে। হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'ড্যাড, আই ডিড নট ওয়ান্ট টু বিলিভ দিস ব্লাডি স্টোরি। এ-গল্প আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু এই লকেটটা—!'

তখন আমরা সুনির হাতে জগদীশের সোনার লকেটটা দেখতে পেলাম। ত্রিভুজের মতো তেকোনা চেহারা—মাঝে মিনে করে ত্রিশূলের মতো একটা ছবি আঁকা। এটা তো জগদীশের গলায় ছিল! কখন খুলে পড়ে গেল? কোথায়?

BanglaBook.org

লকেটটা দেখে জগদীশ থমকে গেলেন। ওঁর একটা হাত অজান্তেই চলে গেল গলার চেনে। খুঁজতে লাগলেন। পেলেন না। সুনি কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'ড্যাড, ইয়ে মুঝে ওঁয়াহা মিলা হ্যায় যাঁহা উন বদমাশোনে মুঝে বন্ধ করকে রখ্খা থা। বাওইহাটি না কী যেন নাম—সেই জায়গায়—ওই হাফ-ফিনিশ্‌ড বাড়িতে। ড্যাডি, তুম্‌হে রুপেয়া কি জরুরত থা? মুঝে ইয়ে সব কিঁউ নহি বতায়া তুম্‌নে? আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি অফ দ্যাট ব্লাডি মানি। একটা পয়সাও আমার চাই না। সব তুমি নিয়ে নাও! সব তুমি নিয়ে নাও!'

দত্তচৌধুরী ইশারা করতেই আমি সুনিকে গিয়ে ধরলাম। ও হিস্টিরিয়ার রুগির মতো হাত-পা ছুড়ে কাঁদছিল। চোখ লাল।

প্রভাস ঘোষ এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন জগদীশের কাঁধে। বললেন, 'লেট্‌স্ গো, মিস্টার আচার্য।'

দত্তচৌধুরী সুনির কাছে এসে লকেটটা নিলেন। সুনির মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমার জন্যে কষ্ট হয়। আবার অবাকও হচ্ছি। যে-লোকটা তোমাকে আটকে রেখে এত অত্যাচার করেছে তাকে তুমি সব দিয়ে দিতে চাইছ? তোমার ভালো হোক, মেয়ে। আই উইশ য়ু দ্য বেস্ট ফিউচার।'

জগদীশকে নিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে দত্তচৌধুরী আমাকে বললেন সোমবার লালবাজারে দেখা করতে। তারপর প্রভাবতী ও সুনিকে দেখিয়ে বললেন, ওদের সামলাতে। আরও বললেন, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তিনি সব ব্যবস্থা করে ল-ইয়ারদের নিয়ে আসবেন। তাঁরাই সুনির মায়ের চিঠি এবং অন্যান্য কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন তুলে দেবেন সুনির হাতে। তারপর বাকি সম্পত্তির পাকা ব্যবস্থার কাজ শুরু করবেন।

দত্তচৌধুরী প্রভাবতীকে বললেন, 'মিসেস আচার্য, আই রিয়েলি ফিল ফর য়ু—।'

তারপর ওঁরা চলে গেলেন।

ঘরে আমি, সুনি আর প্রভাবতী। সুনিকে ছুঁয়ে রয়েছি আমি। ও কাঁদছে। অথচ ক'দিন আগে হলেই এই প্রগলভ মেয়েটা বলত, 'কী বললে, বুড্ঢা জনাব? তোমার বাঁ-হাতের তিনটে আঙুলের মাথা নেই? আরে, আমারও যে ডান হাতের দুটো ফিঙ্গারটিপ্‌স নেই। তব্ তো বন গই বাত, মিলাইয়ে জনাব হাথ—।'

অথচ আজ ও চুপচাপ। ওর ছোট্ট দেহটা ফুলে-ফুলে উঠছিল। আমার আরও কাছে সরে এল ও। অস্পষ্ট জড়ানো গলায় বলল, 'বুড্ঢা জনাব, ডোন্ট এভার লিভ মি। একা থাকলে আমার ভয় করবে।'

আমার চোখ জ্বালা করছিল। বুকে নাম-না-জানা কষ্ট।

একটা মড়া যখন বেঁচে ওঠে তখন বোধহয় এইরকম কষ্টই হয়।

BanglaBook.org

সাক্ষী কেউ নেই

ফোরেনসিক ডায়েরি থেকে।

২৫ আগস্ট, ২০১৮

কোথা থেকে শুরু করব ভাবছি। 'অমরাবতী হত্যাকাণ্ড' নিয়ে এত হইচই হয়েছে, এত লেখালিখি হয়েছে যে আর বলার নয়। সেইজন্যেই নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনাকে দেখা বেশ শক্ত। কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বিলাসবহুল এস্টেট 'অমরাবতী'র নাম এখন সকলের মুখে-মুখে। অমরাবতী এস্টেটের ৩২ জন বাসিন্দা নৃশংসভাবে খুন হয়েছে, আর তাদের ১৩ জন ছেলেমেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এই রহস্যময় ঘটনা নিয়ে গত দু-মাস ধরে টিভিতে নেহাত কম প্রোগ্রাম দেখানো হয়নি। সেখানে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এই খুন ও কিডন্যাপিং সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন, নানা থিওরির কথা বলেছেন, চুলচেরা বিশ্লেষণও করার চেষ্টা করেছেন। ফলে মনে হয় না, নতুন কোনও থিওরির কথা আর কেউ শোনাতে পারবেন।

কিন্তু আজ সকালেই হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এ-বিষয়ে যে-মন্তব্য করলেন, তা একদিকে যেমন অপমানজনক, আর-একদিকে তেমনি ভাবিয়ে তোলে। লালবাজারের পদস্থ অফিসারদের মুখ দেখেই বোঝা গিয়েছিল, তাঁদের মানে লেগেছে। কিন্তু সত্যিই তো, এখনও পর্যন্ত খুনের মোটিভ সম্পর্কে আমরা বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানি না। আর খুনিদের পরিচয় সম্পর্কেও আমরা একইরকম অন্ধকারে।

সেক্রেটারি-সাহেব থমথমে মুখে হাত নেড়ে বলেছেন, 'ডক্টর দাশগুপ্ত, আমরা বারবার "খুনিরা", "খুনির দল" এইসব বলেছি। কিন্তু আদতে হয়তো একজন মানুষই এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্যে দায়ী। আমাকে কে একজন বলেছিল, ক্যারাটে-কুংফু জানা কোনও পাগলের পক্ষে এ-কাজ একেবারে অসম্ভব নয়। ...আর, অনাথ বাচ্চাগুলোর কথা একবার ভাবুন তো! ওরা স্পেস-টাইমের কোনও ফুটো দিয়ে যেন উধাও হয়ে গেছে। ওদের মুক্তিপণের দাবি কেউ জানায়নি, এমনকী ওদের খতম করে ফেলবে এমন হুমকিও কেউ দেয়নি...।'

ভদ্রলোকের কথায় হতাশা ছিল, ক্ষোভ ছিল, আক্ষেপ ছিল। তখন আমি সান্ত্বনা দিতে জবাব দিয়েছি, 'সে যাই হোক না কেন, আমার মনে হয় ওরা বেঁচে আছে।'

'বেঁচে আছে? সত্যি কথা বলতে কী ডক্টর দাশগুপ্ত, এই "মনে হওয়া"র ব্যাপারটা এবার শেষ হওয়া দরকার। সেইজন্যেই আমি এই ইমার্জেন্সি মিটিংয়ে আপনাকে থাকতে বলেছি। আপনি এ-ব্যাপারে দায়িত্ব নিন।'

BanglaBook.org

কথাটা বলে সেক্রেটারি-সাহেব আমার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, আমার খবরদারিটা পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুব একটা ভালো চোখে দেখবে না। বিশেষ করে বছরখানেক আগে 'দত্তভিলা'র হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার দেওয়া রিপোর্ট যখন তারা ভালো মনে নেয়নি। সুতরাং আমাকে হাল ধরতে বলার মধ্যে আমাকে যতটা না প্রশংসা করা হচ্ছে, তারচেয়ে অনেক বেশি অপমান করা হচ্ছে লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে, তাদের সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশান দপ্তরকে। অবশ্য এর কারণও আছে। 'অমরাবতী'র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশ আজ পর্যন্ত একটি সূত্রও হাজির করতে পারেনি—খুনিকে ধরা তো দূরের কথা।

আমার অবস্থা হয়েছিল সেক্রেটারি-সাহেবের মতোই—অর্থাৎ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সূত্রহীন এই হত্যাকাণ্ডের জটিল রহস্য কেমন করে ভেদ করব আমি! তবুও ওঁর কাছে অনুমতি চাইলাম 'অমরাবতী' এস্টেট—মানে খুনের জায়গাটা একবার দেখার জন্যে। বিলাসকুঞ্জ এই এস্টেট এখন একেবারে সিল করে রাখা হয়েছে—প্রেসের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, বা পাবলিক, কাউকেই ওখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে পুলিশের তদন্তকারী অফিসারদের বাহিনী 'অমরাবতী'কে তাদের ভারী বুটের চাপে একেবারে চষে ফেলেছে। জানি না, এখন আর কী সূত্র সেখানে পাওয়া যাবে।

আমাকে একটা সরকারি অনুমতিপত্র লিখে দেওয়া হল। আর 'উপহার' দেওয়া হল দু-দুটো বড় ব্রিফকেস। তার মধ্যে নাকি তদন্ত সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র রয়েছে। ওঁদের মতে এই নথিপত্রগুলো যথেষ্ট 'গুরুত্বপূর্ণ'। যদিও আমার তাতে সন্দেহ আছে।

হঠাৎই আমার মনে পড়ল, ভয়ঙ্কর সেই ঘটনার দিন অকুস্থলে গিয়ে পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা ভিডিও ছবি তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুলিশের কাছে সেই ভিডিও ক্যাসেট রয়েছে। সেক্রেটারি-সাহেবের কাছে সেই ক্যাসেট দেখার অনুমতি চাইলাম।

'পুলিশ ভিডিও? ঠিক আছে, দেখবেন—তবে সহ্য করতে পারবেন তো! অবশ্য দত্তভিলার সেই ঘটনার পর আমার মনে হয়েছে, এ-ধরনের ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার-স্যাপার আপনার দিব্যি হজম হয়ে যায়। কী বলেন, ডক্টর দাশগুপ্ত?'

তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে বিরক্ত হয়ে আমি প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিলাম, ভিডিও দেখার সদিচ্ছাটা বাতিল করব। হোম ডিপার্টমেন্ট ও লালবাজারের বড় কর্তাব্যক্তিরা আমাকে বোধহয় বিপজ্জনক এক বেওয়ারিশ পাগল ঠাওরেছেন। তাঁরা বোধহয় ভাবেন, আমার চিন্তা-ভাবনা বিকৃত, অসুস্থ। সেইজন্যেই হয়তো সুস্থ মানুষের চোখ এড়িয়ে যাওয়া সূত্র শুধু আমারই চোখে পড়ে। আর, একের-পর-এক এইসব 'আবিষ্কার' বড়কর্তাদের অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

এই ডায়েরি ছেপে বের করব বলে যখন বেটা নিয়ে ঘষামাজা করতে বসেছি, তখনই মনে পড়েছে পুরোনো কথা। লালবাজারের স্পেশাল প্রোজেকশান রুমে বসে পুলিশ ভিডিওটা দেখেছি আমি। ছোট্ট সেই ঘরে আর কোনও দর্শক ছিল না। এখন বুঝতে পারছি, সেদিনই আমি অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের আসল কারণের আভাস পেয়েছিলাম। তখন আমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারিনি। ধরতে পারার কথাও নয়। এখন, এই মুহূর্তে, যেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট মনে হচ্ছে, তখন মোটেও তা মনে হয়নি। এই সহজ সরল

BanglaBook.org

ব্যাপারটা শুধু যে আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল তা নয়, কেউই এই সহজ জিনিসটা ধরতে পারেনি। আর এতেই বোঝা যায়, অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য কতটা গভীর।

পুলিশ ভিডিও

অমরাবতীর ঘটনা নিয়ে বেশ কয়েকটা ডকুমেন্টারি তোলা হয়েছে। সেগুলো টেলিভিশনে দেখানোও হয়েছে বহুবার। তাতে এই ভিডিও ফিল্মের নির্বাচিত কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ-লক্ষ দর্শক সেইসব তথ্যচিত্র দেখেছে। আমিও দেখেছি। সুতরাং তা থেকে যে হঠাৎ করে নতুন কিছু পাব এমন ভাবিনি। কিন্তু স্পেশাল প্রোজেকশান রুমে আয়েস করে বসে ছবিটা দেখতে-দেখতে মনে হল, এই ছবির তুলনা নেই। অমরাবতীর কৌতূহল জাগিয়ে তোলা পরিবেশ, বাতাবরণ কী সুন্দর ধরা পড়েছে এই অসাধারণ চলচ্চিত্রে! দেখে মনে হচ্ছে, একটা থমথমে অকুস্থল যেন কোনও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করছে।

দু-মাস আগে, ২৫ জুনের সকালে, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে লালবাজারের ফোটোগ্রাফি সেকশন ২৮ মিনিটের এই ছবি তুলেছে। খুনের ঘটনার ঘণ্টা তিনেক পরে, অর্থাৎ সকাল এগারোটা নাগাদ, ছবিটা তোলা হয়েছে। কপাল ভালো যে ছবিতে কোনও সাউন্ডট্র্যাক নেই। অবশ্য তার দরকারও ছিল না। অমরাবতীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেসব রগরগে রোমাঞ্চকর টিভি প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়েছে তাতে সাউন্ডট্র্যাকের ওপরে অত্যাচার কম হয়নি। এখানে শব্দের ছিটেফোঁটাও না থাকায় এই প্রথম বুঝতে পারলাম, নিস্তব্ধতা অমরাবতীর ঘটনার সঙ্গে কী অদ্ভুতভাবেই না খাপ খেয়ে গেছে! গ্রীষ্মের গনগনে রোদ, কোথাও-কোথাও গাছের ছায়া, সুইমিং পুল, ডাইভিং বোর্ডের কিনারায় অপেক্ষমাণ মাছরাঙা, বিলাসবহুল অট্টালিকা, নির্জন প্রমোদ-কানন, কৃত্রিম পাহাড়। প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, আবেগের এককণাও নেই কোথাও। যেন একটা হাই-টেক সায়েন্স পার্কের সার-সার ল্যাবরেটরি দেখানো হচ্ছে আমাদের। সেখানে কোনও মানুষ নেই। শুধুই যন্ত্র।

অমরাবতী এস্টেটে মোট দশটা বাড়ি। যদিও বাড়ি বললে সেগুলোকে অনেক খাটো করা হয়। তা ছাড়া, আছে রিক্রিয়েশান ক্লাব, জিমনেশিয়াম, সিনেমা হল। স্বাভাবিকভাবেই সিনেমা হলটা দশটা বাড়ির বাসিন্দা ও এস্টেটের নানা স্তরের কর্মচারীদের জন্যে। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন অমরাবতী এস্টেটে শুধু প্রাচুর্য আর বিলাসিতা। দুঃখ সেখানে ঢোকার অনুমতি পেত না কখনও। কিন্তু ২৫ জুনের ঘটনা সব ওলটপালট করে দিয়েছে।

ফিল্মটা শুরু হয়েছে এস্টেটের সদর দরজার গেট-হাউসের ছবি দিয়ে। একটি প্রাইভেট সিকিওরিটি কোম্পানি 'সেকটি কর্পোরেশন'-এর নাম ও লোগো দেখা যাচ্ছে ভিজিটর্স মাইক্রোফোনের পাশে। কিন্তু ছোট্ট জানলার পাশে যে-সিকিওরিটি গার্ড ২৪ ঘণ্টা ইউনিফর্ম পরে বসে থাকে তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

ক্যামেরার চোখ ঘুরে তাকাল একটা ডেলিভারি ভ্যানের দিকে। বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস এই ভ্যানটাই বয়ে নিয়ে আসে। গাড়িটা এখন মিহি ঘাসে-ছাওয়া জমি ঘেঁষে পার্ক করা রয়েছে। তার একটু দূরেই দেবদারু, সেগুন আর মেহগনি গাছ। অনেক খরচ আর আদর-যত্নে গড়ে তোলা কৃত্রিম জঙ্গল।

ভ্যানের ড্রাইভারের বয়েস ২৪-২৫ হবে। রোগা ফ্যাকাসে চেহারা। মাথায় বড় বড় চুল। সে বিরক্তভাবে তাকিয়ে আছে ঘাসে-ছাওয়া জমির দিকে। সেখানে অনেকগুলো গভীর ক্ষতের দাগ। মসৃণ নিখুঁত লন একেবারে শেষ হয়ে গেছে। একে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে কত খরচ পড়বে কে জানে! ড্রাইভারটি হয়তো সেই খরচের কথাই ভাবছে।

এই ড্রাইভারই প্রথম মৃতদেহটা দেখতে পেয়ে সবার আগে শোরগোল তোলে। সে জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে গিয়েছিল মিত্রদের বাড়িতে। সদর থেকে যে-বড়রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এস্টেটের ভেতরে চলে গেছে, তার ওপরে তিন নম্বর বাড়িটাই প্রকাশ মিত্রের।

ক্যামেরা ড্রাইভারকে ধরে স্থির হল। আনকোরা অভিনেতার মতো সে গেট-হাউসের দিকে এগিয়ে গেল। তার গলার কাছে একটা শিরা কাঁপছে। সে দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখাতেই ইউনিফর্ম পরা একজন কনস্টেবল বুলেটপ্রুফ কাচের দরজাটা খুলে দিল। তখনই অফিসের ভেতরটা দেখা গেল।

পাশাপাশি অনেকগুলো টেলিভিশন মনিটর বসানো রয়েছে। তার সব ক'টা পরদাতেই ঝিরিঝিরি তুষারকণা। অমরাবতী এস্টেটের নানা জায়গায় বসানো আছে গোপন টিভি ক্যামেরা। সেইসব ক্যামেরার ছবিই দেখা যায় এই টিভি মনিটরে। নিশ্চয়ই কেউ ক্যামেরা থেকে আসা সঙ্কেতবাহী কেবলগুলো কেটে দিয়েছে।

টিভি মনিটরের সারির ঠিক নীচেই একজন সিকিওরিটি গার্ড পড়ে আছে। এর পরিচয় জেনেছি। অফিসার অলকেশ হাজরা। পাশে রাখা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ানোর সময় পায়নি সে। টেলিফোনের কাটা তারটা পাশের টেবিল থেকে ঝুলছে তার মাথার কাছে।

অলকেশ হাজরার দু-হাত বাঁধা। বাঁশ আর দড়ি দিয়ে তৈরি এক জটিল জ্যামিতির ফাঁদে বন্দি সে। একটা স্প্রিং-লোড করা ইস্পাতের ক্যালিপার্স তার গলায় এঁটে বসেছে। দেখে মনে হচ্ছে, একঘেয়েমি কাটাতে সে অমরাবতী এস্টেটের আদুরে নাই-দেওয়া বাচ্চাগুলোর কারও জন্যে একটা খেলনা তৈরি করতে বসেছিল। তারপর হঠাৎই সেই খেলনার ফাঁদে জড়িয়ে গেছে।

খুনি সম্ভবত এই অদ্ভুত জটিল খেলনাটা আচমকা হাজরার গলায় বসিয়ে দিয়েছে। তারপর এর জোড়াফাঁস এঁটে বসেছে হাজরার গলায়, হাতে, পায়ে। যতই সে ছটফটিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করেছে ততই শক্ত আর মারাত্মক হয়েছে খেলনার ফাঁস। তারপর একসময় দমবন্ধ হয়ে সে মারা গেছে। অন্তত ওর গলার লালচে দাগগুলো সেইরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গেট-হাউস ছেড়ে ক্যামেরা এবার নুড়ি ঢালা বড়রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। এস্টেটের পরিভাষায় এই রাস্তাটার নাম 'অ্যাভিনিউ'। অ্যাভিনিউর দু-পাশে গাছের সারি।

BanglaBook.org

রাস্তা ঝকঝকে তকতকে। বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে চিনেঘাসের লন। আর দুটো বাড়ির মাঝের আড়াল তৈরি করেছে সুদৃশ্য গাছের দল ও বিমূর্ত আকারের পাথর-বসানো খাটো দেওয়াল। এলাকায় আলোর কোনও অভাব নেই। অভাব নেই বাতাসের। কারণ অমরাবতী এস্টেটে বাড়ি পিছু প্রায় দু-একর করে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

এস্টেটের সবকিছুই যেন অতি-নিখুঁত, অতি-সুন্দর। কোনওরকম অপরিচ্ছন্ন বা অগোছালো ব্যাপারের কোনও জায়গা নেই এখানে। একটা শুকনো ঝরাপাতাও এখানে নিশ্চিন্তে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। ১৩ জন ছেলেমেয়ে একসময় থাকত এই এস্টেটে। কিন্তু ওরা এখানে খেলাধুলো করছে, এই দৃশ্যটা এখন কল্পনা করতে বেশ কষ্ট হয়।

ভিডিও ক্যামেরা এবার চলে এল তিন নম্বর বাড়ির সামনে। অ্যাভিনিউ থেকে যে-পাকারাস্তা বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গেছে, তার একপাশে পার্ক করা রয়েছে গাঢ় নীলরঙের একটা মারুতি জেন ডিলাক্স। মিত্রদের গাড়ি। তার পিছনের সিটে বসে আছেন প্রকাশ মিত্র। বয়েস চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন। সফল ব্যবসায়ী। লাখপতি কি কোটিপতি। জনপ্রিয় রঙিন টিভি 'প্রকাশ' তাঁরই কোম্পানি 'প্রকাশ ইলেকট্রনিক্স'-এর তৈরি। পার্ক স্ট্রিটে হেড অফিস।

প্রকাশ মিত্র বাঁ-দিকের দরজার কোণে মাথা এলিয়ে বসে আছেন। স্টিরিও স্পিকারের ওপরে তাঁর কান সেঁটে আছে। যেন একান্ত মনোযোগে কোনও গান শোনার চেষ্টা করছেন—স্বর্গীয় গান। তাঁর চেহারা বেশ দশাসই। দেখে বোঝা যায়, মোটাসোটা হলেও তাঁর শরীরে শক্তি আছে। মানে, ছিল। কারণ, তাঁকে দু-বার বুকে গুলি করা হয়েছে। ক্ষতের চেহারা দেখে মনে হয়, ছোট ক্যালিবারের হ্যান্ডগান ব্যবহার করা হয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রকাশ মিত্রের পরনে প্যান্ট নেই। আর রক্তমাখা পায়ের ছাপ বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে গাড়ি পর্যন্ত। তা ছাড়া, তিনি যে স্নান সেরে নিয়েছেন সেটা তাঁর পরিপাটি চুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং আন্দাজ করা খুব শক্ত নয়, তাঁকে বাড়ির ভেতরই গুলি করা হয়েছে। হয়তো স্নান-টান সেরে ড্রেস করছিলেন, তখন। গুলি লাগার পর তিনি কোনওরকমে দোতলা থেকে একতলায় নেমে এসেছেন, তারপর গাড়িতে এসে বসেছেন। বোধহয় তাঁর আচ্ছন্ন চেতনা সেই অবস্থাতেও ভেবে নিয়েছিল, গাড়িতে উঠে তিনি রোজকার মতো পার্ক স্ট্রিটে হেড অফিসে যাবেন।

কিন্তু জেন ডিলাক্সটার কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ, প্রকাশ মিত্রের পরই তাঁর গাড়ির ড্রাইভারকে গুলি করা হয়েছে। সাদা ইউনিফর্ম পরা সুঠাম চেহারার এক প্রৌঢ়। মাথার চুল প্রায় সাদা। নাম সত্যেন রায়। বাড়ির দরজার পাশেই ফুলের বাগান। সেখানে ফুটে আছে গোলাপি রঙের লিলিফুল। তারই ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রায়। মাথার টুপিটা তখনও ডান হাতে ধরা।

ক্যামেরা কয়েক সেকেন্ড ধরে রায়কে দেখাল। তারপর রক্তমাখা পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

প্রকাশ মিত্র বেশ কয়েকবার হংকং আর সিঙ্গাপুরে গেছেন। কখনও ব্যবসার

BanglaBook.org

কাজে, কখনও বেড়াতে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েও গেছেন দু-তিনবার। ফলে প্রতিটি ঘরের বেশিরভাগ সাজগোজেই চিনে ছাপ। বিশাল মাপের চিনেমাটির ফুলদানির গায়ে ড্রাগনের ছবি। কালো কাঠের ওপরে কারুকাজ করা আসবাব। কয়েক জোড়া মিং ঘোড়া। নানা রঙের জেড পাথরের ছোট-বড় মূর্তি। আশ্চর্য! এইসব সাজগোজ এতটুকু নষ্ট হয়নি। একটি জিনিসও সরেনি তার জায়গা থেকে। অর্থাৎ, খুনিদের দেখে মিত্র পরিবারের কেউই অবাক হননি।

বাড়ির পরিচারিকা পার্বতী দাস বসবার ঘরে সোফাসেটের পাশে গুলি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে। বোঝাই যায়, নিত্যকার ঝাড়পোঁছের কাজের সময় বাধা পেয়েছে সে।

ক্যামেরা চলতে-চলতে ওপরতলার বাথরুমে খুঁজে পেল মিসেস মিত্রকে। বছর ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের সুন্দরী মহিলা। শাওয়ারের নীচে অসহায়ভাবে পড়ে আছেন। পাশের কাচের পার্টিশনের গায়ে তাঁর ডান হাতটা ঠেকে রয়েছে। হাতের মুঠোয় ধরা হলদে রঙের টুথব্রাশ।

মিত্রদের একমাত্র ছেলে দীপায়ন। ষোলো বছরের সেই ছেলেটির চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। ওর শোওয়ার ঘর, পড়ার ঘর স্বাভাবিক, পরিপাটি—এতটুকু এদিক-ওদিক হয়নি কোনও জিনিস। শুধু বাথরুমের টালির ওপরে ভেসে যাওয়া মায়ের রক্তে ওর জুতোর ছাপ চোখে পড়ছে। কিডন্যাপাররা ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে এটাই হয়তো দীপায়নের রেখে যাওয়া শেষ চিহ্ন।

নিরুত্তাপ নিষ্ঠুরভাবে এগিয়ে চলে ভিডিও ছবি। জেন ডিলাক্সে বসা প্রকাশ মিত্রকে ছেড়ে ক্যামেরা প্রশান্ত লন ধরে পৌঁছে যায় পরের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে। এক নম্বর বাড়ি। মালিক জিতেন্দ্র শর্মা ও অলকা শর্মা। দুজন কনস্টেবল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা সরে গেল। তখনই বিলাসী অন্দরমহল চোখে পড়ল।

জিতেন্দ্র শর্মা রিয়েল এস্টেট ডিলার ও প্রোমোটার। এ ছাড়া, 'শর্মা ইনভেস্টমেন্টস' নামের চিট ফান্ড কোম্পানির চেয়ারম্যান। স্ত্রী অলকা শর্মা ডাক্তার, ই-এন-টি স্পেশালিস্ট। সুতরাং বেপরোয়া খরচ করে ঘর সাজিয়েছেন দুজনে। কিন্তু এখানেও সেই একই ব্যাপার। আলমারির তালা কেউ ভাঙার চেষ্টা করেনি। কাচের ক্যাবিনেটে সাজানো কালার টিভি, ভিসিআর যেমন ছিল তেমনই আছে। অ্যাশট্রে, কাচের গ্লাস, ফুলদানি কিংবা শৌখিন কোনও জিনিস জায়গা থেকে নড়েনি, ভাঙেওনি।

ডাইনিং হলে ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন জিতেন্দ্র এবং অলকা। লম্বা ঝকঝকে টেবিলের দু-প্রান্তে দুজন। সামনে ব্রেকফাস্টের আয়োজন। না, খাওয়া শুরু করতে পারেননি। আততায়ীদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন তার আগেই। দুজনেরই মুখে বিস্ময়। ফ্রিজ শটের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁদের জীবন। তবে সামনে রাখা কাপ, প্লেট, ছুরি, কাঁটা-চামচ, টিপট—সবকিছুই অক্ষত। খাবারের ওপরে দু-একটা মাছি উড়ছে। দুধ, কর্ন ফ্লেক্স, ওমলেট, টোস্ট, স্যালাড, ওরা সবাই সাক্ষী এই মর্মান্তিক ঘটনার।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে হাজির ছিল আরও দুজন। বিন্দিয়া ও মালতী। জিতেন্দ্র শর্মার দুই মেয়ে। ওদের খাবার-দাবার, প্লেট, গ্লাস ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। ওরা বোধহয় মরিয়া হয়ে কিডন্যাপারদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

BanglaBook.org

ক্যামেরা আবার বিষণ্ণ ভ্রমণ শুরু করে। পৌঁছে যায় তৃতীয় বাড়িতে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক চিত্রশিল্পীর বাড়ি। কিন্তু এখানেও সেই একই দুঃস্বপ্নের ছবি। মৃত্যু দিয়ে গাঁথা এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত মালা। খুনির দল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় পৌঁছে গেছে এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়িতে। জুন মাসের সেই নির্জন শান্ত সকালে তারা একের পর এক খতম করেছে বাড়ির মালিকদের। তাদের ড্রাইভার, কর্মচারী, পরিচারিকা কেউই রেহাই পায়নি। তারপর কিডন্যাপ করেছে ১৩ জন ছেলেমেয়েকে। সেইদিন থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ১৩টি বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী।

কোনও বাড়িতে উষ্ণ বিছানায় গুলি করে খুন করা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীকে। কোথাও বাথরুমে ধারালো ছুরি দিয়ে। কোথাও বাথটাবে, ইলেকট্রিক শক ব্যবহার করে। অথবা গ্যারেজের দরজায় তাঁদেরই গাড়ি দিয়ে তাঁদের পিষে মারা হয়েছে। মোটামুটিভাবে ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩২ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে নৃশংসভাবে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে খুন করা হয়েছে। এ নিয়ে পুলিশ-বিভাগে কোনও বিতর্ক নেই।

অমরাবতী এস্টেটের পিছনের সীমান্তে ছিল আর একজন সিকিওরিটি অফিসার। তাকে খুন করা হয়েছে ক্রস-বো দিয়ে। একটি ইস্পাতের তীর তার যাবতীয় নিরাপত্তায় ইতি টেনে দিয়েছে।

ভিডিও ক্যাসেটের ছবি এখানেই শেষ হয়েছে।

একটা জিনিস আমাকে বেশ অবাক করল। ২৫ জুনের মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে অমরাবতীর যেন কোনও সম্পর্ক নেই। এতগুলো মৃত্যু সম্পর্কে এই বিলাস-আবাসন যেন নিস্পৃহ, উদাসীন। এর দশটি বাড়ির ধনকুবের মালিকরা গত হয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে অমরাবতীর গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। অতি সহজেই সে মালিকানা বদলের ঘটনাকে মেনে নিতে পারবে। এই হত্যাকাণ্ডের যদি কোনও সমাধান হয়—জানি না, আমি কিছু করতে পারব কি না—তাহলে এই বিলাসবহুল নিঝঝুম বাড়িগুলোয় আবার আসবে দশজন নতুন মালিক। বড়লোক মালিক।

স্পেশাল প্রোজেকশান রুম থেকে বাইরের জনবহুল করিডরে যখন বেরিয়ে এলাম তখন হঠাৎই গায়ে কাঁটা দিল। নতুন মালিকদের কথা ভেবে।

অমরাবতী এস্টেট

পুলিশের তোলা ভিডিও দেখার পর বেশ ক্লান্ত লাগছিল। আমি ফিরে এলাম 'ইন্সটিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি'-তে, নিজের অফিসে। সেখানে আরাম করে বসে অমরাবতীর ইতিহাসটা একটু খতিয়ে দেখলাম।

দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতায় ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস থেকে ৪ কিলোমিটার পুবে প্রায় ৩২ একর জমি নিয়ে তৈরি হয়েছে অমরাবতী এস্টেট। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে সারা ভারত জুড়েই এ-জাতীয় প্রমোদ আবাসন তৈরির একটা ঢেউ শুরু হয়। প্রকৃতির বুকে খোলামেলা জায়গা পেলেই প্রোমোটাররা তাদের কাজ শুরু করে দেয়। তারপর অঢেল টাকা ঢালার মতো বড়লোক খুঁজে পেতে কোনও কষ্ট হয় না।

BanglaBook.org

২০১৫ সালে কলকাতায় অমরাবতী এস্টেট তৈরির কাজ শেষ হয়। অমরাবতীর আগে কলকাতার মাত্র দুটো এরকম আবাসন তৈরি হয়েছিল। একটা ডায়মন্ডহারবারে, আর-একটা সোদপুরে। কিন্তু অমরাবতী সবার সেরা। দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর কলকাতা বা কলকাতা এয়ারপোর্ট—অমরাবতী থেকে কোনওটাই তেমন দূর নয়, অন্তত মোটরগাড়ির হিসেবে। লোকে বলে, অমরাবতী এস্টেট তৈরি করতে মোট খরচ হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। কিন্তু আমার ধারণা, তারও বেশি।

অমরাবতীর সীমানা বরাবর উঁচু পাঁচিল তোলা। তার ওপরে ইস্পাতের জাল। সেখানে বৈদ্যুতিক অ্যালার্ম লাগানো রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে অতন্দ্র গোপন ক্যামেরা। ২৫ জুনের মর্মান্তিক ঘটনার আগে এস্টেট ২৪ ঘন্টা পাহারা দিত ওয়ারলেস ইউনিট হাতে নিরাপত্তা প্রহরী। এস্টেটে ঢুকতে হলে আগেভাগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হত। আর বড়রাস্তা কিংবা ছোটরাস্তায় নজরদারির কাজ করত রিমোট কন্ট্রোলড় টিভি ক্যামেরা।

অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সঙ্গে জড়িত সব পুলিশ অফিসারই এককথায় স্বীকার করেছেন, এই দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডিঙিয়ে একদল খুনি কী করে যে ভেতরে ঢুকল তা স্রেফ বুদ্ধির বাইরে।

সন্দেহ নেই, অমরাবতীর ধনকুবেররা সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে কাজের জন্যে ড্রাইভার, মালি, চাকর, পরিচারিকা, রাঁধুনি ইত্যাদি ছিল। এইসব লোকদের অনেক কসরত করে বাছাই করা হয়েছিল। নিচুশ্রেণীর লোক হলেও এখানে থাকতে-থাকতে তারা উচ্চবিত্তদের খামখেয়ালি বিলাসী জীবনযাত্রার সঙ্গে ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছিল। তবে ভাবা যায়নি, অমরাবতীর বাসিন্দারা একেবারে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। আর তাঁদের কর্মচারীদের ভাগ্যও লেখা হয়ে যাবে একই রক্তের অক্ষরে।

অমরাবতীতে যাঁরা থাকতেন

এবার আমি নিহতদের তালিকার দিকে নজর দিলাম। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট অনেক পরিশ্রম করে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিয়ে অমরাবতীর বাসিন্দাদের ডোসিয়ার তৈরি করেছে। তাদের ধারণা, এই ডোসিয়ারের মধ্যে থেকেই অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে যেতে পারে কোনও নতুন সূত্র। ডোসিয়ারের মধ্যে রয়েছে ফটোগ্রাফ, বার্থ সার্টিফিকেট আর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটের কপি, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট; শেয়ার সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের মতামত, বিভিন্ন শংসাপত্র—আরও কত কী! এইসব কাগজ নাড়াচাড়া করতে-করতে মনে হচ্ছিল, দামি কতগুলো জীবনে কী নৃশংসভাবেই না ইতি টানা হয়েছে!

অমরাবতীর দশটি বাড়ির মালিক ও তাদের পরিবারের লোকজন সম্পর্কে একটা ছোট্ট লিস্ট আমি তৈরি করেছিলাম। বাড়ির নম্বর ধরে সাজানো সেই লিস্টটা এইরকম :

BanglaBook.org

১. জিতেন্দ্র শর্মা (৪৩), রিয়েল এস্টেট ডিলার, প্রোমোটার, 'শর্মা ইনভেস্টমেন্টস'-এর চেয়ারম্যান।
অলকা শর্মা (৪১), ই-এন-টি স্পেশালিস্ট, উল্টোডাঙা ভি. আই. পি. রোডের মোড়ে চেম্বার।
গুলিতে মারা গেছেন।
দুটি মেয়ে : বিন্দিয়া (১৬) ও মালতী (১৫)।

২. রত্নতকুমার (৪৭), আসল নাম রাজীব দত্তগুপ্ত, জনপ্রিয় চলচ্চিত্র-অভিনেতা, অমরাবতী রিক্রিয়েশান ক্লাবের সেক্রেটারি।
সুলতা দত্তগুপ্ত (৪২), ড্রেস ডিজাইনার।
গুলিতে মারা গেছেন।
একটি ছেলে : সুকান্ত (১৭)

৩. প্রকাশ মিত্র (৫২), 'প্রকাশ ইলেকট্রনিক্স'-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
নন্দিতা মিত্র (৪৭), নিউ মার্কেটের 'দ্য জয়েন্ট' নামের ফাস্ট ফুডের দোকানের মালিক।
গুলিতে মারা গেছেন।
একটি ছেলে : দীপায়ন (১৬)।

৪. নবীন মেহতা (৪৯), স্টকব্রোকার।
প্রিয়া মেহতা (৪৬), গৃহবধূ।
বৈদ্যুতিক শকে মারা গেছেন।
একটি ছেলে : বিজয় (১৩), একটি মেয়ে : রূপা (৮)।

৫. ডঃ যতীন প্রধান (৫৪), সাইকিয়াট্রিস্ট, চৌরঙ্গী রোডে 'দ্য কিওর' নার্সিংহোমের মালিক।
ডঃ অনিতা প্রধান (৪৮), সাইকিয়াট্রিস্ট, একই নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত।
গাড়িতে পিষে মারা গেছেন।
একটি ছেলে : সুনীল (১৭)।

৬. নিরঞ্জন গোস্বামী (৪৮), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী।
সুচরিতা গোস্বামী (৪২), চিত্রশিল্পী, 'দ্য ভল্কানো' নামের শিল্পীগোষ্ঠীর সেক্রেটারি।
গুলিতে মারা গেছেন।
কোনও ছেলেমেয়ে নেই।

৭. দীনেশ আগরওয়াল (৪৯), 'ডি টিভি'-র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
সুলোচনা আগরওয়াল (৪২), ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন নেটওয়ার্কের সংবাদ-

BanglaBook.org

পাঠিকা ছিলেন। এখন 'ডি টিভি'-র জনপ্রিয় উপস্থাপক।
শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।
একটি ছেলে : বিনোদ (১৫)।

৮. হীরক সেন (৩৮), 'সেন অ্যাসোসিয়েট্স' নামের এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসার মালিক। আগে রেসের জকি ছিলেন।
মল্লিকা সেন (৩৭), প্রখ্যাত ব্যালে নর্তকী। 'ডান্সিং কার্ভস' নামে নাচের স্কুল আছে গড়িয়াহাটে।
গুলিতে মারা গেছেন।
একটি ছেলে : অনির্বাণ (১৫), একটি মেয়ে : অয়িতা (১৪)।

৯. দুলালচন্দ্র বাগচি (৫৭), 'বাগচি মেডিকেল'-এর চেয়ারম্যান, 'ওমেগা হেল্থ ক্লাব'-এর মালিক।
সাধনা বাগচি (৫৪), গৃহবধূ।
গুলিতে মারা গেছেন।
একটি ছেলে : চন্দ্রনাথ (১৬)।

১০. সমরেন্দ্র দাশশর্মা (৪৬), 'সফ্ট ড্রিঙ্কস কর্পোরেশন'-এর চেয়ারম্যান।
নমিতা দাশশর্মা (৪৬), 'শি ফ্যাশন্স'-এর মালিক।
ক্রস-বো-র তীরে মারা গেছেন।
একটি ছেলে : শুভ্র (১৬), একটি মেয়ে : সোমলতা (১৫)।

নিহত মানুষদের ইতিহাস নিয়ে এ দু-মাসে কম গবেষণা হয়নি। কিন্তু তাতে এমন কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি যাতে এই ধরনের পাইকারি হত্যালীলার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

২৫ জুনের দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন অমরাবতীর কর্মচারীদের অনেকেরই ছিল ছুটির দিন। ফলে, সৌভাগ্যবশত, পরে তাদের কাছ থেকে দশটি পরিবার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তারাই জানিয়েছে, দশটি পরিবারের মালিক ও মালকিনরা অত্যন্ত দায়িত্ববান ছিলেন। তাঁদের পারিবারিক জীবনে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। ছেলেমেয়েদের তাঁরা ভীষণ ভালোবাসতেন, এমনকী মাঝে-মাঝে বাড়াবাড়িরকম আশকারাও দিতেন।

অমরাবতী এস্টেটের ১৩ জন ছেলেমেয়ে সল্টলেকের একটি প্রাইভেট স্কুলে পড়াশোনা করত। সেই স্কুল শুধুমাত্র ওদের জন্যেই তৈরি। স্কুলে পড়ানোর জন্যে যেমন উঁচুদরের শিক্ষক-শিক্ষিকা রাখা হয়েছিল, তেমনই উঁচুদরের ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এস্টেটের মধ্যেই স্কুলটা হয়তো রাখা যেত, কিন্তু মনোবিদ্‌দের পরামর্শে স্কুল ও নার্সিংহোম এস্টেটের বাইরে করা হয়েছিল। এতে নাকি ছেলেমেয়েরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারবে।

BanglaBook.org

স্কুলের নিয়মিত পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে জানা গেছে ওরা পড়াশোনায় বেশ ভালো, আর বাড়ির জন্যে কোনওরকম মানসিক চাপ ওদের ছিল না। তা ছাড়া, ওদের বাবা-মা যথেষ্ট ব্যস্ত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের অনেক সময় দিতেন। এর জন্যে তাঁদের নিজেদের শখ-আহ্লাদ বেশ কিছুটা বিসর্জন দিতে হত।

রিক্রিয়েশান ক্লাবের হই-হুল্লোড়, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, লেকে নৌকো চালানো, ব্রিজ কম্পিটিশান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স মডেলিং—এইরকম সব খেলাধুলোতেই বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেতে উঠতেন। সোজা কথায়, তাঁরা মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন, ওদের জন্যে সুখের জীবন, পরিপূর্ণ জীবন গড়ে উঠুক। অথচ তাঁদের সেই সাধ অপূর্ণ থেকে গেল।

হত্যাকাণ্ড বড় মর্মান্তিক।

কর্মচারীদের মধ্যে যারা খুন হয়েছে

অমরাবতী এস্টেটের দশটি বাড়ির বাসিন্দা ছাড়া বেশ কয়েকজন কর্মচারীও খুন হয়েছিল ২৫ জুন। তারা হল :

মিসেস পার্বতী দাস, মিসেস জয়সওয়াল, মিস আইভি সামন্ত—পরিচারিকা।
হরিগোপাল দত্ত, মহাবীর মিশ্র, সত্যেন রায়—ড্রাইভার।
নীলাঞ্জনা সেন চৌধুরী—নাচের দিদিমণি।
সঙ্ঘমিত্রা রায়—গানের দিদিমণি।
অজিতেশ সরকার, বিক্রম শাহ্—গৃহশিক্ষক।
অলকেশ হাজরা, সোমনাথ ঘোষ—সিকিওরিটি গার্ড।

অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের চুলচেরা তদন্তে জানা গেছে, ২৫ জুন আনুমানিক সকাল ৮টা ২৩ মিনিটে যে-হত্যালীলা শুরু হয় তাতে এস্টেটের প্রাপ্তবয়স্ক কোনও মানুষই রেহাই পায়নি। মাত্র আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৩২ জন খুন হওয়ায় মোটামুটিভাবে বলা যায়, গড়ে একমিনিটে একজন করে খতম হয়েছে খুনিদের হাতে।

যারা হারিয়ে গেল

১৩ জন বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরীর ফটো আমি দেখেছি। ফুলের মতো ফুটফুটে সব নিষ্পাপ শিশু। ওদের বয়েস, আগেই লিখেছি, ৮ থেকে ১৭-র মধ্যে। কিন্তু ওদের ফটো দেখে 'শিশু' ছাড়া অন্য কোনও শব্দ মাথায় আসে না। ফটোগ্রাফে ওদের কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুলের পোশাকে আর কেউ-বা ছুটির দিনে হই-হুল্লোড়ে ব্যস্ত।

ওদের হদিশ পাওয়ার জন্যে সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছে। এমনকী ওদের চিকিৎসার ইতিহাস, রক্তের গ্রুপ, দাঁতের অবস্থা ইত্যাদি পর্যন্ত খতিয়ে দেখা হয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

BanglaBook.org

১৩ জনের মধ্যে চারজন ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ খাচ্ছিল। সামান্য সর্দি-কাশি, ঘুষঘুষে জ্বর আর চোখের পাওয়ারের জন্যে। আর-একজন, সুনীল প্রধান (১৭), মানসিক চিকিৎসাধীন ছিল। তার কারণ অবশ্য তেমন গুরুতর নয় ঃ সে এখনও বিছানা ভিজিয়ে ফেলে।

ডাক্তারদের অতি-উৎসাহের শিকার হয়ে নিয়মিত ওষুধপত্র ওরা খাচ্ছিল বটে, কিন্তু জবানবন্দিতে তাঁরাই স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ১৩ জন ছেলেমেয়ের পুষ্টির কোনও অভাব ছিল না। আর ওদের স্বাস্থ্যও যথেষ্ট ভালো ছিল।

অকুস্থলে ঘষটানোর দাগ, রক্তমাখা হাতের ছাপ, জুতোর ছাপ যথেচ্ছ পাওয়া গেছে। হারানো ছেলেমেয়েদের জুতোর মাপের সঙ্গে সেই ছাপ মিলে যাওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায়, মা-বাবাদের যখন নৃশংসভাবে খুন করা হয়, তখন প্রায় সব ছেলেমেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির ছিল। ওদের চোখের সামনেই ঘটেছে মর্মান্তিক ঘটনা। কিন্তু কোথাও ওদের রক্তের দাগ পাওয়া যায়নি। আর এ-ও মনে হয়নি, ওদের কোনও ক্ষতি করা হয়েছে।

ফাইলগুলো বন্ধ করে রাখলাম। কেন জানি না, ওই নিষ্পাপ ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে আমার মন কেমন করে উঠল। হে ভগবান, ওরা যেন বেঁচে থাকে, ভালো থাকে!

খুনিদের মাথায় সেদিন চাপ ছিল। তারই মধ্যে অত্যন্ত জটিল অভিনব ঢঙে ধনকুবের মানুষগুলোকে কোতল করেছে তারা। অথচ ভয়ে-আতঙ্কে পাগল হয়ে চিৎকার করা একদঙ্গল ছেলেমেয়ের গায়ে তারা আঁচড় পর্যন্ত কাটেনি—শিশুহত্যার ব্যাপারে তারা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিল। তাতেই মনে হয়, যতই দুরাশা হোক না কেন, ছেলেমেয়েগুলো এখনও হয়তো বেঁচে আছে। তবে ওরা কী অবস্থায় আছে কে জানে!

অমরাবতী হত্যাকাণ্ড ঃ বিভিন্ন থিওরি

অনেকক্ষণ ধরে বীভৎসভাবে খুন-হওয়া মানুষগুলোকে নিয়ে আমার সময় কেটেছে। তারপর কিডন্যাপ-হওয়া ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়েও অনেক মাথা ঘামিয়েছি। আমার মাথা ভার লাগছিল। গা গুলিয়ে উঠতে চাইছিল বারবার। সেক্রেটারি-সাহেবের মন্তব্য মনে পড়ে গেল। প্রত্যেক মানুষেরই হজম করার একটা সীমা থাকে। আমারও আছে। কিন্তু কোনও কাজে হাত দিলে আমি সেটা খতম না করে পারি না। খুনিদের মতো আমারও বোধহয় একটা 'কিলার ইন্সটিংক্ট' কাজ করে। কে জানে!

লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ও সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশান ডিভিশন অমরাবতী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করে যেসব থিওরি দিয়েছে এবার সেগুলো দেখতে শুরু করলাম।

১. পাগল খুনির কীর্তি

দত্তভিলার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, দত্তভিলার খুনি পরমেশ হালদারের

BanglaBook.org

কথা। এ ছাড়া, ২৫ বছর আগের একজন খুনির কথাও মনে পড়ছে। স্টোনম্যান। সেই পাগল খুনি ধরা পড়েনি। তবে পরমেশ হালদার ধরা পড়েছিল। অপরাধের কথা স্বীকারও করেছে সে।

শুধু এখানে কেন, পৃথিবীর কোথায় না এ-ধরনের পাগল খুনিরা দেখা দিয়েছে। সেই ১৮৮৮ সালে লন্ডনে জ্যাক দ্য রিপার দিয়ে শুরু। তারপর মাঝে-মাঝেই তাদের দেখা মিলেছে।

উন্মাদ সাইকোপ্যাথরা যখন এরকমভাবে খুন করে তখন সেইসব খুনের কোনও মোটিভ থাকে না। হয়তো অমরাবতীতেও এরকম কোনও কাণ্ড হয়েছে। কিন্তু সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে খুনিকে নিশ্চয়ই কম্যান্ডো ট্রেনিং নিতে হয়েছে। তা নইলে কারও পক্ষে কি গলা টিপে, ক্রস-বো চালিয়ে, গুলি চালিয়ে, ইলেকট্রিক শক দিয়ে, গাড়িতে পিষে আধঘণ্টার মধ্যে ৩২ জন শক্তসমর্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে খুন করা সম্ভব—তা সে যতই পাগল হোক না কেন! তার ওপর আবার ১৩ জন ছেলেমেয়েকে একজোট করে কিডন্যাপ করার ব্যাপার থাকছে। কোনও গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এতগুলো ছেলেমেয়েকে দু-মাস ধরে আটকে রাখাটাও তো খুব সোজা ব্যাপার নয়!

মন্তব্য : *হীরক সেনের বাড়িতে একটা চুরমার হওয়া ভিসিআর পাওয়া গিয়েছিল। তাতে সকালের একটা টিভি প্রোগাম রেকর্ড করা হচ্ছিল। সেই ভিসিআর-এর মেমোরি থেকে দুর্ঘটনার একটা সময় পাওয়া গেছে। আবার গ্যারেজের দরজায় গাড়িতে পিষে যখন ডক্টর যতীন প্রধান ও ডক্টর অনিতা প্রধানকে খুন করা হয় তখন তাঁদের গাড়ির ডিজিটাল ক্লক বন্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকে পাওয়া সময় দেখে বোঝা গেছে দুটো খুনের ঘটনার মধ্যে বড়জোর মাত্র দশ মিনিটের তফাত ছিল। মানে, বলতে গেলে, প্রায় একই সঙ্গে ঘটনা দুটো ঘটেছে। তা ছাড়া, বেশ কয়েকজনকে খোলা জায়গায় গুলি করে মারা হয়েছে। সেই আওয়াজ পেয়ে অন্যান্যরা কেন যে প্রাণভয়ে এস্টেট ছেড়ে পালাননি তা রীতিমতো রহস্যময়। সুতরাং একজন লোকের পক্ষে কি এ-কাজ করা সম্ভব?*

২. একদল সাইকোপ্যাথের কাণ্ড

এটা, বলতে গেলে, প্রথম থিওরিরই পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রথম থিওরিতে যেসব ফাঁক-ফোকর আছে, এই থিওরি তার বেশ কয়েকটার ব্যাখ্যা দিতে পারছে। এটা কি সম্ভব যে, একদল পরমেশ হালদার—অন্তত পাঁচ-ছ'জন—সাত জনের আক্রোশ নিয়ে নেশাগ্রস্ত বেহেড অবস্থায় ঢুকে পড়েছে বড়লোকদের অমৃতলোকে? তারপর সিকিওরিটি গার্ডরা যেই তাদের চ্যালেঞ্জ করেছে অমনি তারা খুনের খেলায় মেতে উঠেছে।

মন্তব্য : *তদন্তকারী দলের প্রত্যেকেই একমত হয়েছেন যে, অন্তত আধডজনের বেশি লোক এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকা উচিত। তাঁদের স্পষ্ট মত হল, খুনিদের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ থেকে ১২ জন। হত্যাকাণ্ডের পেশাদারি দক্ষতা দেখে মনে হয়, একদল সাইকোপ্যাথ এরকম নির্দিষ্ট ছকে খুনের কাজ শেষ করতে পারবে না। তাদের কাণ্ড হলে অনেক এলোমেলো ব্যাপার থাকত। তা ছাড়া, কাউকেই ভয়ঙ্কর কষ্ট দিয়ে তিলে-তিলে মারা হয়নি। সাইকোপ্যাথরা দায়ী হলে এরকম এক-*

BanglaBook.org

আধটা খুন চোখে পড়ত। সব মিলিয়ে এটুকু বলা যায়, অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের পিছনে ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনা কাজ করেছে।

৩. সামরিক-বাহিনীর ভুলের মাশুল

এই কষ্টকল্পিত থিওরির জন্যে মোটেই পুলিশ দায়ী নয়। এই উদ্ভট সম্ভাবনার কথা প্রথম বেরোয় 'সান্ধ্য দর্পণ' পত্রিকায়। তারপর পত্রিকার জনপ্রিয়তা এই থিওরিকে পৌঁছে দেয় বিধানসভায়। কয়েক দশক ধরেই উগ্রপন্থী দমনের জন্যে সামরিক বাহিনীকে আইনি-বেআইনি সবরকমভাবেই কাজে লাগানো হচ্ছে। সেই কারণেই এই থিওরি রাজনৈতিক মদত পেয়েছে। নেতাদের ধারণা, উগ্রপন্থী দমনের জন্যে পাঠানো কোনও মিলিটারি অপারেশান টার্গেট ভুল করে অমরাবতীতে এসে হাজির হয় এবং নির্বিচারে বাসিন্দাদের হত্যা করে। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে তারা খতম করেনি নেহাতই দয়াপরবশ হয়ে। কিন্তু অপারেশান 'সম্পূর্ণ' করার জন্যে ওদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। এই অপারেশানে পঞ্জাব পুলিশের হাত থাকলেও থাকতে পারে।

মন্তব্য : সামরিক বাহিনীর উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত খোঁজ নিয়েও এই থিওরির সমর্থনে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, অমরাবতী এস্টেটের সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে কোনও মিলিটারি গাড়ি, অস্ত্র, বুলেট, চাকার দাগ, বুটের ছাপ কিছুই পাওয়া যায়নি।

৪. রাজনৈতিক খুন : বিদেশি রাষ্ট্রের পরোক্ষ হাত

অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের গুরুত্ব, খুন-হওয়া লোকের সংখ্যা আর একদল ছেলেমেয়েকে চুপিসাড়ে উধাও করে দেওয়া—সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে তাতে এর পিছনে বিদেশি রাষ্ট্রের হাত থাকা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে, এই কাজে অর্থবল, লোকবল আর বুদ্ধি যথেষ্ট মাত্রায় খরচ করা হয়েছে বলে মনে হয়। এ-কাজের পিছনে কোনও কূটনৈতিক স্বার্থ লুকিয়ে নেই তো? নিহতদের বেশ কয়েকজন এমন পদে ছিলেন যাতে বিদেশে যাওয়া, বিদেশি সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা তাঁদের কাছে খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। এইসব যোগসূত্র ধরেই কোনও মোটিভ তৈরি হয়েছে কি না কে বলতে পারে!

মন্তব্য : চুলচেরা তদন্তে জানা গেছে, অমরাবতী এস্টেটের কেউই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁদের মৃত্যুতে প্রায় সবকটা রাজনৈতিক দলই পূর্ণ তদন্তের জোরালো দাবি জানিয়েছে।

BanglaBook.org

৫. উগ্রপন্থীদের কীর্তি

বুলেটের ব্যালিস্টিক অ্যানালিসিস থেকে কোনও-কোনও মহলের এরকম ধারণা হয়েছে যে, এই ঘটনার জন্যে উগ্রপন্থীরা দায়ী। তা ছাড়া, খুনের বিচিত্র পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী দলের কথাও ভাবতে বাধ্য করেছে। আজ থেকে পাঁচ দশক আগে পশ্চিমবঙ্গে

যে-নকশালপন্থী আন্দোলন হয়েছিল, কেউ-কেউ ভাবছেন সেই আন্দোলনই আবার নতুন চেহারায় নতুন মাত্রা নিয়ে মাথাচাড়া দিল না তো! খুন হওয়া বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে শেষের সম্ভাবনাটা অনেকেরই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিহত দশজন কর্মচারীর হিসেবটাকে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। তা ছাড়া, উগ্রপন্থীরা যদি এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ীও হয়, তা হলে ১৩ জন ছেলেমেয়েকে তারা কিডন্যাপ করবে কেন? গত দু-মাসে ওদের মুক্তির জন্যে মুক্তিপণও কেউ দাবি করেনি। আর দশটি বাড়ির মালিক-মালকিন সকলেই যখন নিহত তখন মুক্তিপণ মেটাবেই বা কে? সুতরাং 'উগ্রপন্থী থিওরি' খুব একটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

৬. মাফিয়া দলের কাজ

গত এক দশকে সারা ভারতে মাফিয়া দলের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। এইসব দল পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের অনেকটাই এদের কবলে চলে গেছে। তা ছাড়া, ড্রাগ চোরাচালানের যে-জাল সারা ভারতে বিছিয়ে আছে তারও কলকাঠি এদেরই হাতে। অস্ত্রশস্ত্র পাচারের কাজেও এরা থেমে নেই। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, অমরাবতীর বাসিন্দাদের কেউই ড্রাগ কিংবা চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন না। তবে ভারতের নানা শিল্পাঞ্চলে তাঁদের কয়েকজনের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বলা যায় না, তা থেকেই হয়তো কোনও শত্রুতার সূত্রপাত হয়েছে। আর সেই কারণে মাফিয়া দল নৃশংস প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে দশজনের সঙ্গে শত্রুতা হওয়াটা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি কয়েকজনের সঙ্গে শত্রুতার জন্যে পাইকারি হারে ৩২ জনকে খতম করে দেওয়াটাও এইরকম অস্বাভাবিক। তবে এ-কথা মানতেই হবে, এতবড় অপারেশান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে একমাত্র মাফিয়ারাই পারে। আর প্রতিশোধের জ্বালায় পাগল হয়ে তারা হয়তো ১৩ জন ছেলেমেয়েকে কিডন্যাপ করেছে। তাই যদি হয়, তা হলে তারা নিশ্চয়ই এতদিনে আর বেঁচে নেই।

৭. বাবা-মায়েরা খুনের জন্যে দায়ী

এমনটা কি হতে পারে, দশটি বাড়ির মালিক-মালকিনদের একজন বা কয়েকজন এই খুনের জন্যে দায়ী? তারপর তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন? এর মোটিভ অনেকরকম হতে পারে। যেমন, পেশাগত ঈর্ষা, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, কিংবা বিকৃত মানসিকতা। এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে হতচকিত হয়ে ছেলেমেয়েগুলো হয়তো অমরাবতী এস্টেট ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু কোথায় পালাবে ওরা? অমরাবতীর বাসিন্দাদের অন্যান্য জায়গাতেও সম্পত্তি রয়েছে। কলকাতার বাইরে গ্রামে-গঞ্জে কত জায়গায় যে ওঁদের বাংলো-বাড়ি, বাগান-বাড়ি এসব রয়েছে তার সঠিক খবর ওঁরা ছাড়া আর কেউ জানে না। বাচ্চাগুলো হয়তো সেরকম কোনও একটা বাগান-বাড়িতে গিয়েই আশ্রয় নিয়েছে। এখনও শক কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলেই ওরা এখনও সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার।

BanglaBook.org

অমরাবতী এস্টেটে রিক্রিয়েশান ক্লাব, জিমনাশিয়াম, সিনেমা হল এসব থাকা সত্ত্বেও দশটি বাড়ির বাবা-মায়েরা কেউ কারও বাড়িতে কখনও বেড়াতে, চা খেতে বা গল্প করতে যেতেন না। তাঁদের মেলামেশা যা কিছু হত সবটাই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে, আর বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের স্বার্থে বা আবদারেই তাঁরা সেই মেলামেশা করতেন। ফলে তাঁদের সম্পর্ক ছিল সাধারণ পরিচিতের মতো। বাড়ির কর্মচারীরা পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে বলেছে, অমরাবতী এস্টেট তৈরি হওয়ার পর এই তিন বছরে তারা একটিও ব্যভিচারের ঘটনা দেখেনি। যদি বা সেরকম কিছু হয়ে থাকে তা হলে সেটা হয়েছে এস্টেটের বাইরের কোনও পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে। দশটি বাড়ির স্বামী-স্ত্রীরা যেন নিজেদের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি সই করেছিলেন। আশ্চর্য! অমরাবতী এস্টেটের ডিজাইনের মধ্যে কেউ যেন সমাজবিজ্ঞানের আদর্শ তত্ত্ব অত্যন্ত যত্ন করে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

৮. কর্মচারীদের কীর্তি

অমরাবতীর যেসব কর্মচারী ২৫ জুন ছুটিতে ছিল এই হত্যাকাণ্ড তাদের কীর্তি নয়তো? মালিক আর মালকিনদের ওপরে শোধ নিতে ড্রাইভার, পরিচারিকা, রাঁধুনি, গৃহশিক্ষক— এরা সবাই মিলে এই জঘন্য কাজ করেনি তো! ২৫ জুনের ঘটনার কথা শুনেই এক বুড়ো মালি হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। সে ছাড়া বাকি আর সকলকেই পুলিশ জেরায়-জেরায় একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। কিন্তু মালিকদের ওপরে ক্ষোভ দেখানো তো দূরের কথা, বরং ওরা প্রত্যেকেই পঞ্চমুখে কর্তা-গিন্নিদের প্রশংসা করেছে। তাঁদের কাছে কাজ করে ওরা যে ভীষণ সুখে ছিল, এ নিয়ে কারওরই এতটুকু সন্দেহ নেই।

৯. উদ্ভট কয়েকটি তত্ত্ব

সব খিঁচুড়ি এখনও শেষ হয়নি। নেমন্তন্ন বাড়ির শেষ পদ হিসেবে চাটনির মতো এখানেও কয়েকটি উদ্ভট তত্ত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১. অমরাবতীর সকলেই কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের গুপ্তচর ছিলেন। কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁদের আদেশ দেওয়া হয়, 'তোমরা পরস্পরকে খুন করো', আর সকলের চোখের আড়ালে বাচ্চাগুলোকে পাচার করে দেওয়া হয় সেই বিদেশি রাষ্ট্রে।

২. পরীক্ষামূলক কোনও নার্ভ-গ্যাস প্রোজেক্টাইল আকাশ থেকে ফেলা হয় অমরাবতীর কাছাকাছি এলাকায়। সেই গ্যাসের প্রকোপে একদল মানুষ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় খ্যাপা কুকুরের মতো তারা ঢুকে পড়ে অমরাবতী এস্টেটে, নির্বিচারে বাসিন্দাদের খুন করে। বাচ্চাগুলোকেও খতম করে তারা ওদের সব চিহ্ন মুছে ফেলে। তারপর গ্যাসের প্রভাব কেটে গেলে তারা রেট্রো-অ্যাকটিভ অ্যামনেজিয়ার শিকার হয়ে হত্যাকাণ্ডের সব ঘটনা বেমালুম ভুলে যায়। এবং সবশেষে ফিরে যায় তাদের রোজকার স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু নার্ভ-গ্যাস প্রোজেক্টাইলটা

BanglaBook.org

কারা ফেলতে পারে সেটা ঠিকমতো আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

৩. ভিনগ্রহের কোনও মহাকাশযান অমরাবতীতে এসে নেমেছিল। ভিনগ্রহীরা প্রাপ্তবয়স্কদের খুন করে বাচ্চাদের 'নমুনা' হিসেবে নিয়ে গেছে নিজেদের গ্রহে।

৪. ধর্ম-উন্মাদ কোনও গোষ্ঠী অমরাবতীর সবাইকে খুন করে ছেলেমেয়েদের লোপাট করেছে। এর ফলে দুটো সুবিধে হতে পারে : এক, ছেলেমেয়েগুলো অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে; দুই, মগজ ধোলাই করে ওদের অনায়াসে সেই গোষ্ঠীর সদস্য করে নেওয়া যাবে। তখন ওদের সম্পত্তি সেই গোষ্ঠীর হাতে চলে যাবে।

৫. ছেলেমেয়েরাই হঠাৎ খেপে গিয়ে তাদের বাবা-মাকে খুন করেছে।

এই তালিকায় চোখ বোলানোর পর আমার মনে হল, থিওরিগুলো যেমন অভিনব তেমনই বহুমুখী। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আর উদ্ভট থিওরির নানা অংশে চোখ বোলাতে-বোলাতে আমার আরব্য রজনীর গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। মানুষের কল্পনাবিলাসিতার ধার এতটুকুও ক্ষয়ে যায়নি। কিন্তু এটা ঠিকই যে, আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটেছে অমরাবতী এস্টেটে। অপরাধের ইতিহাসে এরকম কোনও উদাহরণ আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং, এই অদ্ভুত ঘটনার সূত্র খুঁজে পেতে হলে আমাকে যেতে হবে অমরাবতী এস্টেটে। নিজের চোখে দেখতে হবে সবকিছু।

২৯ আগস্ট, ২০১৮ : অমরাবতী দর্শন

অমরাবতী দর্শনের কাজটা যতটা ঝামেলার ভেবেছিলাম, দেখা গেল, ব্যাপারটা তারচেয়েও ঢের বেশি ঝঞ্ঝাটের। ২৫ জুনের ঘটনার পর দুটো মাস কেটে গেছে, কিন্তু জনতার আগ্রহে দেখলাম এতটুকু ভাটা পড়েনি। বরং তা যেন সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়েছে। এর জন্যে দায়ী খবরের কাগজগুলো আর দুনিয়ার রগরগে টিভি প্রোগ্রাম। এ ছাড়া, 'নিউজট্র্যাক' ভিডিও ম্যাগাজিন স্পেশাল এডিশন ক্যাসেট বের করেছে অমরাবতী এস্টেটের ব্যাপার নিয়ে। আবার গতকাল রাতে মেট্রো চ্যানেলের 'অনুসন্ধান' প্রোগ্রামে তো পরিষ্কার বলেই দিল, অমরাবতীর ব্যাপারটা বিক্ষুব্ধ বেকার যুবকদের বেপরোয়া কাণ্ড। দু-বেলা যারা ঠিকমতো খেতে পায় না তারা অমরাবতীর 'ভয়ঙ্কর' বড়লোকদের দেখে যে জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলবে সে আর অসম্ভব কী।

কষ্টকল্পিত হয়তো, তবে অমরাবতী এস্টেটের বাইরে বিশাল জনতার ভিড় দেখে আমারই কেমন সন্দেহ হল, সত্যিই কি এই বেকার যুবক থিওরি কষ্টকল্পিত!

অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বহু মানুষকেই কৌতূহলী করে তুলেছে। ধাপা অঞ্চলের বস্তিবাসী থেকে শুরু করে কলকাতার উঁচুতলার মানুষরা পর্যন্ত নিয়মিত ভিড় জমাচ্ছে অমরাবতীকে ঘিরে। এমনিতেই অমরাবতী একটা দর্শনীয় জায়গা। তার ওপর এই গণহত্যার ঘটনা তাকে প্রায় দশগুণ বেশি দর্শনীয় করে তুলেছে।

BanglaBook.org

এস্টেটের গেটের মুখে চওড়া রাস্তায় প্রায় শ'দুয়েক লোকের জটলা। কারও হাতে বাইনোকুলার, কারও হাতে ক্যামেরা আর কারও বা হাতে ভিডিও ক্যামেরা। রাস্তার দু-ধারে বড়-বড় দেবদারু গাছ। সেখানেও দেখি কিছু লোক চড়ে বসে আছে—গলা লম্বা করে ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করছে।

গোটা অমরাবতীকে ঘিরেই দিন-রাত পুলিশ পাহারা রয়েছে। তবে গেটের কাছটায় পুলিশি তৎপরতা অনেক জোরদার। লাঠি হাতে কনস্টেবল ছাড়াও বেশ কয়েকজন সার্জেন্টকে দেখা গেল এপাশ-ওপাশ পায়চারি করছে, উৎসাহী দর্শকদের উৎসাহ স্তিমিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

এই ভিড় সরিয়ে খুব ধীরে-ধীরে গাড়িটা এস্টেটের গেটের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎই এক তরুণ স্বাস্থ্যবান কর্তব্যপরায়ণ কনস্টেবল সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল আমার গাড়ির বনেটে। আমি গাড়ি থামিয়ে বিরক্তভাবে আমার ফাইল থেকে 'স্পেশাল পারমিশন'-এর কাগজপত্র বের করে তাকে দেখালাম। কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট নয়। অতএব কী করব ভাবছি, এমনসময় সার্জেন্ট শিকদার নামের এক ভদ্র তরুণ অফিসার এগিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করল। তাকে আমার পরিচয় দিলাম।

সার্জেন্ট শিকদারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সে অমরাবতীর ঘটনার বেশ খুঁটিনাটি খবর রাখে। ১ জুলাই থেকে সে এখানে আছে। তাকে আপাতত এই এস্টেটেই পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। এখানে তার শক্তির শতকরা নব্বইভাগই খরচ করতে হচ্ছে রোজকার উৎসাহী দর্শকদের সামলে রাখতে। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ষোলো আনা আগ্রহ থাকলেও তাকে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হচ্ছে।

গেট-হাউসের কাছে গাড়ি পার্ক করে নামার সময় লক্ষ করলাম, অমরাবতী এস্টেটের ক্লোজড সার্কিট টিভি সিস্টেম পুলিশ দিব্যি ব্যবহার করছে। বুঝলাম, খুনিদের কেটে দেওয়া কেবল মেরামত করে নেওয়া হয়েছে। নিহত সিকিওরিটি গার্ড অলকেশ হাজরার চেয়ারে বসে আছে একজন অফিসার, মনোযোগ দিয়ে মনিটরের ছবি দেখছে। সার্জেন্ট শিকদার আমাকে জানাল, অলকেশ হাজরাকে যে বিচিত্র ফাঁস দিয়ে খুন করা হয়েছে সেরকম ফাঁস নাকি গেরিলা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়।

মনিটরের ছবিতে রাস্তা, লন, গাড়ি-বারান্দা এসব দেখতে-দেখতে আমার পুলিশ ভিডিওটার কথা মনে পড়ে গেল। নুড়ি ঢালা রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করতেই মনে হল, এই বুঝি মারুতি জেন ডিলাক্স গাড়িটা দেখতে পাব আমি। আর চোখে পড়বে তার পিছনের সিটে এলিয়ে থাকা প্রকাশ মিত্রের দেহ।

কিন্তু না। সৌভাগ্যই বলতে হবে, তদন্তকারী ফোরেনসিক দল সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ একেবারে লেপে-পুঁছে মুছে ফেলেছে। খুনের প্রত্যেকটি নৃশংস চিহ্ন তারা নিশ্চিহ্ন করেছে পরম যত্নে। জানলার ভাঙা কাচ পালটে দেওয়া হয়েছে, রক্তের দাগ মুছে ফেলা হয়েছে কেমিক্যাল দিয়ে, দেওয়ালে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন বুজিয়ে ফেলা হয়েছে সিমেন্ট দিয়ে—তারপর রঙ করে দেওয়া হয়েছে। নিহত দশটি পরিবারের আত্মীয়দের নির্দেশে (অবশ্যই এর মধ্যে সলিসিটররা জড়িত ছিলেন) লনগুলো পর্যন্ত নিখুঁত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এস্টেটের মধ্যে আয়েসী পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমি। আমার বিশ পা

BanglaBook.org

পিছনে নির্লিপ্ত মুখে সার্জেন্ট শিকদার। মনে হচ্ছিল, আমি যেন অমরাবতীতে বাড়ি কেনার জন্যে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখতে এসেছি। শহরের কলরোল আর ঝঞ্ঝাট থেকে নিশ্চিন্ত আড়াল তুলে অমরাবতী এক অপরূপ আবাসন তৈরি করেছে। এই আবাসনের বাসিন্দা হতে গেলে প্রথমত রুচি থাকা দরকার। আর দরকার অঢেল টাকা।

কম্পিউটার যেভাবে র‍্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করে অনেকটা যেন সেভাবেই ৪ নম্বর বাড়িটার কথা মনে হল আমার। স্টকব্রোকার নবীন মেহতার বাড়ি। মেহতা মারা গেছেন বাথটাবে ইলেকট্রিক শক খেয়ে এবং তারপর ছুরির আঘাতে। আর ওঁর স্ত্রী প্রিয়া মেহতা ব্যায়াম করার সাইকেলে বসা অবস্থায় শক খেয়ে মারা গেছেন। ভদ্রমহিলার ফিগার নিয়ে বড় মাথাব্যথা ছিল। ওঁদের মেয়ে রূপার বয়েস ৮, আর ছেলে বিজয়ের বয়েস ১৩। অমরাবতীর উধাও হওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওরা দুজনই সবচেয়ে ছোট।

সার্জেন্ট শিকদার চাবি খুঁজছিল। তখনই লক্ষ করলাম, রাস্তার ধারের একটা ল্যাম্পপোস্টের মাথায় বসানো একটা টিভি ক্যামেরা গোয়েন্দার চোখে আমাদের ওপরে নজর রাখছে। এইসব ক্যামেরার সাহায্যেই গেট-হাউসের পুলিশ অফিসারটি সকলের আনাগোনার হিসেব রাখছে।

একটু পরেই ক্যামেরার চোখ ঘুরে গেল রাস্তার দিকে। নির্জন পথের দিকে তাকিয়ে যেন নতুন কারও আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্যামেরাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বললাম, 'আমার সল্টলেকের বাড়িতে এরকম একটা গোয়েন্দা-ক্যামেরা লাগালে মন্দ হত না, সার্জেন্ট। এগুলো বেশ কাজের।'

হাতের ধাক্কায় দরজা খুলে দিয়ে সার্জেন্ট শিকদার বলল, 'কোথায় সেরকম কাজের! আসলে...।'

শিকদারের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ক্যামেরার ব্যাপারটাকে আমল দিতে সে মোটেই রাজি নয়। আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। তবে, এইসব ক্যামেরা থাকলে উলটোপালটা লোকজনের ঢুকে পড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আবার ক্যামেরার চোখ যদি সবসময় এভাবে দেখে তা হলেও বড় অস্বস্তি হয়। এই এস্টেটের সিকিওরিটি ব্যবস্থাটা যেই করুক বেশ বুদ্ধি করে করেছে। কিন্তু এ তো মনে হচ্ছে এস্টেট নয়—একেবারে দুর্গ।'

'জেলখানা বলতে পারেন...,' মেহতার ঘরে ঢুকে পড়ে সিগারেট ধরিয়েছিল শিকদার। ঘরে ধবধবে সাদা নরম কার্পেট, ক্রোমিয়াম প্লেটিং করা আসবাবপত্র। সোফা-সেটিগুলো দামি নরম চামড়ায় মোড়া। সেদিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে। তারপর মন্তব্য করল : 'কুকুর আর ক্যামেরা বাইরের লোককে ভেতরে ঢুকতে দেয় না বটে, কিন্তু ওদের জন্যে ভেতরের লোকও বাইরে বেরোতে পারে না, ডক্টর দাশগুপ্ত।'

আমি মজা করে বললাম, 'এরকম আরামের জেলখানা কোথায় পাবেন আপনি! এখান থেকে কে-ই-বা পালাতে চাইবে! তা ছাড়া, এখানে ছোটদের স্বপ্ন দেখার সুযোগ আছে। মানে, ওই বাচ্চাগুলোর কথা বলছি।'

ছোট্ট করে একটা 'হুঁ' শব্দ করল সার্জেন্ট শিকদার। সিগারেট ঠুকে ছাই ঝাড়ল

BanglaBook.org

কার্পেটের ওপরে। ওর আচরণে আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমি বাড়ির ভেতরটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। চেষ্টা করলাম রূপা আর বিজয়ের কথা না ভাবতে। সুন্দর করে সাজানো প্রত্যেকটি ঘরেই রুচি আর অর্থের ছাপ। বিজয়ের নিজস্ব সুইট, বাথরুম আর পার্সোনাল কম্পিউটার দেখতে-দেখতে মনে হল, কী সুন্দর সুখী জীবনই না সকলে কাটিয়েছে এই এস্টেটে!

বিজয়ের শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে নানা পোস্টার সেলোটেপ দিয়ে আঁটা। জনপ্রিয় হলিউড স্টার মার্ক হ্যামিলটন, পপ গায়িকা 'ক্যাট' আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক বিনায়ক রাও ছাড়াও অনেক শিল্পীর ছবি। তাঁদের সবাইকে আমি চিনি না।

দেখলাম, পড়াশোনার ব্যাপারেও বিজয়ের আগ্রহ যথেষ্ট। বুদ্ধিদীপ্ত নানারকম পেপারব্যাক বইয়ে ওর তাক ভর্তি। একটা দাবার ছক চোখে পড়ল। তার পাশে অনেকগুলো কাগজে দাবার চাল নিয়ে বেশ কিছু হিজিবিজি লেখা।

কম্পিউটার রুমে ঢুকে বিজয়ের ভিডিও লাইব্রেরি দেখেও একইরকম তৃপ্তি পেলাম। আধুনিক নানা ছবি ছাড়াও সাজানো রয়েছে বেশ কয়েকটা পুরোনো ক্লাসিক : পথের পাঁচালি, ঘটশ্রাদ্ধ, অঙ্কুর, ব্যাট্‌লশিপ পোটেমকিন, সামার অফ ফরটি টু।

ওর সুইট ছেড়ে বেরোতে-বেরোতে আমি মন্তব্য করলাম, 'দারুণ ছেলে! বেশ সুখেই ছিল বোঝা যাচ্ছে।'

'সুখী?' ছোপধরা দাঁত দেখিয়ে হাসল শিকদার, বলল, 'সুখ তো এখানে বলতে গেলে একরকম কমপাল্‌সরি ছিল, ডক্টর দাশগুপ্ত। যেখানে এতসব সুখের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে সুখী না হওয়াটাও একটা ক্রাইম, তাই না!'

'না, ঠিক তা বলছি না, সার্জেন্ট। আসলে এখানে কোনও আজেবাজে খেলনাপাতি দেখলাম না। মানে, টেনিস র‍্যাকেট, ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট, হোম কম্পিউটার প্রজেক্ট, ভিডিও গেম প্লেয়ার—এইসব আর কী। এখানে সবকিছুতেই বেশ বুদ্ধির ছাপ আছে।'

করিডর ধরে আমাকে নবীন ও প্রিয়া মেহতার শোওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে-যেতে শিকদার বলল, 'অমরাবতীতে আপনি বুদ্ধির ছাপ-টাপ খুব পাবেন। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব সফিস্টিকেটেড ব্যাপার-স্যাপার।'

শিকদারের মন্তব্য আমার কেমন অদ্ভুত লেগেছিল। অমরাবতী এস্টেট নিয়ে এরকম কথা আমি আগে শুনিনি।

মেহতাদের বাথরুমে বাথটাবের দিকে আমরা তাকিয়ে ছিলাম। এখানেই তাঁর ছেলেমেয়ের চোখের সামনে খুন হয়েছেন নবীন মেহতা। প্রথমে বাথটাবের জলে ছুড়ে ফেলা হয়েছে একটা বৈদ্যুতিক হেয়ার ড্রায়ার। তাতেই হয়তো শক খেয়ে মারা গেছেন নবীন। কিন্তু খুনিরা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে একটা বড় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে তাঁর পাঁজরে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অবশ্য মৃত্যুর কারণ হিসেবে দুটো ব্যাপারকেই দায়ী করেছে। মেহতাদের আধুনিক রান্নাঘর থেকে ছুরিটা জোগাড় করতে খুনিদের কোনও কষ্ট হয়নি। শত চেষ্টা সত্ত্বেও রক্তে ভেসে যাওয়া বাথটাবটা ফুটে উঠতে চাইল আমার চোখের সামনে। যেন শুনতে পেলাম, লাল হয়ে যাওয়া জলের মধ্যে শর্ট সার্কিটের বিস্ফোরণের শব্দ। ডোসিয়ারে দেখা মেহতাদের ফটো মনে পড়ল আমার। ঝলমলে মুখ, উজ্জ্বল চেহারার

BanglaBook.org

এক পুরুষ, আর হাসিখুশি সুন্দরী এক রমণী।

নিচের তলায় ছোট্ট একটা প্রাইভেট জিমনাসিয়াম। এখানেই প্রিয়া এক্সারসাইকেলে চড়ে ব্যায়াম করছিলেন। তার পাশেই দেওয়ালে একটা ডায়েরি মতন। সেখানে লেখা রয়েছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে রুটিনমাফিক কী-কী কাজে যোগ দিতে হবে। যেমন, স্কুলের হোমওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর টিভি প্রোগ্রামের ভালোমন্দ নিয়ে মতামত, অমরাবতীর স্পোর্টস ক্লাবের নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে কথাবার্তা, অমরাবতীর ছেলেমেয়ে ও বাবা-মায়েদের সম্মিলিত জুনিয়র ব্রিজ টুর্নামেন্টের পরের রাউন্ডের খেলার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা, লেকে একসঙ্গে নৌকো বাইতে যাওয়া— এইরকম আরও কত!

নাঃ, ছেলেমেয়েদের রোজকার একটি মিনিটও অকারণে নষ্ট করা হয়নি। ওদের গড়ে তোলার পরিকল্পনায় আগাপাস্তলা বুদ্ধির ছাপ। শিকদার মোটেই মিথ্যে বলেনি।

খুনের আদত অস্ত্র যে-হেয়ার ড্রায়ারটা, সেটা পুলিশ নিয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু সেইরকমই আর-একটা যন্ত্র বেসিনের পাশেই তাকে রাখা ছিল। ওটার প্লাগটা হাতে তুলে নিলাম।

বাথরুমের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত আয়না বসানো। সেখানে আমার আর সার্জেন্ট শিকদারের অসংখ্য প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে। শিকদার নির্লিপ্ত মুখে আমাকে দেখছে। যেন এক মাস্টারমশাই তার বুদ্ধু ছাত্রকে ব্যাপারটা নিজে-নিজে বুঝে ওঠার সময় দিচ্ছে।

স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, শিকদার চাইছে আমি খুনিদের নকল করি। কী একটা ঝোঁক চাপল মনে, প্লাগটা গুঁজে দিলাম সকেটে। তারপর সুইচ অন করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল আমার চোখে-মুখে-কপালে। চুল উড়তে লাগল একই সঙ্গে। হেয়ার ড্রায়ারের ভ্রমর-গুঞ্জন আমার মনে কীরকম একটা নেশা ধরিয়ে দিল। আমি আয়নার প্রতিবিম্বগুলো দেখলাম। সার্জেন্ট শিকদারের সিগারেটের ধোঁয়া আমাদের ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে, নাচছে। দু-মাস আগে জুনের সেই সকালে বাথটাব থেকে উঠে আসা বাষ্প ঠিক একইরকম নাচ দেখিয়েছিল। আয়নার গায়ে লেগেছিল অসংখ্য রক্তের ছিটে। নবীন মেহতাকে যে-ই খুন করে থাকুক, সে নিশ্চয়ই তার অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিল রক্তাক্ত এই আয়নায়। প্রতিবিম্বের ভেতরে প্রতিবিম্ব। রক্তের ভেতরে রক্ত। অনন্ত এক রক্তাক্ত পথে খুনি দাঁড়িয়ে ছিল সেদিন।

কেমন এক ঘেন্না আর বিরক্তি জেগে উঠল আমার মনে। হেয়ার ড্রায়ারটার সুইচ অফ করে দিয়ে চাপা গলায় শিকদারকে বললাম, 'কী, এবার খুশি তো!' তারপর হনহন করে মেহতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

সাইকিয়াট্রিস্টদের বাড়িতে

আমরা নিস্তব্ধ অ্যাভিনিউ পেরিয়ে রওনা হলাম ৫ নম্বর বাড়ির দিকে। গোয়েন্দা-ক্যামেরা বেশ কিছুক্ষণ আমাদের অনুসরণ করল। সার্জেন্ট শিকদারের হাতের চাবির গোছায় শব্দ

হচ্ছিল। বিশাল ধনী অপরাধীদের জন্যে তৈরি এক সুপার ডিলাক্স জেলখানার জেলর যেন সার্জেন্ট শিকদার। বুঝতে পারলাম, অমরাবতীর বাসিন্দাদের শিকদার মোটেই পছন্দ করে না। সেটা শুধু ওঁদের অঢেল টাকার জন্যে নয়, বরং যেরকম চোখ-টাটানোভাবে ওঁরা বড়লোকী চালের প্রদর্শনী খুলে বসেছেন সেইজন্যেই বোধহয় বেশি।

আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

সার্জেন্ট শিকদার লোকটিকে আমার খারাপ লাগছিল না। নির্লিপ্তভাবে আপনমনে সিগারেট টানছে, আর ঠিকঠাক না শুনেই আমার প্রতিটি কথায় ঘাড় নাড়ছে। ফলে এটা বুঝতে পারছিলাম, শিকদার নিজে থেকে আমাকে সরাসরি কিছু বলবে না। খুঁচিয়ে ওর কাছ থেকে কথা বের করতে হবে।

সৌভাগ্যবশত, প্রধানদের বাড়িতে সেই সুযোগ পাওয়া গেল।

ঘটনাচক্রে অমরাবতীর একমাত্র এই প্রধানদের সঙ্গেই আমার আলাপ ছিল। দু-বছর আগে দিল্লির একটা সিম্পোজিয়ামে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। আমার মনে পড়ে গেল সুঠাম চেহারার ঋজু একজন পুরুষের কথা। তাঁর পাশেই দাঁড়ানো মাঝ-চল্লিশের এক তন্বী মহিলা। দুজনের চোখে-মুখে ভাবভঙ্গিতে অদ্ভুত এক পেশাদারি দক্ষতার ছাপ। তাকে ঘিরে অলঙ্কারের মতো আত্মবিশ্বাস ঝিলিক মারছে। গেস্টাল্ট সাইকোলজি আর হিউম্যান পোটেনশিয়াল নিয়ে বেশ গভীর বক্তব্য রেখেছিলেন ওঁরা দুজনে। ওঁদের পেপার গুণীজনের সাধুবাদও পেয়েছিল।

ওঁদের ঘরদোর দেখেও পছন্দ হল। পয়সার ছাপকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে রুচির ছাপ। গ্যারেজের দরজায় ওঁদের পিষে মারা হয়েছে। তাই গ্যারেজটাকে এড়িয়ে আমি আর শিকদার একতলাটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। জিমনাশিয়ামে এসে আবার সেই দেওয়াল-ক্যালেন্ডার। এখানেও সেই একইরকম রুটিন : স্কুলের হোমওয়ার্ক, টিভি প্রোগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বই পড়ার পরামর্শ, বাছাই করা কয়েকটা সিনেমার নাম, কয়েকটা ক্লাসিক্যাল অডিও ক্যাসেটের নাম। সত্যি, ছেলেমেয়ের জন্যে অমরাবতীর বাবা-মায়েরা কত ভেবেছে!

প্রধানদের স্টাডিরুমে মনস্তত্ত্বের অসংখ্য বই থরে-থরে সাজানো। তার মধ্যে আমার লেখা কোনও বই নেই দেখে মনটা খারাপ লাগল। ফ্রয়েড, উডওয়ার্থ, মারকুইস, উইলেন্‌ৎস, হোগার্থ—সকলেরই বই আছে সেখানে। লক্ষ করলাম, বইপত্রের মাঝে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় একটা আট ইঞ্চি মাপের কালার টিভি বসানো রয়েছে। তার পাশেই একটা ছোট্ট পড়ার টেবিল, তাতে কাগজ, কলম, বই ছড়িয়ে আছে। পড়াশোনার পরিবেশের মাঝে টিভি সেটটা যেন বুড়োদের খেলনা। মাঝে-মাঝে প্রধানরা এটা নিয়ে খেলা করতেন বোধহয়।

সতেরো বছরের সুনীলের শোওয়ার ঘরে ঢুকেই আমি শিকদারকে লক্ষ করে বললাম, 'এটাই তাহলে ছেলের শোওয়ার ঘর? আচ্ছা, সার্জেন্ট, এখানকার ঘরগুলো আপনার একটু অদ্ভুত লাগছে না!'

সার্জেন্ট শিকদার বোধহয় আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। শান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আলতো কৌতূহল ফুটিয়ে তুলল চোখে-মুখে। তারপর জিগ্যেস করল, 'কেন বলুন তো, ডক্টর দাশগুপ্ত?'

BanglaBook.org

'না, মানে, সব ঘরগুলোই কেমন যেন একরকম। ফার্নিচার কি ফিটিংগুলো নয় —অবশ্য ওগুলোও যে খুব একটা আলাদা তা নয়। কিন্তু ঘরের পরিবেশ, ছক-বাঁধা জীবন—সবই কেমন এক ছাঁদের। এখানকার জীবনযাপনের ঢঙ বড্ড বেশি ছকে বাঁধা, একঘেয়ে।'

সুনীলের শোওয়ার ঘরটা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলাম। একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার চোখে পড়ল। তার পাশে কয়েকটা তাকে কাপ, ট্রফি আর মেডেল সাজানো। কাছে গিয়ে খোদাই করা লেখা পড়ে জানলাম, সুনীল বেশ ভালো সাঁতারু।

'সুনীল দেখছি বেশ ভালো সাঁতার জানত! যদ্দূর মনে পড়ছে, ও-ই তো বিছানায় হিসি করত। অথচ ছেলেটা সাঁতারে কীরকম দারুণ! ওর মা-বাবা এর জন্যে ওকে তেমন একটা তারিফ করত বলে মনে হয় না।'

'না, না, ওঁরা তারিফ করতেন। বলতে গেলে প্রায় সবসময়েই তারিফ করতেন— একেবারে মাত্রা ছাড়া।'

কম্পিউটার চালু করে কী-বোর্ডের কয়েকটা বোতাম টিপল শিকদার। সঙ্গে-সঙ্গে ১৭ মে ২০১৮ তারিখের একটা লেখা ফুটে উঠল পরদায় :

'আজ আমি একটানা দু-ঘণ্টা সাঁতার কেটেছি!'

তার একটু পরেই পরদায় ফুটে উঠল :

'মার্ভেলাস, সুনীল!'

বাবা-মায়ের প্রশংসাবাণী জ্বলজ্বল করতে লাগল কম্পিউটারের পরদায়— ইলেকট্রনিক স্নেহ-মমতার কী অপূর্ব উদাহরণ! জনহীন এই পোড়ো বাড়িতে বাবা-মা-ছেলের এটুকু চিহ্নই শুধু অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

'সে কী! ছেলেমেয়েদের শোওয়ার ঘরে পর্যন্ত বাবা-মায়েরা এভাবে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ রাখত? সার্জেন্ট, আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।'

'লাগবে না! স্কুলের হোমওয়ার্ক শেষ করে আপনি হয়তো হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে একটু আয়েস করছেন, অমনি কম্পিউটার বিপ-বিপ করে জেগে উঠে পরদায় লিখে দেবে, "তাড়াতাড়ি হোমওয়ার্ক শেষ করতে পেরেছ বলে আমরা খুব খুশি হয়েছি, সুনীল!" '

'এ তো একেবারে মনটাকেও নজরবন্দি করে রাখা। গোয়েন্দা-ক্যামেরা তাহলে শুধু বাইরেই নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি যোগ করলাম, 'যাকগে, সুনীল হয়তো দিব্যি সুখেই ছিল।'

একটা ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে কয়েকটা জামাকাপড় পাল্লার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে পাল্লাটা খুললাম। ভেতরটা আগোছালো। টি শার্ট, শর্ট্স, নাইক স্পোর্টস শু, গানের ক্যাসেট, পেপারব্যাক বই, এসবে ঠাসা ক্যাবিনেটটা।

জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎই দুটো সুইমিং কস্টিউমের নীচে কয়েকটা রঙিন ম্যাগাজিন দেখতে পেলাম। 'প্লেবয়' আর 'পেন্টহাউস'। চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওগুলো ব্যবহারে-ব্যবহারে বেশ লাট হয়ে গেছে। শিকদারকে ওগুলো দেখালাম।

'দেখেছেন, শিকদারবাবু, "প্লেবয়"। ছক-বাঁধা জীবনে প্রথম চিড় দেখতে পেলাম

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে।'

সার্জেন্ট শিকদার ম্যাগাজিনগুলোর দিকে দেখল কি দেখল না, মন্তব্য করল, 'এটাকে কি চিড় বলা যায়, ডক্টর!'

'না, তা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। বিছানা ভিজিয়ে ফেলে যে-ছেলেটা তার পক্ষে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে! তা ছাড়া, প্রধানরা বেশ মডার্ন লোক ছিল।'

শিকদার সন্তের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বলল, 'সুনীলও সেটা বুঝত বোধহয়। আমার তো মনে হয়, এসব "প্লেবয়", "পেন্টহাউস" ছিল ক্যামোফ্লেজ। আরও খুঁজে দেখুন, আসল পর্নো হয়তো ওর নীচে-টিচে কোথাও লুকোনো আছে।'

ক্যাবিনেটের ভেতরটা সেরকমভাবে সার্চ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু শিকদারের কথায় কেমন একটা ছোট্ট সন্দেহের কণা দানা বাঁধল। ভাবলাম, দেখিই না, ক্ষতি কী!

খুঁজতে গিয়ে পেলাম কতকগুলো পিস্তল-বন্দুকের দেশি-বিদেশি ম্যাগাজিন। 'গান্‌স অ্যান্ড অ্যামো', 'দ্য রাইফেলম্যান', 'থ্রি নট থ্রি', 'দ্য কমান্ডো'। ওগুলো তুলে নিয়ে এলোমেলোভাবে পাতা উলটে গেলাম। দেখলাম, অনেক পাতায় খুব যত্ন করে কেউ দাগ দিয়েছে। কোনও কোনও পাতার মার্জিনে নানারকম মন্তব্য লেখা। আর বহু পৃষ্ঠা থেকে মেইল অর্ডার কুপনগুলো কেটে নেওয়া হয়েছে।

'ঠিক বলেছেন, সার্জেন্ট—এই হল আসল পর্নো। সুনীল হয়তো কোনও রাইফেল ক্লাবের মেম্বার ছিল। মনে হয় না, জানতে পারলে ওর বাবা-মা রাজি হত।'

'মাথা খারাপ। অমরাবতী এস্টেটের কোনও ছেলে পিস্তল-বন্দুক নাড়াচাড়া করছে এ-কথা বাবা-মায়েরা ভাবতেই পারে না। তার চেয়ে আড়াল-আবডালে মেয়ে চটকানোর কাজটা তাঁদের পক্ষে মেনে নেওয়া অনেক সহজ।'

'এটা বড্ড বাড়াবাড়িরকম শোনাচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো মানুষ করার জন্যে বাবা-মায়েরা...আরে এটা কী!'

সুনীলের ক্যাবিনেটের জিনিসগুলো আমি আবার আগের মতন করে সাজিয়ে রাখছিলাম। ওর গোপন কথা গোপনই থাক। আমি ক্যাবিনেটের ভেতরের আলোটা জ্বেলে নিয়েছিলাম আমার কাজের সুবিধের জন্যে। আর জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে-রাখতেই কথা বলছিলাম শিকদারের সঙ্গে। তখনই অদ্ভুত দাগগুলো আমার নজরে পড়ল।

ক্যাবিনেটের পাল্লার গায়ে কতকগুলো আঁচড়ের মতো দাগ। কোনও জন্তুর নখের দাগ বা দাঁতের দাগ হতে পারে।

'এই দাগগুলো দেখেছেন, শিকদার? মনে হচ্ছে, কোনও ছোট মাপের প্রাণী দরজা খুলে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করছিল। প্রধানরা কি অদ্ভুত জানোয়ার-টানোয়ার পুষত নাকি?'

'পুষত তো বটেই!' চোখে-মুখে অর্থপূর্ণ ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল শিকদার। তারপর বলল, 'এস্টেটের সব জায়গাতেই আপনি এরকম দাগ দেখতে পাবেন।'

কথা শেষ করে সার্জেন্ট শিকদার দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে অপেক্ষা করতে লাগল আমার জন্যে। সুনীলের ঘর ছেড়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

'দাগগুলো কী করে হল বলুন তো? ফোরেনসিকের লোকেরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে।'

'না, ওদেরও এ নিয়ে কনফিউশন আছে।।'

কথা বলতে-বলতে ডক্টর অনিতা প্রধানের শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছি আমরা। বিছানার মাথার কাছে কাঠের ওপরে একইরকম দাগের চিহ্ন। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে সার্জেন্ট শিকদার বলল, 'এরকম দাগ সব জায়গাতেই রয়েছে—দাঁতের দাগের মতো।'

'দাঁতের' কথাটার ওপরে একটু জোর দিল শিকদার। তারপর বিছানায় বসে খাটের পাশে রাখা টিভিটা অন করে দিল।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, 'এখন টিভি দেখার সময় নয়, সার্জেন্ট, আমার কাজ শেষ করতে হবে।'

'এটা অমরাবতীর প্রাইভেট চ্যানেল, ডাক্তারবাবু। দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

শিকদারের হাসিটা একেবারে নির্দোষ ছিল না। কিন্তু আমার চোখ চলে গেল টিভি পরদার দিকে।

পরদায় জানলার বাইরের রাস্তার ছবি ফুটে উঠেছে। ক্যামেরা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বোধহয় শুকনো ঝরাপাতা খুঁজছে। কোনও সাজানো নিস্তব্ধ মঞ্চের আনাচে-কানাচে চলেছে তার অক্লান্ত অনুসন্ধান।

আমি পরদার ছবির দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালাম। বললাম, 'সিকিওরিটিই ওঁদের কাছে সব। এটা নিয়ে ওঁদের এমন ম্যানিয়া হয়ে গেছে যে, গেট-হাউসের সিকিওরিটি টিভি মনিটর থেকে একটা কানেকশান বাড়ির ভেতরেও নিয়ে রেখেছেন।'

শিকদার একঘেয়েমির একটা হাই তুলে বলল, 'অমরাবতীর সব বাড়িতেই একই ব্যবস্থা। একতলায় একটা কানেকশান, দোতলায় একটা কানেকশান। এবার বুঝতে পারছেন, এ-বাড়ি ও-বাড়ি কোনও লটর-পটর হয়নি কেন? কাকে আপনি ফাঁকি দেবেন। তবে ছেলেমেয়েগুলোর কথা একবার ভাবুন তো, ডক্টর দাশগুপ্ত—দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই ওদের চোখে-চোখে রাখা হত। এ যে দেখছি বাচ্চাদের কনসেনট্রেশান ক্যাম্প—তফাতের মধ্যে শুধু রয়েছে স্নেহ-ভালোবাসার ওভারডোজের মোড়ক! আটটার সময় সাঁতার, সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট, তারপর আর্চারির ক্লাস, স্কুলের কাজ, ছবি আঁকা, কম্পিউটার ট্রেনিং, এটা ওটা, কত কী! আর মাঝে-মাঝেই কম্পিউটারের মাধ্যমে পিঠ চাপড়ানো, মার্ভেলাস, সুনীল!'

অনিতা প্রধানের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেটের কড়া ধোঁয়া ছাড়ল শিকদার। ঠোঁট বেঁকিয়ে মন্তব্য করল, 'শুধু একটাই তাজ্জব ব্যাপার, কী করে লোকগুলো পটাপট খুন হয়ে যাওয়ার সময় পেল!'

'ওঁরা যে খুন হয়েছেন তাতে কোনওরকম সন্দেহ নেই। তবে অবাক লাগছে, খুনিরা কী করে ওঁদের সবাইকে একসঙ্গে বাড়িতে পেল। কারণ অমরাবতীর বেশিরভাগ মালিকই ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাতেন। তাঁদের স্ত্রীরাও মোটামুটি বলতে গেলে তাই।'

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, শিকদার আরও কিছু জানে। সেটা ধীরে-ধীরে টেনে বের করা দরকার। তা ছাড়া, এমনিতেই ওকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল।

BanglaBook.org

'হয়তো খুনিরা ওঁদের সঙ্গে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল—।'

'কোনও মিথ্যে দরকার দেখিয়ে? হতে পারে, তবে মনে রাখবেন, সার্জেন্ট, দিনটা জুন মাসের শনিবারের সকাল ছিল। ব্যাপারটা নিতান্ত কাকতালীয় বলতে হবে যে, মালিকদের কেউই ছুটি কাটাতে কলকাতার বাইরে বা বিদেশে কোথাও চলে যাননি। অথচ ওঁদের বেড়াতে যাওয়ার জায়গার কোনও অভাব ছিল না।'

'জানি, এইসব জঘন্য বড়লোকদের টাকার অঙ্ক গুনতে গেলে অর্বুদ, নির্বুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম শেষ হয়ে যাবে।' সার্জেন্ট শিকদারের কথার সুরে তীব্র ব্যঙ্গ ও ঘৃণা ঝরে পড়ল।

'বুঝতে পারছি, এরকম জঘন্য বড়লোক আপনার পছন্দ নয়, কিন্তু উপায় কী বলুন! যাই হোক, আমার অবাক লাগছে যে, সেদিন বড়রা ছোটরা প্রত্যেকেই অমরাবতীতে ছিল। তার ওপর আবার বিনোদ আগরওয়াল—আগরওয়ালদের ১৫ বছরের ছেলেটা—আক্কেল দাঁত তুলতে নার্সিংহোমে গিয়েছিল। ওকে ২৪ জুন অমরাবতীতে নিয়ে আসা হয়।'

'নিয়ে আসা হয়েছিল?' ভুরু বাঁকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল শিকদার। তারপর একতলার স্টাডির দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বিড়বিড় করে বলল, 'নিয়ে এসেছিল, না বিনোদ আগরওয়াল নিজেই চলে আসতে চেয়েছিল...।'

'চলে আসতে চেয়েছিল? হতে পারে। কিন্তু কেন? ডায়েরি বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে তো নতুন কিছু লেখা নেই! প্রতি শনিবারের যা রুটিন তাই : ব্যায়াম, স্কুলের হোমওয়ার্ক, নৌকো চালানো, সাঁতার...।'

'...আজ আমি একটানা দু-ঘণ্টা সাঁতার কেটেছি! মার্ভেলাস, সুনীল!'

শিকদারের ব্যঙ্গ গ্রাহ্য না করে আমি মন থেকে আওড়াতে লাগলাম, 'অমরাবতী এস্টেট নিয়ে একটা টেলিফিল্ম তুলতে চেয়েছিলেন এক প্রোডিউসার। তাঁর দেখা করতে আসার কথা তারপর ছিল। ওদের প্রাইভেট চ্যানেলে উত্তরবঙ্গের বন্যার প্রোগ্রাম—সেটা বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে নিয়মিত দেখতেন। এ ছাড়া, সন্ধেবেলা উইকলি গেট টুগেদার। এই রুটিনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই...।'

'না, নেই। অথচ এখানে চলে আসার জন্যে বিনোদ আগরওয়াল ছেলেটা কীরকম জেদ করেছিল! নার্সিংহোমের ডাক্তাররা ওকে মোটেই ছাড়তে চায়নি।'

'হ্যাঁ, জানি। দিল্লি থেকে ওর কোন এক বন্ধু নাকি দেখা করতে আসবে, এই অজুহাতে বিনোদ চলে এসেছিল। কিন্তু খোঁজ করে জানা গেছে, ও যে-নাম বলেছে সেই নামে দিল্লিতে ওর কোনও বন্ধুই নেই। এরকম মিছে কথা ও বলতে গেল কেন? তা হলে কি বাচ্চাগুলো বাবা-মায়েদের ঠকিয়ে দিয়ে কিছু একটা মজা করার প্ল্যান আঁটছিল?'

এই ঘরের কয়েকটা শেল্‌ফে বেশ কিছু বইপত্র সাজানো ছিল। আমি শিকদারের দিকে পিছন ফিরে এ-বই ও-বই হাতে নিয়ে দেখছিলাম আর ওর উত্তরটা শোনার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছিলাম। অপেক্ষায় কিছু সময় কাটানোর পর আমি ঘুরে তাকালাম শিকদারের দিকে। আমার হাতে তখন মারফির লেখা বিখ্যাত বই 'হাউ টু বিল্ড আপ দ্য ক্যারেকটার অফ ইওর চাইল্ড'-এর প্রথম খণ্ডটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। দেখলাম,

BanglaBook.org

সার্জেন্ট শিকদার ঠোঁটের কোণে হাসছে—যেন একটা অসভ্য রসিকতা শোনার পর সে রুচির আড়াল ডিঙিয়ে হাসতে বাধ্য হয়েছে।

'কী বললেন, মজা? হ্যাঁ, মজাই বটে, ডক্টর দাশগুপ্ত। ওরা বাবা-মাকে চমকে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছিল।'

'হ্যাঁ, একেবারে অসম্ভব নয়। আর খুনিরা, যে করে হোক, এই খবরটা পেয়ে গিয়েছিল। কী, ঠিক বলেছি?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, খুনের নিখুঁত পরিকল্পনা করতে খুনিদের এতটুকু অসুবিধে হয়নি। ওরা জানত, সবাইকে সেদিন এস্টেটেই পাওয়া যাবে। এ ছাড়া, আরও একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট, সার্জেন্ট শিকদার—খুনিরা অমরাবতীর প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ বেশ ভালোরকম চিনত।'

'সে আর বলতে! খুনিরা অমরাবতীর প্রত্যেকটা গাছের পাতাও চিনত। ওরা প্রত্যেকটা সিঁড়ি জানত, অ্যালার্ম সুইচ জানত, প্লাগ সকেট জানত, গোয়েন্দা-ক্যামেরার কথা জানত—সবই জানত। কেন জানবে না, ওরা তো বহু বছর ধরে এখানে রয়েছে—।'

কথা বলতে-বলতে সার্জেন্ট শিকদার ডক্টর প্রধানের আরামচেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ল। মনের মতো করে একটা জরুরি কাজ শেষ করার পর যেভাবে লোকে আয়েস করে, সেইরকমভাবে আড়মোড়া ভাঙল। আর ওর কথায় একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। ওকে জিগ্যেস করলাম, 'কারা বহু বছর ধরে এখানে রয়েছে? চাকর-বাকর-কর্মচারীরা?'

'না, না। ওরা নয়।'

'তাহলে কারা? আপনি জানেন বলে মনে হচ্ছে...।'

কথার মাঝখানে আমি বইসমেত হাতটা নেড়েছিলাম। হঠাৎই বইটা খুলে গেল। জোড়ের সেলাই বোধহয় কাটা ছিল, ফলে বইটা দুভাগে ভাগ হয়ে প্রায় উলটে গেল। আমি অবাক চোখে পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই একইরকম ক্ষতের দাগ। সুনীলের ক্যাবিনেটের ভেতরে যেরকম দেখেছি, অনিতা প্রধানের খাটে যেমনটা চোখে পড়েছে। কেউ যেন অসহ্য আক্রোশে ধৈর্য করে প্রায় প্রত্যেকটা পাতাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

খুঁজে দেখলে কার হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে এই বইয়ের শক্ত ক্ষতবিক্ষত মলাটে? কার আঙুলের ছাপই বা মিলবে অনিতা প্রধানের খাটে?

হঠাৎই যেন সেটা আন্দাজ করতে পারলাম।

'সার্জেন্ট শিকদার, আপনার কি মনে হয়...?'

'আপনার কী মনে হয়, ডক্টর?'

'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। সব কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন?'

'তা ভেবেছি। তবে সেটা কারও পছন্দ হবে না।'

'তবু শুনি। অপছন্দ হলেও আমি সইতে পারব।'

BanglaBook.org

শিকদার একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উত্তরের প্রস্তুতি। কিন্তু হঠাৎই সে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। একটা পুলিশের গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটে এল রাস্তা ধরে। তারপর প্রধানদের বাড়ির কাছে এসে ব্রেক কষল। নুড়ি ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর নেমে এল গাড়ি থেকে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে, চলে এল স্টাডিতে। তার চোখেমুখে যুদ্ধজয়ের হাসি এবং তৃপ্তি। সার্জেন্ট শিকদারকে লক্ষ করে সে বলল, 'সার্জেন্ট, এখানে আর কিছু পাওয়া যাবে না। আপনি লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ইন্সপেক্টর বসাকের সঙ্গে দেখা করুন।'

তারপরই সে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। গলার স্বর সামান্য নরম করে বলল, 'ডক্টর দাশগুপ্ত, রূপা মেহতাকে পাওয়া গেছে! কিডন্যাপারদের কাছ থেকে ও পালিয়ে এসেছে!'

রূপা মেহতা, প্রথম 'বন্দি'

পরের একটা সপ্তাহ 'ইন্সটিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি'তে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। যেসব রুগির অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করেছিলাম তাদের নিয়েই অনেকটা সময় কেটে গেল।

রূপা মেহতার ফিরে আসা নিয়ে তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে গেল চারদিকে। খবরের কাগজ, রেডিয়ো, টিভি, সব মিডিয়াতেই আট বছরের ওই মেয়েটাকে নিয়ে মাতামাতি।

বেচারা অনাথ মেয়েটাকে পাওয়া গেছে ২৯ আগস্ট ভোরবেলায়। শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একগাদা মেইল-ব্যাগের আড়ালে লুকিয়ে ছিল মেয়েটা। একজন টিকিট চেকার ডিউটিতে আসার সময় মেইল-ব্যাগের স্তূপের আড়াল থেকে একটা ফোঁপানির শব্দ শুনতে পান। ভদ্রলোক প্রথমটায় ভেবেছিলেন ব্যাগের স্তূপে আটকে পড়া কোনও বেড়ালছানা-টানা হবে। তাঁর নিজের দুটো পোষা বেড়াল আছে। তাই নেহাতই মায়ার বশে অবোলা প্রাণীটাকে উদ্ধার করতে তিনি এগিয়ে যান। তখন দেখেন, বেড়াল নয়, একটি বাচ্চা মেয়ে। থরথর করে কাঁপছে, এক্ষুনি যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। গায়ে জামা-কাপড়ে নোংরা লেগে থাকা সত্ত্বেও ভদ্রঘরের মেয়ে বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। মেয়েটার পরনে একটা ছেঁড়া ময়লা সুতির জামা, পায়ে একপাটি জুতো।

এই আবিষ্কারের পর টিকিট চেকার শ্রী তপন রায়চৌধুরী রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছেন। একটা টিভি ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ভদ্রলোক বলেছেন, '১৯ বছর রেলে চাকরি করছি। কষ্ট করে সংসার চালাই, কিন্তু কোনওদিন একটা পয়সাও ঘুষ নিইনি। এটা বোধহয় তারই পুরস্কার।'

এরপর যথারীতি রেলপুলিশে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু সাত-আট বছরের বাচ্চা মেয়েটা তাদের কাছে নিজের নাম বলতে পারেনি। মানসিক বা শারীরিক ধকলের জন্যেই হোক, মেয়েটা কেমন যেন জড় পদার্থের মতো হয়ে গেছে, কথা বলতে পারছে না।

আর মাঝে-মাঝে কোণঠাসা পোষা বেড়ালের মতো কীরকম এক অদ্ভুত হিসহিস শব্দ করছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনও সুবিধে করতে না পারায় রেলপুলিশ ব্যাপারটা তুলে দেয় লালবাজারের হাতে। তারা ভেবেছে, মেয়েটা হয় বাড়ি থেকে কাউকে না বলে পালিয়েছে, অথবা বাবা-মা ওকে ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছে স্টেশনে। মেয়েটার জামাকাপড় খুঁটিয়ে দেখে 'ডেম' মনোগ্রাম করা লেবেল চোখে পড়ে। 'ডেম'-এর পোশাকের আকাশছোঁয়া দামের কথা সকলেরই মোটামুটি জানা। সুতরাং তখনই মেয়েটিকে নিয়ে পুলিশের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়।

আর-একটা আবিষ্কার পুলিশকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে : সেটা হল, মেয়েটির জামার কোমরের কাছে কয়েকটা ছোপ। সেগুলো মেয়েটির দু-হাতের অস্পষ্ট ছাপ বলে পরে বোঝা যায়। দাগগুলো যে ধুয়ে তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে তাও ধরা পড়েছে প্রাথমিক তদন্তে। পরে রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছাপটা রক্তের। অথচ মেয়েটির দেহে কোনও ক্ষত ছিল না। লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ও সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশান ডিভিশন দ্রুত খোঁজ-খবরের কাজ সেরে ফেলে সকাল আটটার মধ্যেই। তখন জানা যায়, মেয়েটির জামার রক্ত নবীন মেহতার—নবীন মেহতা খুন হয়েছিলেন ২৫ জুন।

এরপর দাঁতের ছাঁদ ও ফটোগ্রাফ দেখে পুলিশের ধারণা হয়, মেয়েটি রূপা মেহতা —২৫ জুন কিডন্যাপ হওয়া ১৩ জন ছেলেমেয়ের একজন। পুলিশের ধারণা যে সত্যি তা প্রমাণ করে নবীন মেহতার দুজন আত্মীয়া—তাঁরা মেয়েটিকে সহজেই রূপা বলে শনাক্ত করেন।

অনাথ শিশুটির ফিরে আসা নিয়ে ক'দিন ধরে চূড়ান্ত হুলস্থূল চলল খবরের কাগজ, টিভি আর রেডিয়োতে। অন্য সব খবর সরিয়ে প্রত্যেকটি প্রচার মাধ্যমেই শুধু রূপা মেহতা। সকলেরই এক প্রশ্ন : কিডন্যাপারদের হাত থেকে কী করে ছাড়া পেল বাচ্চাটা? এই প্রশ্নকে ঘিরে আবার শুরু হল নতুন-নতুন থিওরি, নতুন-নতুন গালগল্প। মেয়েটা কি পালিয়ে এসেছে? নাকি কিডন্যাপাররা ওকে ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছে? তাহলে কি বাকি বারোজনের জন্যে কয়েক কোটি টাকা মুক্তিপণ চাইবে তারা? সুতরাং অনুমানের উন্মাদনায় কয়েকটি খবরের কাগজ 'অমরাবতী মুক্তিপণ তহবিল', 'অমরাবতী ত্রাণ তহবিল', এসব নামে জনগণের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করার কাজ শুরু করে দিল। তারা বড়-বড় হরফে লিখল, 'আপনি কি চান অমরাবতীর ১২ জন দেবশিশু নৃশংস খুনিদের হাতে খতম হয়ে যাক?' 'আপনি কি জানেন ওদের ওপরে কী ভয়ানক শারীরিক আর মানসিক অত্যাচার চলছে?' —এবং এই হেডলাইনের নিচেই ছাপা হল অর্থসাহায্যের আবেদন। সুতরাং লোকে টাকা পাঠাতে লাগল আশায়-আশায়। এই বুঝি মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরে এল ১২ জন শিশু।

বাচ্চাটা পুলিশি তদন্তে কোনওরকম সাহায্য করতে পারল না। পার্ক স্ট্রিটের 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমে তার চিকিৎসা চলতে লাগল। শিশুদের পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যাপারে 'দ্য এঞ্জেল'-এর যথেষ্ট সুনাম আছে। কিন্তু রূপাকে তারা সঙ্গে-সঙ্গে সারিয়ে তুলতে পারল না। মেয়েটার অবস্থার বিবরণ যা শুনলাম তাতে পরিভাষায় ব্যাপারটাকে 'ইররিভারসিব্‌ল স্টেট অফ ক্যাটাটোনিক সিজার' বলা যায়। ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা

BanglaBook.org

হয়েছে, আর খাওয়ানো হচ্ছে টিউব দিয়ে। তিনদিন পর মেয়েটার প্রথম জ্ঞান ফিরল—তাও মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তখন ও এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছে বলে 'দ্য এগ্রেল'-এর নার্সরা জানিয়েছে। রূপা বিচিত্র এক হিসহিস শব্দ করে বাঁ-হাত দিয়ে কিছু একটা খোলা বা লাগানোর ভঙ্গি করেছে—যেন একটা দরজা খুলছে। আর একই সঙ্গে ডান হাতটা কপালে দিয়ে কিছু একটা সরানোর বা আটকানোর চেষ্টা করছে—যেন কেউ ওকে মারতে আসছিল, আর ও ওর কচি-কচি হাতে সেই আঘাত রুখতে চাইছে।

একবার নয়, অসুস্থ মেয়েটা এরকম মূকাভিনয় করেছে বারবার। তখন নার্সরা ওকে ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে আবার।

এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা পালিয়ে এসেছে। যে-ডিটারজেন্ট দিয়ে ওর জামার দাগ তোলার চেষ্টা করা হয়েছে তা নিতান্তই সাধারণ। আর ওর জুতোয় যে-মাটি লেগে ছিল তাও অতি সাধারণ। তবে এটুকু বলা যায়, মাটির ধরনটা গ্রাম-গঞ্জের—শহরের আশপাশের নয়। তা হলে কি কোনও গণ্ডগ্রামে আটকে রাখা হয়েছে বাচ্চাগুলোকে? তদন্তের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে শেয়ালদা লাইন বরাবর বেশ কয়েকটি আধা-শহর আধা-গ্রামকে বেছে নিয়ে সেখানকার পুলিশকে তৎপর অনুসন্ধান চালাতে বলা হল। ১৩ জন ছেলেমেয়ের একসেট করে ফটোও পাঠিয়ে দেওয়া হল সেখানে।

কিন্তু কোনও লাভ হল না। ওদের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। রূপার অবস্থারও তেমন একটা উন্নতি হল না। আমি বাচ্চাটাকে দেখার অনুমতি চাইলাম, আর সেইসঙ্গে অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট জমা দিলাম। রিপোর্টে আমি কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপারের কথা জানিয়েছিলাম। যেমন, সন্তানের চরিত্র গঠন সম্পর্কে মারফির বিখ্যাত বইটার ক্ষতবিক্ষত অবস্থার কথা। কিন্তু হোম ডিপার্টমেন্ট ও লালবাজার আমাকে অনুমতি তো দিলই না, উলটে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে বলল। সঙ্গে অবশ্য শান্তিপুরী ভদ্রতার একটা লাইন জুড়ে দিল : '...আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে দরকার পড়লেই এ-বিষয়ে আপনার মতো বিশেষজ্ঞের সাহায্য আমরা পাব।'

সুতরাং একা-একা বসে আমি অমরাবতীর কথা ভাবতে লাগলাম—ওখানে গিয়ে কী দেখেছি, কী শুনেছি। সার্জেন্ট শিকদারের হেঁয়ালি-মাখা কথাবার্তা মনে পড়ল আমার। এখন ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিডন্যাপারদের সার্চ পার্টিতে। কিন্তু ইচ্ছায় হোক-অনিচ্ছায় হোক সে আঙুল তুলেছে সুনীল প্রধানের দিকে। কিডন্যাপিং-এর পিছনে সুনীলের হয়তো হাত ছিল। আর খুনের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই সে কিছু না কিছু জানে। সুনীল কি তাহলে লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা পিস্তল বা রাইফেল কিনেছিল কারও কাছ থেকে? তারপর কিডন্যাপারদের বোকার মতো উসকে দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে? তখন ওরা হয়তো খেপে গিয়ে খুনের পর খুন করে গেছে।

আট বছরের রূপা মেহতার মধ্যে উন্নতির কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ও অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী, কিন্তু সাহায্যের কণামাত্রও পাওয়া যাচ্ছে না ওর কাছ থেকে। ফলে ধীরে-ধীরে আমার আগ্রহও কমে গেল। আমি অভ্যেসমতো নিয়মিত রুগি দেখা শুরু করলাম।

BanglaBook.org

কিন্তু হঠাৎই, নেহাতই কপালজোরে, একটা টিভি ডকুমেন্টারিতে আমি বাচ্চাটাকে দেখলাম। সাধারণত অমরাবতী নিয়ে তোলা টিভি ফিল্মগুলো দেখতে আমার বিরক্ত লাগে। কিন্তু হঠাৎ করেই রূপাকে নিয়ে তোলা এই প্রোগ্রামটা চোখে পড়ে গেল আমার। তাতেই অমরাবতী সম্পর্কে আমার আগ্রহ দশগুণ বেড়ে গেল। তখনই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম অমরাবতীর রহস্য। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ২৫ জুন সকালে অমরাবতীর ৩২ জনকে কে খুন করেছে।

টিভি ফিল্ম

টিভি ফিল্মটা মূলত অমরাবতী রহস্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে। তারই মধ্যে 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমের একটা ছোট্ট সিকোয়েন্স রয়েছে। এই প্রথম নার্সিংহোমের ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। কারণ, তারা এখন মরিয়া হয়ে সাক্ষীর খোঁজ করছে—এমন সাক্ষী, যে বাচ্চাটাকে গ্রামে-গঞ্জে কোথাও দেখেছে। কারণ অমরাবতী হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে বেড়ে ওঠা চাপ পুলিশ বোধহয় আর সইতে পারছে না।

রূপা শুয়ে আছে বিছানায়। গায়ের সাদা চাদরটা ছোট-ছোট মুঠোয় খামচে ধরে টেনে রেখেছে প্রায় ঠোঁট পর্যন্ত। মাথাটা একপাশে কাত হয়ে রয়েছে। হতবুদ্ধি চোখ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে টেবিলে ফুলদানিতে রাখা একগুচ্ছ গোলাপের দিকে।

এমনসময় এক সুন্দরী মহিলা একজন কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল রূপার ঘরে। ভাষ্যকার পরিচয় করিয়ে দিল—রূপার কাকিমা ও খুড়তুতো বোন। একজন বয়স্ক নার্স রূপার নজর কাড়ার জন্যে ফুলদানিটা সরিয়ে দিল দূরের জানলার তাকে। তারপর রূপাকে বেশ কয়েকবার ডেকে মাথাটা আলতো করে ঘুরিয়ে দিল কাকিমার দিকে।

এমনসময় আমার শোওয়ার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। কিন্তু আমি টিভির পরদার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। রূপা স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর কাকিমার দিকে। তারপর ও ধীরে-ধীরে বাঁ-হাতটা বের করল চাদরের নীচ থেকে। সেটা সামনে বাড়িয়ে কিছু একটা খোলা বা লাগানোর ভঙ্গি করল। আর একই সঙ্গে ডান হাতটা নিয়ে এল কপালে, কোনও একটা অদৃশ্য আঘাত রুখতে চাইল যেন। সব মিলিয়ে মনে হল, একটা বন্ধ দরজা খোলামাত্র একজন শত্রু ওকে আক্রান্ত করতে গিয়েছিল। সেই আঘাত ডান হাতে রুখে তাকে ফাঁকি দিয়ে তার পায়ের তলা দিয়ে বাচ্চা মেয়েটা ছুটটে পালিয়েছে।

টিভি প্রচারের দৌলতে বাচ্চাটার এই অদ্ভুত ভঙ্গি এর মধ্যেই সকলের কাছে খুব চেনা হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে নানারকম মতও দিয়েছেন। কোনও-কোনও টিভি অভিনেতা অভিনয়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে রূপার ভঙ্গি দিব্যি নকল করেছে। আর আমি অবাক হয়ে ছোট্ট মেয়েটাকে দেখছিলাম।

রূপার অভিব্যক্তিও বেশ অদ্ভুত। ঠোঁট দুটো কেমন ফাঁক হয়ে রয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকায় ফাঁক হওয়া মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। ওর খুদে-খুদে দুটো শ্বদন্ত আলো পড়ে ঝকঝক করছে : জানি না, ওরই মধ্যে বইয়ের বা খাটের ঘুণপোকার মতো ক্ষতচিহ্নের

BanglaBook.org

সমাধান রয়েছে কি না। ছবিটায় নার্সিংহোমের অংশে কোনও সাউন্ড ট্র্যাক না থাকা সত্ত্বেও রূপার দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা হিসহিস শব্দ যেন শুনতে পেল লক্ষ লক্ষ টিভি দর্শক।

পাশের ঘরে টেলিফোন তখনও ক্লান্তভাবে বেজে চলেছে। আমি টিভি সেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে সাংবাদিকের কমেন্ট্রির শব্দটা কমিয়ে দিলাম। অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম অনাথ বাচ্চা মেয়েটার দিকে। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ানো। ফরসা নিষ্পাপ মুখ ফ্যাকাসে। চোখে আহত মরিয়া দৃষ্টি।

আমার শীত-শীত করে উঠল। গলার কাছটায় দম বন্ধ হয়ে এল যেন। কারণ অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের অন্তত একজন খুনিকে আমি চিনতে পেরেছি।

১৭ অক্টোবর, ২০১৮ ঃ পুনশ্চ অমরাবতী

পরদিন সকাল এগারোটায় অমরাবতীতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি গেট-হাউসের কাছে সার্জেন্ট শিকদার আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে সে পরিচয়ের হাসি হাসল। কিন্তু ওইটুকুই। টেলিফোন করে শিকদারকে বলেছিলাম, আমি মেহতাদের বাড়িটা আবার দেখতে চাই। তাতে সে কিন্তু একটুও অবাক হয়নি বা কোনও মন্তব্য করেনি। এখনও নির্লিপ্ত মুখে মেহতাদের বাড়ির চাবি হাতে নিয়ে গেটের কাছে ভিড় জমানো উৎসাহী জনতাকে সরিয়ে সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

আবার সেই সুদৃশ্য পরিবেশ, নির্জন পথ, সুরম্য প্রাসাদ। কিন্তু এবারে আমি সম্পূর্ণ অন্যরকম চোখে সেগুলো দেখছিলাম। মেহতাদের বাড়িতে ঢুকেও সেই পরিচিত পরিবেশ—কিন্তু সবকিছু দেখার ধরনটাই এখন একেবারে পালটে গেছে। শিকদার একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কোনদিকে যাই সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ওকে বললাম, 'মেহতাদের বাথরুমটা শুধু একবার দেখব।'

'আসুন—' শিকদারের গলায় বেশ উৎসাহ টের পেলাম। ছাত্রের মাথা খুলেছে বুঝতে পারলে শিক্ষকের যেমন আনন্দ হয়, ওর খুশির ভাবটা যেন অনেকটা সেইরকমই।

বাথরুমে পৌঁছে শিকদারকে রীতিমতো চমকে দিলাম।

শাওয়ারের পরদাটা সরিয়ে বাথটাবের কল দুটো খুলে দিলাম। শিকদারের দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'স্টেজটা আগে সেট করে নেওয়া যাক, সার্জেন্ট শিকদার। তার জন্যে দু-একটা টুকিটাকি জিনিসও লাগবে—।'

শিকদার এক পা পিছিয়ে গেল। দেওয়ালের আয়নায় ফুটে ওঠা ওর অসংখ্য প্রতিবিম্ব ওকেই অস্বস্তিতে ফেলল যেন। একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনি কি চান করবেন না কি, ডক্টর দাশগুপ্ত?'

'না, না। আপনাকে বিব্রত করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

বাথটাবে যখন ইঞ্চিদুয়েক মতো জল জমল তখন আমি কল দুটো বন্ধ করে দিলাম। তারপর বেসিনের পাশের তাক থেকে মিসেস মেহতার হেয়ার ড্রায়ারটা তুলে

BanglaBook.org

নিলাম। সেটা শক্ত মুঠোয় ধরে ঘুরে তাকালাম শিকদারের দিকে।

'সার্জেন্ট, আপনি তো টিভিতে এঞ্জেল নার্সিংহোমের ছবিটা দেখেছেন। সেখানে রূপা এমন এক হাতের ভঙ্গি করেছিল যেন একটা দরজা খুলে পালাচ্ছে। ও পালাচ্ছিল ঠিকই, তবে দরজা খুলে না...।'

এই প্রথম আমার কথা শিকদারের কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকল। ওর ঠোঁটে নিভে যাওয়া সিগারেট। সতর্ক নজরে লক্ষ করছে আমাকে। আমি হেয়ার ড্রায়ারটা ডান হাতে নিয়ে প্লাগটা তুলে নিলাম বাঁ-হাতে।

'ধরে নেওয়া যাক, সেই শনিবার সকালে নবীন মেহতা এখানে স্নান করছিলেন। সওয়া আটটা নাগাদ রূপা আর বিজয় বাথরুমে এসে হাজির হল। কী করে ওরা দরজা খোলা পেল জানি না। হয়তো ওদের বরাবর শেখানো হয়েছে বিনা পারমিশনে বাবা-মায়ের ফ্ল্যাটে না ঢুকতে। তাই আপনার কথায় এই "জঘন্য বড়লোকেরা" হয়তো বাথরুমের দরজা ভেজিয়ে রেখেই স্নান করত। ফলে রূপা আর বিজয়ের বাথরুমে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ওরা বাবার কাছে কিছু একটা আব্দার করেছিল, আর নবীন মেহতা যথারীতি সে-আবদার মঞ্জুর করেননি। ওরা জানত যে, আবদার মঞ্জুর হবে না। তবুও বাবাকে একটা শেষ সুযোগ দিয়েছিল...।'

হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল সার্জেন্ট শিকদার। বলল, 'এটা তো স্রেফ আপনার আন্দাজ, ডাক্তারবাবু...।'

'হ্যাঁ, আন্দাজ। কিন্তু পরেরটুকু আর স্রেফ আন্দাজ নয়।' আমি হেয়ার ড্রায়ারটা আবার তাকে রেখে দিলাম। তারপর ঃ 'রূপা হেয়ার ড্রায়ারটা নিয়ে প্লাগটা সকেটে গুঁজে দিল। এই কাজটা করতে গিয়ে ওকে বেসিনের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল...।'

আমি প্লাগটা সকেটে গুঁজে দিলাম। দেখলাম, ঠিকমতো ওটা এঁটে বসেছে কিনা। এই ভঙ্গিটাই টিভি ফিল্মে দেখেছি আমরা। রূপার এই মূকাভিনয়ের ভঙ্গি কি আমি ভুলতে পারি!

সুইচ অন করতেই হেয়ার ড্রায়ার প্রাণ পেল। শনশন করে ঘুরতে শুরু করল ওর পাখা। গরম বাতাস এসে ঝাপটা মারল আমার চোখে-মুখে।

'পিস্তলের মতো এই হাতলটা বাঁ-হাতে ধরে রূপা হেয়ার ড্রায়ারটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরম বাতাসের হলকা এসে লাগছে ওর মুখে—চুল উড়ে পড়ছে কপালে। ও ডান হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিচ্ছে কপাল থেকে...।' আমি টিভি ফিল্মে দেখা রূপার ডান হাতের ভঙ্গিটা নকল করে দেখালাম। কপালে চুল উড়ে পড়ছিল, সেগুলো সরিয়ে দিলাম বারবার।

তারপর এক পা পিছিয়ে এসে হেয়ার ড্রায়ারটা ফেলে দিলাম বাথটাবে। একটা ভয় পাওয়ানো হিসহিস শব্দ হল, তারপর আগুনের ঝলক, চাপা শব্দ—বাথটাব কেঁপে উঠল ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে। দেওয়ালের আয়নায় আলোর ঝিলিক দেখা গেল, জল ছিটকে এল আমার গায়ে, শিকদারের গায়ে, এমনকী সিলিং-এও।

ফিউজ পুড়ে গিয়ে হেয়ার ড্রায়ারটা নিষ্পাপভাবে পড়ে রইল ফুটন্ত জলের তলায়। আমি প্লাগ পয়েন্টের সুইচ অফ করে প্লাগটা খুলে নিলাম সকেট থেকে। শিকদার বাথরুমের

BanglaBook.org

হ্যাঙার থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে মুখ-হাত মুছতে লাগল।

'হিসহিস শব্দটা শুনেছেন, সার্জেন্ট? বেচারি মেয়েটা এই শব্দটা জীবনে ভুলতে পারবে না। এই শব্দটা শোনার পর থেকে মনে হয় না আর কিছু ও ঠিকমতো শুনতে পায়।'

মুখ ব্যাজার করে হেয়ার ড্রায়ারটা বাথটাব থেকে তুলে নিল শিকদার। বলল, 'এ-শব্দ আমিও ভুলতে পারব না। সত্যি বলতে কি, প্লাগ লাগানোর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝেছিলাম, মেয়েটা মোটেই দরজা খুলছে না।'

আমি রূপার মনের অবস্থাটা ভাবছিলাম। দরজা খুলে পালালে কেউ ভয়ে বা মেন্টাল শকে বোবা হয়ে যায় না। সাঙ্ঘাতিক কোনও বিপন্ন অবস্থা না হলে সেটা মনের গভীরে এমন দাগ কাটতে পারে না। সে-কথাই শিকদারকে বললাম।

'বাচ্চা মেয়েটা জীবন-মরণ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সেদিন সকালে। ওর কাছে, মানে, ওর পক্ষে...।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিকদার বেশ সহজভাবেই বলল, '...বাবাকে খুন করাটা সত্যিই ওর পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যার চেয়েও বেশি।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, তবে আমার মনে হয় না খুনটা ও করেছে। হেয়ার ড্রায়ারের ইলেকট্রিক শক দিয়ে ও নবীন মেহতাকে অসাড় করে দিয়েছিল। তারপর ওর দাদা বিজয় ছুরি চালিয়ে বাবাকে খতম করেছে।'

সার্জেন্ট শিকদার ঝুঁকে পড়ে বাথটাবের জল বেরোনোর ছিপিটা খুলে দিল। কলকল শব্দে জল বেরিয়ে যেতে লাগল বাথটাব থেকে। কিছুক্ষণ জলপ্রবাহ দেখে আমার দিকে তাকাল শিকদার : 'তাহলে আপনার ধারণা, ওরা দুজনই সব প্ল্যান করেছে? ওই ভাই আর বোন মিলে?'

'হ্যাঁ, ওরা দুজনেই প্ল্যান করেছে। অমরাবতীর অন্যান্য খুনের বেলাতেও ঠিক একইরকমভাবে প্ল্যান করা হয়েছে। আপনি তো জানেন, শিকদার! প্রথমবার যখন এ-জায়গাটা আমি দেখতে আসি, তখন থেকেই তো আপনি সব জানেন—।'

'তাহলে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো, ডাক্তারবাবু। সত্যি-সত্যি অমরাবতীর খুনগুলো কে করেছে?'

'ওই ১৩টা ছেলেমেয়ে—এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। জানি, থিওরিটা উদ্ভট লাগছে। আমিও যে ওটা ঠিক মেনে নিতে পারছি তা নয়। কিন্তু এ ছাড়া এই রহস্যের আর কোনও উত্তর নেই। তা ছাড়া, কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, হয়তো কোনও প্রমাণ খুঁজেও পাব না। তা না পাই ক্ষতি নেই, কিন্তু অমরাবতীর প্রত্যেকটি লোককে ওই নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোই একে-একে নিকেশ করেছে।'

শিকদার চুপ। আমিও চুপ। শুধু বাথটাব দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া জলের শব্দ। আর আমাদের ঘিরে থাকা অসংখ্য প্রতিবিম্ব যেন নীরবে কথা বলছে।

সার্জেন্ট শিকদারকে দেখে মনে হচ্ছিল কী যেন একটা কুরে-কুরে খাচ্ছে ওকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলল, 'হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা মেনে নিতে কেমন কষ্ট হচ্ছে। একটা আট বছরের মেয়ে আর-একটা তেরো বছরের ছেলে। কোর্টে এটা দাঁড় করাতে আপনি হিমসিম খেয়ে যাবেন।'

BanglaBook.org

'হতে পারে, তবে বিজয় আর রূপা মেহতাই হচ্ছে ২৫ জুন সকালের ঘটনার মূলে। মনে রাখবেন ১৩ জন বাচ্চার মধ্যে ওরা দুজনই সবচেয়ে ছোট। তা ছাড়া, ওদের একটা বড় প্রবলেম ছিল : নবীন মেহতা বিশাল চেহারার শক্তিশালী লোক ছিলেন। রেগুলার ব্যায়াম-ট্যায়াম করতেন। বিজয়ের পক্ষে তাঁকে একা খতম করা সম্ভব ছিল না।'

'আর নবীন মেহতা যদি স্রেফ আহত হতেন, তা হলে হইচই বাধিয়ে অন্য বাবা-মায়েদের সাবধান করে দিতেন। সবাই বুঝে যেতেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তখন শুরু হত বাঁচার লড়াই। দরজায় কেউ তালা দিতেন, ছেলেকে স্টিয়ারিং-এ বসা দেখে গ্যারেজের দরজার সামনে কেউ দাঁড়াতেন না, কিংবা ব্যায়ামের সাইকেল চালু করতেন না। সব প্ল্যান একেবারে ভেস্তে যেত।'

'কারেক্ট। সুতরাং রূপা আর বিজয়ের সামনে দুটো চ্যালেঞ্জ ছিল। নবীন আর প্রিয়া মেহতাকে ওদেরই খুন করতে হয়েছে, আর খুব জলদি ওদের কাজ সারতে হয়েছে।'

'কিন্তু কেন বলুন তো? আর একটু বড়সড় ছেলেদের কেউ—ওই রজতকুমারের ছেলে সুকান্ত কিংবা ডক্টর প্রধানের ছেলে সুনীলই তো ওদের হয়ে মেহতাদের খুন করতে পারত...।'

শিকদার ইতিমধ্যে আবার সিগারেট ধরিয়েছে। ঘন-ঘন টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। ওর মুখে এই প্রথম কৌতূহলের স্পষ্ট ছায়া দেখলাম। ও অপেক্ষা করছে।

আমি একটু কেশে নিয়ে বললাম, 'বুঝতে পারছেন না, তাতে ওদের নীতির দিকটাই একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে এটাই ছিল ওদের চরম জেহাদ। ওদের চোখে অমরাবতীর এই খুনের ঘটনা গণজাগরণ, বিপ্লব, বিদ্রোহ—এসব ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ে তার বাবা-মাকে খুনের দায়িত্বে মরিয়া হয়ে সামিল হয়েছে—তার জন্যে ওদের যত চড়া দামই দিতে হোক না কেন।'

'কিন্তু খুনের কায়দাগুলো একবার ভেবে দেখুন, ডক্টর দাশগুপ্ত। ইলেকট্রিক শক, ফাঁস, গুলি, গাড়ির ধাক্কা। এজন্যেই প্রথমটায় মনে হয়েছিল এ কোনও পাগল প্রফেশনাল কিলারের কাজ।'

'আমিও সেরকমটাই ভেবেছিলাম, সার্জেন্ট। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, স্রেফ প্রয়োজন থেকেই এইসব বিচিত্র কায়দাকানুনের উৎপত্তি। প্রথম কথা হল, ওদের মধ্যে যাদের বয়েস কম তারা পিস্তল-বন্দুক ব্যবহার করা তো দূরের কথা, ওসব জিনিস কখনও চোখেও দেখেনি। তাছাড়া সাইকোলজিক্যাল ঝোঁক যাতে কেটে না যায় তার জন্যে খুনগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলাটা খুব জরুরি ছিল। সবসুদ্ধু ওরা হয়তো মাত্র দশ মিনিট সময় নিয়েছিল। তার মধ্যেই বেশ দক্ষতার সঙ্গে ঝটপট কাজ সেরে ফেলেছে। আসলে একটা ঘোরের মধ্যে কাজ করেছিল ওরা। কোটি টাকার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ওদের আর তর সইছিল না। সবকিছু মিলিয়ে একটা জটিল সাইকোলজিক্যাল মোমেন্টাম তৈরি হয়েছিল।'

শিকদার কী ভাবল, তারপর মাথা নাড়ল ধীরে-ধীরে। বলল, 'ভাবা যায়! একটা তেরো বছরের ছেলে রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে! এখানকার মায়েরা মোটেই আমাদের সনাতনী জননী ছিল না। দিব্যি তাকত ছিল গায়ে। সেখানে তারা

BanglaBook.org

একেবারে কোনওরকম শোরগোল তুলতে পারেনি এটা কি বিশ্বাস হয়?'

'সেটাই তো আমি বলতে চাইছি, সার্জেন্ট। একবার ভাবুন তো, যে আপনাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে, তাকে আপনি খুন করতে চাইছেন। তখন খুন করার ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি আপনাকে সেরে ফেলতে হবে যে, ভাববার কোনও সময় যেন আপনার হাতে না থাকে।'

'তার মানে পয়লা মওকাতেই কিস্তিমাত করতে হবে। এর জন্যে তো প্ল্যানিং দরকার। বাচ্চাগুলো আর কারও সাহায্য ছাড়াই এভাবে কাজ হাসিল করেছে এটা মানতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট হলেও উপায় নেই, সার্জেন্ট শিকদার। আমি শিওর যে, ওরা নিজেরাই কাজ হাসিল করেছে। শনিবার সকাল আটটা নাগাদ ওরা মা-বাবাদের খুন করেছে। আর কেউ ওদের হেল্প করেনি। খুন করার পর মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওরা অমরাবতী থেকে চম্পট দিয়েছে। হয়তো এর জন্যে আগে থেকে কোনও ট্যুরিস্ট বাস ভাড়া করে রেখেছিল।'

'বাস চালাবে কে? ড্রাইভার?'

'তার কী দরকার। ওরা নিজেরাই পালা করে চালাবে।'

'কিন্তু ওদের বয়েসটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ডক্টর দাশগুপ্ত। আমাদের এখানে এখনও আঠেরো বছর না হলে হেভি ভেহিকল ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয় না।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'দেশটার নাম ভারত, আর শহরটার নাম কলকাতা। এখানে পকেটে টাকা থাকলে দু-পাঁচ বছরটা কোনও ব্যাপার নয়।'

'ওরা তাহলে এখন কোথায়?'

'কে জানে কোথায়! হয়তো কোনও নির্জন গ্রামে লুকিয়ে বসে আছে। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে একসঙ্গে না থেকে হয়তো চার-পাঁচটা দলে ভাগ হয়ে গেছে। চুপচাপ অপেক্ষা করছে। ওরা জানে, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে, সব চাপা পড়ে যাবে।'

'তাহলে আর ওদের খোঁজ পাওয়া যাবে না?'

'না, সার্জেন্ট, পাওয়া যাবে। কারণ এই ধরনের মানসিক অবস্থার মধ্যে যারা একবার পড়েছে তারা সহজে তা থেকে বেরোতে পারে না। ওদের মগজে যে-পরিমাণ বিদ্রোহের বারুদ বছরের পর বছর ধরে ঠাসা হয়ে আছে তাতে আবার ওরা হিংস্র হয়ে উঠবে। খতমের খেলা ওদের নেশা হয়ে দাঁড়াবে। সেইজন্যে ওদের এগেইনস্টে কেসটা যতই জোরদার করা যায় ততই মঙ্গল। ডেপুটি কমিশনারের কাছে সব জানানোর সময়ে ব্যাপারটা জোর দিয়ে বোঝাতে হবে।'

শিকদার শাওয়ারের পরদাটা টেনে দিল। যেন নবীন মেহতার মৃতদেহটা আড়াল করতে চাইছে। তারপর আপনমনে মাথা নেড়ে বলল, 'শুধু একটা প্রশ্ন, ডাক্তারবাবু। ধরে নিলাম যে, ওই ছেলেমেয়েগুলো বেশ প্ল্যান-ট্যান করে ওদের বাবা-মাকে খুন করেছে। কিন্তু কেন? সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের কোনও ব্যাপার ছিল না, মারধর বা শাস্তি দেওয়ার ঘটনাও ছিল বলে আমরা খবর পাইনি। অত্যাচার যদি কিছু এখানে হয়েই থাকে তা হলে এসব ধরনের অত্যাচার হওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। অথচ তার চিহ্নমাত্রও আমরা

BanglaBook.org

কোথাও দেখতে পাইনি।'

'দেখতে পাবও না। কারণ অমরাবতীর ছেলেমেয়েরা মারধর বা সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের জন্যে বিদ্রোহ করেনি। বরং তার ঠিক উলটো, সার্জেন্ট। ওদের জেহাদ ছিল দম-আটকানো দয়া আর মমতার বিরুদ্ধে। স্নেহ-ভালোবাসা আর লালটু আদরের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই ওরা খুন করেছে।

অমরাবতী হত্যাকাণ্ড : প্রমাণ

পরের তিন-তিনটে দিন সার্জেন্ট শিকদারের সঙ্গেই কেটে গেল আমার। দুজনে মিলে প্রচুর মেহনত করে অমরাবতীর কেস সাজালাম। কিন্তু এরকম একটা অপ্রত্যাশিত সমাধান হোম ডিপার্টমেন্ট বা লালবাজার সহজে মেনে নিতে পারবে বলে মনে হয় না।

প্রতিদিন নানা ফাইল ঘেঁটে, লালবাজারের এভিডেন্স আর্কাইভে রাখা অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে চেষ্টা করলাম ভদ্রস্থ একটা কেস দাঁড় করাতে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, অমরাবতী এস্টেট থেকে দূরে সরে এসে খুনের মোটিভটাকে আমি যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। ওই ছেলেমেয়েগুলোকে যত বেশি ভালোবাসা আদর-যত্নে মানুষ করা হচ্ছিল ওরা যেন ততই খেপে উঠছিল মুক্তি পাওয়ার জন্যে।

আমার যুক্তিগুলো কতটা পলকা আর খেলো শোনাচ্ছে সেটা বোঝার জন্যেই যেন সার্জেন্ট শিকদারকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললাম, 'রূপা মেহতার কথাই ধরা যাক। ও যে চালু হেয়ার ড্রায়ারটা নবীন মেহতার বাথটাবে ফেলে দিয়েছিল তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই আট বছরের বাচ্চা মেয়েটা জেনেশুনে বাবাকে খুন করতে চেয়েছে এটা ভাবতেই এত উদ্ভট লাগছে যে, অন্য উদ্ভট থিওরিগুলো তখন মাথায় ঢুকে পড়তে চাইছে।'

'যেমন?'

প্রোজেক্টর স্ক্রিনের সামনে একগাদা স্লাইড আর তিনটে ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল শিকদার। প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

'যেমন, মেয়েটা হয়তো বাবার চুল শুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে হেয়ার ড্রায়ারটা ওর হাত ফসকে পড়ে যায় বাথটাবে। তাতে রূপা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তখন ওর দাদা ব্যাপারটাকে সুইসাইডের মতো করে সাজাতে চেষ্টা করে। কে জানে, সত্যিই হয়তো ব্যাপারটা সুইসাইড! রূপা আর বিজয়া, নেহাতই অ্যাকসিডেন্টালি বাথরুমে ঢুকে পড়ে...।'

'ও, তাহলে নবীন মেহতা প্রথমে ইলেকট্রিক শক খেয়ে নিজেকে অসাড় করে নেন—যাতে যন্ত্রণা কম-কম হয়—তারপর বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করেন?'

'কিংবা প্রিয়া মেহতাই হয়তো খুন করেছেন স্বামীকে—তারপর মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছেন? উঁহু, বুঝতে পারছি, থিওরিটা অবাস্তব মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের থিওরিটা যে আরও অবাস্তব।'

'অবাস্তব হলেও সেটা থেকে অন্য খুনগুলোর একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া

BanglaBook.org

যাচ্ছে। এই ভিডিও-টেপটা দেখুন, ডক্টর দাশগুপ্ত...।' প্রোজেক্টর অন করে ছবি দেখাতে শুরু করল শিকদার : 'এটা গেট-হাউসের টিভি মনিটরের ভিডিও রেকর্ডিং। মনিটরিং সিস্টেমটা স্যাবোটাজ করা হয় সকাল ৮টা ২৩ মিনিটে। মেইন কেবল আর সমস্ত টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়। এই টেপে ঠিক তার আগের কিছু সিকোয়েন্স তোলা আছে।'

সেই মর্মান্তিক সকালের দৃশ্য ফুটে উঠল ভিডিওর ছবিতে। নির্জন অ্যাভিনিউ, নির্জন লন, জনহীন প্রতিটি পথ। অমরাবতীর কোটিপতিরা কেউ এখনও বিছানায়, কেউ বা ব্রেকফাস্টের টেবিলে, আবার কেউ হয়তো স্নান করছেন বাথটাবে—শেষবারের মতো।

শিকদার বলল, 'টেপের টাইম কোড থেকে দেখা যাচ্ছে সময় তখন আটটা বাইশ। এই টেপ শেষ হওয়ার সম্ভবত তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই গেট-হাউসের সিকিওরিটি গার্ড অলকেশ হাজরা খুন হয়। ওর পকেটে যে-অটোমেটিক পকেট রেকর্ডার ছিল তার ক্যাসেট থেকে আর-একজন যে সিকিওরিটি গার্ড, সোমনাথ ঘোষ, তার গলা পাওয়া গেছে। অমরাবতীর পিছন দিকের সিকিওরিটি পোস্ট থেকে সোমনাথ ঘোষ ক্যামেরার গোলমালের ব্যাপারটা জানতে চাইছিল হাজরার কাছে। ওদের দুজনের মধ্যে ওয়ারলেস যোগাযোগ ছিল, আর ওয়ারলেসে ওদের যা কথাবার্তা হত তার সবটাই অটোমেটিক টেপরেকর্ডারে রেকর্ড হয়ে যেত। ওদের দুজনের পকেটেই এরকম রেকর্ডার থাকত। ক্যামেরা ফেইল করার তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই ক্রসবো-র তীরে ঘোষ খুন হয়।'

'তাহলে বলছেন, এই দুটো খুন দিয়েই শুরু হয়েছিল, অমরাবতীর গণহত্যা?'

'আমি বলছি না, ওপরতলার হোমরা-চোমরা অফিসারদের তাই ধারণা। তাঁরা বলছেন, হাজরা আর ঘোষের মার্ডার দুটোই নাকি ছিল সিগনাল। গ্যাং-এর অন্য সবাই তখন অ্যাটাক করার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সিগন্যাল পেয়েই তারা কাজে নেমে পড়ে।'

'হতেও পারে। কাউকে না কাউকে তো শুরুর সিগনালটা দিতে হবে...।'

'তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু টেপে আর একটু আগে কী আছে দেখুন...।'

শিকদার টেপটা রিওয়াইন্ড করতে লাগল। ছবি ছুটতে লাগল পিছন দিকে। অমরাবতী এস্টেটের পরিচিত শান্ত দৃশ্য পিছু হটতে লাগল। একটা সবুজ টিয়া অ্যাভিনিউ ধরে উলটো দিকে উড়ে গেল। যেন মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে না চেয়ে পিছু হটছে। অমরাবতী এস্টেটে সময় খুশিমতো এগিয়ে চলে, পিছু হটে। এখানকার বাসিন্দারা অতীত-ভবিষ্যৎকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের গড়ে তোলা আদর্শ সুখের জগতে বাস করতেন। দুর্ঘটনাবিহীন, নির্বিঘ্ন, সভ্য হাই-টেক জীবন ছিল তাঁদের। সেদিক থেকে এই ছেলেমেয়েগুলো যেন হঠাৎই বাস্তবের অচল ঘড়িটায় দম দিয়ে বাবা-মায়েদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, এই পৃথিবীতে কারও জীবনই বিচ্ছিন্ন নয়। বোধহয় মৃত্যুও।

পরদার দিকে আঙুল দেখিয়ে শিকদার বলল, 'মেহতাদের বাড়ি। সময় মোটামুটি আটটা উনিশ।'

BanglaBook.org

আমি মনোযোগ দিয়ে পরদার ছবি দেখতে লাগলাম। গোয়েন্দা-ক্যামেরা যেন একঘেয়েমি কাটাতেই মেহতাদের বাড়িটা ক্রোজআপে স্ক্যান করতে লাগল। হাই-টেক ক্যামেরার সুপার লেন্স সিস্টেম প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি কী সুন্দর নিখুঁতভাবেই না ধরছে! লাউঞ্জ, ডাইনিং-রুমের কাচের জানলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্যামেরা। ঘরের ভেতরে সাজানো ফার্নিচারও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা কোয়ার্জ ঘড়ি টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। তাতে সময় দেখা যাচ্ছে : আটটা কুড়ি।

আমি একরকম আপনমনেই মন্তব্য করলাম : 'এখানে তো সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। সিগনালের জন্যে খুনিদের কেউ তো অপেক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে না...।'

'দাঁড়ান, ডাক্তারবাবু—খুনিদের এখুনি দেখতে পাবেন।'

ক্যামেরা স্টাডির জানলা ছুঁয়ে গেল। বুকশেলফের গাঢ় রঙের জন্যে ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আলোছায়ার জটিল খেলার মধ্যেও একটা বাচ্চার ছবি দেখতে পেলাম।

'দাঁড়ান, সার্জেন্ট, ছবিটা থামান এখানে—।'

'ও, আপনার চোখে পড়েছে তাহলে...।'

ছবিটা থামাল শিকদার। তারপর কীসব বোতাম টিপে ফ্রেমটা এনলার্জ করে দিল। আর তখনই আমি রূপা মেহতাকে দেখতে পেলাম।

মেয়েটা জানলার কাছে একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর হাঁটু জানলার চৌকাঠে ঠেকে আছে। মাথার চুল অগোছালো হয়ে কপাল আর চোখের খানিকটা ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু ওর ঠোঁটে একচিলতে চাপা হাসি। যে-হাসির অর্থ হল, মেয়েটা সব জানে। ওর নজর অ্যাভিনিউর ওপারের বাড়িটার দিকে।

বাচ্চা মেয়েটার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ওর দাদা বিজয়। বিজয়ের মুখের ওপরে গাছপালার আবছা প্রতিবিম্ব পড়ায় মুখটা রহস্যময় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। ওর চোখও উলটো দিকের বাড়ির দিকে। বিজয় আর রূপার মাঝখানে রয়েছে একটা ডেস্ক-টপ টিভি, তাতে গেট-হাউসের সিকিওরিটি মনিটরের ছবি ধরা পড়েছে।

শিকদারকে বললাম, 'আমরা এখন যে-ছবি দেখছি সেটাই ওদের ওই ডেস্ক-টপ টিভিতে ধরা পড়েছে। হয়তো ওরা কিছু একটা দেখেছে—তাই সবাইকে সাবধান করে দিতে চাইছে...।'

'না। ওরা অপেক্ষা করছে, কখন টিভির ছবি মুছে যাবে। এরাই আপনার ওই গুরুর সিগনালটা দিয়েছে।' শিকদার ছবিটাকে স্লো মোশনে চালাতে লাগল। বিজয় এগিয়ে এল জানলার কাছে, বোনের ঠিক পিছনটায় দাঁড়াল। তারপর ওরা দুজনে হাতে হাত মিলিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল। যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি।

'এবার ভালো করে লক্ষ করুন, ডক্টর দাশগুপ্ত...।'

দাদার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মেয়েটা হাতটা একটু ওপরে তুলল। তখনই ওর দেহটা ঝুঁকে এল জানলার কাচের দিকে। জামার নিচের দিকটা একটু ছড়িয়ে গেল। দেখা গেল, কোমরের ঠিক নিচে লাল রঙের দুটো ফুলের নকশা আঁকা আছে।

'ওগুলো রক্তমাখা হাতের ছাপ।' শিকদার চাপা গলায় বলল, 'ওর বাবার ব্লাড

BanglaBook.org

গ্রুপের রক্ত। ২৯ আগস্ট রূপাকে যখন শেয়ালদা স্টেশনে পাওয়া যায় তখনও ওর জামায় এই ছাপ দুটো ছিল।'

আমি হতবাক হয়ে দেখছিলাম। ফুলের পাঁচটা পাপড়ির মতো কচি-কচি পাঁচটা আঙুলের ছাপ। রক্তের ছাপ।

'তার মানে তখন নবীন মেহতা আর প্রিয়া মেহতা শেষ। বিজয় আর রূপাই প্রথম খুনের হাতেখড়ি দিয়েছে। তারপর নিচে নেমে এসে অন্য খোকা-খুকুদের সিগনাল দিয়েছে। ওদের সাকসেসের ওপরে বাকি ব্যাপারটা ডিপেন্ড করছিল।'

শিকদার মাথা নাড়ল, বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। ওরা কোনদিকে তাকিয়ে আছে দেখেছেন? রাস্তার ওপারে বিন্দিয়া শর্মার বেডরুমের জানলার দিকে। ওদের কাছ থেকে পজিটিভ সিগনাল পেয়ে বিন্দিয়াই বোধহয় টিভি আর টেলিকোন কেব্‌ল কেটে দেওয়ার সিগনাল দিয়েছে।'

'তখনই সব টিভি মনিটরের ছবি মুছে গেছে, আর শুরু হয়ে গেছে খুন-খুন খেলা।' কথাটা বলে আমি প্রোজেক্টরের কাছে এগিয়ে গেলাম। বাচ্চাটার হাতের ফুলের মতো প্রিন্ট দেখতে লাগলাম। আপনমনেই বিড়বিড় করে বললাম, 'মেয়েটা তাহলে জামায় হাত মুছেছে। দাদা যখন বাবাকে বাথটবে খতম করছে তখন ও জামায় হাত মুছছে।' গলার স্বর উঁচু করে বললাম, 'ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোকজন এটা দেখে কী বলছে?'

'ওদের সেরকম কোনও মাথাব্যথাই নেই। ওরা বলছে ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে স্টাডিতে বন্দি করে রেখেছিল খুনিরা। ওরা তাই জানলার কাছে এসে সাহায্য চেয়ে ইশারা করছে।'

'সে কী! ওরা দেখতে পায়নি মেয়েটা হাসছে? মানছি, খুব চাপা হাসি—কিন্তু হাসি বলে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে!'

শিকদার ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'কোথায় লাগে মোনালিসা! মেয়েটার মনের জোর আছে। কিন্তু ও পালিয়ে এল কেন বলুন তো?'

দিনের-পর-দিন একসঙ্গে কাজ করে এই তরুণ সার্জেন্টটির সঙ্গে আমার কীরকম যেন একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল। ওর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে ভালো লাগছিল আমার।

'সার্জেন্ট, এটা ভুলে যাবেন না, রূপার বয়েস মাত্র আট বছর। বাকি সবাই কিন্তু টিনএজার হয়ে গেছে। অমরাবতী এস্টেটে রবিঠাকুরের তোতাকাহিনির মতো পরম স্নেহ, যত্ন, আর ভালোবাসা সকাল-সন্ধে গুঁজে দেওয়া হত বাচ্চাগুলোর গলা দিয়ে। নিয়মমাফিক আদর-যত্নই ছিল ওদের প্রধান খাদ্য। অমরাবতীর বাবা-মায়েরা বাচ্চা মানুষ করার আদর্শ অথচ অস্বাভাবিক এই থিওরিটাই বেছে নিয়েছিলেন। অথচ বাচ্চারা মনেপ্রাণে স্বাভাবিক জীবন চাইছিল। চাইছিল একটু বকাঝকা, মারধর কান্নাকাটি, বিরক্তি, ভুল-বোঝাবুঝি—সোজা কথায় ওরা দেবশিশু হতে চায়নি, সাধারণ মানবশিশু হতে চাইছিল। ওরা চায়নি যে, বাবা-মায়েরা ওদের প্রতিটি কাজের প্রশংসা করুক—মেকি প্রশংসা। ওরা চায়নি, ওদের রোজকার প্রতিটি মুহূর্ত ছক-বাঁধা নিখুঁত নিয়মে চলুক। ওরা স্বাভাবিক—মানে, একটু-আধটু এলোমেলো ওলটপালট জীবন চাইছিল।'

BanglaBook.org

'আর রূপা মেহতা?'

'ওর তো বয়েস মাত্র আট বছর। এ-বয়েসে সবাই আদর চায়, ভালোবাসা চায়, চায় কারও ওপরে নির্ভর করতে—' কথা বলতে-বলতে পরদার কাছে গিয়ে আমি হাসিমুখ মেয়েটার উজ্জ্বল ছবির ওপরে হাত রাখলাম : 'ও সবকিছুর শুরু করেছে, সুইচ টিপে খুনের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, কিন্তু ও দলের পাণ্ডা নয়। অমরাবতীর আদর-যত্নের দিনগুলোর কথা, স্নেহ-মায়া-মমতার দিনগুলোর কথা ওরই তো সবচেয়ে বেশি মনে পড়বে। সেই দিনগুলোর জন্যে ওর যে আপসোস হবে এটাই তো স্বাভাবিক। নিন, সার্জেন্ট, আর কী-কী দেখার আছে দেখে নিই।...আসলে অমরাবতীর ঘটনার প্ল্যান করেছে রূপার চেয়ে বেশি বয়েসের, অনেক বেশি বিপজ্জনক মাথা।'

অমরাবতীর দেবশিশুরা

এরপর বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সার্জেন্ট শিকদার আমাকে ব্যস্ত রাখল পুলিশি তদন্তের নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়ে : ফিল্ম, স্লাইড, ভিডিও, ফটোগ্রাফ, আরও কত কী। এসবের মধ্যে অমরাবতীর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বহু তথ্য রয়েছে : ওরা কেমন ধরনের, ছোটবেলা থেকে কীভাবে ওরা বড় হয়েছে, ওরা কীভাবে জীবন কাটাত, ওদের শখ-আহ্লাদ কী ছিল। শিকদারের দেখানো বস্তুগুলো ঘেঁটে এসব সম্পর্কে বেশ ভালোরকম আন্দাজ পাওয়া গেল।

সব মিলিয়ে যে-সুন্দর ছবিটা ফুটে ওঠে তাতে মানতেই হয়, অমরাবতীর ১৩ জন ছেলেমেয়ে ভীষণ ভালো, বুদ্ধিমান, পড়াশোনা আর খেলাধুলোয় বেশ তুখোড়। ফটোগ্রাফে ওদের নিষ্পাপ মুখগুলো যেন পবিত্র দেবশিশুর ছবি। কেউ স্কুলের পোশাকে দাঁড়িয়ে, কেউ বা ভিজে সাঁতারের পোশাকে সুইমিং পুলের পাড়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাত নাড়ছে—বোধহয় বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে দক্ষতার তৃপ্ত হাসি উপহার দিচ্ছে। তিনজনের ছবি দেখলাম অ্যাথলিটের পোশাকে—হয়তো অমরাবতীর স্পোর্টসের সময় তোলা।

ছবিগুলো দেখতে-দেখতে আমার মনে হল, এইসব হাসিখুশি হই-হল্লোড়ের মধ্যেই হয়তো ওদের নিরুদ্দেশ হওয়ার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। না-পসন্দ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ওরা হয়তো এভাবেই তলে-তলে নিজেদের তৈরি করেছিল।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম : বছরখানেক ধরে ছেলেমেয়েগুলো বাইরের খেলাধুলো থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে অন্দরমহলে মন দিয়েছিল। ওদের ডায়েরি, ওদের তোলা ভিডিও ছবি থেকে ব্যাপারটা বোঝা যায়। তা ছাড়া, একটা পত্রিকা পাওয়া গেছে—নাম 'অমরাবতী অ্যাগনি'। বিচিত্র নামের এই পত্রিকাটা পনেরো বছরের বিনোদ আগরওয়াল তার ডেস্ক-টপ কম্পিউটারে ছাপিয়ে বের করত। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল তেরো, ফলে তেরো কপিই মাত্র ছাপা হত।

এইভাবে ছেলেমেয়েদের মনের অন্দরমহলের এক অন্ধকার নিজস্ব জগৎ ক্রমে প্রকাশিত হল।

BanglaBook.org

গত বছরের শীতের শুরু থেকেই ওরা বাইরের খেলাধুলো পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে দিনের প্রায় সারাটা সময়ই কাটিয়ে দিত যার-যার ঘরে। এত সূক্ষ্মভাবে ধীরে-ধীরে ওরা অভ্যেসটা পালটেছে যে, ব্যাপারটা কারও চোখে লাগেনি। তবে সাক্ষি দিতে গিয়ে দুজন কাজের লোক বলেছে, ইদানিং বাচ্চাদের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বেশ ঝামেলা হচ্ছিল।

রিটা (মিসেস রিটা ডিসুজা) : বাঁশ, নাইলনের দড়ি, স্প্রিং, তার, লোহার রড এসব দিয়ে চন্দ্র কী একটা পিকিউলিয়ার খেলনা তৈরি করছিল। আমি একদিন ওটা বিছানা থেকে সরিয়ে মেঝেতে রাখতে গেছি, ওটা খটাস করে এঁটে বসল আমার গায়ে। চন্দ্র ছুটে এসে আমাকে ছাড়ায়। মিস্টার বাগচি ব্যাপারটা জানতে পেরে চন্দ্রনাথকে আদর করে বলেন আমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে। ও হাসিমুখে বাবার কথা শুনেছিল।

নীলিমা (মিস নীলিমা দাস) : অনির্বাণ সবসময়েই ওর কম্পিউটার নিয়ে কীসব করত। কোনও সময়েই ওর ঘর কাজের জন্যে খালি পাওয়া যেত না। তখন আমি মিসেস সেনকে বলেছিলাম আমার কাজের সময় ঠিক করে সেটা অনির্বাণকে বলে দিতে।

বাইরের জগৎ থেকে এইভাবে ওরা নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ায় ওদের যে-সামান্য কয়েকজন হাতে-গোনা বন্ধু ছিল তারাও আসা-যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল। বন্ধুদের দু-একজন এরকম মন্তব্যও করেছে যে, 'ওরা নিজেদের মধ্যে সবসময় গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করত, নিজেদের নিয়েই মেতে থাকত। আর নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় একটা অদ্ভুত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলত, যেন আমরা কেউই না।'

খোঁজখবর করে জানা গেছে, অমরাবতীর প্রায় প্রত্যেকটা ছেলেমেয়েই ডায়েরি লিখত। তার মধ্যে কেউ-কেউ আবার ডায়েরি লেখার কাজটা সেরে নিত কম্পিউটারে বা ওয়ার্ড প্রসেসরে। কিন্তু ২৫ জুনের আগে প্রায় সব ডায়েরিই লোপাট হয়ে গেছে। হয় পেপার শ্রেডারে দিয়ে সেগুলোকে কুচিকুচি করে ফেলা হয়েছে, অথবা কম্পিউটারের ফাইল মুছে ফেলা হয়েছে সযত্নে।

কিন্তু বিন্দিয়া শর্মা আর মালতী শর্মার গোপন ডায়েরি খুঁজে পাওয়া গেছে। ওদের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পিছনে প্যানেলের ফাঁকে লুকোনো ছিল। অমরাবতী রহস্যের ব্যাপারে এই ডায়েরি থেকে সরাসরি সাহায্য পাওয়া গেছে এমন নয়। কিন্তু ডায়েরিতে ওরা এমন এক জীবনযাপনের কথা কল্পনা করেছে যা অমরাবতীর সাজানো অতি-সভ্য বিলাসবহুল জীবনের থেকে একেবারে আলাদা।

বিন্দিয়ার ঘরে হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুধাকর মূলের 'দো বহেন' উপন্যাসটি পাওয়া গিয়েছিল। সেই উপন্যাসে এক পুরনো আমলের রাজবাড়ির দু-বোনের কথা লেখা আছে। উপন্যাসটির নাম তদন্তকারী অফিসারদের আগ্রহী করে তুলেছিল। তাঁরা ওটা পড়ে তার সারমর্ম লিখে রেখেছিলেন ইংরেজিতে। আমি সেটা পড়েছি।

বিন্দিয়া আর মালতীর ডায়েরি পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায়, 'দো বহেন' উপন্যাসকে মনে রেখেই ওরা অমরাবতীর নতুন জীবনের কথা কল্পনা করেছে। শুধু মোটা দাগের

BanglaBook.org

চড়া সেক্স ঢুকিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে। স্যাডিজ্‌মও বাদ যায়নি সেখানে। এমনকী সোডোমির ঝোঁকও রয়েছে জায়গায়-জায়গায়।

সব মিলিয়ে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই কিশোরী দুজন নিরুপদ্রব মেকি জগৎ থেকে চলে আসতে চাইছিল বাস্তবের নিষ্ঠুর শরীরী জগতে।

অমরাবতীর অন্য বাচ্চারাও মুক্তি চাইছিল। সেটা ওদের বিভিন্ন হবির ধরন দেখে বোঝা গেছে। যেমন, শুভ্র দাশশর্মা দিনরাত ওয়াকম্যান, ওয়ারলেস, রেডিও এসব নিয়ে মাথা ঘামাত। ও একটা হাই-পাওয়ার রেডিও অ্যানটেনা বাড়ির ছাদে বসিয়ে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল। অমরাবতীর টিভি সিকিওরিটি সিস্টেমের সঙ্গে যখন ওটার ইন্টারফিয়ারেন্স হয় তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ে।

একইরকম অস্থির চাপ লক্ষ করা গেছে 'অমরাবতী অ্যাগনি'-র পাতায়। গত মার্চ ও জুনের মধ্যে যে-সংখ্যাটি বিনোদ আগরওয়াল কম্পিউটারে ছাপিয়ে ১৩ জন পাঠক পাঠিকার মধ্যে বিলি করেছিল তার একমাত্র বিশেষত্ব ছিল বস্তাপচা একঘেয়ে খবর। যেমন, ওই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার দুটো হেডলাইনের তর্জমা করলে দাঁড়ায় : 'আপনি কি জানেন, জলের চেয়ে লোহার ঘনত্ব বেশি?' ও 'মেঘ সবসময় আকাশে থাকে।'

অনির্বাণ সেন কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করে 'পাই-এর মান দশমিকের পর এককোটি ঘর পর্যন্ত বের করেছে। তারপর প্রিন্টারে প্রিন্টআউট নিয়ে সেই কাগজ সেঁটে তার ঘরের চারটে দেওয়ালই প্রায় ঢেকে ফেলেছে। বাবা-মা তাকে এ-কাজ থেকে নিরস্ত করলে পর সে 'রেডিও ফ্রি অমরাবতী' নামে একটা অডিও প্রোগ্রাম চালু করে। গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনির্বাণ এরকম ছ'টা প্রোগ্রাম ক্যাসেট তৈরি করে অমরাবতীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলি করেছিল। প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু ছিল এলোমেলো শব্দ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনির্বাণের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ—আর মাঝে-মাঝে দীর্ঘ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

জয়িতা সেন আর সুকান্ত দত্তগুপ্ত মিলে একটা অদ্ভুত ভিডিও ফিল্ম তুলেছিল। সেই ফিল্মটার মধ্যেই এসব চাপা অস্থিরতার মূল রহস্যটা খুঁজে পাওয়া গেছে বলে আমার ধারণা। ১৭ মিনিট দীর্ঘ এই ছবিটা প্রথমটায় দেখে মনে হবে, অমরাবতীর দৈনন্দিন জীবন নিয়ে সাদামাটা একটা ডকুমেন্টারি। এই ডকুমেন্টারি তোলার সময়ে বাবা-মায়েরা মারফির বইয়ের নির্দেশ মতো খুশিমনে সাহায্য করেছিলেন। ডকুমেন্টারির ধরনটা অনেকটা যেন কোনও এস্টেট ডিলারের প্রোমোশনাল ভিডিওর মতো। এতে একের পর এক রঙিন দৃশ্যে রয়েছে, বাবা-মায়েরা ড্রইংরুমে বসে আছেন, ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছেন, গাড়ি পার্ক করছেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। ফিল্মের ধারাভাষ্য বেশ চমৎকার—উষ্ণ, আন্তরিক। তবে মাঝে-মাঝে বাবা-মায়েদের নিয়ে সামান্য মজাও করেছে ওরা। যেমন, নাচের রেওয়াজের সময়ে মল্লিকা সেন স্টেপ ভুল করে পড়ে যাওয়ার পর ক্যামেরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর হতভম্ব অসহায় অবস্থা দেখিয়েছে। আবার প্রকাশ মিত্রের হাত থেকে জলের গ্লাস পড়ে যাওয়ার ঘটনা দেখানো হয়েছে স্লো মোশনে।

এই ফিল্মের নির্বাচিত অংশ বাবা-মায়েদের দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া,

অমরাবতীর অতিথিদের ফিল্মটা প্রায়ই দেখানো হত। কিন্তু ১৩ জন ছেলেমেয়ে ফিল্মটার যে-সংস্করণ গোপনে দেখত সেটা অনেক আলাদা। এটার সাউন্ড-ট্র্যাকটা একইরকম, তবে সুকান্ত আর জয়িতা প্রায় ২৫ সেকেন্ড মতো বাড়তি ফুটেজ জুড়ে দিয়েছে আগের ১৭ মিনিটের সঙ্গে। ছবির জায়গায়-জায়গায় জুড়ে দেওয়া অংশগুলোর বিষয় হল, গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট, জেলখানা, ইলেকট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার, কঙ্কালের মাথা ও কাটাকুটি হাড়—নীচে লেখা 'বিপদ', আর মারদাঙ্গা গুলিগোলার ছবি। এসবের বেশিরভাগই টিভির ডকুমেন্টারি, নিউজ প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন সিনেমা থেকে বাছাই করা। কিন্তু বাবা-মায়েদের নিয়ে তোলা তথ্যচিত্রের ফাঁকে-ফাঁকে এইসব ছবি জুড়ে দেওয়ায় গোটা ভিডিও ফিল্মের চরিত্রটাই গেছে পালটে। স্পষ্ট বোঝা যায়, এর মধ্যে কোথায় যেন উদ্ধত বেপরোয়া এক হুমকি লুকিয়ে রয়েছে।

২৫ জুনের আগেই এই ভিডিও টেপের প্রায় সব কপি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শুধু একটা ক্যাসেট পাওয়া গেছে প্রধানদের শোওয়ার ঘরের সিন্দুকে। জানি না, এই ফিল্ম দেখে সাইকিয়াট্রিস্ট দুজন কী ভেবেছিলেন। কিন্তু ফিল্মটা দেখে আমার মনে হল, স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা কীরকম খেপে উঠতে পারে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ফিল্মটার মধ্যে রয়েছে। তা ছাড়া, অঢেল টাকা আর আধুনিক হাই-টেক সভ্যতা এই আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র, আরও ধারালো, আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে।

ছবিটা শেষ হওয়ার পর আমি সার্জেন্ট শিকদারকে বললাম, 'অদ্ভুত ফিল্ম, সার্জেন্ট। এ থেকেই গোটা ব্যাপারটা দিব্যি ফুটে উঠছে।'

'সুকান্ত ছেলেটা কি দলের পাণ্ডা হতে পারে? একে তো ওর বয়েস বেশি, তার ওপর...।'

'হতে পারে। তবে কোনও একটা ব্যাপার হঠাৎ করে ওদের খুনের প্ল্যান করতে উসকে দিয়েছে।'

'ফিল্মটা যেন একেবারে অমরাবতীর খুনের ব্লু-প্রিন্ট। গুলি, গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট, ইলেকট্রিক শক...' সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিয়ে হোঁচট খেল শিকদার।

'শিকদার, আমার মনে হয়, অমরাবতী নিয়ে টেলিফিল্ম তোলার পরিকল্পনাটাই বাচ্চাগুলোকে বেপরোয়া করে তোলে। ২৫ জুন ওই প্রোডিউসারের আসার কথা ছিল। ওরা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছিল, যদি ওই ফিল্ম তোলা হয় তা হলে ক্যামেরার সামনে ওদের সত্যি-সত্যি অভিনয় করতে হবে। দেখাতে হবে, অমরাবতীতে বাবা-মায়ের স্নেহ-মমতার তথাকথিত ছায়ায় ওরা কত না সুখী। আগাপাস্তলা মেকি ফাঁপা এই ব্যাপারটাই ওদের ঘেন্নার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরা মরিয়া হয়ে একেবারে খেপে উঠেছিল। বুঝেছিল, এতদিনের মিথ্যের পিছনে এইবার সত্যি-সত্যি একটা ফুলস্টপ বসানো দরকার...।'

শিকদার ওর স্বভাবসিদ্ধ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মন্তব্য করল : 'সেটাই ওরা বসিয়ে দিল রক্তের ফোঁটা দিয়ে—।'

পরদায় তখন ক্রেডিট টাইটেল ফুটে উঠছে। পটভূমিতে অমরাবতীর প্রশান্ত ছবি।

আমি রূপা মেহতার কথা ভাবছিলাম—আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তা হলে বাচ্চা মেয়েটা ওর শৈশবের জগতে ফিরে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে পালিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

'সার্জেন্ট, এই ফিল্মটার এডিট করা একটা কপি পাওয়া যেতে পারে?'

'মানে ওই গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট, কঙ্কালের মাথা—ওসব বাদ দিয়ে বলছেন? হ্যাঁ, সে-ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু ওটা নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'রূপাকে দেখাতে চাই। মনে হচ্ছে, ওটা দেখলে সুখের দিনগুলোর কথা মেয়েটার মনে পড়ে যাবে। মনে পড়ে যাবে ওর মা-বাবার কথা...।'

পার্ক স্ট্রিটে কিডন্যাপিং

আমার কপাল খারাপ বলতে হবে, রূপা মেহতাকে ফিল্মটা আর দেখানো গেল না।

ফিল্মটা ওকে দেখানোর সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমি লালবাজারে এবং হোম ডিপার্টমেন্টে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানি না, আমার তদন্তের ব্যাপারে ওঁদের কেমন একটা নিস্পৃহভাব লক্ষ করলাম। তবুও ধৈর্য ধরে ওঁদের অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রূপা তখন পুলিশ পাহারায় 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে আছে। ইতিমধ্যে ও অবশ্য একটু-আধটু কথা বলতে পারছে, তবে সেটা তিন বছরের শিশুর মতো আধো-আধো ভঙ্গিতে। আমার মনে হল, অমরাবতীর ঘটনার দিন পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি ওর মন থেকে মুছে গেছে।

অমরাবতীর ঘটনার জন্যে যে ওই ১৩ জন 'দেবশিশু'ই দায়ী সে-কথা আমি হোম ডিপার্টমেন্ট বা লালবাজারকে জানাইনি। কেন যেন মনে হচ্ছিল, এখন এ-কথা জানানো ঠিক হবে না। যাই হোক, পুলিশের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাকি ১২ জন ছেলেমেয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ ছাড়াও কয়েকটি খবরের কাগজ ও ব্যবসায়িক সংস্থা পাবলিসিটির লোভে বেশ কয়েকটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু তারাও হালে পানি পায়নি।

বলা বাহুল্য, কিডন্যাপাররা ইতিমধ্যে কোনওরকম দাবি জানায়নি। আর এতদিন পর আমার সত্যি-সত্যিই যেন মনে হতে লাগল, ওই ১২ জন ছেলেমেয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোনও হাই-টেক কারিকুরিতে হাইপার স্পেসে মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় জানা গেল, ওই ১২ জনের অন্তত তিনজন মোটেই হাইপার স্পেসে উধাও হয়ে যায়নি। বরং তারা বেশ কাছাকাছিই ছিল।

৪ নভেম্বরের বিকেলে ভিডিও ক্যাসেটটা ব্রিফকেসে ভরে আমি 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমের লবি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। না, ছবিটা রূপাকে দেখানোর অনুমতি আমি পাইনি। তবে লালবাজারের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সঙ্গে রূপার কথা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি জানতে পেরেছি রূপার ঘরে ভিডিও দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ, ডাক্তারদের ধারণা, ওকে স্বাভাবিক করে তুলতে হলে ওকে নিয়মিতভাবে চিলড্রেন্স প্রোগ্রাম দেখানো উচিত। সুতরাং এখন সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে।

পাঁচতলায় পৌঁছে দেখি ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ অফিসার রূপার প্রাইভেট ওয়ার্ডের সামনে পাহারায় রয়েছে। ওরা আমার পাস দেখল, ব্রিফকেস দেখল, তারপর

BanglaBook.org

বডি সার্চ করে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল।

ঘরে ঢুকে দেখি অল্পবয়সি একজন নার্স রূপার সামনে একটা জিগস' পাজ্‌ল নিয়ে বসে আছে। আর রূপা জিগস' পাজ্‌লের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ঠিকঠিক জায়গায় বসাতে চেষ্টা করছে।

বুড়ো আঙুল মুখে ঢুকিয়ে রূপা চুপচাপ আমাকে লক্ষ করছিল। ওর কপালে চুলের গোছা নেমে এসেছে। ওর আয়ত চোখজোড়ায় স্বপ্নমাখা নিষ্পাপ দৃষ্টি। দেখে মনে হয়, বাচ্চাটা সবে মায়ের দুধ ছেড়েছে। এই অসহায় শিশুটি কি সত্যিই বাবাকে খুন করেছে, শুরু করেছে অমরাবতীর হত্যালীলা? এক মুহূর্তের জন্যে আমার থিওরির ওপরে আমারই বিশ্বাস টলে গেল। ব্রিফকেস থেকে ক্যাসেটটা বের করে নার্সকে বললাম, আমি কেন রূপার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

'এই দ্যাখো, রূপা—ডাক্তারবাবু তোমার জন্যে কী সুন্দর একটা সিনেমা নিয়ে এসেছে।' কথাটা বলে নার্সটি জিগস' সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

রূপা বেশ মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখছিল। ওর চোখে সতর্ক গভীর দৃষ্টি। যখন ও হেয়ার ড্রায়ারটা বাথটাবের জলে ফেলে দেয় তখন নবীন মেহতা নিশ্চয়ই খুব তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল।

ওর চোখে চোখ রাখতে আমার যে অস্বস্তি হচ্ছে সেটা কি রূপা ধরে ফেলেছে? নার্সটির সঙ্গে টুকটাক কথা বলতে-বলতে আমি ক্যাসেটটা ভিসিআর-এ ঢুকিয়ে দিলাম।

সব ঠিকঠাক করে সুইচ অন করতেই বাইরের করিডর থেকে আচমকা একটা গোলমালের শব্দ পেলাম। কীসের শব্দ সেটা বুঝে ওঠার আগেই ধস্তাধস্তির নতুন একটা শব্দ কানে এল। তার পরই একটা ট্রলি উলটে যাওয়ার শব্দ। আর সঙ্গে-সঙ্গে দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা। ইউনিফর্ম পরা একজন কনস্টেবল পিছু হটে ঘরে ঢুকে পড়ল। পোশাকের আড়ালে লুকোনো হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করতে চেষ্টা করল একই সঙ্গে।

খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, একটা ট্রলি কাত হয়ে পড়ে গেছে মেঝেতে। দুটো ট্রে, শিশি-বোতল, তোয়ালে সব এপাশ-ওপাশ ছিটকে পড়েছে। উলটো দিকের দেওয়ালের কাছে একজন অ্যাটেনড্যান্ট হাঁটুগেড়ে বসে আছে। দ্বিতীয় কনস্টেবলটি তাকে ধরে তোলার চেষ্টা করছে, আর একই সঙ্গে নিজের ডান হাত আড়াল করে রিভলভারটা বের করে নিচ্ছে। তার চোখ অদ্ভুত তিনটে মূর্তির দিকে।

মূর্তি তিনটে চেহারায় ছোটখাটো। পরনে সাদা গাউন, মুখে সাদা কাপড়ের ঢাকনা—অপারেশন করার সময় ডাক্তাররা সাধারণত যেরকম ঢাকনা মুখে লাগান। গাউনের ফাঁক দিয়ে ওদের গায়ের টি-শার্টের লোগো দেখা যাচ্ছে। লোগোর পাশে একটি পপ গ্রুপের নাম : 'দ্য বিস্ট্‌স'। লোক তিনটেকে দেখে বেঁটেখাটো ল্যাব টেকনিশিয়ান বলে মনে হয়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। কারণ ল্যাব টেকনিশিয়ানদের হাতে কখনও অটোমেটিক পিস্তল থাকে না। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা জিনিসগুলো তৎপর পা ফেলে পাশ কাটিয়ে গেল ওরা। করিডরের পুলিশটি তখন রিভলভার উঁচিয়ে ধরতে শুরু করেছে। আর ঠিক তখনই দুটো নিষ্ঠুর তীব্র শব্দ শোনা গেল। করিডরে গুলি চলেছে।

BanglaBook.org

বুকে গুলি খেয়ে কনস্টেবলটি পড়ে গেল মেঝেতে। তার ভারী শরীরের ধাক্কায় হাঁটুগেড়ে বসে থাকা অ্যাটেনড্যান্টটিও একই সঙ্গে কাত হয়ে পড়ল। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সে। এবং হানাদার তিনজন ঢুকে পড়ল রূপার ঘরের ভেতরে। কাপড়ের আড়ালের ওপারে ওদের চোখ চঞ্চলভাবে নড়ছে। ওরা টিভির দিকে দেখল। সেখানে তখন অমরাবতী এস্টেটের মনোহারী ছবি। শুনতে পেলাম, দ্বিতীয় কনস্টেবলটি চেঁচিয়ে কী একটা বলল, তারপর রিভলভার চালাতে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলো গুলির শব্দ হল। ঘরের জানলার দুটো কাচ চিড় ধরে ভেঙে গেল ঝনঝন শব্দে। পুলিশ কনস্টেবলটি বাঁ-হাতটা শূন্যে তুলে অন্ধের মতো হাতড়ানোর ভঙ্গিতে দরজার দিকে এক পা এগিয়ে গেল। তারপর দড়াম করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে।

আচমকা আক্রমণে পরের কয়েকটা সেকেন্ড যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। দস্যু তিনজন চট করে চলে গেল রূপার বিছানার কাছে। ওদের অটোমেটিক পিস্তল যে-কোনও মোকাবিলার জন্যে তৈরি। ওরা কি রূপাকে খুন করবে নাকি? আমি বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্যে সামনে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে ওদের একজন ঝুঁকে পড়ে রূপাকে কোলে তুলে নিয়েছে। বাচ্চাটার মুখ লেপটে আছে লোকটার কাঁধের সঙ্গে। দ্বিতীয়জন মুখের ঢাকনাটা খুলে ফেলতেই তাকে চেনা গেল। বয়কাট চুলের এক কিশোরী। কঠিন রুক্ষ চোখে-মুখে অস্বাভাবিক উত্তেজনার ছাপ। সে জানলার কাছে গিয়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকাল। তখনই লক্ষ করলাম, নার্সের ডান হাতে একটা রিভলভার। পরে জেনেছি, নার্সটি আদতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসার মমতা দত্ত। সুতরাং আবার গুলির শব্দ হল—অন্তত কয়েকটা। জানলার শার্সির আর-একটা টুকরো খসে পড়ে গেল। মিস দত্তের হাতে আর কাঁধে লাল ছোপ দেখা গেল। রিভলভার পড়ে গেল হাত থেকে। তিনি বিছানার পাশে কাত হয়ে পড়লেন।

কিডন্যাপার তিনজন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে দরজার কাছে। ওদের একজন আমাকে লক্ষ করে পিস্তল চালাল। সেই মুহূর্তে আমি ওদের চিনতে পারলাম : বিন্দিয়া শর্মা, সুকান্ত দত্তগুপ্ত আর চন্দ্রনাথ বাগচি—অমরাবতীর তিন দেবশিশু!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়ার্ড পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। তার সঙ্গে নার্সিংহোমের ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টিম। টিভিটা আমি কোনওরকমে অফ করে দিলাম। টিভির পরদায় রক্তের ছিটে। সাদা পোশাক পরা দুজন লোক ছুটে এল আমার কাছে। আমার বাঁ-হাতটা টেনে নিয়ে কীসব করতে লাগল। টের পেলাম, হাতের ডানার কাছটা ব্যথা করছে, জ্বালা করছে। সামান্য অবাক চোখে লোক দুজনের দিকে তাকাতেই একজন বলল, 'নড়বেন না, আপনার হাতে গুলি লেগেছে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই...।'

BanglaBook.org

অমরাবতী হত্যাকাণ্ড : খুনিদের পরিচয়

হাত সেরে ওঠার সময় দিতে গোটা নভেম্বর মাসটা আমার প্রায় বিশ্রামেই কাটল। সেই অলস সময়ে 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমের ভয়ঙ্কর ঘটনাটা টিভি প্রোগামের অ্যাকশন রিপ্লের মতো বারবার ভেসে উঠতে লাগল আমার মনে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসারের

সঙ্গে বেশ কয়েকবার ওই ঘটনা নিয়ে আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্তে এলাম, ট্রলি উলটে পড়া থেকে রূপা মেহতাকে নিয়ে পালানো পর্যন্ত কিডন্যাপারদের সময় লেগেছে মাত্র ২০ সেকেন্ড। এই সময়ের মধ্যে একজন পুলিশ কনস্টেবল খুন হয়েছে, আর-একজন কনস্টেবল ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার মমতা দত্ত গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মমতা দত্তের জন্যেই আমি নেহাত প্রাণে বেঁচে গেছি। নইলে আমার ধারণা, কিডন্যাপাররা আমাদের দুজনকেই খতম করতে চেয়েছিল।

এত অল্প সময়ে ওদের এই অপকর্ম হাসিল করার ধরন দেখে মনে হয়, ব্যাপারটা নিয়ে বেশ আগেভাগেই প্ল্যান ছকে নেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, পুলিশ ওদের কোনও হদিশ পায়নি। আর রূপা মেহতা বেঁচে আছে কি না ঈশ্বর জানেন। অমরাবতী এস্টেটের তিনজন নিখোঁজ ছেলেমেয়েই যে এই কিডন্যাপিং-এর ঘটনার জন্যে দায়ী এটা হোম ডিপার্টমেন্ট বা নিউজ মিডিয়াকে সহজে বিশ্বাস করানো যায়নি। কারণ ওই ১৩ জন অনাথ ছেলেমেয়েকে ঘিরে এতদিন ধরে লাগামছাড়া আবেগ খরচ করা হয়েছে। সুতরাং বাস্তবের মুখোমুখি হতে এখন আর সহজে মন চায় না।

তবে সৌভাগ্যের কথা, বিন্দিয়া শর্মা, সুকান্ত দত্তগুপ্ত আর চন্দ্রনাথ বাগচিকে অনেকেই শনাক্ত করেছে। শুধু আমি বা মমতা দত্তই নয়, ওই নার্সিংহোমের আরও অনেকেই ওদের চিনতে পেরেছে। এভাবে চিনে ফেলার কারণ, কিডন্যাপিং-এর ঘটনার তিনদিন আগে, বিন্দিয়া, সুকান্ত আর চন্দ্রনাথ জেনারেল চেক আপের জন্যে 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল। একজন বয়স্ক অচেনা লোক ওদের তিনজনকে নিয়ে এসে ভর্তি করেছিল। বলেছিল, ওরা তার ছেলেমেয়ে। লোকটি একটা প্রেসক্রিপশনও জমা দিয়েছিল নার্সিংহোমে। কিন্তু পরে খোঁজ করে সেই প্রেসক্রিপশনের নাম ও ঠিকানায় কোনও ডাক্তারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমার ধারণা, বিন্দিয়া, সুকান্ত ও চন্দ্রনাথ টাকার বিনিময়ে ওই লোকটিকে বাবার ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি করিয়েছিল।

তিনদিন ধরে নার্সিংহোমের প্রতিটি নিয়মকানুন আদবকায়দা জেনে নিয়েছিল ওরা তিনজন। রূপা কোথায় আছে, ওর পাহারার ব্যবস্থাই বা কীরকম—এসব খবর নিতেও ওদের অসুবিধে হয়নি। তা ছাড়া, ওদের একটা মস্ত সুবিধে ছিল : বয়েস অল্প হওয়ায় অনেকের সন্দিহান চোখকেই ওরা সহজে ফাঁকি দিতে পেরেছে।

একটা ব্যাপার বড় অদ্ভুত লেগেছে আমার। বিন্দিয়া, সুকান্ত আর চন্দ্রনাথ বেপরোয়াভাবে নার্সিংহোমের প্রায় সর্বত্র ওদের হাতের ছাপ ফেলে গেছে। এতে মনে হয়, রূপার কিডন্যাপিং-এর ঘটনা বা বাবা-মাকে খুন করার কথাটা ওরা মোটেই অস্বীকার করতে চায় না। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বিবেক, অপরাধবোধ, সামাজিক দায়িত্ব—এসব শব্দগুলো ওদের ডিকশনারি থেকে ওরা মুছে ফেলেছে। সুস্থ মানসিক জগতে ফিরে আসার দরজা ওদের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে বরাবরের মতো।

রূপা মেহতা কি এখনও বেঁচে আছে? তদন্তকারী অফিসারদের ধারণা, দলের খবর যাতে পাঁচকান না হয়ে যায় তার জন্যে 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমে রূপাকে ওই তিনজন খতম করতেই চেয়েছিল। নেহাতই আনাড়িপনার জন্যে ওরা ব্যর্থ হয়। কিন্তু রূপা যে বেঁচে আছে তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। অমরাবতী হত্যাকাণ্ডের পিছনে এক বিকৃত

BanglaBook.org

দুঃস্বপ্নের যুক্তি কাজ করেছে। সেই অমানুষিক যুক্তির দাবিতেই রূপাকে বেঁচে থাকতে হবে। সেই একই যুক্তিতে অমরাবতীর বড় ছেলেমেয়েরা চেয়েছিল, রূপা ওর মা-বাবাকে খুনের কাজে সামিল হোক। ওরা চায়, রূপা ওদের বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্যটা ঠিকমতো বুঝে নিক। ওদের বিচারই যে ন্যায়বিচার তাতে ওই বাচ্চা মেয়েটার যেন এতটুকু সন্দেহ না থাকে। এ-ধরনের অন্ধ গোঁড়ামির শেকড় বেড়ে ওঠে একতার মধ্যে দিয়ে। তা ছাড়া, বড় ছেলেমেয়েগুলো নিশ্চয়ই বুঝেছে, আর দু-এক বছর পরে রূপা যখন আর ছোট্টটি থাকবে না, তখনই ওরা চিরকালের জন্যে মেয়েটাকে দলে পাবে।

অমরাবতী হত্যাকাণ্ড : সম্ভাব্য কারণ

রূপার কিডন্যাপিং-এর ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই নতুন-নতুন থিওরি আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। থিওরিগুলো যেমন বিচিত্র তেমনই হাস্যকর। কেউ বললেন, অমরাবতীর ছেলেমেয়েগুলো বিদেশি রাষ্ট্রের গুপ্তচর কিংবা কোনও হিপনোটিক ড্রাগ দিয়ে ওদের ব্রেনওয়াশ করা হয়েছে। আবার কেউ-বা আরও এককাঠি ওপরে গিয়ে জানালেন, ১১২৬ সালের ১৪ আগস্ট সুইফ্‌ট-টাট্‌ল নামে যে-ধূমকেতু আসছে এই আচমকা হত্যালীলা তার প্রভাব নয়তো!

লালবাজারে তদন্তকারী অফিসাররা লিখিতভাবে না হলেও মৌখিকভাবে এরকম জানালেন যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজন ছিল লিডার। নানান ধর্মগুরুর মতো তাকে বাকি ১২ জন গুরু বলে মেনেছিল। তার কথা অন্ধভাবে শুনত ওরা। সেই লিডারের নির্দেশেই ২৫ জুন সকালে ওরা বাবা-মায়েদের খুন করেছিল। পুলিশের বদ্ধমূল বিশ্বাস, দলের উন্মাদ নেতা মেগালোম্যানিয়ার শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ভগবান বলে ভাবতে শুরু করবে। তখনই সে স্রেফ অহঙ্কারে নিজেকে জাহির করে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। অথবা দলে নতুন মেম্বার নিতে হলেও ওরা আর গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করতে পারবে না। পুলিশ ঠিক ওদের খোঁজ পেয়ে যাবে।

এ-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রথমত, বড় ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে কেউ যে দলের পাণ্ডা ছিল, এমন কোনও সূত্র আমি পাইনি। দ্বিতীয়ত, নিজেদের মধ্যে কম্পিউটারে ছাপা খবরের কাগজ, অডিও ক্যাসেট বা ভিডিও ক্যাসেট দেওয়া-নেওয়া করলেও আমি যতটুকু আঁচ পেয়েছি তাতে ওরা প্রত্যেকে ছিল নিঃসঙ্গ। টিভি ক্যামেরা আর নিয়মমাফিক জীবনের চাপে ওরা বলতে গেলে একরকম নজরবন্দিই ছিল। ঘরই ছিল ওদের জেলখানা।

আমার মত হল, খুনের ব্যাপারটা ছেলেমেয়েগুলোর কাছে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার ছিল না। বরং একটা সাধারণ সাদামাটা ব্যাপার ছিল। বাইরের জগৎ থেকে ওরা ধীরে-ধীরে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছিল। হয়তো বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল ওদের প্রস্তুতি। যার স্বাভাবিক পরিণতি এই অনিবার্য খুন। কোনও পাগল খুনি যখন খুন করে তখন সে নিহত মানুষটির পরিচয় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। সোজা কথায়, পাগল খুনির উদ্দেশ্যই হল একটা উদ্দেশ্যহীন খুন করা।

BanglaBook.org

কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস, অমরাবতীর ঘটনা একেবারে উলটো। নিয়মমাফিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার ওভারডোজই অমরাবতীর হত্যাকাণ্ডের চাবিকাঠি। অমরাবতীর ছেলেমেয়েদের ব্রেনওয়াশ করা হয়েছে অসীম ধৈর্য আর অনন্ত কৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে। এর ফলে মুছে গেছে স্বাধীনতা আর স্বাভাবিক আবেগ। অমরাবতীর বাবা-মা অথবা ছেলেমেয়েদের কখনও আবেগের দরকার পড়েনি। বরং নিয়ম ছিল ওদের কাছে অনেক বেশি জরুরি।

সুতরাং শুধুমাত্র প্রশংসার ঘেরাটোপের ফাঁদে বন্দি হয়ে মাথা খুঁড়ে মরেছে বাচ্চাগুলো। অমরাবতী এস্টেটে তারিফ বা উৎসাহের কোনও ঘাটতি ছিল না। এগুলো এতই সস্তা ও খেলো ছিল যে, কারণে-অকারণে মুড়ি-মুড়কির মতো এগুলো বিলোনো হত। কখনও প্রশংসা বা উৎসাহ ওদের অর্জন করতে হয়নি। ওদের 'সেল্ফ-এক্সপ্রেশন'-এর কোনও জায়গা ছিল না। 'সেনসরি ডিপ্রাইভেশান' বা মানসিক বঞ্চনার মধ্যে থেকে ওরা প্রতিটি মুহূর্তে কষ্ট পেত। বাবা-মায়েদের ওরা ঘৃণা থেকে খুন করেনি। ওদের মনে হয়েছে, আলোর সন্ধান পেতে গেলে এই শেষ বাধাটুকু ওদের সরাতেই হবে। ব্যস, এইটুকুই।

বারবারই আমার মনে পড়ে 'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোমে দেখা সুকান্ত, বিন্দিয়া আর চন্দ্রনাথের কথা। ওরা যখন অটোমেটিক পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছিল তখন কী নির্লিপ্ত নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল ওদের মুখ! পেশাদার খুনির মতোই আবেগহীন। একবার ইন্দোরের 'ইন্সটিটিউট অফ অ্যাভিয়েশান মেডিসিন'-এ আমি কয়েকমাস ছিলাম। তখন আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'এক্সপেরিমেন্ট্স অন সেন্সরি ডিপ্রাইভেশান'। সে-সময়ে দেখেছি, যেসব ভলান্টিয়ার এই পরীক্ষায় সাহায্য করত তারা মাঝে-মাঝে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। শব্দহীন ঘরে রেখে ওই ভলান্টিয়ারদের ক্রমেই অনুভূতিহীন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হত। পরীক্ষার শেষে যখন ল্যাবরেটরির স্টাফরা ওদের বাইরে বের করে নিয়ে আসত তখন প্রায়ই ওরা হিংস্রভাবে স্টাফদের আক্রমণ করত। কেউ-কেউ আবার নিজেদের হাত-পা কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলত। সব মিলিয়ে এই মানুষগুলো 'ইমোশানাল ফ্রিডম' চাইত। আর তাতেই তারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। নিজেদের শূন্যতার জগতে অন্য কাউকে ওরা সহ্য করতে পারত না।

এই 'ইমোশনাল ফ্রিডম' অমরাবতীর ছেলেমেয়েরা অর্জন করতে চেয়েছিল নিজেদের পরিশ্রম ও পরিকল্পনার বিনিময়ে। এ-ব্যাপারে কারও অন্তরে সাহায্য ওরা চায়নি। অন্যের সাজিয়ে দেওয়া নিখুঁত আদর্শ জগতের বন্দিদশা থেকে ওরা মুক্তি চেয়েছিল। ওরা বুঝতে পেয়েছিল, মারাত্মক সুস্থ একটি সমাজে পাগলামিই হচ্ছে একমাত্র স্বাধীনতা।

BanglaBook.org

কখন ওরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল

অমরাবতীর ছেলেমেয়েরা কখন ঠিক করেছিল যে, একটি হেস্তনেস্ত ওদের করতেই হবে? বাচ্চাগুলো যদি কখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাহলে হয়তো ওদের

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যাবে আসল উত্তর। তবে আমার মনে হয়, ২৫ জুন টিভি ফিল্মের প্রোডিউসার আসছে জানতে পেরেই ওরা ধরে নেয় সময় ফুরিয়ে আসছে। এই ফিল্মের সঙ্গে জড়িত অন্তত দুজন ওদের সঙ্গে আগে কথা বলে গেছে : তারা হল, একজন প্রোগ্রাম রিসার্চার ও একজন সোশিওলজিস্ট। অবশ্য ওরা কথা বলেছিল বড় তিন-চারজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে। ২৫ জুন এই দুজনেরও আসার সম্ভাবনা ছিল। কে জানে, এইসব কারণেই হয়তো বাচ্চাগুলো ভেবেছিল ২৫ তারিখটাই ওদের মুক্তি পাওয়ার শেষ দিন। নইলে চলচ্চিত্রের ছবিতে ওরা বন্দি হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।

অমরাবতীর নিখুঁত জীবন নিয়ে বাবা-মায়েদের অহঙ্কার কম ছিল না। সেইজন্যেই ২৫ জুন তাঁরা সকলেই সব কাজ ছেড়ে অমরাবতীতে হাজির ছিলেন। কিন্তু কী করে ওই ছেলেমেয়েগুলো খুনের পরিকল্পনা করেছিল তা এখনও জানা যায়নি। তবে এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য-প্রমাণের সঙ্গে কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে মোটামুটি বলা যায়, ২৫ জুন সকালে ঠিক কী হয়েছিল।

২৫ জুন, ২০১৮ : ফিরে দেখা

সকাল ৫-৫৬ মিনিট

ঘটনার দিন সকালে এই প্রথম একটি ছেলেকে দেখা গেল। গোয়েন্দা-ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে রাতের সিকিওরিটি অফিসার রামজীবন তিওয়ারি অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে চলেছে গেট-হাউসের দিকে। অমরাবতী এস্টেটকে শেষবারের মতো চক্কর দেওয়া হয়ে গেছে। ছ'টার সময় তিওয়ারি আর অফিসার বৈদ্যনাথ সাহার ডিউটি শেষ হবে। ওরা চার্জ বুঝিয়ে দেবে ডে-ডিউটির দুই সিকিওরিটি অফিসারকে। ক্যামেরা তিওয়ারিকে অনুসরণ করছে। তখনই ১৭ বছরের সুকান্ত দত্তগুপ্তকে দেখা গেল। ও বাথরুমের ছোট্ট জানলা দিয়ে উঁকি মেরে রামজীবন তিওয়ারিকে লক্ষ করছে।

সুকান্তর ছিপছিপে চেহারায় শিশুসুলভ মুখমণ্ডল শান্ত, স্থির—কিন্তু ওর সামনে এখন অনেক কাজ।

চন্দ্রনাথ ওদের বাড়ির জানলা দিয়ে গেট-হাউস দেখতে পাচ্ছে। ৬টার সময় গার্ডরা ডিউটি পালটালেই ও ইশারা করে সুকান্তকে জানিয়ে দেবে। শনিবার সকালে এই ডিউটি বদলের ব্যাপারটা মাঝে-মাঝেই একটু দেরি করে হয়। কারণ, তখন ওরা চারজন গেট-হাউসে চা তৈরি করে খায়, গল্পগুজব করে। এইভাবে পরের ব্যস্ত দু-ঘণ্টা থেকে ১৫ মিনিট খরচ হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে সুকান্ত দেখে নেবে ওর দলের তিনজন—বিজয় মেহতা, রূপা মেহতা আর বিন্দিয়া শর্মা—জেগে উঠে তৈরি হয়ে নিয়েছে কি না। তারপর ও চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়বে বাড়ির বাইরে। গোলাপ বাগানের মাটির নীচে একটা শটগান সুকান্ত আগে থেকেই পুঁতে রেখেছিল। সেটা

BanglaBook.org

তুলে নিয়ে ও ফিরে আসবে নিজের শোওয়ার ঘরে। এরপর ও চন্দ্রনাথের সঙ্গে টেলিফোন আর টেলিভিশনের কেবল কাটতে যাবে।

সকাল ৬-০২ মিনিট

চন্দ্রনাথ বাগচির হাতেও পুরো দু-ঘণ্টা রয়েছে। সুকান্তর সঙ্গে গিয়ে কেবল কাটা ছাড়াও ওকে ওর দলের তিনজনের খেয়াল রাখতে হচ্ছে। এই তিনজন হল, শুভ্র দাশশর্মা, সোমলতা দাশশর্মা আর বিনোদ আগরওয়াল। তবে সবচেয়ে ঝামেলার কাজ হল, বাঁশ, নাইলনের দড়ি, তার, স্প্রিং, লোহার রড দিয়ে তৈরি আজব খেলনাটাকে কম্পিউটার রুমের সিলিং থেকে পেড়ে অতি সাবধানে নিয়ে যেতে হবে গেট-হাউসে। অফিসার হাজরা যেন কোনওভাবেই বুঝতে না পারে ওটা আসলে একটা মারাত্মক ফাঁদ। যাওয়ার সময় বাবা-মায়ের জানলার নীচ দিয়ে খোলা লন ধরে ওকে হেঁটে যেতে হবে। কেউ যেন ওকে সন্দেহ না করে। অফিসার হাজরা আবার সিকিওরিটির নিয়মকানুন পাই-টু-পাই মেনে চলে। গেট-হাউসে ঢুকতে হলে খেলনা দেখানোর ছলে ঢুকতে হবে। যদিও খেলনাটা আসলে খুন করার খেলনা।

জানলার ওপরে হুমড়ি খেয়ে অধীরভাবে গেট-হাউসের দিকে তাকিয়ে আছে চন্দ্রনাথ। সুকান্ত দত্তগুপ্ত বা বিনোদ আগরওয়ালের মতো মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছে না ও। শুধু দরদর করে ঘামছে। ঈস, এত ঘাম কেন! সিকিওরিটি অফিসারগুলোই বা গেল কোথায়!

সকাল ৬-০৯ মিনিট

বিন্দিয়া শর্মা বালিশের নীচে রাখা অ্যালার্মের শব্দ শুনল। শোওয়ার ঘরের আবছা অন্ধকারে ও কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকাল। পেজিং সিগনাল দপদপ করে জ্বলছে। 'টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার...' কবিতাটার প্রথম লাইনটা টাইপ করে ওকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে সুকান্ত। ওকে ডাকছে। ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে কম্পিউটারের পরদা থেকে লেখাটা মুছে ফেলতে হবে। অ্যালার্মটা বন্ধ করে ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘুম পুরোপুরি কাটেনি, তবে শরীরটা ফ্রেশ লাগছে।

সুকান্তই জোর দিয়ে বলেছিল, শুক্রবার রাতটা প্রত্যেকের ভালো করে ঘুমনো দরকার। নাঃ, এতে ভালোই হয়েছে। অন্য খাটে শোওয়া ছোট বোন মালতীর দিকে দেখল বিন্দিয়া। মালতীরও ঘুম ভেঙে গেছে।

বিন্দিয়া কম্পিউটারের কাছে গিয়ে টাইপ করল: 'হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট য়ু আর...', যার অর্থ হল, সুকান্তর সিগনাল ও দেখতে পেয়েছে। বিন্দিয়া বাথরুমে গেল। হঠাৎই ওর গা গুলিয়ে উঠল। বেসিনের সামনের দেওয়ালে লাগানো আয়নায় দু-হাতে ভর দিয়ে (তদন্তে ওর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে আয়নায়) বেসিনে বমি করল। তারপর কোনওরকমে মুখ-টুখ ধুয়ে নিল। পোশাক পালটে নীল রঙের ট্র্যাক-স্যুট পরে নিল বিন্দিয়া। কম্পিউটারের ফ্লপি ও কাগজপত্র রাখার আলমারি খুলল। ফ্লপির বাক্স ও ফ্যানফোল্ড

BanglaBook.org

কাগজের আড়াল থেকে দুটো লামা পিস্তল বের করে নিল। বাবা-মাকে খুন করার জন্যে ও আর মালতী এই পিস্তল দুটোই ব্যবহার করবে।

সকাল ৬.১৫ মিনিট

এতক্ষণে সব ছেলেমেয়েই উঠে পড়েছে। এ-কাজে ওদের সাহায্য করেছে ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম আর কম্পিউটারের পরদার পেজিং সিগনাল। অনির্বাণ সেন পুরোদস্তুর জামা-কাপড় পরেই শুয়েছিল। পরদার সিগনাল দেখে উঠে এল কম্পিউটারের কাছে, অপেক্ষা করতে লাগল। পাশের অ্যাটাচ্‌ড বাথে ওর ১৪ বছরের বোন জয়িতা স্নান করছে। যাতে জল বয়ে যাওয়ার কলকল শব্দ বাবা-মা শুনতে না পায় তার জন্যে ওর নাইট ড্রেসটা ঝাঁঝরির মুখে চাপা দিয়ে রেখেছে (তদন্তের সময়ে ভেজা নাইট ড্রেসটা ঝাঁঝরির মুখে দলা পাকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল)।

শুধু সুনীল প্রধানই ঘুমোতে পারেনি। সারাটা রাত ও চেয়ারে বসে টিভি দেখেছে। অবশ্য বাবা-মাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে ভলিয়ুম নবটা একেবারে কমিয়ে রেখেছিল। যাতে বোঝা না যায় যে, সারা রাত ও ঘুমোয়নি, সেইজন্যে বিছানার চাদর-বালিশ চটকে এলোমেলো করে দিয়েছে। কিন্তু ফোরেনসিক পরীক্ষায় ওর এই চালাকি খুব সহজেই ধরা পড়ে গেছে।

ভোর চারটের সময় সোমলতা দাশশর্মার ঘুম ভেঙে গেছে। তারপর দুটো ঘণ্টা ও দাদার ঘরে এসে বসে ছিল। দাদা শুভ্র ঘুমোচ্ছিল। সোমলতা দাদার ক্রস-বোটা কোলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিল। তখনই ক্রস-বোর একটা ইস্পাতের তীর পড়ে যায় মেঝেতে, গড়িয়ে চলে যায় সোফার তলায় (তদন্তের সময়ে এটা খুঁজে পাওয়া গেছে)। কিন্তু হাতে আরও ন'টা তীর থাকায় সোমলতা নিশ্চিন্ত ছিল। ন'টা তীর ওর বাবা-মা আর সিকিওরিটি গার্ড সোমনাথ ঘোষের পক্ষে যথেষ্ট।

দাদা জেগে ওঠার আগেই রূপা মেহতার ঘুম ভেঙে গেছে। জামা-কাপড় পরে নিয়ে ও একটা চকোলেট খেতে শুরু করে। পাশের ঘরে ও আর বিজয় পড়াশোনা করে। তারই এককোণে রূপার পুতুলখেলার নানা সরঞ্জাম। চকোলেট হাতে ও পাশের ঘরে গিয়ে দেখে দাদা ওর পুতুলের ঘর থেকে একটা লম্বা ইলেকট্রিক কেবল বের করে নিচ্ছে। দাদার কথায় এই তারটা রূপাই পুতুলের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। এবার দাদা এই তারটা মায়ের এক্সারসাইকেলের স্টিল ফ্রেমের সঙ্গে জুড়ে দেবে। স্বাভাবিকভাবেই তারের অন্য মাথাটা চলে যাবে জিমনাশিয়ামের প্লাগ পয়েন্টে।

অ্যাভিনিউর ওপারে সুনীল প্রধানকে দেখতে পাচ্ছে বিনোদ আগরওয়াল, অনির্বাণ সেন আর জয়িতা সেন। দরকার মতো ওরা ইশারা করতে পারছে। রাস্তার ধারে ফাইবার পোলের ওপরে কসানো সিকিওরিটি ক্যামেরা যেই ওদের বাড়িগুলো স্ক্যান করতে শুরু করল অমনি ওরা লুকিয়ে পড়ল। বিনোদের ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেছে। গতকাল উত্তেজনায় ওর হাত থেকে অ্যালার্ম ঘড়িটা পড়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে (এক্সিবিট নাম্বার : ২৭)। ছ'টা পাঁচে ঘুম ভেঙেই ও দেখে কম্পিউটারের পরদায় পেজিং সিগনাল অধীরভাবে দপদপ করছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ওর জগিং

BanglaBook.org

গু-র একটা ফিতে ছিঁড়ে যায় (তদন্তের সময় এই ছেঁড়া ফিতের একটা টুকরো পাওয়া গেছে)। তখন ও বড় টুকরোটা দিয়েই কোনওরকমে জুতোটা পরে নেয়। তারপর ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে একটা ছোট টেবিলের পায়ায় হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। টেবিলে রাখা কাচের তৈরি শৌখিন একটা ফুলদানি পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় (এক্সিবিট নাম্বার : ৩৪)। কিন্তু এতে বিনোদ একটুও ভয় পায়নি। কারণ বাবা-মা পাশের ঘরে থাকলেও ওঁরা কোনও শব্দ পাবেন না। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ওঁদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই গভীর ঘুম আর কখনও ভাঙবে না।

সকাল ৬-২১ মিনিট

ডে শিফটের সিকিওরিটি গার্ডরা এসে গেছে। কপাল ভালো যে, আজ আর চায়ের আসর বসানোর সময় নেই। অপেক্ষা করতে-করতে চন্দ্রনাথ বাগচি রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছে। ঘামের বন্যা বয়ে যাচ্ছে ওর শরীরে ; জামা-গেঞ্জি-জাঙিয়া-প্যান্ট সব ঘামে ভিজে সপসপে। কিন্তু যে মুহূর্তে রামজীবন তিওয়ারি আর বৈদ্যনাথ সাহা গাড়ি করে চলে গেল তক্ষুনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল চন্দ্রনাথ। অলকেশ হাজরা আর সোমনাথ ঘোষ গেট-হাউসের দায়িত্ব নিল। চন্দ্রনাথ সেটা দেখে নিয়ে ইশারা করল সুকান্ত দত্তগুপ্তকে বাবা-মায়েরা ঘুম ভেঙে উঠতে শুরু করবেন সাতটা থেকে সোয়া সাতটার মধ্যে। সুতরাং এস্টেটের এদিক-ওদিক গিয়ে কাজ সারার জন্যে ছেলেমেয়েদের হাতে এখনও চল্লিশ মিনিট সময় আছে।

সকাল ৬-২৩ মিনিট

সুকান্ত শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর মায়ের ঘরের দরজার সামনে এসে ও একটু দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে। না, কোনও শব্দ নেই মা এখনও জেগে ওঠেননি। মাঝে-মাঝে মায়ের নাক ডাকে। এখন তাও শোনা যাচ্ছে না। মাঝরাতে মায়ের হঠাৎ-হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তবে তারপর বেলা পর্যন্ত গাঢ় ঘুমে ডুবে থাকেন। সুকান্ত সিঁড়ির ল্যান্ডিং পেরিয়ে চলে যায় বার্গলার অ্যালার্ম সিস্টেমের ক্যাবিনেটের কাছে। ক্যাবিনেটের পাল্লা খুলে সার্কিটের ফিউজ খুলে নেয়। তাতে মেন সুইচ ও পলিমার ব্রিজ কানেক্টরের নানা জায়গার ওর হাতের ছাপ পড়ে (লালবাজারে সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্ট এই ছাপের কপি তুলেছে)।

এখন বাড়ি ছেড়ে বেরোতে সুকান্তর কোনও অসুবিধে নেই। খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গ্যারেজের পিছন দিক দিয়ে ও চলে আসে গোলাপ বাগানে। সবার চোখে আড়ালে মাটি খুঁড়ে শটগানটা বের করে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বন্দুকটা লুকিয়ে রাখে বইয়ের ক্যাবিনেটের ভেতরে।

সুকান্ত আবার চলে আসে বাগানের কাছে। সেখান থেকে টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে চলে যায় এস্টেটের পিছনের সীমানার দিকে। ঘাস আর গাছপালার ফাঁক দিয়ে চলে গেছে পায়ে-হাঁটা পথ। সুকান্ত সেই পথ ধরে চলতে থাকে। সোমনাথ ঘো

টহল দিয়ে এদিকে পৌঁছতে-পৌঁছতে এখনও অন্তত বিশ মিনিট। একটু পরেই দেখা যায় গেট-হাউস—সবুজের ফাঁকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। প্রথম বাড়ি আর গেট-হাউসের মাঝে লতানো গাছের অলঙ্কারের পরদা। পথের পাশে দেবদারুর ঘন সারি। তার পাতার আড়াল সরাতেই চন্দ্রনাথ বাগচিকে দেখা গেল। একটা গাছের গোড়ায় বসে আছে। ওর পাশেই মাটিতে রাখা আছে সেই খুন করার খেলনা।

সকাল ৬-৩৫ মিনিট

শুভ্র দাশশর্মা গাছপালার ফাঁক দিয়ে হেঁটে চলেছে এস্টেটের উত্তর দিকে। উত্তরপ্রান্তের পায়ে-চলা পথের কাছে এসে পৌঁছয় শুভ্র। গেট-হাউস থেকে এই জায়গাটা সবচেয়ে দূর। এখানেও যথারীতি একটা খুঁটির মাথায় বসানো গোয়েন্দা ক্যামেরা। নির্জন পথে অন্তত একশো গজ করে এপাশ-ওপাশ দেখতে পাচ্ছে ক্যামেরার চোখ। খুঁটির সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটা টেলিফোন বক্স আর একটা মিনিয়েচারাইজ্‌ড রিলে। এখান থেকেই কানেকশান চলে গেছে গেট-হাউসের টিভি মনিটরে।

খুঁটির পিছনেই রডোডেনড্রনের ঝোপ। তার ঘন পাতার আড়ালে অমরাবতীর বাড়িগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। সেই ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে শুভ্র থলে থেকে ক্রস-বোটা বের করে নেয়। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে ক্রস-বোটাকে ঠুকে স্প্রিং টেনে লাগিয়ে দেয় ইস্পাতের তীর। তারপর টেলিফোন বক্স থেকে মাত্র ছ'ফুট দূরে ঝোপের আড়ালে তৈরি হয়ে বসে শুভ্র। অপেক্ষা করতে থাকে।

সকাল ৬-৪৮ মিনিট

চন্দ্রনাথ আর সুকান্ত একটা ঢাকনা সরিয়ে টেলিফোন আর টিভির কেবল বের করল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কেবলের ওপরের ভিজে মাটি খুঁড়েছে ওরা। ছোট্ট একটা চৌকো গর্ত কেটে পৌঁছে গেছে দু-হাত নীচে বসানো কেবলের কাছে। তারপর কেবলের আরমারিং কেটে ইনসুলেশন বের করে রেখেছিল। সেই গর্তের মধ্যে স্টিল কাটার ঢুকিয়ে দিল সুকান্ত। ওর পাশে বসে খুনের খেলনাটার স্প্রিং টেনে ওটাকে রেডি করছে চন্দ্রনাথ। এটাই অলকেশ হাজরার মাথায় পরিয়ে একটা দড়ি ধরে টান মারতে হবে। তা হলেই ফাঁদের বাঁধুনিতে আটকে পড়বে অফিসার হাজরা। তার হাত বাঁধা পড়বে, আর ইস্পাতের নখ এঁটে বসবে তার গলায়। দেখতে-দেখতে এক্তেকাল।

BanglaBook.org

সকাল ৭-০০ টা

বাচ্চাদের সমস্ত আয়োজন শেষ। অনির্বাণ সেন ওর জামাকাপড়ের আলমারি খুলে পোশাকের স্তূপের আড়াল থেকে বের করে নিল একটা বোল্ট-অ্যাকশন টার্গেট রাইফেল। তখনই আলমারির হাতলে খোঁচা লেগে ওর ডান হাতের পিঠের নুনছাল উঠে যায় (হাতলের ফোরেনসিক পরীক্ষায় এর প্রমাণ পাওয়া গেছে)। বিছানায় বসে রাইফেলটাও

শেষবারের মতো সাফ করে নেড়েচেড়ে দেখে নেয়। তারপর তাতে টোটা ভরে নেয়।

বিন্দিয়া আর মালতী শর্মা কম্পিউটারে কথা চালাচালি শেষ করে নিয়েছে। বিন্দিয়া ওর খুদে লামা পিস্তলে গুলি ভরে নিল। তারপর বিছানার পাশে রাখা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিল পিস্তলটা। ড্রয়ারটা ওর হাতের খুব কাছেই। মালতী ওর পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছে ওর বড় মাপের মোনালিসা পুতুলের পায়ের ফাঁকে। বিছানায় বসে-বসেই ওরা জানলা দিয়ে সুনীল প্রধানকে দেখতে পাচ্ছে। নিজের ঘরে বসে সুনীল তখন একটা 'প্লেবয়'-এর পাতা ওলটাচ্ছে।

তৈরি হয়ে ছেলেমেয়েরা যে-যার ঘরে বসে আছে। অপেক্ষা করছে। কম্পিউটারের শূন্য পরদায় শুধু কারসর দপদপ করে জ্বলছে। যন্ত্রটাও যেন অপেক্ষা করছে কখন শুরু হবে ঘটনার ঘনঘটা।

সকাল ৭-০৫ মিনিট

বাবা-মায়েদের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। সাধনা বাগচি ঘুম ভাঙার পরেও কয়েক মিনিট বিছানায় শুয়ে রইলেন। বিছানার পাশে রাখা ইলেকট্রনিক টু-ইন-ওয়ান—সঙ্গে ডিজিটাল ঘড়ি। ঘড়ি দেখে নিয়ে অটোমেটিক টেপ রেকর্ডারে দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি রেকর্ড করতে শুরু করলেন : 'এগারোটায় টিভির লোক আসবে। গাড়ির ডুপ্লিকেট চাবিটা গ্যারেজে খুঁজে দেখতে হবে। আইভিকে আজকের মেনু বুঝিয়ে দিতে হবে। চন্দ্রনাথের সঙ্গে বসতে হবে কালকের প্রোগ্রাম ঠিক করার জন্যে...' (এই ক্যাসেটটা পুলিশের হাতে এসেছে। এক্সিবিট নাম্বার : ১০৫)!

সকাল ৭-১২ মিনিট

রজতকুমার রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা ওঁর আগামী ডাবল ভারশন ছবি 'অন্তিমযাত্রা'য় খাপ খেয়ে যেতে পারে। তাই স্বপ্নটা যতটুকু মনে আছে টুকে নিলেন বিছানার পাশে রাখা প্যাডের কাগজে (এক্সিবিট নাম্বার : ৮২)। স্বপ্নের একটা জায়গা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে তাঁকে। সাদা চাদর গায়ে দিয়ে একটা বিছানায় বসে আছেন তিনি। বিছানার চারপাশে আগুন জ্বলছে। তাঁর গায়ে তাপ লাগছে, তবে কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। কে যেন কোন বই থেকে কীসব গুনগুন করে পাঠ করে চলেছে। আকাশে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল ঘড়ি—গলে-গলে বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে পড়ছে। তিনি চিৎকার করে কী একটা বলতে যাবেন, অমনি একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'কাট...।'

BanglaBook.org

সকাল ৭-২৯ মিনিট

সুচরিতা গোস্বামী স্নান করছিলেন বাথরুমে। বয়ে যাওয়া জলের ধারায় নানা ছবি দেখছিলেন। একটু দূরে তাকে রাখা রেডিও বাজছিল করুণ সুরে। যেন বহুদূর থেকে

দুঃখী বাতাস ভেসে আসছে। বাথটাবের পাশ থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা তুলে নিয়ে সুরটা রেকর্ড করতে শুরু করলেন সুচরিতা। পরে এটা শুনে হয়তো কোনও ছবির আইডিয়া পাওয়া যাবে।

সকাল ৭-৪৫ মিনিট থেকে ৮-০০ টা

সব বাবা-মায়েরাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন—শুধু দীনেশ আগরওয়াল ও সুলোচনা আগরওয়াল ছাড়া। কড়া ঘুমের ওষুধ ওঁদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। এই ওষুধ নার্সিংহোম থেকে বিনোদ চুরি করে নিয়ে এসেছিল।

অমরাবতীর বাসিন্দা দুই শিক্ষক অজিতেশ সরকার আর বিক্রম শাহ্ উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। জেগে গেছে নাচ-গানের দুই দিদিমণি নীলাঞ্জনা আর সঙ্ঘমিত্রাও। বাবা-মায়েদের কেউ-কেউ স্নানের আগে একটু-আধটু যোগব্যায়াম করে নিচ্ছেন, আবার কেউ বা ট্র্যাক-স্যুট পরে একতলার সুইমিং পুলের পাড়ে দুলকি চালে দৌড়চ্ছেন।

সকাল ৮-০৫ মিনিট

পার্বতী দাস এসে পৌঁছল মিত্রদের বাড়িতে। ঠিকে কাজের লোকেদের মধ্যে সে-ই আজ প্রথম এসে হাজির হয়েছে। তার ঠিক পরেই এল মিসেস জয়সওয়াল আর আইভি সামন্ত। ওদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে জানা গেছে, টিভি ফিল্মের লোকজন আসার কথা আছে বলে ওরা প্রত্যেকেই একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগছিল। গেট-হাউস থেকে খবরের কাগজ আর চিঠিপত্র ওরা রোজকার মতো নিয়ে এসেছে। সেগুলো মালিক বা মালকিনের হাতে তুলে দিয়ে ওরা ব্রেকফাস্টের আয়োজন শুরু করে।

সকাল ৮-১০ মিনিট

ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করছে। খুনের সবরকম অস্ত্রশস্ত্র একেবারে তৈরি। সুকান্ত আর চন্দ্রনাথ টেলিফোন আর টিভি কেব্‌লের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে অপেক্ষা করছে। হাতে স্টিল কাটার। সব ছেলেমেয়েরই নজর এখন মেহতাদের বাড়ির দিকে।

সকাল ৮-১৫ মিনিট

মোটামুটি এইসময় নাগাদ মিসেস মেহেতা সামান্য ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ সেরে নিয়ে জিমনাশিয়ামের এক্সারসাইকেলে উঠে বসেন। তিনি শুনতে পাচ্ছেন, দোতলার বাথরুমে জলের শব্দ। স্বামী নবীন মেহতা বাথটাবে জল ভর্তি করছেন। মিসেস মেহতার ধারণা, রূপা আর বিজয় এখনও ঘুমোচ্ছে। ব্যায়াম সেরে নিয়ে ওদের সঙ্গে তা হলে একটু মজা করলে হয়। এ-কথা ভাবতে-ভাবতে এক্সারসাইকেলের স্প্রিং দেওয়া সিটের ওপরে চড়ে বসলেন মিসেস মেহতা। সুইচ অন করে দিলেই সাইকেলের শক্তিশালী মোটর ঘুরতে

BanglaBook.org

শুরু করবে, সঙ্গে-সঙ্গে প্যাডেল ঘুরবে, সিট আর হাতল দ্রুত তালে ওঠানামা করবে। সেই অবস্থায় সাইকেলে ঠিকঠাক বসে থাকতে পারাটাই বেশ কঠিন। মিসেস মেহতা প্যাডেল স্ট্র্যাপে পা ঢুকিয়ে দিলেন, হাত রাখলেন চামড়ার ফিতে লাগানো ধাতুর হাতলে। এই সাইকেলের ব্যায়াম তাঁর নিয়মিত অভ্যেস। মোটর থেকে ইলেকট্রিক কেব্‌ল চলে গেছে দেওয়ালে লাগানো প্লাগ পয়েন্টের দিকে। জিমনাশিয়ামের নানা যন্ত্রের জন্যে অনেক ইলেকট্রিক কেব্‌ল রয়েছে। একটা বাড়তি ইলেকট্রিক কেব্‌ল যে মোটরের লাইভ টারমিনাল থেকে তাঁর সাইকেলের ইস্পাতের ফ্রেমে লাগানো রয়েছে সেটা মিসেস মেহতা লক্ষ করলেন না।

ঝুঁকে পড়ে সুইচ অন করলেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেল তাঁর শরীরের মধ্যে দিয়ে। শরীরের প্রতিটি পেশি সঙ্কুচিত হয়ে ঝাঁকুনি দিল। এক্সারসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রিয়া মেহতা, কিন্তু হাত-প্যায়ের ফিতের বাঁধন তাঁকে পড়ে যেতে দিল না। সামনের দেওয়ালে লাগানো প্রমাণ মাপের আয়নায় রূপা ও বিজয়কে শেষবারের মতো হয়তো একবার দেখতে পেলেন তিনি। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা মায়ের পরিণতি দেখছে। দুরন্ত গতির সাইকেলে বিচিত্র বিকৃত ভঙ্গিতে বসে থাকা প্রিয়ার হাত-পা মাথা-কোমর ওঠানামা করছে দ্রুত তালে। এক্সারসাইকেলে শেষবারের মতো চড়ে নিচ্ছেন তিনি।

তিন মিনিট পর বাথটাবে স্নান করতে-করতে জিমনাশিয়াম থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলেন নবীন মেহতা (তাঁর স্ত্রী ডান পা-টা বারবার মেঝেতে লাগছিল)। ছেলে আর মেয়ে যখন বাথরুমে আচমকা ঢুকে এল তখন তিনি ওদের জিগ্যেস করলেন শব্দটা কিসের। কিন্তু তিনি দেখলেন, মেয়ে কোনও জবাব না দিয়ে একটা হেয়ার ড্রায়ার তাক থেকে তুলে নিয়ে তার প্লাগটা গুঁজে দিচ্ছে সকেটে। কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে মেয়ে এগিয়ে গেল বাথটাবের কাছে, বাবার চোখে চোখ রেখে ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলল এক রহস্যময় হাসি।

সকাল ৮-২১ মিনিট

বিন্দিয়া শর্মা দেখল, স্টাডির জানলা থেকে রূপা আর ওর দাদা হাত নেড়ে ইশারা করছে। এই সিগনাল দ্রুত পৌঁছে গেল টিভি আর টেলিফোন কেব্‌লের কাছে কাটার হাতে অপেক্ষায় থাকা চন্দ্রনাথ ও সুকান্তের কাছে। যার-যার শোওয়ার ঘরে ছেলেমেয়েরা চুপচাপ বসে আছে। প্রত্যেকেই টেলিফোনের রিসিভার কানে চেপে ধরে আছে, শুনছে। প্রায় দেড় মিনিট পর টেলিফোনের লাইন ডেড হয়ে গেল।

BanglaBook.org

সকাল ৮-২৩ মিনিট

আর সাত মিনিটের মধ্যে অমরাবতী এস্টেটের বাকি ৩০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হল।

গেট-হাউসের মনিটরের পরদার সব ছবি মুছে যাওয়ায় সিকিওরিটি অফিসার

অলকেশ হাজরা বাইরে বেরিয়ে এল গেট-হাউসের মাথায় বসানো ক্যামেরাটা পরীক্ষা করতে। চন্দ্রনাথ বাগচি গেট-হাউসের দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিল। হাতে সেই বিচিত্র খেলনা। চন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝেই উদ্ভট সব খেলনা তৈরি করে সবাইকে দেখায়। অলকেশ হাজরাকেও আগে এরকম কয়েকটা খেলনা দেখিয়েছে ও। কিন্তু হাজরার দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই। সে চন্দ্রনাথকে হাত নেড়ে গেট-হাউসে ঢুকতে বলে। ক্যামেরা পরীক্ষা করে কোনও গোলমাল খুঁজে না পেয়ে হাজরা আবার ঢুকে পড়ে গেট-হাউসে। তার পকেটে রাখা ওয়াকিটকিতে তখন সিকিওরিটি অফিসার সোমনাথ ঘোষের কথা শোনা যাচ্ছে। সে বলে চলেছে, তার এলাকায় বসানো ক্যামেরাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। সিটে বসে অলকেশ হাজরা টিভি মনিটরগুলো দেখে। চন্দ্রনাথ তখন তার পিছনে দাঁড়িয়ে খেলনা নিয়ে কীসব বকর-বকর করে চলেছে। ওইরকম কথা বলতে-বলতেই চন্দ্রনাথ খেলনাটা ওপরে তুলে চোখের পলকে হাজরার মাথায় পরিয়ে দেয়। তারপর এক টান মারে খেলনার বিশেষ একটা নাইলনের দড়িতে। খটাস করে একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে দুটো ইস্পাতের আঁকশি এঁটে বসে যায় হাজরার গলায়। বাঁশ, স্টিল, স্প্রিং আর নাইলনের দড়ির জটিল ফাঁদে বন্দি হল অলকেশ হাজরা। শেষ মুহূর্তে তার মনে পড়েছিল অক্টোপাসের কথা।

সকাল ৮-২৫ মিনিট

ডক্টর যতীন প্রধান ও ডক্টর অনিতা প্রধান এগিয়ে যাচ্ছেন ওঁদের গাড়ির দিকে। গাড়িটা পার্ক করা রয়েছে গ্যারেজের সামনে। ওঁদের দুজনের হাতেই এখন অনেক কাজ। অনিতাকে একবার বালিগঞ্জে যেতে হবে একজন বৃদ্ধা পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলতে। যতীন প্রধান একটা সুপার-৮ ক্যামেরার অর্ডার দিয়েছিলেন। আজ সেটা ডেলিভারি নিতে যাবেন। টিভি প্রোডিউসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় ওই ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখবেন। গ্যারেজের কাছে এসে ওঁরা দেখলেন, সুনীল গাড়িটা ব্যাক করে বের করে রেখেছে। এখুনি ও আবার ফিরে যাবে ব্রেকফাস্টের টেবিলে। ভোরের বাতাসে গাড়ির ইঞ্জিনের মিহি গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎই অনিতা দেখলেন, গ্যারেজের দরজার সামনে একটা ম্যাগাজিন খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তার রঙিন পাতায় নগ্ন তরুণীর লাস্যময় ছবি। আতঙ্কে হতবাক হয়ে কোনওরকমে ম্যাগাজিনটা তুলে নিলেন তিনি। 'প্লেবয়'। স্বামীকে ডেকে ম্যাগাজিনটা দেখালেন অনিতা। ডক্টর যতীন প্রধান স্তম্ভিত। এই প্রথম ঘুণপোকার দেখা পেলেন ওঁরা। গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসা ছেলের দিকে ওঁদের খেয়াল ছিল না। ইঞ্জিনের চাপা শব্দও ওঁরা খেয়াল করেননি। গাড়িটা যখন ওঁদের ওপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল খেয়াল হল তখন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সকাল ৮-২৬ মিনিট

অমরাবতী এস্টেটের সীমান্তের পথ ধরে সিকিওরিটি অফিসার সোমনাথ ঘোষ হেঁটে

BanglaBook.org

যাচ্ছিল ইমার্জেন্সি টেলিফোনের দিকে। খুঁটিতে বসানো গোয়েন্দা-ক্যামেরার পিনিয়ানটা জ্যাম হয়ে গেছে। হাজরাকে ওয়াকিটকিতে ডেকে সে খবর দিয়েছে বারবার। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। রডোডেনড্রন ঝোপের পাশে রাখা ভিডিও টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল ঘোষ। ছোট্ট পরদায় কোনও ছবি নেই। গোটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমটাই যেন ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। ক্যাবিনেট খুলে রিসিভারটা তুলে নেওয়ামাত্রই ক্রস-বো থেকে ছোড়া প্রথম তীরটা তার পিঠে এসে গেঁথে গেল।

জিতেন্দ্র শর্মা আর অলকা শর্মা ডাইনিং টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। মেয়ে বিন্দিয়া আর মালতী এসে ডাইনিং রুমে ঢুকল। ওদের পরনে ট্র্যাক-স্যুট, ঠোঁটে দুষ্টুমির চাপা হাসি। হাত দুটো পিছনে লুকনো। যেন অবাক করা কিছু একটা দেখিয়ে বাবা-মাকে চমকে দেবে। বিন্দিয়া মায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মালতী দাঁড়াল বাবার পিঠের কাছে। ওরা বাবা-মাকে চোখ বুজতে বলল। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই দুজনের মাথা ফুটো হয়ে গেল বিন্দিয়া ও মালতীর গুলিতে।

সকাল ৮-২৭ মিনিট

'প্রকাশ ইলেকট্রনিক্স'-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রকাশ মিত্র শোওয়ার ঘরে জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন। পাশের বাথরুম থেকে স্ত্রী নন্দিতা কথা বলছিলেন। পোশাক পরতে-পরতেই প্রকাশ মিত্র ছোট্ট 'হুঁ, হাঁ' করে উত্তর দিচ্ছিলেন। এমনসময় ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল ছেলে দীপায়ন। ওর ডান হাতে ছোট ক্যালিবারের একটা অটোমেটিক পিস্তল। পিস্তলটা ও এমনভাবে উঁচিয়ে ধরল যেন একটা জিনিস হঠাৎই পেয়ে ও বাবাকে দেখাচ্ছে। তারপর বাবার বুকে গুলি করল। প্রকাশ মিত্র বসে পড়লেন বিছানায়। শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সাদা জামার বুকের কাছটা লালচে হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেল। ডান হাতটা খামচে ধরলেন বুকের ওপর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে লাগল। স্ত্রীকে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। ওই অবস্থাতেই দেখতে পেলেন, নন্দিতা বাথরুমের ভেতরে পিছিয়ে যাচ্ছেন। ছেলের দ্বিতীয় গুলিটা মায়ের গায়ে লাগল না। তবে তিনি শাওয়ারের পার্টিশনের কাছে উলটে পড়ে গেলেন। শরীরটা আধপাক খেয়ে গড়িয়ে গেল শাওয়ারের নীচে। তখন মায়ের মাথায় পরপর দু-বার গুলি করল দীপায়ন। তাঁর সমস্ত নড়াচড়া স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্ত্রী বা ছেলের কথা না ভেবে প্রকাশ মিত্র টলতে-টলতে শোওয়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ল্যান্ডিং পার হওয়ার সময় টের পেলেন পা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর ঠিক কয়েক পা পিছনেই দীপায়ন, কিন্তু প্রকাশ মিত্রের মাথায় শুধু সদরে পার্ক করে রাখা মারুতি জেন ডিলাক্স গাড়িটার কথাই ঘুরছে। যে করে হোক গাড়িতে উঠে বসতেই হবে তাঁকে। এখনও সময় আছে। সত্যেন যদি তাঁকে চট করে বেলভিউ ক্লিনিকে নিয়ে যেতে পারে তাহলে এখনও আশা আছে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলেন প্রকাশ মিত্র। নগ্ন পায়ে রক্তের আঠালো দাগ। সত্যেন রায় গাড়ির কাচ মুছছিল। প্রকাশ তাকে জড়ানো গলায় কিছু একটা বললেন। সত্যেন গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে

BanglaBook.org

বাড়ির দরজার দিকে তাকিয়েছিল। দেখল, বাবার পিছু-পিছু দীপায়ন বেরিয়ে এসেছে সকালের ঝকঝকে রোদে। হাতে ঝকঝকে পিস্তল। সত্যেন রায় দিশেহারা হয়ে পিছিয়ে গেল বাগানের দিকে। কিন্তু দীপায়ন সঙ্গে-সঙ্গে তাকে গুলি করল। এক অদ্ভুত যুক্তিতে মাথার টুপিটা ডান হাতে খুলে নিতে চাইল সত্যেন। আর একই সঙ্গে তার প্রাণহীন দেহটা কাত হয়ে পড়ে গেল ফুলের বাগানে। গোলাপি লিলিফুলের দল সত্যেন রায়ের মুখে নরম চুমু এঁকে দিল।

প্রকাশ মিত্র বুকের কাছে অসহ্য যন্ত্রণা টের পাচ্ছিলেন। তাঁর মাথার ভেতরে উদ্ভট জটিল শব্দের হিজিবিজি ঝিঁঝিপোকার মতো ডাকছিল। ঝাপসা চোখে দেখলেন, পিস্তল হাতে ছেলে এগিয়ে আসছে গাড়ির জানলার কাছে। তারপর তাঁর অসহায় চোখ দেখল, ১৬ বছরের ছেলেটা নির্লিপ্ত মুখে তাঁকে আবার গুলি করল।

সকাল ৮-২৮ মিনিট

চন্দ্রনাথ বাগচি গেট-হাউস থেকে ফিরে এসেছে বাড়িতে। মরণ খেলনাটা যখন অফিসার হাজরার গলায় এঁটে বসেছে তখন খেলনার ধারালো তারে চন্দ্রনাথের বাঁ-হাত কেটে গেছে। বাড়িতে ফিরে সিঁড়ির নীচে থমকে দাঁড়ায় ও। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাঁ-হাতের কাটা জায়গায় জড়িয়ে নেয় (রক্তমাখা রুমালটা পুলিশের হাতে এসেছে। এক্সিবিট নাম্বার : ৭৭)। ওর মা লাইব্রেরি-ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে লাইব্রেরি-ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। প্রধানদের গ্যারেজের দরজায় গাড়ির ধাক্কা মারার শব্দ দূর থেকে ভেসে এসেছে ওঁদের কানে। কীসের শব্দ? বাগচিরা অবাক হয়ে ভাবছিলেন। তা ছাড়া, এস্টেটের নানা জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছিল গুলির শব্দ। ওঁরা গেট-হাউসে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয়নি। লাইন ডেড। সুতরাং পুলিশেও খবর দেওয়া যায়নি। চন্দ্রনাথের জন্যে ওঁদের দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। এমনসময় ছেলেকে দেখতে পেলেন মিসেস বাগচি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। পরনে ট্র্যাক-স্যুট। তাতে রক্তের ছাপ। ছেলেকে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ও মাকে উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। চিন্তিত মা ছেলেকে অনুসরণ করে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে গেলেন। চন্দ্রনাথ ওর শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। এবার বেরিয়ে এল হাতে শটগান নিয়ে।

সকাল ৮-২৯ মিনিট

গুলির শব্দ আর ডেড টেলিফোন লাইন নিরঞ্জন গোস্বামী ও সুচরিতা গোস্বামীকে বিচলিত করেছিল। ওঁরা সদর দরজা খুলে বাড়ির বাইরে এলেন। দেখলেন, ওঁদের টাটা ফাইভ স্টার এস্টেট ওয়াগনের পাশে সুনীল প্রধান দাঁড়িয়ে আছে। অমরাবতী এস্টেটের ছেলেমেয়েদের 'সোশাল ওয়ার্ক' বাধ্যতামূলক ছিল। তারই একটা অংশ ছিল 'সকলের তরে সকলে আমরা' প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। ওঁরা ভাবলেন, সেই কাজের জন্যেই সুনীল ওঁদের গাড়িটা সাফ করতে এসেছে। সুনীলের

BanglaBook.org

ঠোঁটে অনেকটা সেইরকমই একটা হাসি। এক বালতি জল আর গাড়ি ধোওয়ার কাপড়টা নিয়ে আসার জন্যে মিসেস গোস্বামী বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। সেগুলো নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন স্বামী পড়ে রয়েছেন দরজার কাছে। জামায় রক্ত। মিসেস গোস্বামী চিৎকার করে উঠলেন। হাত থেকে জলের বালতি, কাপড়, সব খসে পড়ে গেল। তিনি স্বামীর মৃতদেহের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তখনই স্টাডির দরজায় একটা শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, সুনীল দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠোঁটে আগের হাসিটা এখনও একইরকমভাবে লেগে আছে। আর ওর জুতোয় রক্তের দাগ। মিসেস গোস্বামী এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, সুনীল প্রধান কী সাফ করতে এসেছে।

সকাল ৮-৩০ মিনিট

এতক্ষণে অমরাবতী এস্টেটের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকলেই মারা গেছেন। শুধু দীনেশ আগরওয়াল ও সুলোচনা আগরওয়াল এখনও ওষুধে আচ্ছন্ন হয়ে গভীর ঘুমে ডুবে আছেন। ফলে ওঁরা টের পেলেন না, ছেলে বিনোদ ওঁদের মুখের ওপরে বালিশ চাপা দিয়ে দম বন্ধ করে দিচ্ছে।

পরিচারিকা তিনজন এত শোরগোলে বিপদের গন্ধ পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। তখনই ওদের গুলি করে খতম করা হয়। সবার শেষে মারা গেছে প্রাইভেট টিউটর অজিতেশ সরকার। সে হীরক সেনদের লাইব্রেরি-ঘরে লুকিয়ে বসে জয়িতার হোমওয়ার্ক কারেকশান করছিল। জয়িতা সেখানেই তাকে গুলি করে।

খুনিদের শেষ ঠিকানা

বাবা-মা ও অন্যান্যদের খুন করে পথের বাধা সরিয়ে ১৩ জন ছেলেমেয়ে অমরাবতী এস্টেট থেকে উধাও হয়ে যায়। সবাইকে খুন করার পর এস্টেট ছেড়ে রওনা হতে ওরা মিনিট দশেকের বেশি সময় নিয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এমন কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি যা থেকে বলা যায় কীভাবে ওরা এস্টেট ছেড়ে পালিয়েছে। ওদের বেশিরভাগেরই পরনে ছিল ট্র্যাক-স্যুট। সুতরাং সকালবেলা যদি কেউ ওদের অমরাবতীর আশেপাশে দেখেও থাকে, তা হলে ওদের মোটেও সন্দেহ করবে না। কারণ সকালবেলা ট্র্যাক-স্যুট পরে দৌড়নোটা অমরাবতীর আশেপাশের অঞ্চলে নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। আর একটু দূর থেকে ওদের ট্র্যাক-স্যুট বা জুতোয় লেগে থাকা রক্তের দাগ দেখে নেহাতই কাদামাটির দাগ বলে ভুল করাটা অস্বাভাবিক নয়।

'দ্য এঞ্জেল' নার্সিংহোম থেকে রূপা মেহতাকে কিডন্যাপ করার পর ছেলেমেয়েগুলোর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওরা কোথায় কেমন করে গা ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে। হয়তো ওরা একসঙ্গে না থেকে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হয়তো টাকা দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক লোকজনদের ওরা গার্জেন সাজিয়েছে। এখনকার দুনিয়ায় টাকা থাকলে কী না হয়।

BanglaBook.org

একটি ব্যক্তিগত মন্তব্য

এই ডায়েরি যখন সকলের সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন একজন দায়িত্ববান সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে কয়েকটি কথা বলা দরকার মনে করি। ডায়েরির নানা জায়গায় নানাভাবে এ-কথা আমি অনেকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছি, কিন্তু এবার সরাসরি বলা উচিত। ওই ১৩ জন ছেলেমেয়ে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে মারাত্মকরকম বিপজ্জনক। কোনও দুর্ঘটনায় কোনও মানুষের মুখ যদি বীভৎস, বিকৃত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তাহলে তাকে দেখলেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আমরা শিউরে উঠি। কোনওরকম ভাবনা-চিন্তা না করেই তার সম্পর্কে সতর্ক সাবধান হয়ে যাই। অমরাবতীর ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক একইরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে—তবে সেটা মানসিক দুর্ঘটনা। বাইরের নয়, ভেতরের। ফলে ওদের মন বীভৎস, বিকৃত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এই মন সেরে ওঠার কোনও উপায় নেই। ছোটবেলা থেকেই আদর্শ নিয়মের বেড়াজালে ওদের মানুষ করার চেষ্টা হয়েছে। ফলে শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পেয়েছে। ওরা লম্বা সময় ধরে এক ধারাবাহিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়েছে। এই অস্বাভাবিক মানসিকতার জগৎ থেকে কখনও ফেরা যায় না। সামান্য সম্ভাবনা ছিল রূপা মেহতার, কিন্তু নার্সিংহোমের কিডন্যাপিং-এর ঘটনা সেই সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

সুতরাং অমরাবতীর ছেলেমেয়েরা আবার দেখা দেবে। অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে দেখা দেবে। ওরাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, মানুষের স্বাভাবিক পরিবেশ ও সমাজ প্রয়োজন, অমরাবতীর মতো শতকরা একশোভাগ সুস্থ মেকি সমাজব্যবস্থা নয়। অমরাবতী এস্টেটের তথাকথিত সাফল্য দেখে এরকম আরও অনেক এস্টেট তৈরি হয়েছে, হচ্ছে। আশা করি অমরাবতীর মর্মান্তিক পরিণতি এস্টেটের ব্যাপারে উৎসাহী সকলকে সাবধান করে দেবে। বলা বাহুল্য, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, বিধানসভার সদস্যরা, সকলেই আমার রিপোর্টকে 'সম্পূর্ণ অবাস্তব' বলে অগ্রাহ্য করেছেন। এখনও ওঁদের ধারণা, ৩২ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে খুন করে খুনিরা ওই ১৩ জন ছেলেমেয়েকে কিডন্যাপ করেছে। আমি বারবার বলা সত্ত্বেও কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেননি। তাই নিরুপায় হয়ে এই ডায়েরি আমি প্রকাশ করছি। এটা পড়ার পর কেউ যেন আমাকে দোষ দেবেন না যে, আমি আগে থেকে সবাইকে সাবধান করে দিইনি।

BanglaBook.org

কিরাত আসছে

এক ঃ কিরাত পীসমেকার চৌধুরী

স্যামুয়েল কোল্ট উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম পীসমেকার হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। অন্তত ১৮৬১ সালে কোল্ট সাহেব অনেক ভেবে-চিন্তেই নামটা দিয়েছিলেন। শান্তিরক্ষক। কিন্তু শান্তিরক্ষার বদলে অশান্তিমূলক ব্যাপারেই তাঁর যন্ত্রের প্রয়োগ বেশি। আর বিশেষ করে নামের এই অপব্যবহার আমাকে অস্থির ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। যেমন এখন করছে।

যদি আপনার বুক থেকে ঠিক তিনহাত দূরে কোল্ট রিভলভারের নল অবিচল থাকে এবং সেই অস্ত্রের মালিক কষ্টকৃত গম্ভীর স্বরে পাঠশালামার্কা ইংরেজিতে আপনাকে বলে, 'লোয়ার ইওর হ্যান্ডস অ্যান্ড ইউ আর ডেড।' তা হলে আপনি কী করবেন, তা সবাই জানে। চুপচাপ হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু আমি কী করব, তা সবাই জানে না। অন্তত এই লোকটা জানে না।

সুতরাং খুব শান্ত স্বরে ওকে বললাম, 'হাত নামাতে বারণ করেছ, কিন্তু পা তুলতে যখন বারণ করোনি...।'

লোকটা আমার কথা বুঝল কি না জানি না, তবে মারটা বুঝল।

প্রথমে একটা 'মাওয়াশি গেরি'।

অর্থাৎ, লোকটার ডানহাতের কনুই লক্ষ করে ডানপায়ের প্রচণ্ড এক লাথির ছোবল। এবং পরমুহূর্তেই একটা 'শুতো গামেন উচি'।

অর্থাৎ, ওর বাঁ-রগের ওপর আমার ডানহাতের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ।

লোকটা মার্শাল আর্ট-এর নিয়ম অনুযায়ী উলটে পড়ল পাঁচহাত দূরে। কোল্ট ছিটকে পড়ল আরও তিনহাত দূরে।

প্রথমে কোল্টটা তুলে নিলাম। পকেটে রাখলাম। এগিয়ে গিয়ে লোকটার শরীরে পায়ের খোঁচা—আসলে লাথি—মারলাম। নড়ল না। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কোল্টটা বাগিয়ে ধরে ওর মাথায় পীসমেকার স্লীপিং ট্যাবলেট এক ঘা প্রয়োগ করলাম। এবং নিশ্চিন্ত হলাম।

এবারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। একপাশে টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম করুণ আগন্তুককে।

বয়েস তিরিশের এদিকেই। দাড়ি-গোঁফ কামানো ভরসা মুখ। গলায় সরু চেন। পরনে চেক শার্ট আর সাদা ক্লেয়ার্স। স্বাস্থ্য মন্দ নয়। শরীরচর্চা করার অভ্যেস হয়তো আছে। এরপর আর থাকবে না।

ছোট্ট দোতলা এই বাড়ি। এখানে আমি একাই থাকি। একটু আগে দোতলার ঘরে বসে একটা ফিল্ম পত্রিকায় চোখ বোলাচ্ছিলাম, বর্তমান আগন্তুকের প্রবেশ। এবং পরিণতি

BanglaBook.org

বর্ণনা মতো। না, এর পরিচয়, অভিসন্ধি ইত্যাদি নিয়ে আমি এতটুকু ব্যস্ত নই। কারণ সেসব আমি জানি। জানাটাই আমার কাজ। সুতরাং ভাবনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম স্টিল আলমারির কাছে। আলমারির দরজা খুলে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে, আলমারির তৃতীয় তাকে, থাক-থাক নোট। বিশ, পঞ্চাশ ও একশো টাকার নোট। নতুন।

একটা বিশ, একটা পঞ্চাশ ও একটা একশো টাকার নোট বান্ডিল থেকে খুলে নিলাম। আলমারি বন্ধ করে ফিরে এলাম ঘুমন্ত দেবশিশুর কাছে। শিশু এখনও অসাড়। সুতরাং নোট তিনটে হাতে নিয়ে সাড় ফেরার প্রতীক্ষায় রইলাম। মনে চিন্তা বয়ে যায় সুষম ছন্দে। আমি কে? কেন এখানে এসেছি? উত্তর কেউ জানে না। আমিও কি সঠিক জানি?

হঠাৎই লোকটা সামান্য নড়ে উঠল। বেঁচে ওঠার ইঙ্গিত। তারপর ডানহাতে ভর দিয়ে উঠতে গিয়েই ককিয়ে উঠল। মাওয়াশি গেরি লাথিতে সম্ভবত ওর ডানহাতটা কনুই থেকে ভেঙে গেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আগন্তুক। আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

শেষ টান দিয়ে সিগারেট ফেলে দিলাম। হাতের নোট তিনটে নাচিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম! তারপর ঝুঁকে পড়ে বাঁ-হাতে ওর জামাটা খামচে ধরে এক ঝাঁকুনি দিলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মাসুদ, ওঠো।'

লোকটা অবাক হয়ে চমকে উঠল। চোখে চেতনা ফিরে এল। এক হ্যাঁচকায় মাসুদকে বসিয়ে দিলাম। ওর যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে মনোযোগ দিলাম না। তারপর টেবিল থেকে বল পয়েন্ট পেন তুলে নিয়ে নোট তিনটের সাদা জায়গায় লিখলাম :

"উইথ বেস্ট উইশেস।"
কিরাত চৌধুরী—পীসমেকার।

মাসুদের দিকে নোট তিনটে এগিয়ে দিলাম।

অবাক চোখে ও নোট তিনটে নিল। লেখাটা দেখল। থতিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?' এবং পরমুহূর্তেই সটান চিৎ হয়ে ছিটকে পড়ল। কারণ, আমার ডান পা চকিতে ছোবল মেরেছে ওর চোয়ালে। শান্ত স্বরে বললাম, 'ছিঃ, তুমি নয়, আপনি বলো। নইলে লোকে বলবে, নরোত্তম শর্মার বফাদার কুত্তা সবক শেখেনি।'

আমার মুখে নরোত্তম শর্মার নাম শুনে আবার বিস্ময় প্রকাশ করল মাসুদ। সেটা বুঝলাম ওর তীক্ষ্ণ হয়ে আসা চোখ দেখে। ওকে আরও বললাম, 'মাসুদ, এবার যে-কথাগুলো বলব, মন দিয়ে শোনো। কারণ, শর্মা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চাইবে। আমার নাম কিরাত চৌধুরী। বয়েস একটুও না কমিয়ে চল্লিশ। এটা আমার বাড়ি। আমার ব্যবসা আছে। তোমাদের মতোই ব্যবসা। তবে এসবই তুমি জানো। যেটা জানো না, সেটা হল তোমাকে কেন আমি ছেড়ে দিচ্ছি। সেটা এইজন্যে—।'

মাসুদকে টেনে তুললাম। ওর পাঁজরায় প্রচণ্ড এক লাথি কষিয়ে আবার ওকে শুইয়ে দিলাম। ঠোঁটের কষ বেয়ে সরু রক্তের রেখা প্রকট হল। ওর অবাক হাত থেকে

BanglaBook.org

নোটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে চলে এলাম টেবিলের কাছে। ডানদিকের ড্রয়ার খুলে একটা বড় ছুঁচ বের করলাম। ছুঁচের ফুটোয় সরু টোন সুতো পরানো। কারণ আমি তৈরি ছিলাম। আমি জানতাম, নরোত্তম শর্মা আমার কাছে লোক পাঠাবে। আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। চেষ্টা করবে, এ-ব্যবসার পথ থেকে আমাকে চিরতরে সরিয়ে দিতে। অম্বর রায়ের মতো। কিন্তু একটা জায়গায় শর্মা বিরাট ভুল করেছে। আমি রায় নই। আমার জান ইস্পাতের তৈরি। আমার মান আকাশছোঁয়া।

ছুঁচ-সুতো নিয়ে মাসুদের কাছে ঝুঁকে এলাম। একটানে ওর চেকশার্ট সরিয়ে দিলাম বুক থেকে। পটাপট ছিঁড়ে গেল জামার দুটো বোতাম। সামনেই মাসুদের ফরসা চামড়া। ডান বুকে একটা পুরোনো ক্ষতের দাগ কুখ্যাতি অথবা দুঃসাহসের পরিচয় দিচ্ছে। নোট তিনটে নিয়ে ছুঁচ দিয়ে ফোঁড় দিলাম ওর বুকের চামড়ায়।

'ও—ও—ওঃ—' ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠল মাসুদ।

আমি হাসলাম। ফোঁড়ের পর ফোঁড় দিয়ে নোট তিনটে ভালো করে এঁটে দিলাম ওর বুকে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বললাম, 'সন্টলেক। সেক্টর নাম্বার তিন। নির্জনতার জন্যে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ জায়গা পেয়েছে।'

হাতের কাজ যখন শেষ হল, তখন মাসুদের বুকের চামড়া টকটকে লাল। তারই মাঝে আরও লাল ক্ষীণ রক্তের ধারা। ওকে রেখে কিচেন থেকে একমুঠো চিনি নিয়ে এলাম। বুকের ক্ষতস্থানে চেপে ধরলাম। রক্ত পড়াটা অন্তত বন্ধ হবে। আমি চাই না, রক্তক্ষরণে মাসুদ মারা যাক। এখনও ওর মরার সময় হয়নি। পরে হবে।

এবার প্যান্টে হাত ঘষে মাসুদকে সটান দাঁড় করিয়ে দিলাম। ও টলে পড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ ধরে রাখতেই ভারসাম্য ফিরে পেল। দু-চোখ এখনও বোজা।

'মাসুদ!' নিজের স্বরের তীব্রতায় নিজেই চমকে উঠলাম, 'চোখ খোলো!'

আমি কি সংযম, স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছি?

মাসুদ অতিকষ্টে চোখ খুলে তাকাল। ঘরের সামান্য আলোতেও ওর চোখের অভিব্যক্তি স্পষ্ট নজর কাড়ে। বিস্ময় : এখনও বেঁচে আছে বলে। ভয় : এরপর কী হতে চলেছে ভেবে।

'শর্মার ঝোপড়ায় ফিরে যাও!' ওর বুকে আঁটা নোটগুলোয় আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, 'এগুলো ওকে দেবে। নোটগুলো ধুয়ে নিতে বলবে। রক্তের দাগ লেগে আছে। তারপর বলবে খবরটা পড়তে। জলে সে লেখা মুছবে না; বল পয়েন্ট পেনে সেইজন্যেই লিখেছি। ওকে বলবে, দ্য টাইম ইজ আপ। গেট রেডি, শর্মা। কিরাত আসছে। পীসমেকার কিরাত চৌধুরী।'

আমার চোখ জ্বলছে। মন জ্বলছে।

ওকে ধরে-ধরে নিয়ে এলাম একতলায়। সমস্ত আলো নিভিয়ে দরজা খুলে নির্জন রাস্তায় বের করে দিলাম মাসুদকে। আমাদের উপস্থিতির সাক্ষী ওপরের তারা, ঝিকমিক আকাশ আর দূরের একচক্ষু লাইটপোস্টের ভেপার ল্যাম্পগুলো।

শেষবারের মতো দাঁতে দাঁত চেপে হিস্‌হিস্ করে বললাম, 'লিসন্ কেয়ারফুলি ইউ ফ্যাগ! যেন ভুল না হয়! শালা নরোত্তমকে বলবি কিরাত আসছে। শাস্তি নিয়ে আসছে। ওম শান্তি!'

BanglaBook.org

এক ধাক্কায় মাসুদকে ছিটকে দিলাম অ্যাসফল্টের রাস্তায়। জানি, আশেপাশে কোথাও একটা গাড়ি লুকিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। ওকে ঠিক জায়গামতো পৌঁছে দেবে।

সদর দরজা বন্ধ করে ওপরে এলাম। টেবিল-ঘড়িতে রাত সাড়ে দশটা।

মাসুদ কী করে ঢুকল বাড়িতে? দোতলার বারান্দায় বেয়ে উঠে? নাকি একতলার পেছনের পাঁচিল টপকে? সে যাই হোক, মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, মাসুদ ওর ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নরোত্তম শর্মার সামনে। নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলতে চাইছে। নরোত্তম এগিয়ে এসে নোট তিনটে ছিঁড়ে নিল ওর বুক থেকে। লেখাগুলো পড়ল। কী একটা বলতে গিয়ে থামল। আলোর দিকে তুলে ধরে একে-একে পরখ করল নোট তিনটে। উত্তেজনায় ঘুরে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'যো শক থা ওহি সাচ নিক্‌লা! জালি নোট! কিরাত চৌধুরী আমাদের লাইনে নেমেছে।'

সকাল হল।

চোখ খুললাম। নির্জন এলাকার সকাল ও চঞ্চল শহরের সকালের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফারাক রয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই মাসুদের কথা মনে পড়ল। নরোত্তম শর্মার কাছে খবর পৌঁছে গেছে তো? আমি জানি, এরপর শুরু হবে আসল খেলা।

অম্বর রায় পার্ক সার্কাসে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত। এখন, যতদূর জানি, সে ফ্ল্যাটে ওর বিধবা বউ থাকে। মণিকা রায়। আমার খেলায় মণিকা রায়েরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, মণিকা রায়কে বাদ দিয়ে অম্বর রায়ের স্মৃতিচারণ করা যায় না।

সুতরাং টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডিরেক্টরি তুলে নিলাম হাতে। অম্বর রায়ের ফোন নম্বর আমার জানা। তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে পাতা উলটে ফোন নম্বরটা আর-একবার দেখে নিলাম। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরালাম।

'হ্যালো—' ও-প্রান্তে মহিলা কণ্ঠস্বর। মণিকা রায় নাকি?

'আমি একটু মিসেস রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ধরুন, মাকে ডেকে দিচ্ছি—।'

অনুমানে বুঝলাম, কাজের লোক। মণিকা রায়ের পক্ষে একেবারে একা থাকাটা তেমন স্বাভাবিক নয়।

একটু পরেই—'হ্যালো—।'

'কে, মিসেস রায়?'

'কে? কে আপনি?' মণিকা রায় কি আমার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছে? তার ব্যাকুল প্রশ্নের ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সংশয়, অবিশ্বাস আর প্রত্যাশা।

'মিসেস রায়, আমার নাম কিরাত চৌধুরী। আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি অম্বরের বন্ধু।'

'কি-রা-ত চৌধুরী। অম্বরের বন্ধু!' মণিকা রায় দ্বিধা-ভরা স্বরে থেমে-থেমে

BanglaBook.org

উচ্চারণ করল। তারপর ইতস্তত করে বলল, 'এই নামে ওঁর কোনও বন্ধুর কথা তো... কখনও...মানে...।'

আমি মণিকাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'না শোনারই কথা। কারণ আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—জেলে।'

ও-প্রান্তে আচমকা শ্বাস টানল মণিকা রায়। বোধহয় কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর অস্ফুটে বলল, 'জেলে...আলাপ...হয়েছিল...!'

আমি গলার স্বর কিছুটা নরম করে বললাম, 'জানি, শুনতে আপনার খারাপ লাগছে, কিন্তু কথাটা সত্যি। যাই হোক, ফোনে তো এতকথা হয় না, আর বলাটাও ঠিক হবে না। আমি এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। অম্বরের সম্পর্কে কতগুলো জরুরি কথা আমার জানার আছে। প্লিজ, আপনি আপত্তি করবেন না। কথা দিচ্ছি, আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না।'

ও-প্রান্ত অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তখন আমি আবার বললাম, 'মিসেস রায়, আই নীড ইওর হেল্প। সো হেল্প মি—প্লিজ! অন্তত একটিবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা খুব জরুরি।'

কিছুক্ষণ কী ভেবে ছোট্ট করে মণিকা রায় বলল, 'আসুন, আমি অপেক্ষায় থাকব—।'

'থ্যাংক্স্ এ লট।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। তারপর পোশাক পরে প্রস্তুত হলাম। লক্ষ্য : মণিকা রায়। উদ্দেশ্য : এখনও কি সঠিক জানি?

বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হল না। ঠিকানা না থাকলেও এলাকাটা আমার চেনা। ফ্ল্যাটটাও অচেনা নয়। সুতরাং ট্রামরাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ভেতরে পা বাড়ালাম। সজ্ঞানেই বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। মণিকা—মণিকা রায়। কেমন আছ তুমি? কীরকম দেখতে হয়েছে তোমাকে?

ফ্ল্যাটের দরজার পাশে কলিংবেল। কী ভেবে বেল না টিপে দরজায় টোকা দিলাম।

'কাকে চাই?' সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠ। সময় পারেনি ছিনিয়ে নিতে।

আমি নীরব।

দরজা খুলে গেল। কোঁকড়ানো ঘন একমাথা চুল নিয়ে মিষ্টি মুখের অবাক দৃষ্টি আমাকে জানিয়ে দিল মণিকা রায়ের কাছে আমি অচেনা। নীরব প্রশ্ন ফুটে উঠল চোখের তারায়। কে আপনি?

'আমি কিরাত চৌধুরী। আমাকে আপনি চেনেন না, তবে আপনাকে আমি চিনি। অম্বরের মুখে অনেক শুনেছি। জেলে থাকতে—।'

আমার কথায় মণিকা যেন চমকে উঠল। পলকের জন্যে আনমনা হয়ে গিয়েই ওর চোখ আবার আমাকে দেখল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কষ্টিপাথর-পরীক্ষায় সফল হলাম। কারণ ওকে আমি জানিয়েছি, আমি অম্বর রায়ের জেলের বন্ধু। সতীর্থ কয়েদী। অতএব বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও অতিরিক্ত সার্টিফিকেট হিসেবে বললাম, 'জেলে থাকতে আপনাকে দেখেওছি। অম্বরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন—যেবার ওর অসুখ করেছিল, শীতকালে।'

BanglaBook.org

অর্থাৎ অম্বর রায় একবারের বেশি জেলে গিয়েছিল, তাও আমি জানি। এও জানি, একবার শীতকালে ওর অসুখ করেছিল। সুতরাং সামান্য খোলা দরজা প্রশস্ত হল। নজরে এল সাদা শিফন শাড়ি। মণিকা, পৃথিবীতে অম্বরের জায়গা হল না? কে থাকতে দিল না ওকে?

'ভেতরে আসুন—' ছোট্ট অথচ আন্তরিক আহ্বান।

ভেতরে পা রাখলাম। অনুভব করলাম, পকেটে মাসুদের পীসমেকার। আমারটা বাড়িতে। আলমারিতে। এখানে শান্তি এমনিতেই আছে। শান্তিরক্ষকের প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমার হাত পকেটের বাইরে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে।

বসবার ঘর সাজানো-গোছানো। মানুষের কাজ কম থাকলে আসবাবের প্রতি যে অতিরিক্ত যত্ন নেয়, সেই যত্নের ছাপ সর্বত্র। বিনা অনুরোধেই বসলাম। বললাম, 'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন, মিসেস রায়।'

নীরবে বসল প্রতিমা। বিবাদ-প্রতিমা।

হঠাৎই চোখ তুলে সরাসরি প্রশ্ন করল মণিকা, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি কেন এসেছেন—এতদিন বাদে?'

'মিসেস রায়, অম্বর মারা গেছে কতদিন?'

'আপনি জানেন না?' সন্দেহ-বিস্ময় জায়গা পেল পাশাপাশি।

'না। আমি দিন দশেক হল জেল থেকে বেরিয়েছি।' মিথ্যে বললাম।

সদ্যমুক্ত কয়েদীকে সামনাসামনি দেখলে যে-প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায়, তা মণিকার মধ্যে পেলাম না।

'প্রায় চার বছর।'

'চার বছর!' আমার বিস্ময়ে যে-প্রশ্ন লুকিয়েছিল তার উত্তরে মণিকা বলল, 'আমি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরি করি। বাচ্চাদের পড়াই। শত কষ্ট হলেও এ-ফ্ল্যাটটা ছাড়িনি। এখানেই ওর স্মৃতি ছড়ানো রয়েছে...।' ওর গলার স্বর শেষদিকে ভেঙে যেতে চাইল।

কিছুক্ষণ আমি নীরব। মণিকাও।

তারপর অতিকষ্টে ওর চোখে তাকালাম। আমার চোখ জ্বালা করছে। মাথা দপদপ করছে। জানতে চাইলাম, 'কী করে মারা গেল অম্বর?'

'আপনি ওর বন্ধু; বলতে কষ্ট হলেও আপনার সব জানা উচিত।' মণিকা উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপরে পোলার পাখা ঘুরছে। তবুও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন? মণিকা পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল অদূরে টেবিলে রাখা অম্বর রায়ের ফটোর কাছে। অম্বরের কপালে চন্দনের টিপ। মুখে একচিলতে হাসি। আমার দিকে না ফিরেই মণিকা প্রশ্ন করল, 'আপনার বন্ধুর কিসের ব্যবসা ছিল জানতেন?'

জানি। জাল নোটের ব্যবসা। আমার মতো। সুতরাং বললাম, 'না, জানি না। জেলে গিয়েছিল কী একটা রাহাজানির অভিযোগে—।'

'ওটা সাজানো। ওর আসল ব্যবসা ছিল জাল নোটের। পনেরো বছর বয়েস থেকে এ-পথে ওর হাতেখড়ি। এমনিতে ও ছিল খুব চাপা স্বভাবের। কাউকে কিছু বলত না। আপনি হয়তো কিছুটা আঁচ করে থাকবেন। আপনি ওর বন্ধু—' আমার দিকে

BanglaBook.org

ফিরল মণিকা রায়, 'কিন্তু আপনি এসব জেনে কী করবেন? এখন তো সব চুকেবুকে গেছে—।'

'যায়নি!' আমার স্বর তীব্র। নিজের অজান্তেই। সংযত হয়ে বললাম, 'আমারও একই ব্যবসা। তাই আমার জানা উচিত—একটু আগে আপনিই তো বললেন। তা ছাড়া, যদ্দূর জানি অম্বর সুবিচার পায়নি।'

'এ-পৃথিবীতে সুবিচার কেউ পায় না, মিস্টার চৌধুরী, তবে অম্বরের ওপরে যা হয়েছে তা অবিচারের চেয়েও একশো গুণ ভয়ঙ্কর।' ক্ষিপ্র পায়ে চেয়ারে এসে বসল মণিকা। খুব শান্ত স্বরে বলল, 'অম্বরকে নরোত্তম শর্মা তিলে-তিলে খুন করেছে!' মণিকার চোখে জল। স্মৃতি বড় ভয়ঙ্কর। ওর দৃষ্টি শূন্য হয়ে এল; মন ফিরে গেল অতীতে—চার বছর আগে। একই সঙ্গে আমিও যেন রওনা হলাম স্মৃতির রেলগাড়ি চড়ে।

'অম্বরের সঙ্গে আমার দশ বছর আগে বিয়ে হয়। দুর্ভাগ্যের জন্যেই হয়তো সন্তান পাইনি। কিংবা হয়তো ভালোর জন্যেই। কে বলতে পারে, আমার ঘরে দ্বিতীয় অম্বর রায় তৈরি হত না? সে যাক, বিয়ের বছরখানেক পরেই ওর ব্যবসার কথা আমি জানতে পারি। কিন্তু প্রথম কয়েকদিন বাদানুবাদের পর সবই মেনে নিয়েছিলাম—এ ছাড়া উপায় কী ছিল? ওর জন্যে অনেক দুঃখ-কষ্ট আমি পেয়েছি। এমনকি জেলেও গেছি ওর সঙ্গে দেখা করতে, সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু লোকটা ও খারাপ ছিল না, বিশ্বাস করুন। ওকে ওর ব্যবসার কথা তুলে আঘাত দিলে বলত, "মণি, ছোটবেলা মাথার ওপরে কেউ ছিল না। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে না পেয়ে এ-পথে গেছি। তখন থেকে জাল নোটের ব্লক তৈরির কারিগরিতে হাত পাকিয়েছি। এখন সারা ভারতে আমার চেয়ে ভালো নোট কেউ ছাপতে পারে না। আমার ঘরে আজ নোটের পাহাড়।"

'আমি তখন বলেছি, "টাকাটাই সব নয়, অম্বর। টাকার আমার দরকার নেই। শুধু তুমি আমার কাছে থাকলেই হবে—আমার সব পাওয়া হবে।" উত্তরে ও হেসেছে, অনুনয় করে বলেছে, "প্লিজ, আর ক'টা দিন, মণি। তারপরই আমরা দুজনে কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দেব কোনও নাম-না-জানা গ্রামে। যেখানে ছোট্ট সুন্দর বাড়ির পাশে থাকবে বয়ে যাওয়া নদী, আশেপাশে গাছ-গাছালির সবুজ, নানারঙের ফুল। আর আমরা দুজন—।"

'উত্তরে আমি চুপ করে থাকতাম। অবাক চোখে অম্বরকে দেখতাম। দেখতাম, টাকার নেশা ওকে কীভাবে ঘিরে ধরেছে। কোনওদিন কি ও পারবে এই নেশার বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে? কোনওদিন কি সত্যি হবে ওর অজানা গাঁয়ে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন? শুধু এইসব ভাবতাম আমি—।'

মণিকা হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। ছোট্ট করে কাশল। আমি অদ্ভুত চোখে ওকে দেখছিলাম। ওর কথা শুনছিলাম। ইস্, অল্পের জন্যে অম্বরের স্বপ্ন কেমন চুরমার হয়ে গেল! ভাঙা টুকরোগুলো খুঁজে-পেতে জোড়া দিয়ে আর কি সেই স্বপ্ন ফিরে পাওয়া যায়?

নিচু গলায় মণিকা আবার বলতে লাগল, '...একদিন, ও মারা যাওয়ার দু-একদিন আগে, হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত আর উত্তেজিত হয়ে অম্বর বাড়িতে এল...।

BanglaBook.org

দুই : অম্বর ঈশ্বর রায়

মণিকার কথা :

স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, কলিংবেল বেজে উঠল অধৈর্যভাবে। পরপর চারবার। এ-সময়ে কে আসতে পারে? অম্বর তো বলে গেছে ফিরতে রাত হবে। তাহলে? চুলে শেষ কাঁটাটা গুঁজে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে প্রশ্ন করলাম, 'কে?'

উত্তর এল, 'মণি, আমি—অম্বর।'

অবাক হয়ে দরজা খুললাম।

অম্বর দাঁড়িয়ে। চোখে-মুখে শ্রান্তি ও হতাশার ছাপ। ক্ষিপ্র পায়ে ঘরে ঢুকে এল ও। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে সটান চলে গেল শোওয়ার ঘরে। শুনতে পেলাম স্টিল-আলমারি খোলার শব্দ। আমার বিস্ময় এবার ভয়ের চেহারা নিল। আশঙ্কা নিয়ে ছুটে গেলাম শোওয়ার ঘরে। দেখি, আলমারির গোপন কোটর থেকে নোট-ছাপার ব্লকগুলো বের করছে অম্বর। সাজিয়ে রাখছে বিছানার ওপর।

'কী হয়েছে, অম্বর?'

অম্বর ফিরে তাকাল আমার দিকে। এক মুহূর্ত। তারপর আবার আলমারির দিকে মন দিল।

একটু পরে আলমারি বন্ধ করে ও বিছানায় বসল। ইশারায় আমাকেও বসতে বলল পাশে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ও বলল, 'মণি, আমাদের কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে। আজই। এখুনি।'

'কেন?' ভয়ে আমার বুক দুরু-দুরু।

আমার পিঠে হাত রাখল অম্বর। চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির। বলল, 'নরোত্তম শর্মার নাম তোমাকে আগেও তো বলেছি, তাই না?'

আমি নীরবে সম্মতি জানালাম।

'শর্মা আমার পিছনে লেগেছে। আমি এ-লাইনে আছি আজ প্রায় পঁচিশ বছর। আমার মতো নিখুঁত নোট কেউ ছাপতে পারে না। সবাই বলে, অম্বর রায়ের ব্লক সেরা ব্লক। তাই জাল নোটের কারবারে সাকরেদের জোর না থাকলেও আমি একচেটিয়া ব্যবসা করি। সুইজারল্যান্ড থেকে পার্চমেন্ট কাগজ স্মাগল করে আনা থেকে নোট-ছাপা—সব আমি নিজের হাতে করি। এ-ব্যাপারটাই কেউ ভালো চোখে দেখছে না। অন্তত এ-লাইনের অন্য ব্যবসাদাররা। নরোত্তম শর্মা বছর কয়েক হল লাইনে নেমেছে। ওর তাঁবে বহু লোক কাজ করে। ওর এস্ট্যাবলিশমেন্ট খরচ আমার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু ওর মালের বাজার-দর কম। তাই ও আমাকে লাইন থেকে সরাতে চায়। আজ মাসখানেক হল নোটের এই ব্লকগুলোর জন্যে আমার পেছনে শর্মার লোক লেগেছে, কিন্তু আমি প্রাণপণে এগুলোকে আগলে রেখেছি। আর কতদিন পারব জানি না। সুতরাং আর দেরি নয়। ইতিমধ্যেই অনেক দেরি আমার হয়ে গেছে। জিনিসপত্র যা পারো, দুটো সুটকেসে গুছিয়ে নাও—।'

BanglaBook.org

আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম। চটপট দুটো সুটকেসে ামা-কাপড় ও কয়েকটা দরকারি জিনিস গুছিয়ে নিলাম। অম্বরও আমাকে সাহায্য করতে াগল। টাকা-পয়সা নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে ভরছি, অম্বর তাড়া দিল, 'টাকা আমার সঙ্গে াছে, আর নিতে হবে না। শর্মা কখন গোলমাল বাধাবে, কে জানে।'

শোওয়ার ঘর থেকে বাইরের ঘরে এলাম। অম্বরের দু-হাতে দুটো সুটকেস। কগুলো ও একটা সুটকেসে ভরে নিয়েছে। একবার পিছন ফিরে দেখে নিলাম, দরকারি কানও জিনিস ফেলে যাচ্ছি কি না। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই আমরা পাথর। অম্বর নিশ্চল। ামিও। শুধু শোনা যায় আমাদের হৃৎপিণ্ডের টিপটিপ শব্দ।

কেউ একজন অধৈর্যভাবে কলিংবেল টিপছে।

কলিংবেলের শব্দ ট্রেনের হুইস্‌লের তীব্রতায় আমাদের কানে এসে বাজল।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। কলিংবেলের শব্দ তখনও অবিচ্ছিন্ন।

'মণি, দরজাটা খুলে দাও।' অম্বরের স্বর বরফে ডোবানো। শান্ত।

অন্য কোনও উপায় মাথায় না আসায় অম্বরের কথাই মেনে নিলাম।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। আর অম্বর দুদ্দাড় করে সুটকেস দুটো ফের শোওয়ার ঘরে ঢুকল।

দরজা খুলতেই চোখে পড়ল তিনটে ভদ্র মুখ। মুখে তাদের অভদ্র হাসি। তাদের ধ্যে সামনের জন প্রশ্ন করল, 'মিস্টার অম্বর রায় ইন?'

আমার মধ্যে কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা। সুতরাং দরজা ঠেলে তিনজনই ঘরে ঢুকে াড়ল।

প্রথম জনের চেহারায় কেমন একটা রুক্ষ ছাপ। ফরসা মুখে চঞ্চল চোখ যেন মানায়নি। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা।

দ্বিতীয় জনের মুখ-চোখ শান্ত, অথচ কেমন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব।

আর তৃতীয় জন জানে, পরিস্থিতি অনুযায়ী কী-কী করতে হয়। কারণ ঘরে ঢুকেই স দরজায় ছিটকিনি এঁটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে পড়ে বেলবট্‌স্ প্যান্ট তুলে গাড়ালির কাছে বাঁধা স্ট্র্যাপ থেকে বের করে নিল একটা সোজা ফলার ছুরি। বাকি জন সামনে এগিয়ে এল।

আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। চিৎকার করে বললাম, 'কে? কে আপনারা? কী ান?' কিন্তু ওরা কোনও গ্রাহ্যই করল না। আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ঘুরে াড়িয়ে দেখি, অম্বর কখন আবার বাইরের ঘরে এসে হাজির হয়েছে।

অম্বরের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল প্রথম জন। দ্বিতীয় জন একটু দূরে।

'রায়, দ্য ব্লকস্—' প্রথম জন বলল। চাপা জ্বলন্ত স্বর।

'আমার কাছে নেই।' অম্বরের স্বরে অন্তরের উথালপাথাল নেই।

বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো লোকটার ডানহাত আছড়ে পড়ল আমার গালে।

কখন যে ওদের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি জানি না। গাল যেন জ্বলে গেল স প্রচণ্ড আঘাতে। পড়ে যেতে-যেতেও সামলে নিলাম।

প্রথম জনের স্বর আরও এক পর্দা নীচে নামল, 'এখনও নেই, রায়?'

'ইউ সোয়াইন সান অফ আ বিচ ব্লা—' অম্বরের কথা শেষ হল না। কারণ

BanglaBook.org

দ্বিতীয় জন বাঁ-পায়ে লাথি মেরেছে ওর পেটে। ও শরীর দুমড়ে অনে—কক্ষণ চুপ করে রইল। হাঁ করে শ্বাস টানতে চাইল মুখ দিয়ে। আমার চোখের জল আর বাঁধ মানল না। প্রথম জনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললাম, 'প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন, প্লিজ—'

'মাসুদ!' প্রথম জনের চোখ তখনও অম্বরের দিকে, 'পিক হার আপ।'

মাসুদ—অর্থাৎ দ্বিতীয় জন এক হ্যাঁচকায় সোজা করে দিল আমাকে। তারপর সপ্রশ্ন চোখে তাকাল প্রথম জনের দিকে।

'ভেতরের ঘরে নিয়ে যাও। মেরেছেলে বিছানাতেই ভালো মানায়—।' তারপর সে আবার ফিরল অম্বরের দিকে, 'নাউ, রায়, দ্য ব্লকস্—।'

মাসুদ আমাকে টেনে নিয়ে গেল শোওয়ার ঘরে। বিছানায় বসিয়ে দিল। কিন্তু শুনতে পেলাম অম্বরের গলা, 'আমার কাছে কোনও ব্লক নেই, শর্মা।'

চমকে উঠলাম। এই তাহলে নরোত্তম শর্মা! বাকি দুজন তার সাকরেদ। আরও কী ভাবতে যাচ্ছিলাম, অম্বরের চাপা চিৎকারে বাধা পড়ল। নরোত্তম আবার ওর গায়ে হাত তুলেছে। আমি এখন কী করব? মাসুদ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বিছানায় সুটকেস দুটো পড়ে আছে। ওগুলো সার্চ করলেই তো ব্লকগুলো বেরিয়ে পড়বে। তাহলে অম্বর এমন গোঁয়ার্তুমি করছে কেন?

উত্তরটা পেলাম একটু পরেই। কারণ ছুরি হাতে লোকটা শোওয়ার ঘরে এসে ঢুকল। একপলক চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর পেশাদারী অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঘরটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে শুরু করল। বিছানাপত্র তছনছ করে চেয়ার-টেবিল উলটে সে একমুহূর্ত থমকাল। দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'শর্মা সাব, নো ট্রেস—।'

সঙ্গে-সঙ্গে বসবার ঘর থেকে তীব্র একটা ভোঁতা শব্দ ভেসে এল। পরক্ষণেই অম্বরের ডুকরে ওঠা কণ্ঠস্বর। একটু পরে নরোত্তম শর্মার গলা পাওয়া গেল, 'এত অল্প ওষুধে রায় ভিজবে না। সার্চ জারি রাখো, হুদা।'

হুদা তৎক্ষণাৎ ওর হাতের ছুরি নিয়ে সুটকেস দুটোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে চিরে ফালা-ফালা হল ও-দুটো। পাগলের মতো সেগুলো হাঁটকাতে শুরু করল মাসুদ ও হুদা—দুজনেই। কিন্তু বৃথাই। ব্লকগুলো একটু আগে সুটকেসে থাকলেও এখন আর নেই। অম্বর সামান্য সুযোগেই ওগুলো কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। হয়তো স্টিল-আলমারির গুপ্ত কোটরেই। কিংবা অন্য—।

মাসুদ এসে আমার কাঁধে ওর দু-হাত রেখেছে। লালা ঝরছে চোখ দিয়ে।

চিৎকার করে এক ঝটকায় ওর হাত সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ওর দু-হাতের থাবা এ-ধরনের কাজে অভ্যস্তের চেয়েও বেশি। হুদা আমার সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'মিসেস রায়, আলমারির চাবি—।'

কোনওরকমে বললাম, 'অম্বরের কাছে—।'

বিনা বাক্যব্যয়ে হুদা চটপট চলে গেল পাশের ঘরে। মাসুদও নামিয়ে নিল ওর হাত।

কিছুক্ষণ পরেই অম্বরকে নিয়ে হুদা ও নরোত্তম শর্মা এ-ঘরে এসে ঢুকল। অম্বরের

BanglaBook.org

কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। আর শর্মা হাসছে। হুদার হাতে একটা চাবি। আলমারির চাবি। খোলা হল স্টিলের আলমারি। কিন্তু বিফল হল ওদের অনুসন্ধান। কয়েক মিনিট স্থির নজরে অম্বরের চোখে তাকিয়ে রইল শর্মা। তারপর মেঝেতে একদলা থুথু ফেলে নৃশংস স্বরে বলল, 'আই অ্যাম এ ব্যাড বাস্টার্ড, রায়। রিয়্যাল ব্যাড। এখুনি দেখতে পাবে।'

লাল চোখে হুদার দিকে ফিরল নরোত্তম, 'হুদা, এ-ফ্ল্যাটের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দাও। আমি চাই না, অম্বর রায় চিৎকার করলে আশপাশের কেউ শুনতে পাক।'

ভয়ার্ত চোখে দেখতে লাগলাম ওদের কার্যকলাপ।

জানলা-দরজা বন্ধ করতে হুদার মিনিটখানেকও লাগল না। ও ফিরে এসে সপ্রশ্ন চোখে নরোত্তম শর্মার দিকে তাকাল। নরোত্তম হাসল। বলল, 'গুড...মাসুদ,' মাসুদের দিকে ফিরে তাকাল সে। মাসুদ চকিতে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। নরোত্তম বলল : 'মিসেস রায়কে বিছানায় বেঁধে ফ্যালো। কোনওরকম বাধা দিতে চাইলে...ওয়েল, ইউ নো হোয়াট টু ডু—হিট হার!'

হঠাৎই বিকট চিৎকার করে অম্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাসুদের ওপর। ওর চিৎকার সম্পূর্ণ হলেও ঝাঁপিয়ে পড়াটা সম্পূর্ণ হল না। কারণ হুদার ডান পা সজোরে আছড়ে পড়েছে ওর মুখে। গতিপথ থেকে পাশে সরে গিয়ে অন্তত চার হাত দূরে ছিটকে পড়ল অম্বর। যন্ত্রণায় মুখ ঢাকল দু-হাতে। আমি হয়তো চিৎকার করে থাকব, কারণ মাসুদ বলল, 'লাভ নেই। লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে পড়ুন।'

লাভ সত্যিই নেই। জানলা বন্ধ হওয়ার পর বাইরের রাস্তা থেকে চলন্ত ট্রামের ঘর্ঘর শব্দও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার চিৎকার কে শুনবে! সুতরাং চুপচাপ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মাসুদের হাতের এক হ্যাঁচকা আমাকে চিৎ করে দিল। তারপর বিছানার চাদর ছিঁড়ে সে আমার হাত-পা খাটের সঙ্গে বাঁধতে শুরু করল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অম্বর তখনও মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

নরোত্তম শর্মা শকুন-চোখে সবকিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল। ইশারা করল হুদাকে। হুদা অম্বরকে টেনে তুলল। শর্মা এগিয়ে গেল ওর খুব কাছে। আস্তে-আস্তে বলল, 'রায়, এ জালি কারবার তুমি ছেড়ে দাও। বয়েস হয়েছে, কেন বেকার ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে মহড়া নিচ্ছ। নাউ, গিভ মি দ্য ব্লকস্—।'

অম্বর চুপ। হুদা নির্দেশের অপেক্ষায়। আর মাসুদ বিছানায় আমার পাশে বসে। ওর একটা হাত অন্যমনস্কভাবেই আমার উরুতে।

'রায়, আমার হাতে সময় বেশি নেই। একমাস তোমার এই ব্লকের পিছনে আমি লেগে রয়েছি, আজ আর খালি হাতে ফিরে যাব না—' মিনিট তিনেকের নীরবতা, 'ঠিক আছে, এবার তাহলে যা হবে তার জন্যে আমরা দায়ী নই। ইউ ওন্ট লাইক ইট। বাই গড, ইউ ওন্ট লাইক ইট—' নরোত্তমের চঞ্চল চোখ অম্বরের আরও কাছে ঝুঁকে এল। হিস্‌হিস্ স্বরে ও বলল, 'আরে গাধা, বউটাকে চিৎ করে বাঁধা দেখেও বুঝতে পারছিস না, হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু!'

'নো—ও—ও—' চিৎকার করে উঠেছে অম্বর। আর একই সঙ্গে নরোত্তমের পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা রিভলবার। সেটা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল অম্বরের

BanglaBook.org

চোয়ালে। ওর গাল ফেটে রক্তের বন্যা বইতে লাগল। একহাতে ওর চুলের মুঠি ধরে রিভলবারের নলটা জোর করে অম্বরের দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল নরোত্তম। সেদিকে মনোযোগ রেখেই ছোট্ট করে বলল, 'মাসুদ, গেট গোয়িং—।'

মাসুদ আদেশ পালনের প্রথম ধাপ হিসেবে আমার গায়ে হাত বোলাতে লাগল। আমি চুপ। শুধু চোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ছে। চোখের জল কি শেষ হয় না?

হঠাৎই অম্বর বলে উঠল, 'ব্লক আলমারিতে।' ওর স্বর জড়ানো, জিভ টুকটুকে লাল।

'গেট দেম—' নরোত্তম রিভলবারের নলটা বের করে নিল ওর মুখ থেকে। চুলও ছেড়ে দিল। টলতে-টলতে আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল অম্বর। নিচের তাকের পেছন দিকের গোপন প্লেট সরিয়ে তামার ব্লকগুলো বের করে আনল। হুদা সেগুলো ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর দিল নরোত্তমের হাতে। নরোত্তম রিভলবার এক পকেটে রেখে, অন্য পকেট থেকে বের করল একটা আতসকাচ। তারপর বিছানায় বসে একে-একে ব্লকগুলো পরখ করে দেখল। অবশেষে বলল, 'ও-কে! হুদা, রায়কে বাথরুমে নিয়ে যাও। চোখে-মুখে জল দিয়ে ওর চেহারা ভদ্রস্থ করো। নইলে রাস্তার লোকে সন্দেহ করতে পারে।'

হুদা একটু অবাক চোখে তাকাতেই শর্মা হাসল, 'হি ইজ গোয়িং উইথ আস।'

হুদা অম্বরকে নিয়ে চলে গেল বাথরুমে।

বুঝলাম, নরোত্তম শর্মার ফাঁদে অম্বর পা দিয়েছে। ব্লক নিয়েও শর্মা ওকে ছাড়বে না। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ওর ডেরায়। তারপর...।

'মিস্টার শর্মা, প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন। দয়া করুন—' এই অনুনয় করার সময় নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হল। মাসুদ এতক্ষণ সামান্য বিরক্তি দিয়েছিল, বলল, 'শর্মা সাব রায়জিকে ছেড়ে দেবেন। কোনও ভয় নেই।'

আমি তাকিয়েছিলাম শর্মার দিকে। শর্মা হাসল, 'হ্যাঁ, মিসেস রায়, কোনও ভয় নেই। অম্বরকে কেন নিয়ে যাচ্ছি জানেন? আমি যা দেখি শেষ দেখি, আধাআধি দেখি না। আপনার স্বামীর জাল নোট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট-এ বিক্রি হয়। মানে, একশো টাকার নোটটা পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি হয়। আর আমরা বিশ পার্সেন্ট পেলে বর্তে যাই। কারণ ওই ব্লক। এক নম্বর ব্লক তৈরির কারিগর জালি লাইনে বেশি নেই—ওয়ান অফ দেম ইজ রায়। সো উই আর টেকিং হিম উইথ আস। এক নম্বর ব্লক তৈরির কায়দা-কানুন জানতে। আর এই ব্লকগুলো—' আঙুল তুলে বিছানায় রাখা অম্বরের ব্লকগুলো দেখাল শর্মা, 'এগুলো নিয়ে যাচ্ছি ফর আওয়ার সেফটি। আমি চাই না আমাদের ব্লক তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ এক নম্বরি জালি বাজারে ছাড়ুক।' নরোত্তম শর্মা তাকাল মাসুদের দিকে, 'মাসুদ, কাপড়টা দাও।'

মাসুদ বসা অবস্থাতেই একটা বড় কাপড়ের টুকরো পকেট থেকে বের করে দিল। শর্মা নিজেই ব্লকগুলো গুছিয়ে কাপড়টা দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর দু-বার গাঁটরিটা শূন্যে ঝাঁকিয়ে দেখল, বাঁধুনিটা জুতসই হয়েছে কি না। এমনসময় হুদা ও অম্বর এসে ঢুকল শোওয়ার ঘরে। অম্বরকে পরিপাটি করে সাজানো হলেও গালের কাটা দাগটা বিশ্রীভাবে ফাঁক হয়ে আছে। আর ওর মুখ-চোখও ক্লান্ত। ধুঁকছে।

BanglaBook.org

ভালো করে অম্বরকে খুঁটিয়ে দেখল নরোত্তম। তারপর বলল, 'প্লাগ ইট আপ—' আঙুল তুলে কাটা জায়গাটা দেখাল সে।

হুদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্টিকিং প্লাস্টার, ম্যাডাম—।'

দু-বারের চেষ্টায় উত্তর দিলাম, 'বসবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে।'

হুদা অম্বরকে ছেড়ে দিয়ে রওনা হতেই ও শ্রান্তিতে টলে পড়ে যাচ্ছিল, শর্মা চট করে হাত বাড়িয়ে ওকে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যে অম্বরের পরিচর্যা শেষ হল। আলমারি থেকে জামা-প্যান্ট বের করে ওর পোশাক-পরিচ্ছদও ওরা পালটে দিল। তারপর হুদা ও মাসুদের দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল শর্মা। ব্লকের বান্ডিলটা মাসুদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'পাশের ঘরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো।' তারপর হুদাকে, 'হুদা, টেক রায় উইথ যু। আমি মিনিটদশেকের মধ্যেই আসছি। মিসেস রায়ের কাছে আমার কিছু গোপন খবর জানবার আছে।'

অম্বর নির্জীবভাবে আমাকে দেখল। চোয়ালের প্রচণ্ড ব্যথায় সম্ভবত ও কথা বলার শক্তিও হারিয়েছে। ওর করুণ দৃষ্টিতে আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ফিসফিসে স্বরে বললাম, 'ভয় নেই, অম্বর। আমি তো কই ভয় পাইনি—।'

অম্বর নীরবে হুদা ও মাসুদের সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল। লক্ষ করলাম, ও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার খুব কাছে, বিছানার ওপর ঝুঁকে এসে দাঁড়াল নরোত্তম শর্মা। কিছুক্ষণ আমার চরম অসহায় অবস্থা দেখল। তারপর আচমকা ছোট্ট করে প্রশ্ন করল, 'লাগছে?'

আমি উত্তর দিলাম না।

'কোথায়?' বলেই ও আমার গায়ে হাত দিল। কখন যে পকেট থেকে ওর হাত বেরিয়ে এল কে জানে! আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। বললাম, 'প্লিজ—দয়া করুন।'

নরোত্তম ফিরে গেল শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে। দরজা বন্ধ করে দিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভিনটে শব্দ আমার কানে এল। হুদা ও মাসুদের হাসির শব্দ। অম্বরের কষ্টকৃত প্রতিবাদের শব্দ। এবং ওর যন্ত্রণাক্লিষ্ট প্রচণ্ড আর্তনাদ। হুদা কিংবা মাসুদ হয়তো আবার ওকে লাথি মেরেছে।

নরোত্তম ফিরে এল আমার কাছে। কিছুক্ষণ কী চিন্তা করল। তারপর বলল অনেকটা আপনমনেই, 'মেয়েছেলে বিছানাতেই ভালো মানায়।' বলে আমার পায়ের বাঁধন দুটো ও খুলে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড উওম্যান'। ওর শরীরটা ধীরে-ধীরে ঝুঁকে এল আমার কাছে, খুব কাছে।

আমি প্রচণ্ডভাবে পা ছুঁড়তে লাগলাম।

নরোত্তম হাসল। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো আমার পা-দুটো চেপে ধরল। হা-হা করে হেসে উঠে হিংস্র স্বরে বলল, 'অম্বরকে আমি ওর বউ সমেত শেষ করব।'

আমি ক্রোধে-আশঙ্কায় বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম। শুধু এটুকু মনে আছে, যাওয়ার সময় শর্মা আমার ক্ষত-বিক্ষত হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলেছিল, 'শায়েদ অব উসকো অওলাদ কি কমি নহী মেহসুস হোগী।'

BanglaBook.org

আমি শুধু চেয়ে থেকেছি। আমার শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ অচেতন।
অম্বর, অম্বর, তুমি কেমন আছ? তোমাকে ওরা আর মারেনি তো? আমি, আমি...।
ফ্ল্যাটের দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার আবছা শব্দ পেলাম। ওরা চলে গেল।
ওঃ, ঈশ্বর, আমাকে মৃত্যু দাও!

মণিকার কথা শেষ হল।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে টেবিলে বসে। শরীরের ভেতরে রক্ত টগবগ করে ফুটছে। চোখ-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে না তো? মণিকা কী করে এমন বর্ণনা দিতে পারল? ও কি চায় না ওর লজ্জা লুকোতে? অবশ্য ওর তো কোনও হাত নেই। সবকিছুর জন্যে অম্বরই দায়ী। কিন্তু অম্বরের মৃত্যুর খবর তো মণিকার কাহিনিতে পেলাম না! তাহলে ও জানল কেমন করে যে, অম্বর মারা গেছে? অনুমান, নাকি কোনও জ্বলন্ত প্রমাণ আছে?

চোখের জ্বালা বুকের জ্বালা অনেকটা সহনীয় হয়ে আসতেই মুখ তুলে তাকালাম। কথা বলতে গিয়ে একটা শক্ত অনুভূতির দলা গলাটা যেন বন্ধ করে দিতে চাইল। মণিকা রায়ের সহ্য ও ত্যাগ-স্বীকারের তুলনা নেই।

অনেক চেষ্টায় শব্দ করে প্রশ্ন করলাম, 'অম্বর যে মারা গেছে, আপনি জানলেন কেমন করে?'

'জানি।' সাদা শাড়িতে মণিকার আঙুল সমনস্কভাবে অদৃশ্য কারুকাজ খুঁজছে, 'নরোত্তম শর্মার দলের সরজু নাথানি নামে একজন দলছুট হয়ে মাসখানেক পরে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। সেই আমাকে খুঁটিনাটি সব বলেছে।'

'সরজু!'

মণিকা চমকে তাকাল আমার দিকে : 'আপনি চেনেন ওকে?

'না—ঠিক চিনি বলা যায় না—তবে, ইয়ে, নাম হয়তো শুনেছি। আচ্ছা, অম্বরের ব্যাপার নিয়ে আপনি পুলিশে খবর দেননি?'

'হ্যাঁ, অম্বরকে ওরা কিডন্যাপ করার পর আমি পুলিশকে সব জানিয়েছিলাম, কিন্তু একজন দাগী আসামীকে নিয়ে ওরা খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। হয়তো ভেবেছে, আপদ গেছে ভালোই হয়েছে।' একটু চুপ করে থেকে মণিকা আবার বলল, 'আমি এটুকু বুঝেছিলাম, বিরাট কোনও ক্ষতি না করে অম্বরকে ওরা ছাড়বে না। অম্বরের ওপর ওদের অনেকদিনের রোখ। তা ছাড়া, সেদিন বাইরের ঘরে যখন টলতে-টলতে উঠে আসি, তখন দেখেছি বাইরের ঘরে এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ। অর্থাৎ নরোত্তম শর্মা আমার কাছে থাকার সময়ে অম্বরকে হুদা ও মাসুদ মেরেছে। সরজুর কাছ থেকেই জানতে পারি, ওরা অম্বরকে ডায়মন্ডহারবারের এক বাগানবাড়িতে নিয়ে যায়।

'সাগরিকা হোটেল ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা এগোলেই হুগলি নদীর তীর ঘেঁষে ভাঙা পুরোনো দুর্গ। তার ঠিক মুখোমুখি কতকগুলো টালির ঘর। ওইরকম একটা টালির ঘরে নরোত্তম জাল নোট ছেপে খড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখত। ওখানে ওর যে দুজন লোক বরাবর থাকে, তাদের পরিচয় স্থানীয় লোকেদের কাছে নিরীহ চাষী। সেই দুজনের একজন

সরজু নাথানি।

'অম্বর যখন ওখানে পৌঁছয়, তখন দুপুর...' মণিকা কপালের কাল্পনিক ঘাম মুছল।

আমি হাত তুলে ওকে থামতে বললাম, 'প্রয়োজন নেই, মিসেস রায়। শুধু-শুধু কষ্ট পাবেন।'

মণিকা সৌজন্যবশেও প্রতিবাদ করতে পারল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। অনেকক্ষণ বাদে ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, 'শেষপর্যন্ত অম্বরকে ওরা হুগলি নদীতে ফেলে দিয়েছিল। গভীর রাতে।'

তারপরই লজ্জা-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে ও ডুকরে কেঁদে উঠল। সাদা শিফনে জড়ানো ওর নরম শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক্তিয়ারের বাইরে পা বাড়ালাম। পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম ওকে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে আমার হাতটা ও সরিয়ে দিল। জলভরা চোখ তুলে দেখল আমার ভেজা চোখ। হাতের পিঠ দিয়ে নিজের চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, এক মিনিট—আপনার জন্যে চা নিয়ে আসছি।' মণিকা চলে গেল। বুঝলাম, ও এখন একটু আড়াল চায়।

আমি তখনও একইভাবে বসে। আমার শরীর থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। আমি মাসুদকে কাল রাতে দেখেছি। নরোত্তম ও হুদাকে আমি দেখব। কই? ওরা কোথায়? ওরা—।

'মা কোথায়?' মণিকা রায়ের শোওয়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। দু-চোখ কাচের গুলির মতো উজ্জ্বল। এবং অস্থির।

'এখুনি আসবে।' মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললাম, 'তোমার নাম কী?'

'দুলি। তোমার নাম?'

'কাকু। এসো, এদিকে এসো...।' দু-হাত বাড়িয়ে ওকে আহ্বান জানালাম।

আহ্বানে মেয়েটা সাড়া দিত কি না জানি না, মণিকা চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। পিছনে অল্পবয়েসি একটি মেয়ে। সকালে এ-ই বোধহয় প্রথমে ফোন ধরেছিল।

চায়ের ট্রে ব্যস্তভাবে টেবিলে নামিয়ে রাখল মণিকা। তারপর বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। ফোলা-ফোলা গালে শব্দ করে চুমু খেয়ে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে আমাকে বলল, 'খেয়ে নিন, মিস্টার চৌধুরী। কী লজ্জার কথা, এতক্ষণ আপনাকে চা দেওয়ার কথা আমার মনেই পড়েনি—।'

উত্তরে শুধু হাসলাম।

দুলি আমার বিস্কুটের প্লেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। আধো-আধো স্বরে বলল, 'বিক্কু দাও।'

হেসে একটা বিস্কুট দিলাম ওর হাতে। মণিকার বারণ শুনলাম না। ও শুধু কপট রাগে বলল, 'জুলিটা ভীষণ হ্যাংলা হয়েছে। সুধা, ওকে ও-ঘরে নিয়ে যাও তো—।'

বুঝলাম, 'জুলি' শিশু-উচ্চারণে 'দুলি' হয়েছে। সুধা জুলিকে নিয়ে চলে গেল। ওরা চলে গেলে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার মেয়ে?'

'হ্যাঁ—।' মাথা নিচু করল মণিকা, ছোট্ট করে বলল, 'তবে অম্বরের নয়—নরোত্তমের।'

BanglaBook.org

আমার কানের পর্দায় সশব্দে যেন এক তীব্র লাথি পড়ল। এক ঝটকায় অবাক চোখে উঠে দাঁড়ালাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে মেঝেতে ঠিকরে পড়ল মাসুদের পীসমেকার। আমরা দুজনেই অপলকে রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে। সচেতন হয়েই ওটা তুলে নিলাম।

মণিকা বলল, 'গর্ভের সন্তান মায়েরা সবসময় নষ্ট করতে পারে না। অন্তত আমি পারিনি। তা ছাড়া, এই জীবন নিয়ে একা-একা আমি বাঁচতাম কী করে?

আমি নীরবে আবার বসলাম। চা-বিস্কুট অধ্যায় ধীরে-ধীরে শেষ করলাম। তারপর যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

মণিকা আমার চোখে তাকাল : 'চলে যাচ্ছেন?' আমার কোনও উত্তর না পেয়ে বলল, 'যাওয়ার আগে একটা কথা ছিল—।'

'বলুন—' আমার মনে প্রত্যাশা।

'আপনি কেন এসেছিলেন এখানে?'

চোখ নামিয়ে বললাম, 'অম্বরের কথা জানতে...অম্বর আমার প্রাণের বন্ধু ছিল...।'

'সব তো শুনলেন, এখন কী করবেন?' মণিকার স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, উদগ্র কৌতূহল।

'আপনিই বলুন, কী করা উচিত—।'

'আমি মেয়ে। অন্যায়-অবিচারের পাল্লা সমান করা আমার শক্তি বা সাধ্যের বাইরে—' আমার দিকে আগুন চোখে তাকাল মণিকা : 'নরোত্তম শর্মা এখনও বেঁচে আছে। বহাল তবিয়তে জাল নোটের একচেটিয়া ব্যবসা চালাচ্ছে। আপনি তো অম্বরের বন্ধু, আপনি পারেন না শোধ নিতে?'

'পারব না কেন, পারি।' শান্ত স্বরে বললাম।

'তাহলে কিছু একটা করুন। এতদিন কেউ আমার কাছে আসেনি, আজ আপনি এলেন। নরোত্তমকে খুঁজে বের করুন, ওকে শেষ করুন...ওর ক্লেদ এখনও আমার শরীরে জমে আছে।' কান্নায় ভেঙে পড়ল মণিকা রায়।

আমি অস্থির। মণিকার কান্না বুকের ভেতর অসহ্য জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

কান্না-ভেজা ভাঙা স্বরে হঠাৎই পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল মণিকা, 'কাইল্ড হিম! কিল হিম!' চকিতে এগিয়ে এসে আমার দু-কাঁধ খামচে ধরল ও। প্রচণ্ড শক্তিতে আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে চলল, 'কিল হিম ফর গডস্ সেক! ডেস্ট্রয় হিম! ডিসইনটিগ্রেট হিম!'

পরিমিতিবোধ হারিয়ে ক্রন্দিত মণিকাকে আগলে ধরল আমার হাত।

দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, 'ক্যান ডু, উইল ডু।' এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে মুক্ত করে ওর ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

তিন : সরজু বিশ্বাসঘাতক নাখানি

সরজু নাখানি।

জেল থেকে আমি বেরিয়েছি দশ দিন নয়, দশ মাস। এবং এই দশ মাস সময়ে

নরোত্তম শর্মা সম্পর্কে অনেক খোঁজখবরই নিয়েছি। জানি লাইনে সেরকম প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ এলে শর্মা তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। এটাই ওর রীতি এবং নীতি। তা ছাড়া, হুদা ও মাসুদকে আমি চিনি। পুরোনো দাগী। তবে সরজু নাথানি একবারও জেল খাটেনি। আর মণিকা হয়তো জানে না, শর্মার সঙ্গে সরজু বিশ্বাসঘাতকতা সেরকমভাবে করেনি। প্রথম জীবনে অম্বর রায়ের দোস্ত ছিল সরজু। পরে পয়সার লোভে বা অন্য কোনও কারণে ও নরোত্তমের দলে যোগ দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অম্বরের সঙ্গে একটা ক্ষীণ ভালোবাসার যোগ ওর ছিল। ডায়মন্ডহারবারে যখন অম্বর রায়ের তিরোধান-অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়, তখন সরজু নাথানিও সম্ভবত তাতে অংশগ্রহণ করেছিল—নরোত্তমের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে। পরে বিবেকের দংশনে ও আসে মণিকার কাছে। খুলে বলে সেই নৃশংস ইতিহাস। আরও বলে, সে আর শর্মার দলে নেই। কিন্তু পেটের দায় ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় নরোত্তম শর্মার কাছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সরজু নাথানি এখনও নরোত্তমের কাছেই আছে। ডায়মন্ডহারবারে। চাবীর ভূমিকায়। আমি জানি।

জাল নোটের কারবারীরা একে অপরের খবর রাখে। কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থেই কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। আমি কিন্তু তা করিনি। মাসুদকে দিয়ে গত রাতে জাল নোট পাঠাবার কারণ, নরোত্তম দেখুক, অম্বর রায়ের ব্লক দিয়ে ও যা-নোট ছাপছে, তারচেয়ে খারাপ নোট আমি ছাপি না। আমার নোটও পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টে টপ রেটে বিক্রি হয়। আমি জানি, এবার নরোত্তম খ্যাপা কুকুরের মতো আমার পিছনে লাগবে। আমাকে ধ্বংস করবার মতলব ভাঁজবে। আমিও তাই চাই। নইলে ওর সঙ্গে খেলাটা জমবে কেমন করে?

মণিকা জানে না, জেল থেকে বেরিয়েই অম্বরের মরার খবর আমি পেয়েছি। বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ আমার শুরু হয়েছে তখন থেকেই। মাসুদকে আমি কাল রাতে নমুনা হিসেবে ছেড়ে দিয়েছি। এখন চাই হুদাকে। কিন্তু তার আগে সরজুর সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। আমি জানি, আমার লিস্টে হুদার পরেও আর দুটো নাম আছে। দয়ারাম ভার্গব ও জিতেন দত্ত। ওদের একজন ডায়মন্ডহারবারে সরজুর কাছে থাকে। আর-একজন, জিতেন দত্ত, নরোত্তমের গৃহরক্ষী। নরোত্তমের ছেলে-বৌকে দিন-রাত্তির পাহারা দেয়। জিতেনের কাছে টমসন সাব-মেশিনগান আছে। বরাবরই ছিল।

মণিকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরিচিত পার্কসার্কাস এলাকায় এলোমেলোভাবে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম। তখনই খেয়াল হল, পিছনে কেউ লেগেছে। এ-কেউকে আমি চিনি না। হয়তো শর্মার নতুন রিক্রুট। সুতরাং তাকে আমল না দিয়েই রওনা হলাম ধর্মতলার দিকে। সেখান থেকে ছিয়াত্তর নম্বর প্রাইভেট বাস ধরে ডায়মন্ডহারবার যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

ধর্মতলায় পৌঁছে ছিয়াত্তর নম্বর বাসে উঠলাম। বাস ছাড়তে সামান্য দেরি হলেও ছাড়ল। আমার কেউ নিয়মমাফিক একই বাসে উঠে পড়েছে। ডায়মন্ডহারবার ঘণ্টা দুয়েকের পথ। সুতরাং সে একটা রগরগে মলাটওলা বই বের করে তাতে মনোযোগ দিয়েছে। আর আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, সরজু নাথানি মরণ যন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

রাস্তার পাশে ছোট-ছোট ফলন্ত খেজুর গাছ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

BanglaBook.org

গ্রাম্যপথ একসময় শেষ হল। হুগলি নদীর তীরে সাগরিকা হোটেলের সামনে বাস থেকে নামলাম। তালপাতার টুপি নিয়ে দুটো বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এল, কিন্তু ওদের নিরা করে হোটেলে ঢুকলাম। ইতিমধ্যেই অবশ্য খেয়াল করেছি যে কেউ-সাহেব হো ঢোকেননি। প্রয়োজনও নেই। কারণ ডেরা তো কাছেই। হয়তো সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে আর সাগরিকায় আমার প্রবেশ কপোত-কপোতী মধ্যে নিঃসঙ্গ পাযণ্ড যথা। কিন্তু উপা নেই।

আমার ঘরটা তেরো নম্বর। রাস্তার দিকেই। এখন প্রয়োজন বিশ্রাম। মানা বিশ্রাম। সুতরাং ডাইনিং-রুমে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নোন হাওয়ার গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। অনেকটা সমুদ্রবায়ুর মতো। সম্ভবত কাছেই মোহানা গোটাদুয়েক ছোট জাহাজও চোখে পড়ল।

ক্রমে দুপুর কাটল। বিকেল এল। সন্ধের মুখে সূর্য ঢলে পড়ল হুগলি আড়ালে। মাসুদের পীসমেকার কোমরে গুঁজে প্রস্তুত হয়ে বাইরে বেরোলাম। ঘড়িতে প্রা সাড়ে ছ'টা বাজে। হোটেলের ডানদিকে ও বাঁ-দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের রাস্তায় সেখানেই হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ। এখন গাড়ি বিশেষ নেই। কারণ অ-মরসুমে সময়। রাস্তায় পা দিয়ে রওনা হলাম। অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

একটু পরেই বাঁ-দিকে চোখে পড়ল একটা কোল্ড স্টোরেজ। আর ডানদিকে ভাঙ ফোর্ট। ডান দিকের কাঁচা রাস্তা ধরে পৌঁছলাম নদী-সৈকতে। সৈকত জনহীন, কর্দমাক্ত পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম সামনের বিশাল ঢিবি অথবা ফোর্টের ভগ্নাবশেষের দিকে অন্ধকারেই বেয়ে উঠলাম। হু-হু নোনা হাওয়া আমাকে যেন উড়িয়ে ফেলতে চাইছে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, সামনেই ভাঙা সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে। তারপরই মাটিতে অর্ধ প্রোথিত অকেজো কামানটা থাকার কথা। এখন অন্ধকারে চোখে পড়ছে না। তবে দূরে খেতের মাঝে একজোড়া টিমটিমে লণ্ঠনের আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হয়তো নরোত্ত শর্মার আস্তানা। এখান থেকে জলপথে ও জাল নোট পাচার করে। সুতরাং সরজু প্রত্যাশায় ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে সেদিকেই এগোলাম।

বেড়ার ঘরের জানলায় উঁকি দিয়ে আশা আমার পূর্ণ হল। কয়েকটা খালি গ্লা ও বোতল সামনে রেখে সরজু বসে আছে। আছে দয়ারাম ভার্গবও। শুধু তৃতীয় জন যাকে আমি আশা করিনি, আমাকে অবাক করল।

জিতেন দত্ত।

আর তার টমসন এস-এম-জি বেড়ার দেওয়ালে একপাশে দাঁড় করানো। ওটা দেখে আমার পীসমেকার যেন ভয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইল। টমসন এস-এম-জি পেশাদা লোকেরা হাড়ে-হাড়ে চেনে। সুতরাং আমিও চিনি। কিন্তু আমার সেই কেউ মহাশয় গেলে কোথায়? সে কি ওদের খবর দিয়েই চলে গেছে?

নির্দ্বিধায় নিঃশব্দে আমি ফিরে চললাম সাগরিকার দিকে। মনে দুশ্চিন্তা এবং নতু পরিকল্পনা। কারণ জিতেন দত্ত অন্য ধাতুর মানুষ। আমার পীসমেকার বা মার্শাল আর্টে ও হয়তো সুযোগ দেবে না। শর্মা ওকে নিশ্চয়ই কোনও খবর দিয়ে পাঠিয়েছে, এখানকা ডেরা পাহারা দিতে পাঠায়নি। কারণ, তারচেয়ে নিজের বাড়ির দাম শর্মার কাছে অনে বেশি। ফিরে যেতে-যেতে শুধু অনুভব করে দেখে নিলাম, পকেটে আমার লাইটারটা

BanglaBook.org

আছে কি না।

অবশেষে সাগরিকার আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে এসে দাঁড়ালাম। দুটো ছেলে খালি গায়ে গাড়িগুলোর পাহারায় বসে। তাদের একজনকে ইশারায় ডাকলাম। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বললাম, 'পাঁচ লিটার পেট্রল পাওয়া যাবে?'

কিছুক্ষণ ভেবে মাথা-টাথা চুলকে ছেলেটা তার শাকরেদের সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন পরামর্শ করল। তারপর আমার হাত থেকে নোটটা ছিনিয়ে নিল। আমি আরও কুড়ি টাকা পকেট থেকে বের করে বললাম, 'পাঁচ লিটারের দাম। বাকিটা বখশিশ।'

টাকা হস্তান্তরিত হতে সময় লাগল না। সময় লাগল না পেট্রল মিলতেও। একটা নীল রঙের এইচ-পি টিন একটু পরেই আমাকে দিয়ে গেল ছেলেটা। আমি রওনা হলাম লম্বা পা ফেলে। দেরি করার মতো সময় আমার হাতে নেই। এবার আমি দেখব, জিতেন দত্ত, তুমি দাহ্য কি না।

অন্ধকারে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। সতর্ক আলতো হাতে পেট্রল ছড়িয়ে দিলাম বেড়ার গায়ে, ঘরের চারদিকে। সরজু ওরা একটু আগেই বোধহয় নেশা-পর্ব শেষ করেছে। খালি গ্লাস ও বোতল যোগ করে সেই সিদ্ধান্তে আসাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং পেট্রলের যেটুকু গন্ধ পাওয়া উচিত, তা ওদের নাকে পৌঁছলেও মস্তিষ্ক ভেদ করবে না। ঘর ভেজানো শেষ হলেও পেট্রল পুরোপুরি শেষ করিনি। অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি, সামনেই এক বিশাল খড়ের গাদা। সুতরাং বাকি তরলটুকু তার পায়েই বিসর্জন দিলাম। টিনটা নামিয়ে রাখলাম একপাশে।

লাইটার জ্বালিয়ে প্রথমে ঘরে, তারপর খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিলাম।

মণিকা রায়ের কথায় আমার মাথাতেও আগুন জ্বলছে। অম্বর রায়ের চিতা জ্বলছে। রাবণের চিতা জ্বলছে। নরোত্তম শর্মার চিতা জ্বলছে।

দাউদাউ করে আগুনের সমস্ত শিখা যুগপৎ লাফিয়ে উঠল আকাশে। আমি তখন অনেকটা দূরে সরে এসেছি। সুতরাং সরজু, দয়ারাম ও জিতেনের প্রতিক্রিয়াগুলো দেখতে পেলাম না। ওরা 'আগুন! আগুন!' বলে বিকট চিৎকার করে মুখে হাত চাপা দিয়ে ছুটতে-ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এল। লক্ষ করলাম, জিতেন দত্তর হাত খালি। টমসনটা ও ভেতরেই ফেলে এসেছে। বাইরে এসে খড়ের লেলিহান আগুন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ওরা তিনজন।

এলাকাটা নির্জন, সুতরাং পাড়াপড়শি জমতে সময় লাগবে। আমার লক্ষ্য ছিল সরজু। দেখলাম, ও ক্ষেত পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়চ্ছে। আমিও ছুটলাম। পীসমেকারটা পকেটের আশ্রয় ছেড়ে এখন আমার হাতে। জায়গাটা ক্রমে আলোময় হয়ে উঠছে। সেই আলোর বৃত্তের বাইরে পৌঁছতেই ভেসে এল একাধিক গুলির শব্দ। আগুনের তাপে জিতেনের টমসন মুখ খুলেছে। অতএব খাকি প্যান্ট, সাদা জামা পরা এ-অঞ্চলের পুলিশ এল বলে।

ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে আমার পায়ের শব্দ পেল সরজু। জায়গাটা কাদামর। হয়তো আজকালের মধ্যেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই কাদা-ভেজা মাটিতে আমি জুতো পরে দৌড়লে হাতি ছোটার মতো 'ধপ-ধপ' বিচিত্র শব্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর শব্দ পেয়েই

BanglaBook.org

ঘুরে তাকিয়েছে ও—ছুটতে-ছুটতেই। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওর দৌড়নোর গতিবেগ বেড়ে গেছে। সরজুর খালি পা। পরনে খাটো ধুতি, সাদা হাফশার্ট : কৃষকের ছদ্মবেশ?

'সরজু—উ—উ' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

কিন্তু ও থামল না। তখন বাধ্য হয়ে মাথার ওপর পীসমেকার তুলে এক রাউন্ড ফায়ার করলাম। গুলির শব্দে বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়াল সরজু। আমি ছুটতে-ছুটতে ওর কাছে পৌঁছে ফুটবল শট করার মতো ওর পেটে দমাস করে এক লাথি কষিয়ে দিলাম। ওঁক করে এক শব্দ তুলে ও সটান উলটে পড়ল ভিজে মাটিতে। আমি ওর পাশে শুয়ে পড়ে হাঁফাতে লাগলাম। মাথার ওপরে আকাশে তারারা চোখ টিপে অশ্লীল ইশারা করছে। চারপাশের অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাক আর আমাদের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

মিনিট দশেক বাদে সরজু বিজাতীয় কাতর শব্দ তুলে ধীরে-ধীরে উঠে বসল। চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎই শুয়ে থাকা আমাকে আবছা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

'চেঁচিয়ো না—শোনবার লোক নেই।' শুয়ে-শুয়েই জবাব দিলাম। আকাশের দিকে চোখ রেখে ওকে জিগ্যেস করলাম, 'অম্বর রায়কে মনে পড়ে, সরজু?'

সরজু চুপ। আমি পীসমেকার সমেত হাতটা ওর নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরলাম। এবার উত্তর এল চটপট, 'শর্মা ওকে খুন করেছে।'

'কীভাবে? সেইটাই আমি জানতে চাই।'

হঠাৎই দূর থেকে জিতেন দত্ত আর দয়ারামের গলা পেলাম। ওরা সরজু নাথানির নাম ধরে ডাকছে।

'ও—ওরা আমাকে খুঁজছে।' সরজুর স্বর কাঁপছে।

'খুঁজলেও এই অন্ধকারে খুঁজে পাবে না। এবার বলো, অম্বর রায়ের কী হয়েছিল?'

'রায়কে একদিন দুপুরে এখানে নিয়ে আসে শর্মা...।'

'সঙ্গে আর কে ছিল?' আমার উদাসীন অন্যমনস্ক ভাব সরজুকে বোধহয় অবাক করল।

'হুদা, মাসুদ, আর জিতেন—।'

জিতেন দত্ত, তুমিও ছিলে? আর থাকবে না। তোমার টমসন গেছে, তুমিও যাবে।

'সময়টা ছিল দুপুর। আমি আর দয়ারাম সবে রান্না চড়িয়েছি। শর্মা ওদের নিয়ে ঢুকল। অম্বরকে দেখে প্রায় চেনা যায় না। মুখ-চোখ ফুলো-ফুলো। গাল ফেটে গেছে। প্লাস্টার লাগানো। আপনি হয়তো জানেন না, অম্বরকে আমি আগে থেকে চিনতাম। ও আমার বন্ধুর মতো ছিল। আপনি—।'

'আমিও ওর বন্ধু—প্রাণের বন্ধু। আলি কারবার আমারও আছে—যাকগে, তারপর?'

সরজু একটু অবাক হয়ে মুখ বন্ধ করল। ও কি আমাকে পুলিশের লোক ভাবছে? ভাবুক। তবে কথা ওকে বলতেই হবে। তাই শুয়ে থেকে কত অল্প আয়াসে যে বসে থাকা কোনও লোকের মুখে লাথি মারা যায়, সেটা ওকে হাতেনাতে দেখালাম।

ফট্ করে শব্দ হল। নাথানির নাকের হাড় ভেঙে গেল নাকি? ভাঙুক, ক্ষতি নেই।

BanglaBook.org

কথা বলার জন্যে ওর মুখ অক্ষত থাকলেই আমি খুশি।

'আর উঠে বসার দরকার নেই, নাথানি—স্পিল আউট দ্য হোল স্টোরি!' আমার স্বরে নেকড়ের গর্জন, সাপের হিস্‌হিস্‌।

'শর্মা জানত না, অম্বর আমার পুরোনো বন্ধু। আমিও জানাইনি।' ধুতির খুঁট দিয়ে নাক-মুখ মুছল সরজু।

ওদিকে জিতেন দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসাবশেষ হাতড়াচ্ছে। হয়তো নাথানির পোড়া লাশ খুঁজছে। কিংবা টমসন।

'ওই বেড়ার ঘরেই গোটা দিনটা আমাদের কাটল। সবাই খেলো—অম্বর বাদে। নরোত্তম বলল, জালির কারবার করে রায় অনেক পেট ফুলিয়েছে, একবেলা না খেলে কিছু হবে না। আস্তে-আস্তে বেলা গড়িয়ে সন্ধে হল। শর্মা আপনমনে চুপচাপ বসে কী ভাবছে। একবার আমি জিগ্যেস করতে গেলাম। বললাম, শর্মাজী, কী হয়েছে? উত্তরে বলল, ভাবছি, রায়কে নিয়ে কী করব।

'অন্ধকার হল। রাত হল। অম্বর রায় হাঁটুতে মুখ গুঁজে সারাটা দিন পড়ে ছিল। আর যখনই মুখ তুলে তাকিয়েছে, দেখেছি ওর চোখ ভেজা। হয়তো ওর বউয়ের কথা ভাবছিল। কারণ ওরা এখানে আসার পর মাসুদ আমাকে সবকিছু বলেছে। আমি একবার অম্বরের কাছে গেলাম। ও দেখল আমাকে, ফিসফিস করে বলল, সরজু, তুইও—। আমি ওকে আমার অসহায় অবস্থার কথা বোঝাতে পারিনি। এমনসময় নরোত্তম এল, বলল, সবাই ওঠো। ঘড়িতে তখন রাত প্রায় বারোটা। অন্ধকারে অদৃশ্য থেকে আমরা বেরোলাম। অম্বরকে টানতে-টানতে নিয়ে চলল মাসুদ ও হুদা। আর সবার পিছনে জিতেন। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লোহার কামানটার কাছে। সামনেই ভাঙা কোর্টের আড়াল। তার ওপারেই হুগলি নদীর ছলছল ও নোনা হাওয়ার গন্ধ। নরোত্তম চেঁচিয়ে বলল, লাইটস্‌। চকিতে একটা মশাল জ্বেলে ধরল দয়ারাম। তারপর শুরু হল অম্বরের ওপর অত্যাচার। ওঃ! কোনও মানুষ তা দেখে চুপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু আমি চুপ করে ছিলাম, নরোত্তমের ভয়ে। প্রথমে অম্বরকে উলঙ্গ করে দেওয়া হল, তারপর ওর হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হল একটা খাটো লাঠির সঙ্গে। পা দুটোকেও একটা ফুট চারেক লম্বা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা হল। ফলে অম্বরের পা দুটো প্রকাণ্ডভাবে ফাঁক হয়ে রইল। সেই অবস্থায় মশালটা মাঝখানে পুঁতে সবাই অম্বরকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর যার যা খুশি করতে লাগল। যেমন, নরোত্তম ওর সিগারেটের জ্বলন্ত আগুন চেপে ধরল অম্বরের বুকের বোঁটায়। ও যন্ত্রণায় শিউরে উঠেছে। দাঁতের কামড়ে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। তারপর এল হুদার পালা। হুদা অম্বরকে দু-পায়ের ফাঁকে বারবার লাথি মেরেছে। আর অম্বর জন্তুর মতো চিৎকার করেছে একনাগাড়ে। এসেছে মাসুদ। শব্দ করে একদলা থুতু ছিটিয়েছে ওর মুখে। আর অম্বর আহত জন্তুর মতো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছটফট করে হেঁটে বেড়িয়েছে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছে বারবার। সারা শরীর তখন ওর ক্ষতবিক্ষত। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ওর বুকের দু-পাশে বীভৎস দুটো দগদগে গোল দাগ : নরোত্তমের জ্বলন্ত সিগারেটের চিহ্ন। ঘণ্টাখানেক চলল এই "বিড়াল-ইঁদুর" খেলা। তারপর...।'

'সরজু, তুমি কিছু করোনি?'

BanglaBook.org

আমার নিচু লয়ের প্রশ্নে চমকে উঠল সরজু। অবাক হয়ে তাকাল আমার দি অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল কি না জানি না। ভয়ার্ত স্বরে ও বলল, 'না—।'

উত্তরের রেশ শেষ হল না, আমার পীসমেকার হাতুড়ির মতো বসিয়ে দি ওর দাঁতে। ওর মুখ অক্ষত থাকার আর খুব একটা প্রয়োজন নেই। 'ও—ওঃ—' : বিকট চিৎকার করে দু-হাত মুখে চাপা দিল ও।

ইতিমধ্যে দূরে জিতেন দত্ত ও দয়ারাম ভার্গবের ছায়াশরীর ক্রমশ আমাদের এগিয়ে আসছে। বিপদ বুঝে উঠে দাঁড়ালাম। এক হ্যাঁচকায় তুলে নিলাম সরজুকে। টান টানতে নিয়ে চললাম ঝোপের ভেতর। নিশ্চিন্ত আড়ালে বসে আবার একই প্রশ্ন করল 'সরজু, তুমি কিছু করোনি?'

মাথা নিচু করে জড়ানো স্বরে ও জবাব দিল, 'করেছি। নরোত্তমের ভয়ে। অম্বা মুখে আমার জুতো ঘষে দিয়েছি—।'

'তারপর?' আমার স্বর নয়, যেন পাথর কথা বলছে।

'তারপর অম্বরকে টানতে-টানতে নিয়ে যাওয়া হয় চড়া ছাড়িয়ে নদীর সি বাঁধানো পাড়ে। সেখান থেকে ফেলে দেওয়া হয় জলে। ওর সারা শরীর ক্ষতে দা প্রায় আধঘণ্টা ওর অচেতন দেহের ওপর অত্যাচার চলেছিল। শেষদিকে হয়তো ও গেছিল, কেউ পরীক্ষা করে দেখেনি। সেই অবস্থাতেই ওকে হুগলিনদীতে ফেলে দে হয়...দু-দিন পরে হুগলি নদীতে একটা ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়—অম্বরের। ওর কষ্ট পেয়ে মরার খবর আমি ওর বউকে দিয়েছিলাম।'

'জানি।' তারপর প্রসঙ্গের পরিবর্তন করলাম। কারণ, এখন অম্বর রায়ের মৃ অধ্যায় আমার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নতুন করে জানা হয়ে গেছে। অম্বরের যন্ত্রণা আমি করে অনুভব করেছি। সরজুকে আবার প্রশ্ন করলাম, 'জিতেন দত্ত এখানে কেন এসে

এ-প্রশ্নের ইঙ্গিত দুটো। এক, জিতেন দত্তকে আমি চিনি। দুই, সে যে এ থাকে না, তা আমি জানি।

'নরোত্তম ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। কাল রাতে মাসুদকে কে বা ভয়ঙ্করভাবে মেরেছে। তারপর তিনটে জালি নোট বিঁধিয়ে দিয়েছে ওর বুকে। শেষে অ অবস্থায় ওকে ফেলে দিয়েছে সন্টলেকের রাস্তায়। একটু দূরে গাড়ি নিয়ে রতন অপেক্ষা করছিল, সে-ই মাসুদকে নিয়ে ডেরায় ফিরে যায়। মাসুদ একবার মাত্র ফিরে পেয়েছিল। তখন শুধু বলে, কিরাত আসছে। শাস্তি নিয়ে আসছে। তারপর আ জ্ঞান হারায়। এখন ওর চিকিৎসা চলছে।'

আমার কেউয়ের নাম কি তাহলে রতন শুক্লা?

'আর কেউ আসেনি এখানে?'

'এসেছিল। রতন। চলে গেছে। ও শুধু এসে বলল, মণিকা রায়ের ফ্ল্যাট একটা লোক বেরিয়েছে। সে ডায়মন্ডহারবারে সাগরিকায় উঠেছে। তাই আমরা সাবধান থাকি। ওর বিশ্বাস, গত রাতে এই লোকটাই মাসুদকে রাস্তায় ফেলে গেছে—।'

এতক্ষণ ঝুঁকে বসে ছিলাম, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাঁ-পায়ের লাথি সরজুকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ডান পা ওর মুখে চেপে ধরলাম। কাদামাখা বুটের সো

BanglaBook.org

মুখে ঘষতে-ঘষতে বললাম, 'আমার নাম কিরাত চৌধুরী। আমি অম্বর রায়ের বন্ধু। আমি জালির কারবারে এক নম্বর নোট ছাপি। আমার নোট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টে বিক্রি হয়। নরোত্তমের সঙ্গে দেখা হলে বলবি, কিরাত আসছে। শাস্তি নিয়ে আসছে।'

পাঁউরুটির কারখানায় যেভাবে পা দিয়ে ময়দা মাখা হয়, সেইভাবে বুট দিয়ে ওর মুখটা ইচ্ছেমতো থেঁতলাতে লাগলাম। মুখে কাদা ঢোকায় কোনও শব্দ ওর ঠোঁট চিরে বেরোতে পারছে না। চলে যাওয়ার আগে বললাম, 'ছোটবেলায় পড়িসনি, বোকা বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো! আর শোন, জিতেনকে আর-একটা টমসন কিনে রাখতে বলিস!'

সরজু নাথানির অন্যায় অনেক কম। ও অসহায় ছিল। তাই ওকে আমি বাঁচতে দিতে চাই।

সরজুকে ছেড়ে জঙ্গলের পথে পা বাড়ালাম। এই পথ দিয়ে গোপনে আমাকে আমডাঙা যেতে হবে। সেখান থেকে বাস কিংবা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরব।

ফিকে জঙ্গলে কিছুক্ষণ চলার পরই চোখে পড়ল একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কোনও দরজা নেই। অন্ধকারে সবকিছু একাকার। শোনা যায় রাতপাখির ডাক। কী খেয়ালে ভেতরে ঢুকলাম। কালী মন্দির। ভেতরে কে যেন একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছে। প্রদীপের আলোয় শ্মশানকালীর চোখ জ্বলজ্বল করছে। হাতের খড়্গ মলিন। চোখ থেকে যেন শক্তির বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে। সামনে একটা পুরোনো ক্ষয়ে আসা হাড়িকাঠ। হয়তো রমরমা যখন ছিল, তখন এখানে বলি হত। এখন সবই জরাজীর্ণ। সময়ের শিকার হয়ে অথর্ব। হঠাৎ কী হল, পীসমেকারটা পকেটে ভরে লুটিয়ে পড়লাম মেঝেতে। ভক্তদের অনুকরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চিৎকার করে বললাম, 'শক্তি দাও, মা—শক্তি দাও।'

কিছু চামচিকে শব্দ করে উড়তে লাগল। আমার শরীর অদ্ভুত এক আবেগে কাঁপছে।

কিছুক্ষণ পরে ভাঙা মন্দির থেকে বেরিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলাম।

জিতেন, তুই নতুন টমসন কিনিস কিন্তু! নইলে তোর হাত-পা ভেঙে চুরমার করতে আমার রীতিমত লজ্জা করবে।

চার : নরোত্তম লুগার শর্মা

অন্তর্দৃশ্য :

নিজের বাড়ির চারতলায় পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল নরোত্তম শর্মা। সামনেই খোলা জানলা। কিন্তু তার চোখের পর্দায় অন্য দৃশ্য। খুব শান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াল সে। দু-পা সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'এই কিরাত লোকটা কে?'

'জালির কারবারে আছে—' রতন শুক্লা বিরস মুখে একটা চেয়ারে বসেছিল। উত্তরটাও দিয়েছে নীরস ভাবেই।

'ও তো সও সাল কী পুরানি বাত—।' হিংস্রভাবে খেঁকিয়ে উঠল নরোত্তম। ফ্যাশানদুরস্ত বাবরি চুলে হাত চালিয়ে বলল, 'ও জালির কারবারে এক নম্বর নোট ছাড়ছে বলেই তো তোকে আর মাসুদকে পাত্তা করতে পাঠিয়েছিলাম। মাসুদের বুকে যে নোট

BanglaBook.org

ও সেঁটে দিয়েছে সেগুলো এক নম্বর নোট, আমাদের সমান-সমান। অম্বর রায়ের ব্লব ওর নোট হার মানিয়েছে। এ-লাইনে কোনও নয়া যোগী এরকম নোট ছাপতে পারে না। হয় শালা কারও থেকে ব্লক হাতিয়েছে, নয়তো—।'

হুদা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁত খুঁটছিল, নির্বিকার ভঙ্গি ছেড়ে বলল, 'নয়তো শালা পুলিশের লোক।'

'রাইট।' হাসল নরোত্তম, 'কিন্তু সে-খোঁজ আমরা নিয়েছি। কিরাত বছরখানেক আগে জেল খেটেছে। সে-রেকর্ড আমাদের লোক ভেতর থেকে বের করেছে। শুধু পারছি না, এ-সবই সাজানো কি না। আমাদের লোক বলতে পারছে না, কোনও পুলিশের গোয়েন্দা কিরাতের ছদ্মবেশে আমাদের মুখোশ খুলতে চাইছে কি না। তা ছাড়া, আমার সঙ্গে ওর এই দুশমনির কারণটা কী, তা জানতে হবে। কাল রাতে ও আমার ডায়মন্ডহারবারের ডেরা জ্বালিয়ে রাখ করে দিয়েছে। বহোত মার মেরেছে সরজুকে, আর অম্বর রায়ের হিস্ট্রি জানতে চেয়েছে। লোকটা কি অম্বরের কেউ হয়?'

জিতেন দত্ত বসেছিল রতন শুক্লার পাশে। ওর মুখে ও হাতে দু-এক জায়গায় ফোস্কার দাগ। বলল, 'সরজুকে তো বলেছে অম্বরের দোস্ত। বলেছে আমাকে আর-একটা টমসন কিনে রাখতে?' হাসল জিতেন। স্পষ্ট দেখা গেল, ওর সামনের একটা দাঁত সোনার মাথায় হাত রেখে আয়েসী ভঙ্গিতে ও বলল, 'টমসন নয়, এবার আমি মেশিনগান কিনব শর্মাজী। বিশ্বাস করুন, ভীষণ দরকার, বিশেষ করে এই অবস্থায়।'

'দেখা যাবে।' সংক্ষেপে বলল নরোত্তম। তারপর রতনের দিকে ফিরল, 'মণিক রায়ের সঙ্গে কিরাতের কী কথা হয়েছে, আমাদের জানা দরকার। তুই হুদাকে নিয়ে রাত দশটার মিসেস রায়ের ফ্ল্যাটে যাবি। হয় পেটের কথা কিংবা পাকস্থলী বের নিয়ে আসবি।'

হুদা দাঁত খুঁটতে-খুঁটতেই হাসল। বলল, 'দুটোর একটা পাবেন। মাই ওয়ার্ড, শর্মাজি।'

নরোত্তম শর্মা বিচলিত ভঙ্গিতে দ্রুত পায়চারি করতে লাগল। কী খেয়ালে পকেট থেকে বের করে নিল ওর লুগার অটোমেটিক। উলটে-পালটে দেখল।

'কিরাত বেঁচে থাকলে আমাদের দু-দিক দিয়ে মুশকিল। এক, আমাদের ব্যবসা চৌপাট হয়ে যাবে। দুই, আমরা জানে-মানে চৌপাট হয়ে যাব। মণিকার পেট আলগা করে কিরাতকো ঠিকানে লাগাও। ডোন্ট ডিলে। আমি লালবাজারে আমাদের পোষা টিকটিকিকে আবার খবর পাঠাচ্ছি, কিরাতকে একটু ঘেঁটে দেখার জন্যে। ও-কে?'

'ও-কে।' একই সঙ্গে বলল হুদা ও রতন। এবং নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

দরজার চৌকাঠ পেরোতেই পিছু ডাকল শর্মা, 'রতন—।'

'ইয়েস?' ঘুরে দাঁড়াল রতন শুক্লা।

'ওর সল্টলেকের বাড়িটায় চোখ রাখিস।' লুগারটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল শর্মা।

ওরা চলে যেতেই জিতেন দত্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার এখুনি একটা চেম্বার দরকার।'

'আমার সঙ্গে নীচে এসো। আগে দেখি, মাসুদ বেচারা কেমন আছে—।'

ঘর ছেড়ে সিঁড়িতে পা রাখল জিতেন দত্ত ও নরোত্তম শর্মা।

BanglaBook.org

দোতলার কোণের দিকের একটা ঘরে মাসুদ শুয়েছিল। ডানহাত পুরোটা প্লাস্টার করা, বুকে ব্যান্ডেজ, চোখ দুটো বোজা। পাশের ছোট টেবিলে রাখা জলের গ্লাস ও ওষুধপত্র ঘরটাকে হাসপাতালের চেহারা দিয়েছে। মাসুদের বিছানার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল নরোত্তম শর্মা ও জিতেন দত্ত।

'মাসুদ—।'

নরোত্তমের ডাকে কোনও সাড়া দিল না মাসুদ। জিতেন দত্ত বলল, 'ডক্টর সেনগুপ্ত তো বলেছেন, আজ ওর জ্ঞান ফিরতে পারে—।'

'সঙ্গে এ-ও বলেছেন, এ-কেস হসপিটালে ট্রান্সফার করা উচিত ছিল—।' মাসুদের দিকে চোখ রেখেই শর্মা বলে চলল, 'কিন্তু হসপিটাল মানেই তো কানুনী ঝামেলা।'

জিতেন দত্ত কোনও উত্তর দিল না। দেখতে লাগল মাসুদকে। মাসুদের মুখ অনেক শুকিয়ে গেছে এই দু-দিনে। চোখের নীচে কালচে ছায়া।

'চলো—।'

ঘর ছেড়ে বেরোল শর্মা। পিছনে জিতেন দত্ত।

একটা ঘর পরেই নরোত্তমের শোওয়ার ঘর। ভেতরে ঢোকার আগে জিতেনকে লক্ষ করে সে বলে গেল, 'জাস্ট এ মিনিট—।'

ঘরে কেউ নেই। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বাঁ-দিকে রাখা বিশাল একটা খাটের দিকে এগিয়ে গেল নরোত্তম। সটান ঢুকে গেল তার তলায়। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখের সামনেই খাটের তলার কাঠের পাটাতন। তার এক জায়গায় চাপ দিতেই সরে গেল ফল্‌স্ কাঠের প্যানেল। ভেতরের ফোকরে হাত ঢুকিয়ে পাশের দিকে এগিয়ে দিল হাতটা। একটু পরেই যখন নরোত্তমের হাত বেরিয়ে এল, তখন সেটা আর খালি নেই। সে-হাতে রয়েছে একটা স্মিসার মেশিন পিস্তল। কাঠের প্যানেল আবার সরিয়ে দিল সে।

চিৎ হয়েই খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল নরোত্তম। উঠে এগিয়ে গেল দরজার কাছে।

জিতেন অন্যমনস্কভাবে নিজের হাতের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, নরোত্তমকে দেখেই মনোযোগী হল। চোখ ছিটকে গেল মেশিন পিস্তলটার দিকে।

'এই নাও—আমার আর্মারিতে এর চেয়ে এফেকটিভ ওয়েপন আর নেই। এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। স্টপ কিরাত উইথ ইট।'

হাসল জিতেন। মেশিন পিস্তলটা নিল। উলটে-পালটে দেখল। তারপর বলল, 'কিরাত, রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব। ও-কে শর্মাজি, আমি তাহলে নীচে যাই। বলা যায় না, কখন আমাকে আবার ব্যস্ত হতে হবে—।'

'ও-কে!' শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল নরোত্তম শর্মা। ঘরের বিপরীত প্রান্তে আর-একটা দরজা রয়েছে। সেদিকেই পা বাড়াল সে। যাওয়ার পথে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারাটা এক পলক দেখে নিল।

দরজা দিয়ে বেরোলেই একটা ছোট্ট ঘর। ব্যবহার হয় ভাঁড়ার ঘর হিসেবে। ঘরটার শেষপ্রান্তে অন্য আর-একটা দরজা। সেটা দিয়ে যাওয়া যায় বসবার ঘরে।

জাল নোটের ব্যবসায় যারা বড়লোক হয়েছে, তাদের বসবার ঘর যেরকম হওয়া উচিত, সেরকমভাবেই সাজানো বসবার ঘরটা। একপাশে একটা সোফায় বসে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত একজন মহিলা। তার পায়ের কাছে মেঝেতে একটা ছবির বই খুলে হুমড়ি

BanglaBook.org

খেয়ে আছে একটা বছর পাঁচেকের ছেলে। পরনে দুজনেরই ঘরোয়া পোশাক, তবে সচ্ছলতার ছাপ তাতে স্পষ্ট।

নরোত্তমকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মাথায় ঘোমটা দিল মহিলা। সেলাই রেখে এসে প্রশ্ন করল হালকা স্বরে, 'কিছু খাবে?'

'নাঃ, খিদে নেই।'

অন্য আর-একটা সোফায় বসল নরোত্তম। জামার কয়েকটা বোতাম খুলে দিল ওকে দেখেই বই ছেড়ে উঠে পড়ল ছেলেটি। দৌড়ে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল, 'ড্যাডি আজ আমি স্কুলে যাব না—' উচ্চারণে আবদারের সুর, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

মহিলা কপট রাগে ধমক দিয়ে উঠল, 'ছিঃ রকু, ইস্কুল কামাই করে না!'

'যেতে চাইছে না, থাক না—' ক্লান্ত স্বরে বলল নরোত্তম।

মহিলা কোনও উত্তর না দিয়ে আবার সেলাই নিয়ে ব্যস্ত হল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রকুর ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিল নরোত্তম। বলল, 'যাও, বিছানায় বসে ছবির বই দেখো গিয়ে। বিকেলে তোমার জন্যে ফাইভস্টার নিয়ে আসব।'

'প্রমিস?' চোখ বড়-বড় করে জানতে চাইল রকু শর্মা।

'প্রমিস—' ক্লান্ত হাসল নরোত্তম।

ছবির বইটা তুলে নিয়ে লাফাতে-লাফাতে শোওয়ার ঘরে চলে গেল রকু।

'গীতা—' নিজেরা একা হতেই আস্তে করে ডাকল নরোত্তম।

'কী?' সেলাই ছেড়ে মুখ তুলে তাকাল গীতা শর্মা।

'ক'টা দিন একটু সাবধানে থেকো। গোলমাল শুরু হয়েছে। আমাদের ব্যবসা হয়তো কিছুদিন একটু মন্দা যাবে।'

গীতা শর্মা কোনও পালটা প্রশ্ন করল না। প্রশ্ন যে করতে নেই, তা ও জানে। এতদিনে সেটুকু বুদ্ধি ওর হয়েছে। ও আবার চোখ ফেরাল সেলাইয়ের দিকে।

দু-হাতের দশ আঙুল পরস্পরের মাথায় ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ কী ভাবল নরোত্তম। তারপর আপনমনেই হেসে বলল, 'গীতা, আমার জন্যে একগ্লাস দুধ নিয়ে এসো। আর রাতে আমাকে ভালো করে খেতে দিও; কারণ, কাল সকালেই একটা খারাপ খবর আসবে—।'

অবাক চোখে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল গীতা শর্মা।

নরোত্তম বিড়বিড় করে বলল, 'ভগবান, মণিকা রায় যেন স্বর্গে জায়গা পায়। কিরাত চৌধুরী জানে না, আমার দুশমনি মীরজাফরের দোস্তির চেয়েও খারাপ।'

BanglaBook.org

পাঁচ : মণিকা সুইসাইড রায়

ডায়মন্ডহারবার থেকে ফিরেছি সেদিন অনেক রাতে। অনেক কষ্টে। তারপর থেকে শুধু ভেবেছি অম্বরের কথা। মণিকার কথা। জুলির কথাও ভুলিনি। তখনই মনে-মনে ঠিক

করেছিলাম, পরদিন সকালে আবার মণিকার কাছে যাব। তাই গেলাম।

কলিংবেল বাজালাম।

দরজা সামান্য খুলল। না, সাদা শিফন শাড়ি দেখা গেল না। পরিবর্তে মলিন শাড়ি, মলিন মুখ। দরজা আরো প্রসারিত হতেই প্রমাণিত হল অনুমান সঠিক। সুধা। তার কোলে জুলি।

জুলি আমাকে দেখে চিনতে পারল। বলল, 'কাকু—বিস্কু দাও।'

অপ্রস্তুতে পড়লাম। সঙ্গে বিস্কুট নেই। সুতরাং 'কাল ঠিক নিয়ে আসব,' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুধাকে প্রশ্ন করলাম, 'মিসেস রায় আছেন?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ও, ইশারায় আমাকে ভেতরে আসতে বলল।

'বসুন, মাকে ডাকছি।' জুলিকে কোলে নিয়ে চলে গেল।

বসলাম। আগের দিনের দেখা ঘরটা আরও-একবার খুঁটিয়ে দেখলাম। পরিপাটি ও যত্নের ছাপ আজ আরও বেশি। মাথার ওপরে পোলার পাখা আজও পরিশ্রম করে চলেছে, কিন্তু আমার উত্তাপ ঠান্ডা হয় কই?

এমনসময় মণিকা এসে ঢুকল। বুকের ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল আমার। বেশবাস অবিকল কালকের মতো। আমি কেমন যেন অসহায় বোধ করলাম। ও মিষ্টি করে বলল, 'আজ আর ভুল হয়নি। চায়ের কথাটা আগেই বলে এসেছি।'

আমি মাথা নিচু করে হাসলাম।

'কী খবর? নতুন কিছু করতে পারলেন?' ঠান্ডা শীতল স্বর।

আমার হাসি মিলিয়ে গেল। বাঁ-হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে বললাম, 'না, শুধু আপনার স্বামীর মারা যাওয়ার খবরটা ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

'তাতে কি অম্বর বেঁচে উঠবে?'

অমানুষিক সংযমের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'কাজে নামার আগে শত্রুপক্ষের শক্তি যাচাই করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মণিকা। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার চৌধুরী। এতদিন আমি চুপচাপ ছিলাম। সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মন আবার আশাবাদী হয়ে উঠেছে। আপনি এখন আমার একমাত্র ভরসা। আপনি যদি অম্বরের সত্যিকারের বন্ধু হন, তাহলে কখনওই ওর অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে থাকতে পারবেন না। আর যদি...' আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। আপনার ওপর আমার তো কোনও দাবি থাকতে পারে না...নেইও...।'

থাকতে পারে না? কেন?

প্রসঙ্গের পরিবর্তনে ঘড়ি দেখলাম। বললাম, 'আপনি কি এখন স্কুলে বেরোবেন?'

অবাক হয়ে জবাব দিল ও, 'হ্যাঁ, কেন?'

'চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই। তৈরি হয়ে আসুন।'

আরও বিস্মিত মণিকা রায় ভেতরে গেল তৈরি হয়ে নিতে।

চা ও সিঙাড়া একটু আগেই আমার টেবিলে এসে পৌঁছেছে। সুধাই দিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

জুলিকে কোথাও নজরে পড়ল না। হয়তো এখন ওর ঘুমোবার সময়। সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম।

একটু পরেই মণিকা এল।

'চলুন।'

নীরবে উঠলাম। পা বাড়ালাম দরজার দিকে। এবং নীরবেই আমরা একসঙ্গে রাস্তায় পা দিলাম।

মণিকার স্কুলটা পার্কসার্কাস ময়দানের কাছে। হাঁটাপথে মিনিট আট-দশের রাস্তা। অতএব পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমি ও মণিকা।

পথ চলতে-চলতে রতন শুক্লাকে আমি খেয়াল করেছি। অন্তত সত্তর গজ পেছনে। কিন্তু মণিকাকে সে-কথা আর জানালাম না। ওর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে লাভ নেই।

একটু পরে মণিকা হঠাৎ ডাকল, 'মিস্টার চৌধুরী—।'

'বলুন।'

'আসল কথা কী জানেন, ওই জাল নোটের ব্যবসাটাকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি। অম্বর এর জন্যে প্রাণ দিয়েছে। জানি না, আরও কতজন দেবে। সেইজন্যেই হঠাৎ আপনার ওপরে রেগে উঠেছিলাম। কেন এ-পথে এলেন আপনি?'

ওর প্রশ্নের উত্তরে অনেক কিছুই হয়তো বলার ছিল, কিন্তু চুপ করে রইলাম।

মণিকা বলল, 'অম্বরের সঙ্গে যখন প্রথম আমার পরিচয় হয়, তখন জানতাম ও বিজ্ঞাপনের এজেন্ট। শহরের কোন একটা নির্জন এলাকায় ওর অফিস। একদিন ও নিয়ে গেল আমাকে অফিস দেখাতে দমদম ক্যান্টনমেন্টে। সামনেটা সুন্দর করে সাজানো-গোছানো বিজ্ঞাপন এজেন্সির অফিস 'রায় অ্যাডস'। তার পিছনেই ছোট্ট একটা প্রেস। বিজ্ঞাপনের কাগজপত্র ইত্যাদি ছাপার জন্যে। পরে জেনেছি, সেখানে জাল নোট ছাপা হত।'

'জাল নোটের ব্যবসা সাধারণত এরকম ছদ্মবেশেই করা হয়।' নির্বিকারে উত্তর দিলাম। টের পেলাম, মণিকার চোখ চকিতে আমাকে ছুঁয়ে গেল। আরও বললাম, 'জাল নোটের ব্লক কীভাবে তৈরি হয় জানেন?' আমার ঠোঁটে দুর্জ্ঞেয় হাসি।

মণিকা অবাক হয়ে তাকাল, বলল, 'না।'

'তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে ওই তামার ব্লক তৈরি করা হয়। মেশিনপত্র নিয়ে গিয়ে নিজেকেই করতে হয়। বৃন্দাবন, কাশী হচ্ছে জালিয়াতদের ব্লক তৈরির আসল ঘাঁটি।'

'ওইজন্যেই অম্বর মাঝে-মাঝে কলকাতার বাইরে যেত?' আত্মগতভাবেই বলল মণিকা, 'একবার আমাকে নিয়ে ও মথুরায় গিয়েছিল—।'

'আরও-একটা মজা জানেন?' সপ্রশ্ন চোখে তাকাল ও, 'নোট ছাপার কাগজগুলো এমন যে, ব্লক ছাপা হওয়ার পর কালিটা কাগজে সামান্য ছড়িয়ে পড়ে নোটের ছাপটা ব্লকের চেয়ে মাপে একচুল করে বড় হয়ে যায়। এতে সুবিধে হচ্ছে, ব্লক ও নোট সমেত ধরা পড়লে সাত বছরের জায়গায় সাজা কমিয়ে তিন-চার বছর করে নেওয়া যায়। কোর্টের জজসাহেবকে বলা যায়, ওই ব্লকে সেই নোট ছাপা হয়নি, কারণ ব্লক ও ছাপা নোটের মাপের হেরফের আছে।'

মণিকা হাসল না। আনন্দ পেল না। স্বাভাবিক সুরেই প্রশ্ন করল, 'নোটগুলো যারা

BanglaBook.org

কেনে, তারা চালায় কোথায়?'

অবাক হয়ে বললাম, 'হঠাৎ আপনার এ-কৌতূহল?'

'অম্বরকে অনেকবার জিগ্যেস করেছি, বলেনি। তাই।'

'বেশিরভাগ চালানো হয় পাঞ্জাবে। গরুর পাল যেখানে নীলাম হয়, সেখানে। তা ছাড়া, অন্যান্য রাজ্যেও চালানো হয়—ওই নীলামের সময়। এর কারণ, যে জাল নোট চালায় তাকে নোট চালানোর পর বেশিক্ষণ নীলামের জায়গায় থাকতে হয় না। তা ছাড়া, তার পরিচয় নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না। জাল নোটগুলো প্রথম ছড়িয়ে পড়ে শহরতলীতে, পরে শহরে। তার কিছুদিন পর ছড়িয়ে পড়ে গোটা ভারতবর্ষে—।'

কিন্তু মণিকা এসব জিগ্যেস করছে কেন? এতদিন পরে কি ওর নতুন করে অম্বর রায়ের কথা মনে পড়ছে?

'এইজন্যেই অম্বর কয়েকবার ইউ. পি., হরিয়ানায় গিয়েছিল—' কিছুক্ষণ চিন্তার পর, 'জাল নোট নিয়ে।'

চুপ করে রইলাম। রতন শুক্লা এখনও আমাদের পিছনে। আমাকে নজরে-নজরে রাখছে। ও জানে না, এরকম নজর আমি গত কয়েক মাস ধরেই রেখেছি—নরোত্তমের ওপর। ওর সংসারের ওপর। জাল নোটের ব্যবসায় আমি পথের কাঁটা হতে চাই না। পথের কাঁটা চাইও না।

'জানেন মিস্টার চৌধুরী, অম্বর কিন্তু বেশিরভাগ দিনই বাড়িতে বসে থাকত। বেরোত কম—।'

প্রশ্নের ইঙ্গিত স্পষ্ট। বললাম, 'জাল নোট কেউ সারা মাস ধরে ছাপে না, মণিকা। মাসে তিন-চারদিন ছাপলেই যথেষ্ট।'

ভুলটা কানে লাগল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। মণিকার কষ্টকৃত অন্যমনস্ক ভাব দেখে বুঝলাম, ভুলটা ওর কানেও ঠেকেছে। সুতরাং আবার ক্ষমা চেয়ে ভুলের শেকড়টা ওর মনে গেঁথে দিতে চাইলাম না। দুজনেই না শোনার ভান করে মুহূর্তটা কাটিয়ে দিলাম।

'ওই যে আমার ইস্কুল।' আঙুল তুলে দেখাল মণিকা।

ছোট্ট ছিমছাম সাদা ধবধবে বাড়ি। বাইরের লনে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরা খেলা করছে। চারদিকে ফুলগাছের সারি। সব মিলিয়ে এ-দৃশ্যকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু একটা বলতে চেয়ে দুজনেই চুপ।

মণিকা, মণিকা, কিছু বলবে? বলো না?

'চলি—' অস্ফুটে বলল, মণিকা।

'আচ্ছা। কখন ছুটি আপনার?'

'চারটেয়।'

'আমি আসব?' মনে সামান্য সংশয়।

'কাজ না থাকলে আসবেন—।'

'আসব।' কাজ ফেলে আসব।

মণিকা রায়কে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। জেল থেকে বেরোনোর পর ও আমার চোখের আড়াল হয়নি।

BanglaBook.org

চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম, 'মিসেস রায়—।'

ঘুরে দাঁড়াল মণিকা।

'নরোত্তম শর্মার কথা আমি ভুলিনি। ভুলিনি আপনার কথাও। দি প্রিল্যুড টু ডিসইনটিগ্রেশন ইজ আন্ডার ওয়ে।'

'আপনি পারবেন।'

ছোট্ট কথাটা ভীষণ শব্দে আমার কানে এসে বাজল। মণিকা আর দাঁড়ায়নি। হনহন করে হেঁটে গেছে স্কুলের দিকে। আর আমার রক্ত স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছে গেছে। আমার ওপর ওর এই ভরসা, বিশ্বাস, আমার প্রতিজ্ঞায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

কতক্ষণ একা-একা দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ঘোর ভাঙল দূরে রতন শুক্লাকে দেখে। ওকে লক্ষ করে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম। ও কী করবে ঠিক করতে পারছে না। ছদ্মবেশ ও অভিনয় আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, না সরে যাবে নিরাপদ আশ্রয়ে!

সিদ্ধান্ত নিতে ওর দেরি হল। কারণ, ততক্ষণে আমি পৌঁছে গেছি দ্বিধাগ্রস্ত রতনের কাছে। ও অনেক কষ্টে চলমান যানবাহনের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

ওর খুব কাছে, প্রায় গায়ে-গায়ে গিয়ে দাঁড়ানোর পরেও রতনের চোখ অন্য দিকে।

'গাড়ি-ঘোড়ার সুমারি করছেন বুঝি?' খুব ভদ্রভাবে জিগ্যেস করলাম।

ভীষণ চমকে উঠল রতন শুক্লা। ফিরে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, 'রতন শুক্লা, খোদা মেহেরবান। অম্বরের খুনের কিস্‌সায় তুমি ছিলে না। বেঁচে গেলে। নইলে সরকারি আদম-সুমারিতে আরও একটা নাম কমে যেত।'

রতন শুক্লা অকূল পাথারে পড়ে গেছে। চকিতে দেখছে চারপাশে। ওর থুতনিটা বারকয়েক নেড়ে দিয়ে আমি আরও শান্ত স্বরে বললাম, 'বাড়ি চলে যাও। দুধের বোতল নিয়ে শুয়ে পড়ো। বড়দের যুদ্ধের সময় ছোটদের থাকতে নেই।'

তারপর পা বাড়ালাম। লক্ষ বাড়ি। উদ্দেশ্য বিশ্রাম। কারণ আবহাওয়া এখন থমথমে। ঝড়ের পূর্বাভাস।

কালবৈশাখী, সাইক্লোন, টাইফুন, শিলাবৃষ্টি, তোরা সব একসঙ্গে আয়। আমি যে তোদের জন্যে কদিন ধরে অপেক্ষা করেছি রে!

বিকেল পার হতে চলেছে। চারটের সময় মণিকাকে স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। বলেছি, সন্ধেবেলা আবার আসব। সকালে ওর কাছ থেকে ফিরে আসার পর বহু চিন্তাই মনে ঝড় তুলেছে।

প্রথমে এসেছে নরোত্তম শর্মা। কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা করেছি ওর চার বছর আগেকার চেহারাটা। এবং ওর নৃশংস মনটা। ও কি জানে, জুলি নামে ওর একটা মেয়ে আছে? বোধহয় না।

জেল থেকে বেরিয়ে আমি তৈরি হয়েছি যুদ্ধের জন্যে। নরোত্তমকে যথারীতি লোভ দেখিয়েছি এক নম্বর জাল নোট ছেপে। বাজারে খবর পেয়ে ও খ্যাপা কুকুরের মতোই আমার পিছনে লেগেছে। ফলে আমার খোঁজাখুঁজির অনেক মেহনত বেঁচে গেছে। শেষ

BanglaBook.org

পর্যন্ত ও পাঠিয়েছিল মাসুদকে, আর তখনই ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি বাইরে। ওর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছি।

এরপর ভেবেছি মণিকার কথা। ওর সম্পর্কে নতুন করে ভাবার কিছু ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে নিয়ে আমার মন ব্যস্ত থেকেছে। ভাবতে ভালো লাগছে, একটু পরেই ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে। সুতরাং বাড়ি ছেড়ে রওনা হলাম। আলমারি খুলে সঙ্গে নিলাম দুটো পঞ্চাশ ও একশো টাকার নকল নোট। মণিকাকে দেখাব। অম্বর ওকে কখনও জাল নোট সবিস্তারে দেখায়নি।

রাস্তায় বেরিয়ে রতন শুক্লাকে কোথাও নজরে পড়ল না। তাহলে কি সে বাড়ি ফিরে গেছে? শর্মার কাছে কোনও নতুন চালের পরিকল্পনা নিতে?

কিছুটা পথ এগোতেই হঠাৎ মনে পড়ল জুলির কথা। সকালে ও বিস্কুট চেয়েছিল। সুতরাং পথ-চলতি একটা স্টেশনারি দোকান থেকে একটা ক্র্যাকজ্যাকের প্যাকেট কিনলাম, সঙ্গে আরও এক প্যাকেট ক্যাডবেরি জেমস্।

মণিকার ফ্ল্যাটে পৌঁছে ওকে বিস্মিত-বিমূঢ় অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। জুলিকে কোলে নিয়ে ও অদ্ভুত চোখে একটা চিঠি না কী যেন দেখছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই চমকে উঠল। বুঝলাম, মন দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত থাকায় ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ রাখতেও মণিকা ভুলে গেছে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতের চিঠিতে চোখ নামিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?'

নিঃশব্দে চিঠিটা ও আমার দিকে এগিয়ে দিল।

দেখলাম, জিনিসটা চিঠি নয়, একটা সাদা কার্ড। তাতে লাল রঙের সাইন পেনে বড়-বড় করে মণিকার নাম লেখা। সেই নামের ওপর কালো কালি দিয়ে মোটা লাইনে কেউ বিরাট একটা ট্যাড়া টেনে দিয়েছে।

এর মানে কী? কেউ কি—!

'কাকু, বিক্কু—?'

জুলি। মণিকার কোল থেকে আমার হাতের রংচঙে প্যাকেট দুটো দেখতে পেয়েছে। ওর হাতে এ-দুটো দেওয়ার কথা এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি। হেসে বললাম, 'বিক্কু—এই নাও।'

দুটো প্যাকেট ওর দু-হাতে ধরিয়ে দিলাম। চকচকে চোখ নিয়ে জুলি একবার নিজের ডান হাত, একবার বাঁ-হাত দেখতে লাগল।

'আসছি—' বলে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মণিকা।

সুতরাং আমি উপবিষ্ট, স্থবির, দুশ্চিন্তামগ্ন।

কে পাঠালো এই কার্ড? নরোত্তম শর্মা?

মণিকা ফিরে এল। জুলি নেই। আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ চা আছে। বিনা আহ্বানেই বসল আমার মুখোমুখি। চোখে-মুখে প্রত্যাশার চিহ্ন। অর্থাৎ, কার্ডটা দেখে কী বুঝলে বলো।

কিন্তু আমি বললাম না। নীরবে চায়ের কাপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। স্বাদ নিলাম। বিস্বাদ ঠেকল। কারণ, কার্ডের নিহিত ইঙ্গিত আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। যখন বুঝলাম, আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকলে ভদ্রতায় বাধবে, তখন ওকে বললাম, 'মিসেস রায়,

BanglaBook.org

কেউ বোধহয় আপনাকে ভয় দেখাতে চাইছে। তবে তা স্রেফ মিছিমিছি।'

'কে ভয় দেখাতে চাইছে? নরোত্তম শর্মা? কেন?'

শ্রেণীবদ্ধ এই তিনটি প্রশ্নের তৃতীয়টার উত্তর আমার জানা নেই। শুধু বললাম, 'আপনি স্কুল থেকে ফিরেই কার্ডটা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, একটু আগে—।'

'কার্ডটা কে রেখে গেল, কেউ দেখেনি?'

'না। অন্তত সুধা তো কিছু বলতে পারছে না।'

কিছুক্ষণ চিন্তারত থেকে বললাম, 'কারও ঠাট্টাও হতে পারে। যাকগে, যদি কোনও বিপদের আভাস পান, তাহলে এই নম্বরে ফোন করে আমাকে খবর দেবেন।'

টেবিল থেকে কাগজ-কলম নিয়ে নিজের ফোন নম্বর লিখে দিলাম। মণিকা সেটা ভাঁজ করে হাতে মুঠো করে রাখল। কার্ডটাও ফিরিয়ে দিলাম ওর হাতে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টায় পকেট থেকে জাল নোট দুটো বের করলাম।

'আপনি কখনও জাল নোট দেখেছেন?'

'না।' একটু ভেবে : 'অম্বর কখনও দেখায়নি।'

আমি জানতাম।

'এই দেখুন।'

আগ্রহ ও কৌতূহল ঝলসে উঠল মণিকার চোখে। ওর বয়েস দশ বছর কমে গেল। নোট দুটো নিয়ে ও দেখতে লাগল। ওপরে তুলে আলোর দিকে ফিরিয়ে বারবার পরখ করল। শেষে বলল, 'হতেই পারে না। কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না।'

'বোঝা যাবে না। অম্বরের নোটও এইরকম হত। মনে হত আসল।' ওর হাত থেকে নোট দুটো নিয়ে বললাম, 'জাল যে, ধরবার উপায় কী জানেন?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ও, 'নোটটার আড়াআড়ি যে কালো সরু দাগটা আছে, আসল নোটে সেটা একটা সরু ফিতে। নোটের দু-পিঠ দুটো কাগজে ছেপে ফিতেটাকে মাঝখানে রেখে কাগজ দুটো পিঠোপিঠি আটকে দেওয়া হয়। ফলে দাগটার মাথার কাছে নখ দিয়ে খুঁটলে দুটো কাগজের ফাঁকে সরু ফিতেটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু নকল নোট ছাপা হয় একই কাগজের দু-পিঠে, এবং ওই কালো দাগটা হয় ছাপারই কারসাজি : সুতরাং আসলের মতো অত নিখুঁত হয় না। এ ছাড়া কাগজ আর জলছাপের সামান্য তফাৎ তো আছেই।'

'আমাকে এতসব বলে কী লাভ? আমি তো আর জাল নোট ছাপতে যাচ্ছি না—।'

'ইচ্ছে হল, বললাম। অম্বর তো কখনও বলেনি—।'

মণিকার মুখ লাল হল। চোখ নেমে গেল। আমি এক অদ্ভুত আবেগে ভেসে চলেছি। চোখের দৃষ্টি মণিকার চোখে নিবদ্ধ।

হঠাৎই উঠে দাঁড়াল মণিকা। বিদায়ের অপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। অতএব জাল নোট দুটো পকেটে রেখে নমস্কার জানিয়ে দরজার দিকে এগোলাম। যাওয়ার আগে বললাম, 'নরোত্তম আপনাকে কিছু করার আগে দু-বার ভাববে। ও জানে, আমি ভদ্রলোক নই।'

মণিকা নিশ্চুপে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'সত্যি তাই?'

BanglaBook.org

অন্তর্দৃশ্য ঃ

রাত সাড়ে দশটা।

পার্কসার্কাসে ট্রামরাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে মণিকা রায়ের ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখছিল দুজন মানুষ। একজন অন্যমনস্কভাবে দাঁত খুঁটছে, অন্যজনের হাতে একটা ইংরেজি পেপারব্যাক। মণিকা রায়ের ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। কবজি উলটে ঘড়ি দেখল প্রথম জন। দ্বিতীয় জনের দিকে চেয়ে মাথা হেলাল, 'লেটস্ গো।'

ওরা ট্রামরাস্তা পার হয়ে এপারে এল। ঢুকল ফ্ল্যাটবাড়ির ভেতরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে, মণিকা রায়ের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। প্রথম জন দাঁত খুঁটতে-খুঁটতেই বাঁ-হাতে কলিংবেল টিপল। দু-বার। আর দ্বিতীয় জন পেপারব্যাকটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

একটু পরেই ভেতর থেকে কিছুটা বিস্ময় মেশানো প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে?'

দ্বিতীয় জন কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিল প্রথম জন। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, 'কিরাত। কিরাত চৌধুরী—।'

প্রয়োজনের কম সময়ে দরজা খুলল। এবং ওদের দুজনকে দেখে বিরাট এক চিৎকার করতে হাঁ করল মণিকা। কিন্তু চিৎকারটা আর করা হল না। প্রথম জনের নির্ভুল লাথি আছড়ে পড়ল ওর পেটে। ঘরের ভেতরে ছিটকে পড়ল মণিকা রায়। মাথাটা ঠুকে গেল মেঝেতে। দু-হাতে পেট চেপে হাঁ করে শ্বাস নিতে চাইল। ততক্ষণে ওরা ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভেতর থেকে ভালো করে এঁটে দিয়েছে ঘরের দরজা।

প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে লক্ষ করে বলল, 'শুক্লা, ফ্ল্যাটের চোখ-কান বন্ধ করে দে—।'

রতন শুক্লা বসবার ঘরের জানলাগুলো চটপট এঁটে দিল। তারপর পড়ে থাকা মণিকাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল শোওয়ার ঘরে। কাজ সেরে ফিরে এল একটু পরেই। প্রথম জনের জিজ্ঞাসু চোখের উত্তরে বলল, 'ডান—। ও-ঘরে একটা মেয়ে আর বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়েছি।'

প্রথম জন হেসে বলল, 'বাচ্চাটাকে কিছু করিসনি তো? ওটা বসের অওলাদ।'

দ্বিতীয় জন হেসে জবাব দিল, 'না, কিছু করিনি।'

মণিকা ততক্ষণে কিছুটা সামলে উঠেছে। ওর মনে পড়ল কিরাতের দেওয়া ফোন নম্বরটার কথা। ওটা টেবিলে কাগজের প্যাডের তলায় আছে। যে করে হোক, ওটা নিতে হবে।

অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল মণিকা। চেঁচিয়ে বলল, 'কী চান আপনারা?' হুদাকে ভোলার পক্ষে চার বছর মণিকার কাছে যথেষ্ট নয়। সুতরাং প্রশ্নটা করা হল তাকে লক্ষ করেই।

'মিসেস রায়, চার বছর বাদে আবার ফিরে আসতে হল। এ চার বছর আপনি বেশ পীসফুল বেবি হয়ে ছিলেন। তবে আজকাল একটু দুষ্টু হয়ে পড়ছেন। সে যাই হোক, মিছিমিছি ঝুটঝামেলা আমি এড়াতে চাই। সো হেল্প্ আস—।'

'কিরাত চৌধুরীর গল্পটা আমাদের শোনান—' বলল রতন শুক্লা।

আচমকা পাশে রাখা টেবিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মণিকা রায়। হাত ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

হয়ে উঠে দাঁড়াল, রতন শুক্লা ও হুদা, দুজনেই অবিচলিত, নির্বিকার, মিটিমিটি হা
আর হুদার হাতে উঠে এসেছে একটা সরু ফলার ছুরি। একজন অসহায় মহিলার স
ওর দুজনেই নিশ্চিন্ত—এবং নিশ্চিত।

'রতন—' হুদা শান্ত গলায় বলল, 'একটা ফ্রেশ কাগজ আর পেন নাও। মি
রায়কে দাও। বলো, একটা সুইসাইড নোট লিখতে। কনসাইজ অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট
লিখলে...।'

রতন শুক্লা টেবিল থেকে কাগজ ও পেন নিল, দিল মণিকাকে। আর হুদা মণি
দিকে একবার তাকাল, তারপর গিয়ে বসল টেবিলের কাছে একটা সোফায়।
ইশারা করতেই সে এক ঝটকায় মণিকা রায়কে বসিয়ে দিল হুদার পাশে। অন্য
নিজে বসল। দুজনের শরীরের মাঝে চিপটে রইল মণিকার শরীরটা। ওর এক হাতে কা
অন্য হাতে কলম। এতক্ষণে ভয়ের ছাপটা উলঙ্গ হয়ে চোখে প্রকাশ পেয়েছে।

হুদা বিশ্রীভাবে হাসল, 'মিসেস রায়, নাউ উই আর গোয়িং টু হ্যাভ এ লং
রিয়্যাল লং...।'

হুদা ও রতন শুক্লা শব্দ করে হাসল। ওদের দুজনের মাঝে মণিকার
থরথর করে কেঁপে উঠল। ওর ডানহাতে ফাউন্টেন পেন ও কিরাতের ফোন
লেখা চিরকুটটা ঘামছে...।

ছয় : অপারেশান নরোত্তম ডিসইন্‌টিগ্রেশান

পরদিন সকাল সাতটায় গেলাম মণিকার বাড়িতে। কথা ছিল না, তবে গতকালের কা
কথা ভেবে মনটা অস্থির ছিল, তাই গেলাম। ওর ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে সন্দেহের
ছায়াটা কেঁপে উঠল আমার চোখের তারায়। কারণ দরজাটা ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হয়ে খে
একটা পাল্লা হাওয়ায় সামান্য দুলছে। আমার গতি মন্থর হল, শরীর সতর্ক হল।
প্রস্তুত করলাম যে-কোনওরকম বিপজ্জনক অবস্থার জন্যে। কিন্তু দরজা ফাঁক করেই
পাথর। কয়েক মুহূর্ত অসাড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ভেতরে ঢুকে দরজা
করলাম। আরও একবার তাকালাম মণিকার দিকে। ওর মৃতদেহের দিকে।

ঘরে পোলার পাখা থেকে গলায় শাড়ি বাঁধা অবস্থায় মণিকার দেহটা ঝুল
ওর পরনে শুধু শায়া আর ব্লাউজ। পাখা ঘুরছে। ফলে মণিকার দেহটাও খুব আস্তে ঘু
ওর পায়ের কাছে একটা চেয়ার উলটে পড়ে আছে। সব মিলিয়ে আত্মহত্যার এক নি
দৃশ্য।

প্রথমে পাখা অফ করলাম। তারপর চেয়ারটা সোজা করে তার ওপর দাঁ
অতিকষ্টে বাঁধন আলগা করে মুক্ত করলাম মণিকার দেহ। শুইয়ে দিলাম মেঝে

ওর মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে বাচ্চাছেলের মতো কাঁদতে লাগলাম।

মণিকা, মণিকা, আমার চোখের জল এখনও শেষ হয়নি। আর কত কষ্ট ও
পাব? এসময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে? অম্বর রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ ও
একা নিতে পারব তো?

BanglaBook.org

মণিকার দেহ থেকে মুখ তুলতেই নজর পড়ল অম্বরের দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কপালে চন্দনের টিপ। টেবিলে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ।

মুহূর্তের মধ্যে সাংঘাতিকগিরি ফুঁসে উঠল বুকের ভেতরে। ছবির এই হতভাগা লোকটার জন্যেই এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা পেতে হল মণিকাকে। আর শুধু কি মণিকা? আমি, আমার কথাটা কেউ ভাববে না?

উঠে এগিয়ে গেলাম ছবির কাছে। অম্বরকে হাতে তুলে নিলাম। ওর মুখে থুতু ছিটিয়ে বললাম, 'শালা ভেড়ুয়া, ডরপোক!'

আমার বুক ভেঙেচুরে শেষ। কপালের শিরা সাপ হয়ে কিলবিল করছে। বিষের জ্বালায় শরীর অস্থির।

চকিতে অম্বর রায়কে তুলে নিয়ে আছাড় মারলাম ঘরের মেঝেতে : 'শালা ওয়ার্থলেস! অপদার্থ!'

ফটো চুরমার হল সশব্দে।

ঠিক তখনই শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল তুলি।

ঘুম জড়ানো চোখ বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে ঘষছে। হয়তো আমার অনিয়ন্ত্রিত আচরণের শব্দই ওর ঘুম ভাঙিয়েছে। ও আস্তে করে বলল, 'কাকু—মা—।'

মণিকাকে শোয়ানো অবস্থায় রেখে উঠে গেলাম তুলির কাছে। বললাম, 'মা ঘুমোচ্ছে। তুমি ঘুমোবে চলো। তোমার জন্যে আবার বিস্কুট নিয়ে আসব। লক্ষ্মী মেয়ে।'

ওকে নিয়ে গিয়ে আবার শুইয়ে দিলাম বিছানায়। মেঝেতে সুধা অকাতরে ঘুমিয়ে। শোওয়ার ঘরের দরজা ভেজিয়ে ফিরে এলাম বসবার ঘরে। মণিকার কাছে।

মণিকা আত্মহত্যা করেনি। দরজা খোলা রেখে কেউ গলায় দড়ি দেয় না। আর গলায় দড়ি দিয়ে কেউ পাখাও চালাতে পারে না। তাহলে কে ওকে আত্মহত্যায় বাধ্য করল? নরোত্তম?

ঘরের আসবাবপত্র গোছানো। তবে সব ক'টা জানলা বন্ধ। যেমন বন্ধ ছিল অম্বর রায়কে এ-ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে। চার বছর আগে।

এবার চোখ ফেরালাম মণিকার দিকে। প্রশান্ত মুখ। অথচ ভয়ঙ্কর অশান্ত দুই চোখ। জিভের ডগা বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ওর দু-হাত মুঠো করা। ডানহাতের মুঠো জোর করে খুলতেই পেলাম একটা সুইসাইড নোট। মণিকারই লেখা।

'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

অতি ব্যবহারে কথাগুলো বড় পুরোনো হয়ে গেছে। তবে আমি জানি, ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমি, দায়ী অম্বর রায়।

চিরকুটটা ওলটাতেই নজরে পড়ল কোণ ঘেঁষে ছোট দুটো অক্ষর : 'হ' এবং 'দা'। অক্ষর দুটোর মধ্যে কম করে ইঞ্চি দেড়েক ফাঁক। নিশ্চয়ই খুনির চোখকে ফাঁকি দিয়ে মণিকা এ-কাজ করেছে। সেইজন্যেই অক্ষর দুটো বিভিন্ন সময়ে অনেকটা দূরত্বে লেখা। আমার বুকের ভেতরে কালবৈশাখী দুরন্ত হয়ে উঠল। 'ভেঙ্কার্স'-এর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকারে কেউ যেন গান করছে, 'হ—দা! হ—দা! হ—দা,' আর

BanglaBook.org

তার সঙ্গী অপচ্ছায়াদের উন্মত্ত ট্যাঙ্গো নাচ।

জ্বালাধরা চোখ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ঝুঁকে পড়ে মণিকার বাঁ হাতের মুঠোটা খুললাম। আমার ফোন নম্বর লেখা চিরকুটটা বেরিয়ে এল। দু-একটা অক্ষর ঘামে ঝাপসা হয়ে গেছে। আমাকে ফোন করবারও সুযোগ পায়নি ও।

দুটো কাগজই পকেটে রাখলাম। বসবার ঘরের আলনা থেকে একটা শাড়ি নিয়ে ঢেকে দিলাম মণিকার দেহ। ঘরে কোথাও গতকালের কার্ডটা পেলাম না। তখন রিসিভার তুলে ফোন করে দিলাম পুলিশে। ফোনে বললাম, পার্কসার্কাসের অমুক নম্বর বাড়ির অমুক ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে।

তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

মণিকার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে আসার আগে আর-একবার ওর মৃতদেহের কাছে গেলাম। চাপা ফিসফিসে স্বরে বললাম, 'নরোত্তম নয়, হৃদা নয়, আই অ্যাম গোয়িং টু ডিসইন্টিগ্রেট দ্য হোল লট মণিকা, দ্য হোল লট!'

কান্নার দমকে শেষদিকে আমার স্বর বুজে গেল।

পুলিশের কাছে শুধু আজকের রাতটা আমি রেহাই চাই।

কারণ আজ রাতেই আমি নরোত্তম শর্মাকে ওর দল সমেত নির্বংশ করব।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। আমার চোখের জল শুকোল না। মণিকার কথা মন-প্রাণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের মনে আশার আলো দেখা দিলে ঈশ্বর কি সে-আলো এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দেন? না, এখানে সে-আলো নিভিয়েছে হৃদা। এবং একইসঙ্গে নিজের শাস্তি দ্বিগুণ করেছে। চেষ্টা করলাম, দুঃখ মন থেকে মুছে ফেলতে। ধীরে-ধীরে অন্ধ ক্রোধ, আক্রোশ, ঘৃণা, আমার শরীরে জায়গা করে নিল। হতাশা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমি বড় দেরি করে ফেলেছি। এ-দেরি না করলে মণিকাকে হারাতে হত না।

সুতরাং ঘরের টেবিল-চেয়ার সরিয়ে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করলাম। তারপর শর্টস ছাড়া সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেললাম। শুরু করলাম প্র্যাকটিস।

প্রথমে চোখ বুজে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসলাম। মাথা ঝুঁকিয়ে নীরব রইলাম কয়েক সেকেন্ড। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ঘাড়ের ব্যায়াম দিয়ে শুরু করলাম ওয়ার্ম-আপ এক্সারসাইজ। অ্যাঙ্কল স্ন্যাপ, লেগ স্ট্রেচ, পুশ-আপস, কিঙ্গার অ্যান্ড রিস্ট এক্সারসাইজ। এরপর বিভিন্ন পাঞ্চিং, স্ট্রাইকিং, কিকিং অ্যান্ড ব্লকিংয়ের শ্যাডো প্র্যাকটিস। আর, সবশেষে জিউ কুমাইত-এর বিভিন্ন ভঙ্গির অনুশীলন। জিউ কুমাইত কারাটের সবচেয়ে অ্যাডভান্সড স্টেজ। এতে প্রতিপক্ষকে যে-আঘাত করা হয় তা চরম এবং ভয়ঙ্কররকম বিপজ্জনক।

ঘণ্টাখানেক প্র্যাকটিসের পর বসলাম বিশ্রাম নিতে। তারপর একসময় রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই রান্নার ব্যবস্থা করলাম। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিস্তরঙ্গ মন নিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। এখন চাই প্রশান্তি। পরিপূর্ণ প্রশান্তি।

ঘুম অথবা আচ্ছন্নতা ভাঙল বিকেল চারটে নাগাদ। উঠেই প্রস্তুতি শুরু করলাম।

BanglaBook.org

আলমারি খুলে কয়েকটা বিশ, পঞ্চাশ ও একশো টাকার জাল নোটের বান্ডিল বের করলাম। গুছিয়ে রাখলাম টেবিলে। এরপর বেরোল মাসুদের পীসমেকার। তাকে অনুসরণ করে আমারটা। দুটোরই সেফটি নাড়াচাড়া করে কর্মতৎপরতা যাচাই করে নিলাম । যদিও ঠিক জানি না, এগুলোর প্রয়োজন হবে কি না। তারপর জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম কয়েকটা কেনাকাটা করতে। প্রথমে কিনলাম একটা সাদা থান। সঙ্গে লম্বা এককালি সাদা কাপড়ের টুকরো। আর সবশেষে একটা বড় রজনীগন্ধা-কুঁড়ির মালা। রাতের দিকে ফুটবে। তখনই মালাটা আমার দরকার।

বাড়িতে ফিরে এসে একটা অকেজো লোহার চাবি বের করে সাদা কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে একটা কাছা তৈরি করলাম। তারপর থান ও কাছা একটা প্যাকেটে মুড়ে রেখে দিলাম। আবার শুয়ে পড়লাম বিছানায়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবতে শুরু করলাম অম্বর রায়ের ইতিহাস। মণিকা রায়ের ইতিহাস। প্রতিশোধ-স্পৃহাকে তীব্র করার জন্যে তারিয়ে-তারিয়ে এ-ভাবনার প্রয়োজন আছে।

মাসুদ, হুদা, নরোত্তম শর্মা, জিতেন দত্ত, দয়ারাম ভার্গব। তোমরা সবাই তৈরি তো? এতদিনের প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে, ভাই। আজ রাতে কিরাত আসছে। শাস্তি নিয়ে আসছে।

নরোত্তম শর্মার চারতলা বাড়ি যেন সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁপিয়ে পড়া বৃষ্টির ছাঁট রুখতে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে প্রায় রাত আটটা নাগাদ। এখন রাত দশটা। থামেনি। বরং বেড়েছে। আমার বগলে ফুল ও কাপড়ের প্যাকেট। দু-হাত বর্ষাতির পকেটে। শরীরের সংস্পর্শে দুটো 'কুইক ড্র' শোল্ডার-হোলস্টারে দুটো পীসমেকার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে।

রাস্তা পার হয়ে নরোত্তম শর্মার বাড়ির সামনের গাড়িবারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। অল্প পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। কোনও জনপ্রাণী নেই। শুধু একটা কালো অ্যাম্বাসাডর নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে। বর্ষাতি ও হাতের প্যাকেটগুলো দরজার কোণে নামিয়ে রেখে একমুহূর্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর সামান্য চাপ দিলাম দরজায়। দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে। সামনেই হলঘর। কেউ নেই। জিতেন দত্ত, নরোত্তমের উত্তম গৃহরক্ষী, গেল কোথায়? হলঘরে যখন নেই, তখন বসবার ঘরে তাকে আবিষ্কার করার শতকরা নব্বুইভাগ আশা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। আশা আমার পূর্ণ হল।

জিতেন দত্ত দরজার সোজাসুজি একটু ডানদিক ঘেঁষে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল। কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে হয়তো বৃষ্টির ছাঁটের শক্তি পর্যবেক্ষণ করছিল। একটা স্মিসার মেশিন পিস্তল পড়ে আছে ওর ডানপাশে। ডানহাতের নাগালেই। আমি ঘরে ঢুকতেই ও তাকাল আমার চোখে। এক মুহূর্তের দ্বিধা : ভাবল, মেশিন পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে কি না। আমরা দুই জন্মের প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। জিতেন আমার চেহারা আগে দেখেনি। কিন্তু পরিস্থিতি ও আমার অভিব্যক্তির যোগফল ওকে জানিয়ে দিল আমিই সে। কিরাত চৌধুরী।

চোখের পলকে ডানপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিতেন।

BanglaBook.org

কিন্তু তার আগেই অমানুষিক ক্ষিপ্রতায় আমাদের মধ্যেকার ব্যবধান আমি কমিয়ে ফেলেছি। এবং আমার 'ইওকো তোবি গেরি' সরাসরি গিয়ে পড়েছে জিতেন দত্তর কোমরে। প্রত্যাশা অনুযায়ী এই সাইড জাম্পিং কিকে কোমর ভেঙে যাওয়ার কথা। হয়তো গেলও তাই। কারণ এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ল জিতেন। মেশিন পিস্তলটা তখনও ওর নাগালের বাইরে। কিন্তু কিলার জিতেন দত্তর প্রচেষ্টার অন্ত নেই। সাপের মতো এঁকেবেঁকে ওর হাত এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে পিস্তলের দিকে। এবং একই সঙ্গে উঠেও বসেছে ও। গোঙাচ্ছে।

ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ দেখলাম ওর প্রচেষ্টার দৃশ্য। তারপর জিগ্যেস করলাম, 'জিতেন দত্ত, শর্মা কোথায়? বানরোত্তম শর্মা?'

জিতেন মুখ খুলল সামান্য দেরি করে। বলল, 'এখানে নেই—।'

তাহলে কি ডায়মন্ডহারবার গেছে?

'বাড়িতে তাহলে কে আছে?'

দত্ত চুপ। সুতরাং যা করণীয় তাই করলাম। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দৌড়ে এসে শূন্যে লাফিয়ে জিউ কুমাইত-এর এক 'মা তোবি গেরি' বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। দেওয়াল ঘেঁষে বসে থাকায় এই ভয়ঙ্কর লাথিতে জিতেনের মাথাটা সশব্দে ঠোক্কর খেল দেওয়ালে। কট করে এক নোংরা শব্দ হল। দেওয়াল লাল হল। জিতেন কাত হয়ে পড়ে গেল। অতিকষ্টে খুলে থাকতে চেষ্টা করল বুজে আসা চোখ দুটোকে।

ওর খুব কাছে মুখ নামিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'জিতেন, অম্বর রায়কে মনে পড়ে? ডায়মন্ডহারবারে মারা গিয়েছিল যে অম্বর রায়? সে আমাকে পাঠিয়েছে। আমি কিরাত চৌধুরী। তোমাদের শাস্তি দিতে এসেছি।'

জিতেন কখনও চোখ খুলছে, কখনও বুজে আছে। ঝুঁকে পড়ে কুড়িয়ে নিলাম ওর মেশিন পিস্তল। নলটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম ওর মুখে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক প্রচণ্ড বুটের লাথি মারলাম বেরিয়ে থাকা মেশিন পিস্তলের বাঁটে। বাইরে বুক কাঁপানো শব্দে বাজ পড়ল। জিতেনের দাঁত ভাঙার শব্দ শোনা গেল না। শোনবার প্রয়োজনও ছিল না। যে-হারে ওর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তাতে ওর এখন 'যাবার বেলায়...' গাইবার কথা। তবুও ওকে ধরে বারকয়েক ঝাঁকুনি দিলাম। জিতেন অসাড়। মুদিত নয়ন। 'তুমি রবে নীরবে...'।

'ওকে আর বিরক্ত কোরো না। লেট হিম লাই।' পেছন থেকে কেউ বলল।

হু—দা! হু—দা! হু—দা!

'ভেঞ্চার্স'-এর মনে আগুন ধরানো পপ সঙ্গীত আবার আমার বুকে বাজতে থাকে। আস্তে-আস্তে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াই।

হলঘর ও বসবার ঘরের মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়িয়ে হদা। দু-চোখ যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। আগুনে-আগুনে সংঘর্ষ হল।

মণিকা, কোথায় তুমি? এসো, আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আমাদের দেখো, চেয়ে দেখো...।

আমি এক পা তুলে অন্য পায়ের হাঁটুতে রেখেছি। দুটো হাত আঙুল বাঁকিয়ে এগিয়ে দিয়েছি সামনে। দেহ তরোয়ালের মতো সোজা। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে চোখ ওপর

BanglaBook.org

দিকে তুলে দেখছি হুদার মুখ। পরিভাষায় 'স্টর্ক স্টান্স'।

আচমকা নিচু হল হুদা। একই সঙ্গে বেল্‌বট্‌সের পায়ের কাছটা তুলে ট্র্যাপে বাঁধা ছুরিটা বের করে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। ছিটকে এল আমার দিকে। ওর ছুরি সমেত হাত সামনে বাড়ানো।

সরু ফলার ছুরি। আমার চেনা। মণিকা সেটা দেখেছিল। চার বছর আগে। দয়া, মায়া, মমতা, কৃপা ইত্যাদি জাতীয় শব্দগুচ্ছ আমার অভিধানে বর্তমানে অদৃশ্য । সুতরাং ক্ষমাহীন অপলক চোখ হুদার বুকে নিবদ্ধ রেখে 'নিকো আশি দাচি' ভঙ্গিতে বাঁ-দিকে সরে গেলাম। এই 'ক্যাট স্টান্স'-এর মর্ম হুদা বুঝল না। বুঝল না পরমুহূর্তেই কী হতে চলেছে। এবং তাই হল।

বাঁ-হাতের তালু দিয়ে ওর ছুরিসমেত হাতের কনুইতে এক প্রচণ্ড 'পাম হিল ব্লক' প্রয়োগ করলাম, আর একই সঙ্গে আমার ডানহাত টানটান হয়ে বজ্রের শক্তিতে কাটারির মতো নেমে এল ওর কব্জিতে। মট করে কনুইটা ভেঙে গেল। আর তৎক্ষণাৎ আমার ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা বঁড়শির মতো বেঁকে পলকে ঢুকে গেছে হুদার দু-চোখে।

যন্ত্রণাকাতর চিৎকার যদি আঘাতের মাপকাঠির সঙ্গে সমানুপাতিক হয় তাহলে হুদার আঘাত যে গুরুতর তা স্বীকার করতে হয়। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে তখন ও চিৎকার করছে। চোখ ঢেকেছে বাঁ-হাতে। কারণ ডানহাত অসাড় হয়ে কাঁধের সঙ্গে ঝুলছে।

ওর দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না, তাই পিছন ফিরে পা ঘুরিয়ে উশিরো কেকোমি', অর্থাৎ 'ব্যাক কিক' দিয়ে শুইয়ে দিলাম হুদাকে। থুতনিতে লাথি খেয়ে ওর দেহটা শূন্যে লাফিয়ে ছিটকে পড়ল পিছনে। মেঝেতে।

একইসঙ্গে আর-একটি পতনের শব্দ আমাকে বিচলিত করল। ফিরে তাকালাম। সবার ঘরের দরজায় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে এক মহিলা। আর-একটি ছোট ছেলে পাশে বসে তাকে ঠেলে জাগাবার চেষ্টা করছে। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে আমি তাকিয়ে আছি গীতা শর্মা ও রকু শর্মার দিকে। নরোত্তমের বউ এবং একমাত্র ছেলে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম পায়ে-পায়ে। ছেলেটা ভয়ঙ্কর ভয়-পাওয়া মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। মাকে ঠেলে জাগাতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। ওর সামনে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়ালাম।

হুদা কিংবা জিতেনের চিৎকারেই কি ওরা নেমে এসেছে নীচে?

'নরোত্তম শর্মা কোথায়, রকু?'

বাচ্চাটা ভয় পেল। বলল, 'ড্যাডি বাড়ি নেই—।'

'আর কে আছে বাড়িতে?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর : 'মাসুদকাকু—জ্বর হয়েছে।'

হওয়ারই কথা।

'কোথায় মাসুদ?'

'ওপরে।'

BanglaBook.org

ওদের ডিঙিয়ে বাইরে বেরোলাম। টেলিফোনের লাইনটা কোথায়? হলঘরে এসে দরজার কাছেই সেটা চোখে পড়ল। এক হ্যাঁচকায় সকেট থেকে তার উপড়ে নিলাম। আমি চাই না টেলিফোন তুলে গীতা অথবা রকু শর্মা তারস্বরে চিৎকার করুক। অন্তত এই মুহূর্তে।

ফিরে এলাম বসবার ঘরের দরজায়। গীতা শর্মা এখনও অচেতন। এবং রকু এখনও প্রচেষ্টায় সচেতন। ও একবার অপরাধী-চোখে ভয়ে-ভয়ে দেখল আমার দিকে। আমি হাসলাম। একদলা থুতু ছেটালাম মেঝেতে। তারপর বাঁ-পাশে বেয়ে ওঠা সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করলাম দোতলায়। মনে-মনে চিৎকার করলাম, মাসুদ, মাসুদ, আমি এসেছি! তোকে নিতে এসেছি!

কয়েকটা ঘর অনুসন্ধানের পর মাসুদকে পেলাম। বিছানায় শুয়ে আছে ও। ডান হাত প্লাস্টার অফ প্যারিসে মোড়া, বুকে ব্যান্ডেজ। ঘরে অল্প পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছিল। আন্দাজে সুইচ টিপে ফ্লুওরেসেন্ট লাইট জ্বেলে দিলাম। মাসুদ ঘুমিয়ে আছে। ভালোই হল।

ওর খুব কাছে এগিয়ে গেলাম। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর শরীর সামান্য কেঁপে উঠছে। সুইচ-বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্লাগ পয়েন্টে প্লাগ গোঁজা রয়েছে। প্লাগের তার চলে এসেছে মাসুদের শিয়রে রাখা টেবিল-ল্যাম্পের দিকে। টেবিল-ল্যাম্প এখন জ্বলছে না। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম সুইচ-বোর্ডের কাছে। প্লাগ পয়েন্টের সুইচ অফ করলাম। তারপর ঘরের বাইরে এলাম। ওপরে তাকাতেই চোখে পড়ল ডিসট্রিবিউশান বোর্ড। তাতে সার দিয়ে ফিউজ লাগানো। পাশের ঘরে গিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা চুলের কাঁটা নিলাম। একটা চেয়ারও টেনে নিয়ে এলাম বাইরে। চেয়ারে উঠে ফিউজগুলো থেকে একটা করে ব্রিজ খুলতে লাগলাম। দেখতে চাইলাম, মাসুদের ঘরের লাইন কোন ফিউজের সঙ্গে সংযুক্ত। খুঁজে পেলাম। বাকি ব্রিজগুলো যথাস্থানে লাগিয়ে দিলাম। মাসুদের ঘর এখন অন্ধকার। ব্রিজের বদলে চুলের কাঁটা দিয়ে লাইন জুড়ে দিলাম। ওর ঘরে আলো জ্বলে উঠল আবার। এ-লাইন এখন সহজে ফিউজ হবে না। তাই আমি চাই।

ফিরে এলাম মাসুদের ঘরে। টেবিল-ল্যাম্পের তারটা এক প্রচণ্ড টানে বিচ্ছিন্ন করলাম। তারের উন্মুক্ত প্রান্ত দুটো নিয়ে গেলাম মাসুদের কাছে। তারপর তামার দু-প্রান্তে ভালো করে পাকিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম মাসুদের দু-কানে। সুড়সুড়ি পেয়ে সামান্য নড়ে উঠল ও। আমি মুচকি হাসলাম। এবং সোজা এগিয়ে গিয়ে প্লাগ পয়েন্টের সুইচটা অন করে দিলাম। দুশো তিরিশ ভোল্টের ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে উঠল মাসুদ। ওর বন্ধ চোখ নিমেষে খুলে গেল। কয়েক মুহূর্ত বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা কী হচ্ছে। কিন্তু পারল না। তখন আপাত-সুস্থ বাঁ-হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলাম বিছানায়। এক পায়ে চেপে ধরলাম ওর মুখ, অন্য পায়ে বাঁ-হাত। আমার পায়ে রবার সোলের জুতো। অতএব বিদ্যুৎ-রোধক। মাসুদের চামড়ার শরীর। অতএব বিদ্যুৎ-পরিবাহী। ওর দেহটা আমার দু-পায়ের তলায় লাফাতে লাগল। কর্সা মুখ আস্তে-আস্তে কালচে হয়ে গেল। শুধু অর্ধস্ফুট এক চিৎকার করতে পারল মাসুদ। তারপর নীরব হল।

BanglaBook.org

লাফিয়ে খাট থেকে নেমে এলাম আমি। কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডের নীতি অনুযায়ী মাসুদের শরীরটা তখনও স্থির কম্পাঙ্কে কাঁপছে। জ্বলন্ত আলোর নীচে সেই বীভৎস দৃশ্যকে ফেলে রেখে একতলায় নেমে এলাম।

গীতা শর্মার ঘুম ভেঙেছে। ও এখন উঠে বসেছে। প্রাণপণে আঁকড়ে আছে রকু শর্মাকে। হাজার হলেও একমাত্র ছেলে। নয়নের মণি। নরোত্তমের মণি।

ভয়ার্ত চোখ এখন আমার কাছে সহজ-স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং গীতা ও রকুর অভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে বললাম, 'মিসেস শর্মা, নরোত্তম কোথায়?'

'বাড়ি নেই।'

'জানি।' একটু সময় দিয়ে, 'কোথায় গেছে?'

গীতা শর্মা চুপ।

অয়ি পতিব্রতে, নিষ্ফল প্রচেষ্টা তোমার। এক ঝটকায় রকুকে শূন্যে তুলে টেনে নিয়ে এলাম আমার পাশে। এটা ভয়ার্ত চিৎকার জন্ম নিল গীতার ভোক্যাল কর্ডে। কিন্তু একটা পীসমেকার চকিতে বের করে আনতেই সেটার মৃত্যু হল মাঝপথে।

কোল্টের নলটা ঠেসে ধরলাম রকুর রগে। না, একটা বাচ্চাকে মেরে ফেলার মতো অমানুষ আমি নই। অম্বর রায়ও ছিল না। এ-প্রক্রিয়া শুধু ভয় দেখানোর জন্যে। সাপের ফোঁসফোঁস। দংশন নয়।

'নরোত্তম কোথায় গেছে?'

'ডায়মন্ডহারবার—।'

রকুকে ঠেলে দিলাম মায়ের কোলে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

ওদিকে হৃদার 'উঃ—আঃ' আবার শুরু হয়েছে, সেইসঙ্গে সামান্য নড়াচড়াকেও ও এখন প্রশ্রয় দিতে পারছে। একপলক হৃদার দিকে দেখলাম। তারপর ফিরলাম গীতা শর্মার দিকে। বললাম, 'শুধু-শুধু চিৎকার করে এখন থেকেই গলা ব্যথা করবেন না। পরে এর দরকার হবে—।'

রিভলবার হোলস্টারে ঢুকিয়ে এবার চলে এলাম হলঘরের দরজায়। দরজার বাইরে একপাশে রাখা প্যাকেট দুটোর একটা তুলে নিলাম। এসে দাঁড়ালাম রকুর কাছে। হাঁটু গেড়ে বসলাম। প্যাকেট খুলে কাছাটা বের করলাম। পরিয়ে দিলাম রকুর গলায়। বেচারা এর মানে বুঝতে পারল না। ওর মা বুঝল। কান্না মেশানো ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল। আমি নির্বিকার মুখে সাদা থানটা বের করলাম। ছুড়ে দিলাম গীতা শর্মার কোলে। ও তখন মুখ ঢেকেছে বোবা আশঙ্কায়। ঝুঁকে পড়ে রুমাল দিয়ে ওর কপালের সিঁদুর মুছে দিলাম। সিঁদুরের জ্বলজ্বলে রেখা অস্পষ্ট হল। গীতা শর্মার দেহটা ফুলে-ফুলে উঠছে। রকুকে জিগ্যেস করলাম, 'বাইরের গাড়িটা কার?'

'আমাদের।'

'তোমার ড্যাডি কি অন্য গাড়িটা নিয়ে গেছে?' নরোত্তমের একটা সবুজ ফিয়াট আছে।

'হ্যাঁ—।'

আমার এখানকার কাজ শেষ। প্রায়। বসবার ঘর ও ভাঁড়ার ঘর খুঁজে নাইলনের দড়ি পেলাম। সেটা নিয়ে হৃদার কাছে গেলাম। ও এখনও কাতরাচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে শক্ত

BanglaBook.org

করে ওর গোড়ালি দুটো একসঙ্গে বাঁধলাম। তারপর ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেলাম বাইরে। অ্যাম্বাসাডারের পেছনের বাম্পারে দড়িটার অন্য প্রান্ত বাঁধলাম শক্ত করে। হুদাকে শুইয়ে দিলাম মেঝেতে। তারপর আবার ফিরে গেলাম হলঘরে।

গীতা শর্মাকে বললাম, 'বাড়ি ছেড়ে বেরোবেন না—আপনার স্বামীর মঙ্গলের জন্যে। আর খুদা গওয়া, আপনার ইজ্জত আপনারই আছে। অন্যায়ভাবে আপনাকে স্পর্শ পর্যন্ত আমি করিনি।' আপনার স্বামী কিন্তু করেছিল, মিসেস গীতা শর্মা। অম্বর রায়ের বউয়ের প্রাণ ও ইজ্জত নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলেছে। অ্যান্ড আই ডিডন্ট লাইক ইট, বাই গড!

অবাক গীতা শর্মা ও ত্রস্ত রকু শর্মাকে স্থবির রেখে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সদর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম। অ্যাম্বাসাডর গাড়ির সামনের দরজা খুলে হ্যান্ডেলটা বের করে নিলাম। ওটা সদর দরজার কড়া দুটোয় ঢুকিয়ে জ্যাম করে দিলাম। ভেতর থেকে হাজার টানলেও দরজা এখন খুলবে না। গীতা ও রকু শর্মা এখন নরোত্তমের আত্মার শান্তি কামনা করুক।

ফুলের মালার প্যাকেটটা গাড়িতে তুলে নিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসলাম! গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। প্রচণ্ড প্রারম্ভিক গতিবেগ গাড়িটাকে ছিটকে দিল সামনে।

রাত এখন প্রায় সওয়া এগোরোটা। ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার রাস্তা একদম ফাঁকা। ভালোই হল। গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটে চলা হুদার দেহটা চট করে কারও নজরে পড়বে না। তা ছাড়া, আমি যেভাবে গাড়ি চালাব, তাতে ওর দেহ খুব সামান্য সময়েই মৃতদেহে পরিণত হবে।

হুদা, তুই দশবার মরলেও মণিকার একবারের শোধ হবে না। এ আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা মাত্র। অম্বর রায়ের স্মৃতি দীর্ঘজীবী হোক। লং লিভ দ্য পাস্ট!

ডায়মন্ডহারবার।

রাত একটা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি। আমার কালো অ্যাম্বাসাডর 'সাগরিকা' থেকে অন্তত দুশো গজ দূরে অন্ধকারের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সাগরিকার দরজায় নিয়ন লাইটের সাদা আলোর পর্যাপ্ত ছড়াছড়ি। অ্যাম্বাসাডর ও তার সঙ্গে বাঁধা হুদাকে নিয়ে আলোর সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করা বিপজ্জনক। অতএব হাঁটতে শুরু করলাম। সঙ্গে নিলাম রজনীগন্ধার মালার প্যাকেটটা। এটা আমার কাছে এখন অনেক দামী।

রাস্তা নির্জন। স্বাভাবিক। এ-রাত প্রতিশোধের রাত। হুগলি নদীর ওপর থেকে হু-হু করে জোলো হাওয়া আসছে। শোঁ-শোঁ শব্দ তুলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে আমার রক্তে। যেন চিৎকার করে বলছে, কিরাত, প্রতিশোধ নাও। প্রতিশোধ নাও।

নেব। নিচ্ছি।

নরোত্তম শর্মা, সরজু নাথানি এবং দয়ারাম ভার্গব এখন, এই মুহূর্তে, কী অবস্থায় আছে কে জানে!

হয়তো ওরাও ভাবছে আমি এখন কী অবস্থায় আছি।

BanglaBook.org

মাসুদ, জিতেন ও হুদা কী অবস্থায় আছে।

একই অবস্থায় আছে। দুরবস্থায়। রাত্তার ঘষায় হুদার গরম হওয়া শরীর এখন ঠান্ডা হচ্ছে।

অতি সন্তর্পণে সাগরিকা অতিক্রম করে এগিয়ে চললাম। যথাস্থানে পৌঁছে আবিষ্কার করলাম নরোত্তমের নতুন ডেরা। সেদিনের পুড়ে যাওয়া বেড়ার ঘরের জায়গায় তৈরি হয়েছে একজোড়া নতুন ঘর। সেই অগ্নিগর্ভ দুর্ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে চোখে পড়ে কিছু পোড়া খড়ের চিহ্ন। দয়ারাম, সরজু, বেশ করিৎকর্মা আছে। দুর্ঘটনার স্মৃতি অল্প সময়েই মুছে দিয়েছে স্থানীয় লোকের মন থেকে।

চারপাশের নির্জনতা সেই একইরকম। বৃষ্টি আপাতত স্তব্ধ হলেও তার ঘণ্টাখানেক আগেকার ব্যস্ততার ছাপ সর্বত্র। এবারে আর জানলা দিয়ে উঁকি-টুঁকি মারার ভূমিকা করলাম না। সটান এক লাথিতে বেড়ার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলাম। একটা পীসমেকার ডানহাতের অচঞ্চল আঙুলে স্থির। বাঁ-হাতে রজনীগন্ধার মালা।

ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখবার মতো।

নরোত্তম শর্মা, সরজু নাথানি, দয়ারাম ভার্গব ও রতন শুক্লা গোল হয়ে বসে মেঝেতে। ওদের বৃত্তের ঠিক মাঝখানে থরে-থরে সাজানো জাল নোটের বান্ডিল। ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে। নরোত্তমের ডানহাত ওর বুকের বাঁ-দিক লক্ষ করে এগোতে গিয়ে স্থিরচিত্র। দয়ারামও প্যান্টের পিছন-পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল। থামল।

'কিরাত—!' নরোত্তম অস্ফুট স্বরে বলে উঠল।

আমি সোজা এগিয়ে গেলাম দয়ারামের কাছে। পীসমেকারের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলাম ওর নাকে। পরমুহূর্তে একই আঘাত মাথার পিছনে। দয়ারাম গয়ারাম হল। রক্তাক্ত মুখ-চোখে সটান শুয়ে পড়ল।

রতন শুক্লা ও সরজুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'রতন, সরজু—অম্বর রায় তোমাদের ক্ষমা করেছে। যু মে লীভ। এ আমাদের আপোসী মামলা। শুধু-শুধু লোকজন ডেকে আমাকে বিরক্ত কোরো না। সরজু জানে, আমি দোস্ত অম্বরের বেইজ্জৎ মৃত্যুর শোধ নিতে এসেছি।'

সরজু রতনের হাত ধরে টান মারল। দু-হাত তুলে উঠে দাঁড়াল ধীরে-ধীরে। সরজুকে দেখলাম। ওর মুখ ফোলা। মুখে ক্ষতের চিহ্ন এখনও রয়েছে। আমার সঙ্গে কয়েকদিন আগের সাক্ষাৎকারের চিহ্ন।

ঠান্ডা গলায় বললাম, 'বড়দের যুদ্ধের সময় ছোটদের থাকতে নেই। লীভ আস অ্যালোন।'

এমনসময় ঝমঝম শব্দে আবার বৃষ্টি নামল।

নরোত্তম বসে থেকেই চোখের সামান্য ইশারা করল রতনকে। রতন হাত তুলে ঘর ছেড়ে বেরোতে যাচ্ছিল। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে বা ভেবে আমার রিভলবার ধরা হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সরাসরি ওর মুখে গুলি করলাম।

কোল্টের বিশ্রী শব্দে সরজু শিউরে উঠল। রতন শুক্লা রক্তাক্ত শরীরে মুখহীন অবস্থায় এসে পড়ল আমার গায়ে। ওর কপাল ও গালের একপাশ উড়ে গেলেও সহজাত

BanglaBook.org

প্রতিক্রিয়ায় আঁকড়ে ধরল আমার জামা। তারপর ওর হাঁটু অবশ হল। ওর দেহের ভার আমার জামা অবলম্বন করে ক্রমশ মেঝের দিকে নামতে লাগল। বিরক্তিকর শব্দে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল আমার শার্ট। উন্মুক্ত হল আমার বুক।

এক হাতে ফুলের মালা, অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

রক্ত হিম করা ভয়ঙ্কর শব্দে বাইরে বাজ পড়ল। অবাক নরোত্তম চিৎকার করে উঠল, 'অম্বর, অম্বর রায়—তুমি বেঁচে আছ?!'

ও আমার পুড়ে যাওয়া স্তনবৃন্ত দুটো দেখতে পেয়েছে। যে-দাগ ও চার বছর আগে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে এঁকে দিয়েছে আমার বুকে। আর নরোত্তমের বিস্মিত-বিহ্বল হওয়ার কারণ অম্বর রায়ের মুখের সঙ্গে আমার মুখ মোটেও মিলছে না।

সরজু নাথানি দাঁড়িয়ে ছিল রতন শুক্লার ঠিক পিছনেই। থরথর করে কেঁপে উঠল। ওর চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। ও ধীরে-ধীরে আমার খুব কাছে এগিয়ে এল। রতন শুক্লার দেহ ডিঙিয়ে আমার গায়ে হাত রাখল। হাত বোলাতে লাগল।

'অম্বর, তুই বেঁচে আছিস! তুই আজও বেঁচে আছিস!'

হঠাৎই হিংস্রভাবে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নরোত্তম শর্মা। আমার কোল্ট সমেত হাত ছিটকে এগিয়ে গেল ওর মুখের সামনে। অন্য হাতে ফুলের মালাটা বের করে ঝুলিয়ে দিলাম ওর গলায়, এবং জামার আড়াল থেকে বের করে নিলাম বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা ওর লুগারটা। নরোত্তম এখন পাথরের মতো স্থির। কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যে কথা! অল লাইজ! অম্বর রায় চার সাল আগে—।'

'এই ডায়মন্ডহারবারে মারা গেছে।' আমি হাসলাম, 'মনে পড়ে, নরোত্তম, এখানে আসার পথে গাড়িতে তুমি আমাকে বলেছিলে, পরের জন্মে জালি লাইনে আর থেকো না, রায়। এ-কথা অম্বর রায় ছাড়া আর কে জানবে?'

সরজু হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। হাঁটু গেড়ে বসে আমার পা জড়িয়ে ধরল, 'অম্বর, অম্বর, আমাকে মেরে ফেল তুই। শেষ করে দে। আমি অনেক পাপ করেছি রে, অনেক পাপ করেছি—।'

আমার অবিচলিত চোখ নরোত্তমের চোখে। সেই অবস্থাতেই বললাম, 'চলে যা, সরজু, এখানে থাকিস না। কাল রাতে শর্মা মণিকাকে খুন করেছে।'

গলায় মালা নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত নেড়ে প্রতিবাদ করতে গেল নরোত্তম, আমার বাঁ-পায়ের সাইড কিক ওর চোয়ালে গিয়ে আঘাত করল। মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির শব্দ ঘরের শব্দকে আড়াল করল। কাৎ হয়ে বেড়ার দেওয়ালে ছিটকে পড়ল নরোত্তম। কোনওরকমে আবার উঠতে চেষ্টা করল।

সরজুর কাছে আমার ডান পা এখনও বন্দি।

'সরজু! বেরিয়ে যা এখান থেকে!' আমার বুক ফাটানো গর্জনে চমকে উঠল নাথানি। তাকাল আমার থমথমে মুখের দিকে। কী দেখল, কী বুঝল, ও-ই জানে। আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে দেখল রতন শুক্লার ধ্বংসাবশেষের দিকে। অচেতন দয়ারামের দিকে। তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরের বৃষ্টিতে। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'অম্বর, তুই আমাকে ক্ষমা করিস না—।'

এখন ঘরে আমি ও নরোত্তম একা। আর অচেতন দয়ারাম ভর্গব। চেতনা ফিরবে

BanglaBook.org

কি না জানি না।

নরোত্তম অবাক চোখে খুঁটিয়ে আমাকে দেখছিল। বলে উঠল, 'অসম্ভব! অম্বর রায় মারা গেছে।'

একই কথা বারবার শুনতে আমার ভালো লাগে না। তাই কোনও জবাব দিলাম না। ঘরের আলো বলতে একটা হ্যারিকেন ও একটা মোমবাতি। ওপরের টালির ছাউনি থেকে কোথাও-কোথাও চুঁইয়ে-চুঁইয়ে জল পড়ছে। জাল নোটের স্তূপের দিকে এক পলক দেখে নরোত্তমকে বললাম, 'কার ব্লক? আমার?'

একটু দেরি করে ঘাড় নাড়ল নরোত্তম, 'হ্যাঁ।'

আমি হাতের পীসমেকার ও লুগার দরজা দিয়ে ছুড়ে দিলাম বাইরে। জলে ভিজে ওগুলো অকেজো হয়ে যাক। নরোত্তম শর্মা তো আমাকে গুলি করে মারেনি, তাহলে আমি কেন মারব? সুতরাং অবশিষ্ট পীসমেকার ও হোলস্টার দুটো একইভাবে পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করল।

আস্তে-আস্তে বলতে শুরু করলাম, 'নরোত্তম, সেদিন তোমরা আমাকে ফেলে দিয়েছিলে ভরা হুগলি নদীতে। আমাকে বাঁচিয়েছিল আমার হাতে-পায়ে বাঁধা খাটো লাঠি ও ফুট চারেক লম্বা বাঁশটা। তোমরা যেগুলো বেঁধে দিয়েছিলে। আমার প্রাণ তখনও দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি। ধুকপুক করছিল বুকের খাঁচায়। জলে পড়তেই আমি ডুবলাম না। ডুবেও ভেসে রইলাম ওই লাঠি আর বাঁশের জন্যে। এইভাবে ভাসতে-ভাসতেই একসময় জ্ঞান ফিরল। আমি তখন স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছি নৌকোঘাটার দিকে। একটা ছোট নৌকোর সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগল। টলে উঠল নৌকো, তার মাঝি। সে এল দেখতে। হাতে হ্যারিকেন। দেখতে পেল আমাকে। অতিকষ্টে টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিল তার নৌকোয়। আমার অবস্থা দেখে আশেপাশের নৌকো থেকে দু-একজন সঙ্গী-সাথী জোগাড় করল সে। আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল, সেবা-শুশ্রূষা করল। কিন্তু আমার সারা মুখের বিশ্রী ক্ষতগুলো নদীর জলে ভিজে তখন চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে।

'শেষে ওরাই আমাকে ভর্তি করে দিল হাসপাতালে। পুলিশ কেস হল। আমি পরিচয় গোপন করলাম। তা ছাড়া, আমাকে দেখে কারও চেনার উপায়ও ছিল না। কেউ বুঝতে পারল না, আমিই অম্বর রায়—জালি লাইনের শাহানশাহ্। পুলিশকে বললাম, কিছু অচেনা লোক আমাকে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে আসে। অকারণে প্রচণ্ড অত্যাচার করে। তারপর রাতে নৌকো থেকে ফেলে দেয় মাঝ-নদীতে। তারা কে, কেন আমাকে মারল, আমি কিছুই জানি না। তাদের দেখলেও আমি চিনতে পারব না, কারণ, তাদের মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। পুলিশি অনুসন্ধান ওখানেই থেমে রইল।

'আমার চিকিৎসা চলল। মুখের ওপর সার্জনের কারিকুরি যখন শেষ হল, তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারছি না। কে আমি? আমার নতুন তৈরি নামটা থেকে গেল। কিরাত চৌধুরী। প্রায় আটমাস বাদে আমি ছাড়া পেলাম। যে-সার্জন আমার চিকিৎসা করেছিলেন তিনি কেসটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে নিজের পকেট থেকে বহু পয়সা খরচ করেছিলেন। আমি ছাড়া পাওয়ার সময় হাতে দেড়শোটা টাকাও গুঁজে দিলেন। এতগুলো দিন পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকে

BanglaBook.org

তাঁকে আমি কেমন বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। খুলে বলেছিলাম আসল ঘটনা। তিনি বললেন, আপনাকে এখন কেউ চিনতে পারবে না। প্রতিশোধ নিন। ওদের ছেড়ে দেবেন না। আপনি তো মরেই যেতেন। এ আপনার বাড়তি জীবন, থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী।

'পরে জেনেছিলাম ওই সার্জনের স্ত্রী এক গুণ্ডাদলের হাতে হেনস্থা হয়ে আত্মহত্যা করে।'

গলার মালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল নরোত্তম। তারপর হঠাৎই ওটা খুলতে গেল।

'খবরদার!' হিংস্র স্বরে গর্জে উঠলাম, 'খুলবি না ওই মালা!'

ঘরের এককোণে কিছু খড়ের পাশে একটা খড় কাটার ধারালো ক্লীভার পড়ে ছিল। চোখের পলকে সেটা হাতে তুলে নিলাম। নরোত্তম আমার চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গেই হাত থামিয়ে দিয়েছিল, এখন নামিয়ে নিল।

'মালা গলা থেকে খোলার চেষ্টা করলে, কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে দেব! এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তাই ঠিক-ঠিক মতো শেষ করতে চাই। মণিকা অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছে, নরোত্তম। ও বাঁচতে চেয়েছিল। জুলির জন্যে।'

নরোত্তম অবাক হল। জুলির নাম কি ও এই প্রথম শুনল?

বৃষ্টির সুষম ছন্দময় সঙ্গীত শুনতে-শুনতে ভাবছিলাম পুরোনো কথা। দমদম ক্যান্টনমেন্টের অফিসে আমার লুকোনো বহু টাকা ছিল। জাল নোট। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে নতুন পরিচয়ে নতুন জীবন-যাপন শুরু করলাম। লুকোনো জাল নোট গোপনে লোক ধরে বিক্রি করতে লাগলাম। আমার প্রতিশোধের মূলধন জমতে শুরু করল। তখন থেকেই আমি চোখ রাখতাম মণিকার ওপর। নরোত্তমের দলের ওপর। কলকাতায়। ডায়মন্ডহারবারে। সব জায়গায়।

তারপর একসময় নোট ছাপার নতুন ব্লক তৈরি করলাম। নতুন করে ছাপতে শুরু করলাম জাল নোট। আমি জানতাম, আমার নোট বাজারে ছাড়তে শুরু করলেই নরোত্তমের টনক নড়বে। ও আমার পিছনে ফেউ লাগাবে। তারপর দুনিয়া থেকে আমাকে সরিয়ে দেবে।

নোট আমি ছাড়তে শুরু করি অনেক দেরিতে। পুরোপুরি তৈরি হওয়ার পর। দীর্ঘ তিন বছর আমি জিউ কুমাইত-এর ট্রেনিং নিয়েছি। সকাল সন্ধে পরিশ্রম করেছি। নরোত্তমকে সে-কথা বললাম, তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেলাম মোমবাতিটার কাছে।

'নরোত্তম শর্মা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই—।'

মোমের শিখা লক্ষ করে চালিয়ে দিলাম এক ওপেন হ্যান্ড চপ। নিমেষে ছুটে যাওয়া হাতের পিছনে যে বায়ুশূন্যতা তৈরি হল, তাতে নিভে গেল আগুনের শিখা।

আমি হাসলাম : 'সেইদিন থেকেই মনে-মনে বলেছি, নরোত্তম শর্মা, এবারে শুরু হোক অম্বর রায়ের বদলার পালা। যখনই আমার মনটা নরম হয়ে আসত, তখনই জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরতাম আমার দুই স্তনবৃন্তে। তখন নতুন করে আবার

BanglaBook.org

মনে পড়ে যেত তোমার অত্যাচারের কথা। আরও ভাবতাম, এ আমার বাড়তি জীবন, থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী!'

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নরোত্তমের দিকে ডানপাশে আরও-একটা পাল্লাহীন দরজা ছিল। হয়তো পাশের ছোট কোনও ঘরে যাওয়ার। হঠাৎই সেদিক লক্ষ করে দৌড়তে শুরু করল নরোত্তম। একই সঙ্গে দয়ারাম ভার্গবও নড়তে শুরু করেছে।

মুহূর্তের মধ্যে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। শূন্যে এক লাফ দিয়ে দয়ারামের গলার ওপর গিয়ে পড়লাম। আমার পায়ের তলায় ওর শ্বাসনালী কাঁপছে। ওদিকে শুনছি বেড়া ভাঙার শব্দ। নরোত্তম পাশের ঘরের বেড়া ভেঙে পালাতে চেষ্টা করছে। দয়ারাম আমার জুতোর তলায় প্রতিরোধে ক্ষান্তি দিল। ওর ছটফটানি বন্ধ হল। এবার আমি ছুটলাম নরোত্তমের প্রস্থান-পথ লক্ষ করে। ডানহাতে খড়-কাটা ভারী বঁটি শক্ত মুঠোয় ধরা।

পাশের ঘরে কোনও আলো ছিল না। তবে দেখতে পেলাম জল ঢুকছে। কারণ একপাশের বেড়ার দেওয়াল ছত্রখান। সেই ফাঁক দিয়ে পালিয়েছে নরোত্তম। সুতরাং নিমেষে বেরিয়ে পড়লাম ঘরের বাইরে। অন্ধকার ও বৃষ্টিতে।

দূরে নজর চলে না। আমার সারা শরীর ভিজতে লাগল। শুধু কান পেতে রইলাম দূরাগত কোনও ছপছপ শব্দের জন্য।

শব্দটা একসময়ে কানে এল।

জঙ্গলের দিকে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা। অর্থাৎ নরোত্তম পালাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। আমিও অনুমানে ভর করে ছুটতে শুরু করলাম। নরোত্তম শর্মাকে আমি অতিরিক্ত আয়ু দিয়ে ফেলেছি।

ওর পায়ের শব্দ ক্রমশ আমার কানে স্পষ্টতর হচ্ছে। কিন্তু খেতি জমি পেরিয়ে ও জঙ্গলে ঢুকতেই শব্দটা একেবারে চাপা পড়ে গেল, একটু পরে আমিও ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে।

এবার শুরু হল শিকার শিকারি খেলা।

নরোত্তম শর্মা ভয়ে উদভ্রান্ত, ত্রস্ত। আর আমি ধীর, স্থির, প্রতিশোধে অবিচল। সুতরাং একটু পরেই ভিজে পাতার আড়ালে ছপছপ শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি সন্তর্পণে এগোতেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল পাতার ফাঁক দিয়ে সেই ঝলসানো আলো বর্শার ফলার মতো আমাদের বিদ্ধ করল।

কারণ আমার মুখোমুখি হাত পনেরো দূরত্বে দাঁড়িয়ে নরোত্তম শর্মা। ওই ক্ষণিকের আলোয় আবিষ্কার করলাম, আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল নরোত্তম। এবং ভয়ঙ্করভাবে কান ফাটিয়ে বজ্রপাতের শব্দটা এবার শোনা গেল।

আমি ততক্ষণে আন্দাজে ভর করে নরোত্তমকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি।

একটু পরেই দূরে একটা ভাঙা বাড়ির অবয়ব ও আলো দেখা গেল। নরোত্তমও সম্ভবত সেটা দেখতে পেয়েছে। কারণ পরবর্তী বিদ্যুৎচমকেই চোখে পড়ল ও সেদিক লক্ষ করে ছুটছে। আশ্রয়ের আশায়। সাহায্যের আশায়।

BanglaBook.org

মিনিটখানেকের তফাতে আমি সেই ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম, এবং আবিষ্কার করলাম, এ আমার সেই আগে দেখা ভাঙা কালীমন্দির।

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম।

মন্দিরের ভেতর যথারীতি প্রদীপ জ্বলছে। শ্মশানকালী আগের মতোই করালবদনা। ফুটো ছাদ দিয়ে কোথাও-কোথাও ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়লেও মায়ের মূর্তি অবিকৃত। এবং নরোত্তম শর্মা মা-কালীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। ওর ভিজে চুল চোখে-মুখে কপালে লেপ্টে আছে। পরনের জামা-প্যান্ট থেকে টপটপ করে জল ঝরছে। গলায় মালাটা নেই। হয়তো জঙ্গলে কোথাও ফেলে দিয়েছে।

নরোত্তম গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিল। হাত দিয়ে ভিজে চুল সরিয়ে দিল চোখ থেকে। তারপর চারপাশে তাকাল অনুসন্ধানী চোখে। সম্ভবত আত্মগোপনের কোনও জায়গার খোঁজে। অবশেষে খুঁজেও পেল।

মা-কালীর মূর্তির পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিল নরোত্তম।

কিন্তু আমি ওকে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নিংড়ে নেওয়া জামাটা ও ফেলে রাখল পায়ের কাছে। তারপর, উবু হয়ে বসে হাঁফাতে লাগল।

আমি সরে এলাম ফাটলের কাছ থেকে।

হাসিমুখ নিয়েই মন্দিরে ঢুকে পড়লাম। সামনেই মেঝেতে নরোত্তমের গা থেকে ঝরে পড়া জল। হাত থেকে খড়-কাটা ক্লীভার নামিয়ে রেখে দু-হাত জোড় করে প্রণাম করলাম মাকে। তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে গেলাম মূর্তির পিছনে। নরোত্তম তখন বসে ঠান্ডায় কাঁপছে। বৃষ্টির শব্দ, বাজ পড়ার শব্দ বোধহয় আমার পায়ের শব্দকে অশ্রুত করেছিল ওর কাছে, কারণ বাঁ-হাতে চুলের মুঠি টেনে ধরে ওকে এক হ্যাঁচকায় দাঁড় করাতেই ও ভীষণভাবে চমকে উঠল। কেঁপে উঠল ওর শরীরটা। কিন্তু পরমুহূর্তেই, আমার সঙ্গে যুঝতে গেল। দু-হাত দিয়ে চেপে ধরল আমার গলা।

আমার হাসি পেল। এ-অম্বর সে-অম্বর নয়। ও ভুল করেছে। সুতরাং ডানহাত মুঠো করে বুড়ো আঙুল দিয়ে ওর পাঁজরার ঠিক নীচে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করলাম। ওর মুখ হাঁ হল। চেষ্টার চূড়ান্ত করল বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাস-প্রশ্বাসকে সচল করতে। আমার গলা ছেড়ে নিজের পেট চেপে ধরল। আমি ওকে চুলের মুঠি ধরে টানতে-টানতে মা-কালীর মূর্তির সামনে নিয়ে এলাম। ঝুঁকে পড়ে ডান হাতে তুলে নিলাম মায়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকা একমুঠো সিঁদুর। নরোত্তমের কপালে ও গলায় মাখিয়ে দিলাম। ও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। চিৎকার করে কেঁদে উঠল। নিচু হয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরল। হাউহাউ কান্নায় বলে উঠল, 'অম্বর, অম্বর, আমাকে ছেড়ে দাও! ছেড়ে দো মুঝে! মুঝে মাফ কর দো!'

চুলের মুঠি ধরে ওকে টেনে দাঁড় করালাম।

'মা-কালী তোকে মাফ করবে—' বলে ওর প্যান্টের বোতামগুলো এক টানে ছিঁড়ে ফেললাম। ওকে নগ্ন করতে বেশি সময় লাগল না। সিঁদুর মাখা অবস্থায় ওকে নিয়ে গেলাম হাড়িকাঠের কাছে। বহুদিন পর আজ এটা ব্যবহার হবে। ওর ডান পায়ের হাঁটুতে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি মারলাম। ওর শরীরটা পড়ে গেল মেঝেতে। আর আমি চুল ধরে রাখার ফলে মাথাটা শূন্যে। সেই অবস্থাতেই হাড়িকাঠের খাড়কাঠ খুলে নিলাম।

BanglaBook.org

বাইরে আবার বাজ পড়ল। বৃষ্টির তেজও কমেনি। সেইসঙ্গে আমার কানে ভেসে আসছে ঢাকের মাতাল করা বাজনা। ধুনোর নেশা ধরানো গন্ধ।

নরোত্তম বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদছে। চিৎকার করছে, 'অম্বর, অম্বর, আমাকে বাঁচতে দাও। মেরো না! প্লিজ! আওর এক মওকা মুঝে দো! ম্যাঁয় তুমহারী পাওঁ পড়তা হুঁ—।'

ওর চোখের জলে আমার পা ভেসে যাচ্ছে। চার বছর আগেকার অম্বর রায়ের কথা আমার মনে পড়ল, মনে পড়ল মণিকার কথা। এক ঝটকায় ওর মাথাটা টেনে হাড়িকাঠে বসিয়ে দিলাম। চুলের মুঠি ছেড়ে বাঁ-পায়ে চেপে ধরলাম ওর মাথাটা। তারপর আড়কাঠ আবার লাগিয়ে দিলাম। আমার চোখে জল নেই। রক্তের চেয়ে অশ্রুর দাম অনেক বেশি।

নরোত্তমের গোটা দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে হাড়িকাঠের গোড়ার মাটি, পড়ে থাকা ফুল।

কিছু ফুল তুলে ওর চুলের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। বুকের ভেতরে ঢাকের বাজনা এখন আরও উত্তাল, ধুনোর গন্ধ ফুসফুসকে অবশ করে তুলছে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম খড়-কাটা ক্লীভারটা। হাঁটু গেড়ে বসলাম হাড়িকাঠের সামনে।

নরোত্তমের দেহ সামান্য কাঁপছে। ও আর প্রতিরোধের চেষ্টা করছে না, অনুনয় করছে না। ও জানে, করে লাভ নেই। অম্বর রায়ও প্রতিরোধ করে, অনুনয় করে, লাভ পায়নি।

মা-কালীর চোখে চোখ রাখলাম। কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলাম। বৃষ্টির শব্দ বাইরে অবিচল। রাত এখন কত কে জানে। ঢাকের বাজনা ও ধুনোর গন্ধে মাতাল বাতাবরণে কোথা থেকে যেন ভেসে এলো বলির মন্ত্রপাঠের মন্দ্র উচ্চারণ :

'পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
বলিস্তে পূজায়াময়ি বিতরতাং মর্তবসতাং।

তারপর বুক কাটিয়ে অম্বর রায় ও মণিকা রায়ের জ্বালা-যন্ত্রণা-হতাশা যোগ করে এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলাম, 'মা! মা! মাগো—।'

আমার ডানহাতে ধরা ধারালো ক্লীভার আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল শূন্যে...।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গোলাপ বাগানে ঝড়

এক

ঘটনা যখন ঘটে তখন বিজন বাড়িতে ছিল না।

থাকার কথাও নয়। কারণ, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই বিজন চৌধুরী চাকরি করে, অফিসে যায়। ফেরে কখনও সাতটা, কখনও-বা রাত আটটা। প্রথম-প্রথম কবিতা অনুযোগ করত এই দেরি করে ফেরা নিয়ে, পরে ধীরে-ধীরে ব্যাপারটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। বিজন কবিতাকে বলত অফিসের কাজের চাপ। কবিতা হাসত। ও বুঝত সব। কারণ বিয়ের আগে থেকেই ও বিজনকে চেনে। বিজন শুধু যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তা নয়, ও হচ্ছে কম্পিউটার পাগল। ও একবার কম্পিউটারের সামনে বসলে বিশ্বজগৎ ভুলে যায়। ওর চাকরিটাই ওর একমাত্র নেশা। অফিসে সবার কাজ শেষ হলেও বিজনের কাজ শেষ হতে চায় না। কারণ কম্পিউটার নিয়ে ওর নানান 'খেলার' যে কোনও শেষ নেই।

এই নেশা বিজন ধরিয়ে দিতে চায় ওর দশ বছরের ছেলে অপুকেও। গত বছরেই জন্মদিনে অপুকে ও একটা পকেট কম্পিউটার উপহার দিয়েছে। কবিতা রাগ করলেও বাবা আর ছেলে মজা করে হেসেছে। অপুর দিদি গোলাপ অবশ্য মায়ের দলে—তবে শুধু কম্পিউটারের ব্যাপারেই। এ ছাড়া বাকি সবকিছুতেই ও বিজনকে আঁকড়ে ধরে। সামনের বছরে গোলাপ স্কুল ফাইনাল দেবে, কিন্তু আচার-আচরণে এখনও যেন সেই ছোট্ট খুকিটি। একজোড়া বেণি দুলিয়ে রোজ ঝগড়া, খুনসুটি, বাবা-মায়ের আদরের ভাগ নিয়ে লড়াই।

ঘটনাটা ঘটে গেল ঠিক সন্ধে সোয়া ছ'টা নাগাদ।

যারা এসেছিল তারা যে বিজনের রোজকার আনাগোনার হিসেব রাখত তাতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া হয়তো আরও অনেক খবর রাখত—কে জানে!

দরজায় কলিংবেলটা বেজে উঠেছিল খুব চেনা ঢঙে। যেমন করে বিজন বাজায়। এই শব্দের ঢঙটুকুও কি নকল করেছিল ওরা?

ঘরে টিভি চলছিল। তাই দরজা খুলতে একটু দেরি হয়েছিল কবিতার। গোলাপও টিভি দেখছিল, আর একটু আগে কিনে আনা পটাটো চিপস ঠোঙা থেকে আলতো করে তুলে-তুলে মুখে দিচ্ছিল। অপু একটু দূরে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে বসে পকেট কম্পিউটার নিয়ে কীসব খেলা করছিল। টিভি-র দিকে ওর মন ছিল না। এখন গরমের ছুটি চলছে। নইলে ৮টা বাজলেই দু-ভাইবোন নিয়ম করে পড়তে বসে যায়। মা এই নিয়মের নড়চড় হতে দেয় না।

পাশের ঘরে ওদের রোজকার ঠিকে কাজের লোক রাখীর মা ঘর মুছছিল। কবিতা মোড়া থেকে উঠে দরজার দিকে যেতে-যেতে চেঁচিয়ে রাখীর মাকে তাড়া দিল জলদি কাজ সেরে ফেলার জন্য। তারপর দরজার কাছে পৌঁছে হাতের পিঠ দিয়ে মুখটা একবার

BanglaBook.org

মুছে নিয়ে দরজা খুলল।

ভারী বুটের একটা লাথি ছিটকে এসে পড়ল কবিতার বুকে। কোনও চিৎকার করার সুযোগ ও পেল না। সটান ঠিকরে পড়ল রান্নাঘরের কাছে মেঝেতে। দেওয়ালে মাথাটা ঠুকে গেল সজোরে। তিনটে লোক ঢুকে পড়ল ফ্ল্যাটের ভেতরে। সদর দরজাটা বন্ধ করে খিল এঁটে দিল।

লোক তিনজনের পোশাকে কোনও বৈচিত্র্য নেই। তবে মুখগুলো মোটেই সাধারণ নয়। পোড় খাওয়া। নানা কুকাজের ছাপ সেখানে। ফ্ল্যাটে ঢুকেই ওরা তিনজনে পকেট থেকে ভুরু আঁকার কালো পেনসিল বের করে নিজেদের মুখের যেখানে-সেখানে আঁকিবুকি কেটে নিল। চোখের পলকে তিনটে মুখ ভুতুড়ে হয়ে গেল। ওদের একজন কবিতার ওপরে হামলে পড়ে জামা-কাপড় ধরে টানাটানি করতে লাগল। আর বাকি দুজন ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল বসবার ঘরে।

ওদের দুজনকে দেখে গোলাপ আর অপু ভয়ে পাথর হয়ে গেল। সমস্ত চিৎকার আটকে গেল গলায়।

লোক দুটো নিজেদের মধ্যে কয়েকটা কথা বলল। কথার শেষে একজন বলল, 'বড়সাহেব যা ইচ্ছে তাই করতে বলেছে।' বলে ভয়ঙ্করভাবে হাসল সে। অপু ভয়ার্ত চোখে লোক দুটোকে দেখছিল।

এবারে দুজনের একজন পকেট থেকে একটা লিকলিকে ছুরি বের করে গোলাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আর অন্যজন টিভি-র কাছে গিয়ে শব্দটা কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিল। তারপর ঘরের জানলা ক'টা দ্রুত হাতে বন্ধ করে দিয়ে ছুটে গেল অপুর কাছে। বুট-পরা পায়ে সপাটে এক লাথি মারল ওর রগে। ফট্ করে একটা বিশ্রী শব্দ হল। লোকটা তখন অপুর পড়ে যাওয়া নরম দেহটার ওপরে লাফাতে লাগল। আর, একই সঙ্গে মুখ দিয়ে নানারকম বিজাতীয় শব্দ করতে লাগল। লোকটার কালো রঙে আঁকিবুকি কাটা মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিল।

টিভি-র আওয়াজ কয়েক পরদা চড়া হতে এবং নিজের কাজ শেষ করে রাখীর মা বসবার ঘরের দরজায় এসেছিল। এবং ওই পর্যন্তই। মহিলার মুখটা হাঁ হয়েছিল একটা আর্ত চিৎকার শুরু করার জন্য। কিন্তু গোলাপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা হাতের লিকলিকে ছুরি সামনে বাড়িয়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাখীর মায়ের দিকে। পেটের মধ্যে ছুরিটা আমূল গেঁথে দিয়ে দু-বার হ্যাঁচকা মারল। রাখীর মা হাঁ-করা মুখ দিয়ে বাতাস টানতে লাগল। ওর পেট দিয়ে তখন বাতাস ঢুকছে। আর রক্তের ছিটেয় ভরে গেছে আততায়ীর ভুতুড়ে মুখ ও নীল কুশ শার্ট।

রাখীর মা নিঃশব্দে টলে পড়ে যেতেই ঝুঁকে পড়ে ছুরিটা ওর শাড়িতে মুছে নিল লোকটা। আর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছল নিজের মুখ। তারপর চোখ কুঁচকে ফিরে তাকাল গোলাপের দিকে। ওর সঙ্গী তখন অপুকে ছেড়ে গোলাপকে পিছমোড়া করে ধরেছে, আর ওর বিনুনি করা চুলের গন্ধ শুঁকছে।

ছুরি উঁচিয়ে আততায়ী এগিয়ে এল গোলাপের কাছে। খুব কাছে।

এই প্রথম গোলাপের আতঙ্কবিকৃত ঠোঁট চিরে একটা ডুকরে ওঠা শব্দ বেরিয়ে এল। টিভি-তে তখন কী একটা নাচগানের প্রোগ্রামের হই-হল্লোড় চলছে।

BanglaBook.org

গোলাপকে যখন দুজন স্যান্ডউইচের মতো চেপে ধরেছে, তখন প্রথম লোকটা বসবার ঘরে এসে ঢুকল। একই সঙ্গে ঢুকল কবিতা। কারণ ওর অচৈতন্য দেহটাকে চুলের গোছা ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে এসেছে ওর আক্রমণকারী। লোকটা শব্দ করে হাঁকাচ্ছিল।

কবিতার শরীরে জামা-কাপড় বলতে প্রায় কিছুই নেই। ফরসা মুখে অজস্র কামড়ের দাগ। বুকে-পেটে-উরুতেও একই ধরনের চিহ্ন। দেখে বোঝার উপায় নেই ও বেঁচে আছে, না মরে গেছে।

কবিতাকে ছেড়ে দিয়ে দুটো হাতের তালু নিজের মুখে ঘষল লোকটা। কালো দাগগুলো আরও বেবড়ে গেল। তারপর সে খিকখিক করে হেসে ছিটকে চলে এল দুই সঙ্গীর কাছে। ওর প্যান্টটা কোমর থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বাঁ-হাতে সেটাকে খামচে ধরে বলল, 'শালা তিনটে বোতামই ছিঁড়ে গেছে।'

অন্য দুজন ততক্ষণে খামচাখামচি করে গোলাপের জামা-প্যান্ট সবই প্রায় খসিয়ে এনেছে। ওরা কখনও বসে কখন দাঁড়িয়ে গোলাপের শরীরের স্বাদ নিচ্ছিল, ঘ্রাণ নিচ্ছিল, আর যথেচ্ছভাবে স্পর্শ করছিল ওকে। তৃতীয় জন এসে হাজির হতেই ষোলোকলা পূর্ণ হল যেন। ওরা তিনজন অশ্রাব্য মন্তব্য করতে লাগল, উল্লাসের চাপা চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে। গোলাপ জড় পদার্থের মতোই ঘাঁটাঘাঁটি হচ্ছিল ওদের হাতে। ওর দম যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পেটের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে বুঝি, আর সমস্ত অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গেছে।

লোকগুলো নিজেদের জুতো ও প্যান্ট খুলে ফেলেছিল কখন যেন। তারপর গোলাপকে নিয়ে ওরা হরির লুট শুরু করে দিল ঘরের মধ্যে। গোলাপ কখনও কারও কোলে, কখনও কারও কাঁধে, আবার কেউ বা ওকে টেনে শুইয়ে পাশবালিশ করে ফেলছে মর্জিমতো।

গমগমে টিভি-র আওয়াজে মুখে কালি-মাখা তিনটে ভুতুড়ে লোকের কুৎসিত উৎসবের হুল্লোড় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। ওরা শুয়ে বসে গড়িয়ে যা-খুশি-তাই করছিল গোলাপকে নিয়ে। ওকে ব্যবহারের মধ্যে আইনকানুনের কোনও বালাই ছিল না।

মিনিট দশেকের মধ্যেই কবিতার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কেমন যেন লালচে ধোঁয়াশার মধ্যে দিয়ে ও গোলাপকে দেখতে পেল।

প্রথমে কবিতার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝি দুঃস্বপ্ন। কিন্তু দুঃস্বপ্নটা কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছিল না। বরং ক্রমেই আরও বীভৎস হয়ে উঠছিল। গলা দিয়ে একটা চিৎকার বের করতে চাইল কবিতা। কিন্তু চিৎকারের বদলে মুরগির ডাকের মতো 'কোঁক-কোঁক' শব্দ বেরিয়ে এল শুধু। সারা শরীরে তীব্র যন্ত্রণা ও বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট নিয়ে কোনওরকমে উঠে বসল ও।

আর তখনই অপুকে ও দেখতে পেল।

এই প্রথম একটা সত্যিকারের চিৎকার করতে পারল কবিতা। কিন্তু টিভি-র শব্দে চিৎকারটা তেমন জোরালো শোনাল না। তবে ওর দিক থেকে চিৎকারটা শোনা মাত্রই তিন শয়তান ঘুরে তাকাল। যে-লোকটা কবিতাকে প্রথম আক্রমণ করেছিল সে হেসে উঠল খিকখিক করে। বলল, 'মাগীর আবার রস জেগেছে।' তারপর চোখের পলকে

BanglaBook.org

চলে এল কবিতার কাছে। কবিতা তখন দ্বিতীয় চিৎকারটা শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই লোকটা এক ঝটকায় ওর মাথাটা ধরে সজোরে নামিয়ে দিল মেঝের ওপর। একটা নারকেল মাটিতে আছড়ে পড়ল যেন। অন্তত শব্দটা শোনাল সেইরকমই। তারপরই কবিতার দেহ পাথর। তখন লোকটা খিস্তি করে একদলা থুতু ছেটাল কবিতার মুখে। এবং আবার ফিরে গেল গোলাপের কাছে।

এমনসময় মিষ্টি শব্দের লহরি তুলে টেলিফোন বেজে উঠল।

লোক তিনটের যৌনচক্র থেমে গেল সহসা। কয়েক মুহূর্ত ওরা স্থির। টেলিফোনটা কয়েকবার বেজে নিস্তব্ধ হল। তখন ওদের একজন বলল, 'চল, কেটে পড়ি।'

আর-একজন বলল, 'দাঁড়া, তার আগে ঘরের বারোটা বাজাই। ঠিক মতো কাজ না হলে বস্ নোট দেবে না।'

তৃতীয় জন বলল, 'এই মেয়েটাকে কী করবি? জিন্দা রাখবি, না খালাস করে দিবি?' লিকলিকে ছুরিটা উঠে এল তার হাতে।

কিন্তু প্রথম জন বলে উঠল, 'এটার আর-কিছু নেই। ছিবড়ে হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয় জন জিগ্যেস করল, 'ওস্তাদ, মালটা বোবা নাকি? তখন থেকে একটা কথা বেরোল না মুখ দিয়ে!'

প্রথম জন খিকখিক করে হেসে বলল, 'মস্তির চোটে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে।'

তারপর সে এক আচমকা ধাক্কা মারল গোলাপকে। গোলাপ ছিটকে গিয়ে পড়ল অপুর গায়ের ওপরে। পড়ে নিথর হয়ে রইল। ওরা তিনজন দ্রুত হাতে প্যান্ট পরে নিয়ে নিজেদের বেশবাস ঠিকঠাক করে নিল। তারপর গোটা ফ্ল্যাট ঘুরে সব জিনিসপত্র ওলটপালট করতে লাগল। বিছানাপত্র, টেবিলের নানা জিনিস, বই-খাতা, কাগজপত্র সব যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দিতে শুরু করল।

একজন হঠাৎ চলে গেল বাথরুমে। একটু পরেই এক বালতি জল হাতে ফিরে এল। সেটা হুড়হুড় করে ঢেলে দিল রাখীর মায়ের মৃতদেহের ওপরে। রক্ত ধোয়া লালচে জল গড়িয়ে যেতে লাগল মেঝের নানান দিকে।

এইভাবে অন্তত পনেরো বালতি জল ওরা ঢেলে দিল বসবার ঘরে, শোওয়ার ঘরে, রান্নাঘরে, ডাইনিং স্পেসে, এমনকী ফ্ল্যাটের দরজার সামনের ছোট্ট অলিপথেও। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে জল দিয়ে ঘষে-ঘষে মুখের কালির দাগগুলো তুলে ফেলল। মুখগুলো পরিষ্কার হয়েছে কি না সেটা পরখ করে নিল বসবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। তারপর ঘরের চারদিকে একবার সতর্ক নজর বুলিয়ে নিয়ে ওদের একজন বলল, 'চল, কাজ ফিনিশ—।'

ওরা জল মাড়িয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে এল। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। আপনা থেকেই লক হয়ে গেল সেটা। টিভি-র আওয়াজ বাইরে থেকেও বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

অন্ধকার রাস্তায় নেমে একজন জিগ্যেস করল, 'ঘরে অত জল ঢাললি কেন?'

আর-একজন বলল, 'তোর মাথায় কিস্সু নেই। ওই থইথই জলের মধ্যে পুলিশ বা পুলিশি কুত্তা কোনও ক্লু পাবে না।'

BanglaBook.org

বাকি দুজন তখন তার বুদ্ধির তারিফ করল।

একটু বেশি আলোকিত চওড়া রাস্তায় পৌঁছে ওরা তিনজন তিনদিকে চলে গেল। যেমন ভূতের মতো ওরা আবির্ভূত হয়েছিল বিজনের ফ্ল্যাটে, তেমনি ভূতের মতো ওরা মিলিয়ে গেল রাতের আলো-আঁধারে।

দুই

বিজন যখন অফিস থেকে বেরোল তখন প্রায় পৌনে সাতটা। বলতে গেলে তাড়াতাড়িই আজ বেরোতে পেরেছে ও। বাসস্টপে পৌঁছতে গেলে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হয় ওকে। সেই হাঁটা-পথের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল।

ক'দিন ধরে বেশ গুমোট পড়েছিল। পথে-ঘাটে অফিসে সবাই বলাবলি করছিল, আজকালের মধ্যেই বৃষ্টি হবে। এই মুহূর্তে সে-কথাই সত্যি হল। আর এই আশীর্বাদের মতো বৃষ্টিতে যে ভিজতে ইচ্ছে করবে সে আর আশ্চর্য কী! সুতরাং ভিজে-ভিজেই হাঁটতে থাকল বিজন। দেখল, রাস্তায় আরও অনেকে ওর মতোই ভিজছে। বিজনের একটা পুরোনো কথা মনে পড়ায় অন্যমনস্ক হাসির ছোঁয়া খেলে গেল ঠোঁটে। অনেক বছর আগের কথা। তখন কবিতাকে নিয়ে ও ভিক্টোরিয়ায় বসত। একদিন মাঠে বসে আছে, হঠাৎই আকাশে কয়েকবার গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ উঠেই বৃষ্টি। ওরা দুজনে উঠে পড়ে মাথা বাঁচাতে গাছতলা খুঁজতে গিয়ে দেখে প্রায় সব আশ্রয়ই হাউসফুল। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করার পর বিজন 'ধুত্তেরি' বলে কবিতাকে হাত ধরে টেনে ঘাসের ওপরে বসিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'যদি ভিজতেই হয় তাহলে এইভাবে গল্প করতে-করতে আনন্দে ভিজব।' কবিতা হেসে বলেছিল, 'পাগল!' তারপর বসে পড়েছিল বিজনের পাশে। ওকে পাগল বলাটা কবিতা এখনও ছাড়েনি। প্রায় সব্বাইকেই বলে, 'ওর কথা বাদ দিন। ও একটা আস্ত পাগল!' এমনকী গোলাপ-অপুকেও বলে, 'তোদের বাবাকে তো কমদিন দেখছি না! বরাবরই এমনি পাগল!' একদিন গোলাপ চটা করে বলে উঠেছিল, 'মা, বাবাকে বরং একেবারে রাঁচিতেই পাঠিয়ে দাও। সেরে-সুরে ফিরে আসুক।' তখন কবিতা গলার স্বর অন্যরকম করে বলেছিল, 'আমার পাগলই ভালো।' পরে বিজনকে আড়ালেও বলেছে, 'তোমার পাগলামি যেন কখনও না সারে। মাঝে-মাঝে রাগ হয় ঠিকই, তবে খারাপ লাগে না। জানো, চারতলার সুনন্দাদির ননদ তনুকা বলছিল, বউদি, বিজনদার মতো একটা পাগল বর জুটিয়ে দাও না, ভাই।'

বিজন হেসে ফেলল, আর একইসঙ্গে ওর খেয়াল হল বাসস্টপে একগাদা লোকের মাঝে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর বৃষ্টিও ধরে গেছে। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে বিজন ভাবল, সত্যিই কি ওর মধ্যে কোনও পাগলামির ছোঁয়া আছে? বিজনের মা শেষ বয়েসে পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাখি দেখলেই শুধু চেঁচিয়ে ডাকত, 'আয়, কাছে আয়!' বিজন তখন শিবপুরে বি. ই. কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ছে। বিজনের বাবা হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় ছোট একটা লেদ কারখানা চালাতেন। আর ওর ছোটভাই সুজন তখন পড়ত ক্লাস ফোরে। মাকে সারিয়ে তোলার জন্য ওরা কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত পারেনি। ওই পাখি-পাগল মানুষটা সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোন ফাঁকে গিয়ে যেন রেললাইনে মাথা দিয়েছিল! বিজনের বেশ মনে পড়ে, ওর বাবা রাতারাতি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ওদের বাড়িতে একটা পোষা চন্দনা পাখি ছিল। বিজন পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে প্রায়ই ও মাকে স্বপ্নে দেখত : মা রেললাইনে দাঁড়িয়ে পাখি ডাকছে, আর একটা বিশাল ট্রেন কালো ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মায়ের দিকে ছুটে আসছে।

খুব কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে বিজনকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতে হয়েছিল। ছোটভাই সুজন নানা আড্ডায় পড়ে পড়াশোনায় বেশিদূর এগোতে পারেনি। বাবার কারখানাটা এখন ও-ই চালায়। ওরা এখনও টিকিয়াপাড়ার সেই বাড়িতেই আছে। বিজন পার্ক স্ট্রিটের কম্পিউটার কর্পোরেশন কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার বছরখানেক পরেই কবিতাকে বিয়ে করে টালার দিকে এক ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে চলে আসে। পুরোনো বাড়িতে মায়ের স্মৃতি ওর গলা টিপে ধরত। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসত। তাই বাবার অনুমতি নিয়ে, সুজনকে বুঝিয়ে ও আলাদা হয়েছে সংসার থেকে। নতুন বাতাস ওকে বাঁচালেও মা কিন্তু ওকে পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি। পাখি দেখলে বিজনেরও কেন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করে।

মা মারা যাওয়ার পর বাবা বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোতেন না। কারখানা চালাতে গেলে যেটুকু দরকার শুধু সেটুকুই। এখন বাবা সত্যিকারের বৃদ্ধ হয়েছেন। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকেন, আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লেখেন। এই তাঁর এক নেশা। বিজন দেখা করতে গেলে বাবা উচ্ছ্বসিত হন না। এমনকী অপু-গোলাপ-কবিতাকে দেখলেও না। বিজন জানে, এটা বাবার বিরূপ মনোভাবের লক্ষণ নয়, বাবা এখন এইরকমই।

আলাদা সংসার পাতলেও বিজন প্রতি মাসে টাকা পাঠাত সুজনের নামে। বছর সাতেক হল সুজন জোর করে সেটা বন্ধ করেছে। বলেছে, 'দাদা, তুমি অনেক করেছ। এখন কারখানা আমি ভালোই চালাচ্ছি। মাত্র দুজন তো মানুষ। দিব্যি চলে যায়। তুমি এভাবে আর টাকা পাঠিয়ো না, প্লিজ। আর তোমার কখনও হঠাৎ টাকার দরকার পড়লে জানিয়ো। সঙ্কোচে মুখ বুজে থেকো না।'

সুজন সময় পেলে মাঝে-মাঝেই আসে বিজনের টালার বাড়িতে। খেলনা আর চকলেট নিয়ে আসে গোলাপ-অপুর জন্য।

দেখতে-দেখতে কতগুলো বছর গড়িয়ে গেল। অনেক স্মৃতিই ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিন্তু মা যে এখনও কেন পাখি ডেকে যায় বিজন জানে না। আর ওর নিজের খামখেয়ালিপনা, পাগলামি? এখনও রেললাইন দেখলে বিজনের সেখানে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। নিজেদের ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে উঠলে মনে হয়, লাফ দিই? আর কম্পিউটারের কী-বোর্ডের বোতাম টিপতে-টিপতে মনে হয়, যদি কম্পিউটার হয়ে যেতাম?

আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। তক্ষুনি বিজন চৌধুরী নামের এই পাগলটার মনে হল, আজ চাইনিজ খাবার কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়? গোলাপ-অপু-কবিতা একেবারে চমকে যাবে!

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বাসস্টপ ছেড়ে পাগলটা আবার পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটা

BanglaBook.org

দিল। একরকম ফিরেই চলল অফিসের দিকে। ওর অফিসের ঠিক পাশেই একটা ভালো চাইনিজ রেস্তরাঁ আছে। আশ্চর্য, অফিস থেকে বেরোনোর সময় কেন যে খাবার কেনার কথা মনে হয়নি! তাহলে খামোকা একই পথ দু-বার হাঁটতে হত না। পাগল! নিজেই নিজেকে বলল বিজন।

প্রতিবেশীদের ডেকে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি। বিজন গোড়া থেকেই দুম-দুম করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল আর কবিতা-গোলাপ-অপুর নাম ধরে চিৎকার করছিল। ওর দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। এমনিতে দরজা বন্ধ করে ওরা তিনজনে যে কোথাও না যেতে পারে এমন নয়। কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে ভেসে আসা টিভি-র জোরালো আওয়াজটাই সমস্ত অঙ্কের হিসেব ওলটপালট করে দিয়েছে।

দরজা ভেঙে পড়তেই একটা আঁশটে গন্ধ বিজনের নাকে এসে ঝাপটা মারল। গা-টা কেমন গুলিয়ে উঠল ওর। ততক্ষণে বিজনকে পেরিয়ে দু-তিনজন ঢুকে পড়েছে ফ্ল্যাটের ঘরগুলোয়।

ওদেরই কেউ হয়তো বীভৎস চিৎকারটা করে থাকবে। সঙ্গে-সঙ্গে বিজনের মাথার ভেতরে সুস্থির ও স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনার স্নায়ুগুলো পটপট করে ছিঁড়ে গেল। খাবারের প্যাকেট ছিটকে পড়ল হাত থেকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অদ্ভুত জান্তব চিৎকার।

জলে জলাকার ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে সবই দেখল বিজন। ওর চোখ দেখলেও মন তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। হাত-পা সব অসাড়। মস্তিষ্ক অবশ।

স্লো-মোশনে গড়িয়ে যাওয়া নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো বিজন সবকিছু দেখতে পাচ্ছিল।

কেউ একজন টিভি বন্ধ করে দিল। আর-একজন দুটো চাদর নিয়ে এসে কবিতা ও গোলাপের দেহ গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল। কে যেন আর. জি. কর হাসপাতালে ফোন করছিল। একজন চেঁচিয়ে কাকে যেন বলে গেল সাইকেল নিয়ে সে থানায় যাচ্ছে। হাসপাতালে ফোন করার পর দ্বিতীয় ফোন গেল লালবাজারে। দরজার দিক থেকে হুড়োহুড়ির শব্দ আসছিল। কৌতূহলী জনতার মুখের ওপরে কয়েকজন ভাঙা দরজাটাই জোর করে আটকে ধরল। দুজন এসে বিজনকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। আস্তে-আস্তে একজন বলল, 'ভেঙে পড়লে চলবে না, চৌধুরী। এখন মন শক্ত করে রাখাটাই জরুরি কাজ।'

সঙ্গে-সঙ্গে যেন বিজনের বুকের ভেতরে কেউ একটা অলৌকিক সুইচ টিপে দিল। ও দু-হাতে মুখ চেপে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। এরকম বুক ফাটা কান্না ওর শরীরের ভেতরে যে জমা থাকতে পারে বিজন তা ভাবতে পারেনি। তিন-চারজন কাছে এসে ঘিরে ধরে বিজনকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। পাগলটা কাঁদতেই থাকল।

একটু পরেই স্থানীয় ডাক্তার ডক্টর বোস এসে হাজির হলেন। বিজন তাঁকে চেনে। অসুখ-বিসুখে দু-একবার তাঁকে দেখিয়েছে ওরা। ডক্টর বোস ঝুঁকে পড়ে যেই কবিতাকে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন অমনি বিজনের মাথার ভেতরে একসঙ্গে একলক্ষ হাউইবাজি

BanglaBook.org

জ্বলে উঠল। ও চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল আচমকা। তারপর হাহাকার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল কবিতার ওপরে। কিন্তু তার আগেই দু-তিনজন ধরে ফেলল ওকে। বিজন পাগলের মতো দাপাদাপি করতে লাগল ওদের হাতের বাঁধনে। ওর গলা ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছিল। তখন চার-পাঁচজন ওকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল ফ্ল্যাটের বাইরে। সেখান থেকে সোজা চারতলায়। যেতে-যেতেই বিজন শুনতে পেল, অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ, দুই-ই এসে গেছে। বিজন তখনও কাঁদছিল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে তেমন কোনও শব্দ বেরোচ্ছিল না। ঝাপ্‌সা চোখে ও দেখতে পেল চারতলার ফ্ল্যাটের খোলা দরজায় সুনন্দা ও তনুকা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও খেয়াল করল, যে-ক'জন ওকে ধরে ওপরে নিয়ে এসেছে তার মধ্যে একজন সুনন্দার স্বামী দীপেন।

দীপেনের ফ্ল্যাটের ভেতরে নিয়ে গিয়ে একরকম জোর করেই ওরা বিছানায় শুইয়ে দিল বিজনকে। সুনন্দা বিজনের ফোলা চোখে ভিজে তোয়ালে বুলিয়ে দিল। আর তনুকা ও দীপেন দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিল ওকে। দীপেন বলল, 'ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নিন। ডক্টর বোস দিয়েছেন। ওখানে এখন আপনার কিছু করার নেই। আমরা সব দেখছি।'

ট্যাবলেট দুটো খাওয়ার একটু পরেই বিজনের চোখে আবেশ নেমে এল। ওর চোখ অসম্ভব জ্বালা করছিল। বুক কাঁপছিল হাপরের মতো। তন্দ্রায় ঢলে পড়তে-পড়তে ও দেখল, মা হাতছানি দিয়ে পাখি ডাকছে। বিজন যদি এই মুহূর্তে পাখি হয়ে যেত! পাখিদের তো শোক-তাপ বলে কিছু নেই। পাখির চোখ দিয়ে জলও পড়ে না। মায়ের কথা ভাবতে-ভাবতেই বিজন একদিন কবিতাকে জিগ্যেস করেছিল, 'আচ্ছা, বলো তো, মা কেন পাখি ডাকত? পাখিদের কাছে মায়ের কি কিছু বলার ছিল?'

কবিতা হেসে বলেছিল, 'তোমার যেমন পাগলের মতো কথা। কোনও পাগল কি তার পাগলামির কারণ বোঝে? তাহলে তো তার অসুখটাই সেরে যেত।'

ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে বিজনের মনে হল, ও পাখি হয়ে যাচ্ছে, আর মা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তিন

দোলনায় দুলছিল বিজন। হঠাৎই তার শিকল ছিঁড়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে বিজন ছিটকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলো হাত ওকে আগলে ধরল।

এক ঝটকায় ঘুম ভেঙে গেল বিজনের। দীপেন ও সুনন্দা ওকে ডাকছে, কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে। বিজন ঘুমচোখে উঠে বসল। সুনন্দা ওর চোখে জলের ছিটে দিতে লাগল। আর দীপেন বলল, 'নিচে চলুন, পুলিশ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে বিজন বিভ্রান্তের মতো জিগ্যেস করল, 'কবিতা, অপু, গোলাপ...।'

'নীচে চলুন, ওরাই সব বলবে।' কথা বলার সময় দীপেনকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সুনন্দাও বিজনের চোখে তাকাতে পারছিল না।

BanglaBook.org

দীপেনের সঙ্গে নীচে নামতে-নামতে বিজন হাতঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে বারোটা। বিজন বাড়ি ফেরার পর প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা কেটে গেছে। তবু এখনও ওর মনে হচ্ছে, নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকলে ও আবার সেই একই দৃশ্য দেখবে। বিজনের মাথা ঝিমঝিম করছিল। ফ্ল্যাটের ভাঙা দরজার কাছে মোতায়েন হয়ে রয়েছে পুলিশ প্রহরী। বিজনের কাঁধে ছোট চাপ দিয়ে দীপেন বলল, 'ভেতরে যান, পুলিশ আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চায়—।'

দীপেন চলে গেল। আর বিজন সন্তর্পণে পা ফেলে ফ্ল্যাটে ঢুকল। ওর বুকের ভেতরটা টিপ-টিপ করছিল।

ফ্ল্যাটের ভেতরে অনুপুঙ্খ তদন্তের কাজ তখনও শেষ হয়নি। অন্তত চার-পাঁচজন সাদা পোশাকের লোক বসবার ঘর ও শোওয়ার ঘরের নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে-বসে-হুমড়ি খেয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে তাদের অনুসন্ধানের কাজ করে চলেছে। তবে ঘরগুলো এখন আর লণ্ডভণ্ড নেই—অনেক গোছানো।

বিজনকে দেখেই লম্বা চেহারার স্বাস্থ্যবান একজন লোক ভরাট গলায় বলল, 'মিস্টার বিজন চৌধুরী?'

বিজন ঘাড় নাড়ল।

'আসুন, ও-ঘরে আসুন।' বলে সেই লোকটি ওকে শোওয়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। যাওয়ার পথে মেঝের একটা জায়গায় খড়ির দাগের ওপর বিজনের পা পড়ল। ওর পা কেঁপে উঠল। এইখানেই পড়ে ছিল রাখীর মা।

শোওয়ার ঘরে একটা চেয়ারে সাদা পোশাকের এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার। সাদা পোশাকের মানুষটি লম্বা লোকটির সঙ্গে চোখে-চোখে কথা বললেন। তারপর বিজনকে বিছানায় বসতে বললেন। অফিসারটিকে ইশারা করতেই সে গিয়ে শোওয়ার ঘর ও বসবার ঘরের মধ্যেকার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল। তারপর একটা মোড়া টেনে নিয়ে কাছাকাছি বসে পড়ল।

বিজনের গলা শুকিয়ে কাঠ। কানে একটা ভোমরা একটানা গুনগুন করে চলেছে। আর বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটছে কেউ।

সাদা পোশাকের মানুষটি কথা শুরু করলেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনার এই অবস্থায় সমবেদনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। তবে আপনি নিশ্চয়ই চান, যে বা যারা এই জঘন্য কাজ করেছে তারা শাস্তি পাক। তাদের শাস্তি দেওয়াটাও একধরনের প্রতিশোধ বলতে পারেন—তবে আইনমাফিক। আর সেইজন্যেই আপনার এই মানসিক অবস্থাতেও কয়েকটা কথা আমরা জিগ্যেস করতে চাই। বুঝতেই পারছেন, ডিউটি ইজ ডিউটি।'

একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমার নাম তরুণ দত্ত, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট, লালবাজার। আর ইনি হলেন—' লম্বা স্বাস্থ্যবান লোকটিকে দেখিয়ে বললেন তিনি, '—এই কেসের আই. ও. নরেন পাল।'

ইউনিফর্ম পরা অফিসারটি নিজেই নিজের পরিচয় দিল, 'আমি আপনাদের লোকাল থানার ও. সি. শচীন ভট্টাচার্য।'

বিজন লক্ষ করল, তিনজনেই ওকে তীক্ষ্ণ নজরে জরিপ করছে।

BanglaBook.org

তরুণ দত্ত হতভাগ্য মানুষটিকে দেখছিলেন। স্বাস্থ্য রোগার দিকে, তবে পাকানো চেহারা। ফরর্সা মুখে চাপদাড়ি মানিয়ে গেছে। বাঁ-ভুরুর ওপরে ছোট্ট একটা কাটা দাগ। হয়তো ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে চোট পেয়ে থাকবে। মাথার চুল এলোমেলো। চোখের চারপাশটা বিশ্রীরকম ফুলে রয়েছে। আর বারবার দাঁতে দাঁত চাপছে—কারণ, একইসঙ্গে কানের নীচে চোয়ালের হাড়টা বেখাপ্পাভাবে উঁচু হয়ে উঠছে।

কীভাবে খবরটা ভাঙা যায় ওর কাছে? তরুণ দত্ত কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন। তারপর কিছু বলে ওঠার আগেই বিজন হোঁচট খাওয়া গলায় বলে উঠল, 'আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে...।'

তরুণ দত্ত মনস্থির করে গলা খাঁকারি দিলেন। বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, মনে রাখবেন, এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়। আপনাকে সব খবরই আমি জানাচ্ছি, তবে—ট্রাই টু টেক ইট ইজি।' একটু থেমে তিনি ধীরে-ধীরে বললেন, 'আপনার স্ত্রী ও মেয়ের কোনও ভয় নেই। ওরা সেরে উঠবে। একটু আগেই হসপিটাল থেকে খবর এসেছে। ওদের আপাতত ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। কারণ, বিশ্রামটাই এখন ওদের সবচেয়ে বড় ওষুধ—।'

বিজনের চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। নরেন পাল ওর পিঠে হাত রাখল। বিজন ভাঙা গলায় বলল, 'আর অপু?'

'অপু বেঁচে নেই। আমরা দুঃখিত, মিস্টার চৌধুরী। আর আপনাদের কাজের মহিলাটিও—।'

বিজন এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর মুখ দিয়ে যে-শব্দ বেরিয়ে এল তাকে শোকার্ত হাহাকার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। দু-হাতে মুখ ঢেকে ও ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতেই কীসব বলছিল বিজন। কিন্তু ওর একটা কথাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। নরেন পাল ও শচীন ভট্টাচার্য বিজনকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। তরুণ দত্ত বিজনকে একটা রুমাল দিলেন। ও চোখ মুছল সেটা দিয়ে। কিন্তু বারবার তা ভিজে উঠছিল। শেষে কান্না চাপতে রুমালটা দাঁতে কামড়ে ধরল বিজন, কিন্তু তবুও ফোঁপানি আর হেঁচকি থামাতে পারছিল না।

তরুণ দত্তর কষ্ট হচ্ছিল। মায়া হচ্ছিল হতভাগ্যটার জন্য। আকস্মিক এই দুর্ঘটনা শিশুর চেয়েও দুর্বল করে দিয়েছে পুরুষটাকে। কিন্তু এক্ষুনি এর সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। নইলে তদন্তে দেরি হলে তার জন্য হয়তো অনেক দাম দিতে হবে।

সুতরাং তরুণ দত্ত সবাইকে চমকে দিয়ে ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'মিস্টার চৌধুরী, এখন কান্নাকাটির সময় নয়। বসুন। আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

বিজন থতমত খেয়ে বসে পড়ল। কোনওরকমে বলল, 'আমি ওদের দেখতে যাব—।'

তরুণ দত্ত কঠিন গলায় বললেন, 'যাবেন। সময় হলে আমরাই আপনাকে নিয়ে যাব।'

বিজন দলা-পাকানো রুমালটা দিয়ে চোখ-নাক মুছে নিল। তারপর বড়-বড় শ্বাস টেনে প্রথম প্রশ্নের অপেক্ষা করতে লাগল।

তরুণ দত্তের ইশারায় নরেন পাল কথা বলল, 'আপনার ওপরের নীচের ফ্ল্যাটের

BanglaBook.org

লোকজনদের জিগ্যেস করে ঘটনাটার মোটামুটি বিবরণ আমরা পেয়েছি। তবুও আপনার কাছ থেকে একবার শুনতে চাই।'

বিজন হোঁচট খাওয়া ভাঙা গলায় ধীরে-ধীরে সবই বলল। কথা বলতে-বলতে আবার ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। ও নাক টানছিল বারবার।

তরুণ দত্ত পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। বিজনের দিকে এগিয়ে ধরলেন। তাঁর ভাবভঙ্গিতে কেমন এক নীরব আদেশ ছিল। বিজন ইতস্তত করে সিগারেট নিল। তরুণ দত্ত লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড সময় দিলেন ওকে ধাতস্থ হওয়ার জন্য। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার চৌধুরী, এবারে বলুন, আপনার বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের মোটিভ কী? চাবি-টাবি যা কিছু পেয়েছি তা দিয়ে আমরা আলমারি-দেরাজ সব কিছুই খুলে দেখেছি। আমাদের সার্চ কমপ্লিট। তাতে দেখেছি দামি কিছুই খোয়া যায়নি। তা ছাড়া, আপনার সম্পর্কেও অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। এজন্যে আমাদের ক্ষমা করবেন। পুলিশের কাজে আমাদের একটু সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত হতেই হয়। এনি ওয়ে, আপনাকে আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, য়ু আর ক্লিন। আর সেই জন্যেই উই রিয়েলি ফিল ফর য়ু।'

বিজন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কারা কেন এরকম কাজ করল আমি কিছুই জানি না।'

নরেন পাল বলল, 'আমাদের ধারণা এটা কারও একার কাজ নয়—কোনও গ্যাঙের কাজ। আর এ-ও বলতে পারি সাধারণ ডাকাত তারা নয়। কারণ, টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না কিছুই তারা নেয়নি। তবু আপনি নিজে একবার চেক করে কনফার্ম করুন।'

বিজন উঠে দাঁড়াল। শচীন ভট্টাচার্য ও নরেন পাল ওর সঙ্গে এগোল বসবার ঘরের দিকে। তরুণ দত্ত বসে-বসে চিন্তাকুলভাবে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। বিজনের জন্য তাঁর ভয় হচ্ছিল। এত নৃশংসভাবে যারা একটা মানুষের পরিবারকে ধ্বংস করতে চায় তারা বিজন চৌধুরীকে সহজে রেহাই দেবে না।

মিনিটদশেক ধরে এঘর-ওঘর করল বিজন। সমস্ত কিছু খুঁজে দেখল। তারপর ফিরে এসে তরুণ দত্তর কাছে বিছানায় বসল। সিগারেটের ধোঁয়া তেতো লাগছিল ওর। সেটা বিছানার পাশেই টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। বলল, 'আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না।'

তরুণ দত্ত একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে বা আপনার পরিবারের সঙ্গে শত্রুতা আছে এমন কারও কথা মনে পড়ে?'

বিজন জোরে-জোরে দু-বার নাক টানল। একটু ভেবে বলল, 'নাঃ—।'

শচীন ভট্টাচার্য ও নরেন পাল বিজনের দু-পাশে বসে পড়েছিল। দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'ভালো করে ভেবে দেখুন।'

বিজন আবার ভাবল। তারপর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল।

তরুণ দত্তর সিগারেট ছোট হয়ে এসেছিল। তিনি উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। একটা খোলা জানলার কাছে গিয়ে সেটা ছুড়ে ফেলে দিলেন বাইরের অন্ধকারে। আপনমনেই মাথা নেড়ে বললেন, 'ইট মাস্ট বি সামথিং ভেরি ভাইটাল। বিনা কারণে কেউ দু-দুটো মেয়েকে ভায়োলেন্টলি অ্যাসাল্ট করে না। তা ছাড়া, এ-ধরনের ক্রাইম করে বেড়ায় এমন কোনও গ্যাঙের কথাও আমাদের জানা নেই।'

BanglaBook.org

কথা শেষ করে তিনি সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন শচীন ভট্টাচার্য ও নরেন পালের দিকে। ওরা দুজনেই ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এ-ধরনের ক্রিমিনাল গ্যাঙের কথা ওরা দুজনেও জানে না।

তরুণ দত্ত বিজনের খুব কাছে এগিয়ে এলেন। দু-হাত নেড়ে বললেন, 'থিংক হার্ড, মিস্টার চৌধুরী। তা নইলে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। আপনার স্ত্রী ও মেয়েকে পরের বারে আর বাঁচাতে পারবেন না। এমনকী আপনারও সাংঘাতিক কোনও বিপদ হতে পারে।'

বিজন দু-হাতে মাথার চুল খামচে ধরে বলল, 'জানি না, জানি না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না আমার।'

আবার কান্না পাচ্ছিল ওর। একইসঙ্গে মাথায় শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত দপদপানি।

তরুণ দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বিজনের মুখের খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। খুব ধীরে-ধীরে ভাবুন। আপনার আত্মীয়-স্বজনের কারও সঙ্গে শত্রুতা আছে? কিংবা পাড়ার চেনা-পরিচিত লোকজন? বন্ধুবান্ধব? অথবা অফিসের কেউ?'

তরুণ দত্তের কণ্ঠস্বর বিজনকে যেন সম্মোহিত করে ফেলছিল। ওর মাথার ভেতরে সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে আত্মীয়-স্বজন বলতে সুজন আর বাবা। এ ছাড়া কবিতার দুই দাদা, বিধবা মা, আর ছোট বোন নিনি থাকে ঢাকুরিয়ায়। এদের মধ্যে শত্রু? অসম্ভব! আর পাড়ার চেনা-পরিচিত লোকজন, বন্ধুবান্ধব বা অফিসের কেউ...নাঃ, তাও অসম্ভব।

বিজন ঠোঁট টিপে মাথা নাড়ল।

তরুণ দত্ত খানিকটা হতাশ ভঙ্গিতে বিজনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ওয়েল, তাহলে এবারে একটা খারাপ প্রশ্ন করব। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। ...আপনার স্ত্রী কবিতা অথবা মেয়ে গোলাপের কোনও রাগী প্রেমিক... মানে...।'

বিজন এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু ওর হাত-পা অসম্ভবরকম কাঁপছিল বলে ও টলে পড়ে যাচ্ছিল। নরেন পাল শক্ত এক হাতে ওকে সামলে নিল। বিজন তার হাতের বাঁধন ছাড়াতে পারছিল না।

তরুণ দত্ত এই প্রথম এক চিলতে হাসলেন। সিগারেটে গভীর টান দিয়ে এক মুহূর্ত দম নিলেন। তারপর বললেন, 'রাগ করবেন না, মিস্টার চৌধুরী। সবরকম পসিবিলিটির কথাই আমাদের ভাবতে হয়। আর আপনার উত্তর শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমরা এক কানাগলিতে ঢুকে পড়েছি। আপনার বাড়িতে এই নৃশংস আক্রমণের কোনও মোটিভ নেই, চুরি-ডাকাতি হয়নি, আপনার কোনও শত্রু নেই—দেন হোয়াট? দেন ব্লাডি হোয়াট?'

শেষ কথাটা তরুণ দত্ত অনেকটা চেঁচিয়ে বললেন, তাঁর ফরসা মুখ লালচে হয়ে গেছে। হাতের সিগারেটটা চেয়ারের গায়ে ঘষে নিভিয়ে ছুড়ে দিলেন মেঝেতে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দু-পকেটে হাত গুঁজে একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিজন শুধু তাঁর পিঠ দেখতে পাচ্ছিল। ওর মনে হল, ভদ্রলোক ভেতরের কোনও চাপা রাগ সামলে নিতে চাইছেন।

BanglaBook.org

মিনিটদুয়েক পরে তরুণ দত্ত আবার ফিরে এলেন বিজনের কাছে। চেয়ারে বসলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, এ-ঘটনার কোনও মোটিভ যখন আমরা আপাতত পাচ্ছি না, তখন অপরাধীদের চেনার জন্যে আমাদের অন্ধকারেই হাতড়াতে হবে। তবে কতকগুলো কথা আপনাকে বলছি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হসপিটাল থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট যা পেয়েছি তাতে মনে হয়, আপনার স্ত্রী ও মেয়ে মালটিপল রেপের ভিকটিম। ওদের সুস্থ হয়ে উঠতে অন্তত দিন সাতেক সময় লাগবে। আমরা সাবধান থাকতে চাই। তাই হসপিটালে একজন আর্মড গার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর আপনার সেফটির জন্য কী করতে পারি, বলুন। এনি সাজেশান?'

বিজনের চোখের কোণে জলের ফোঁটা তৈরি হচ্ছিল। ও এপাশ-ওপাশ জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর বলল, 'আমার সেফটির জন্যে আমি মোটেও ভাবি না। আপনাদের অসুবিধে না হলে এই ফ্ল্যাটেই আমি থাকতে চাই। যদি সত্যিই কোনও কারণ থাকে তাহলে ওই শয়তানগুলো হয়তো আবার ফিরে আসবে এখানে। তখন—।'

বিজনকে থামিয়ে দিয়ে শচীন ভট্টাচার্য বলল, 'যদি আপনি চান তাহলে এখানেও একজন গার্ডের ব্যবস্থা করা যায়।'

বিজন ঘুরে দেখল শচীনবাবুর দিকে। বলল, 'তাহলে ওই লোকগুলো হয়তো আসবে না।'

তরুণ দত্ত বললেন, 'এতে আপনার লাইফ-রিস্ক আছে।'

বিজনের গলার ভেতরে একটা ব্যথা নড়াচড়া করছিল। ও ফিসফিসে গলায় বলল, 'এটাকে এখনও আপনি লাইফ বলেন!'

তরুণ দত্ত বললেন, 'পরশু সকালের মধ্যেই সমস্ত ল্যাব রিপোর্ট আমরা পেয়ে যাব। তাতে নতুন করে তেমন কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না। কারণ ল্যাবের লোকজন বলছিল, বেশিরভাগ আঙুলের ছাপই তেমন স্পষ্ট নয়। তবু দেখা যাক। আপনার টেলিফোন নম্বর আমরা নিয়ে নিয়েছি। আর আপনি এই ফোন নাম্বারটা রাখুন—।'

টেবিল থেকে একটা বাংলা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে তার সাদা অংশে দ্রুত হাতে টেলিফোন নম্বরটা লিখে দিলেন তরুণ দত্ত। কাগজটা বিজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'কোনও জরুরি খবর থাকলে এই নাম্বারে ফোন করে দিয়ে দেবেন। আমি অথবা পাল খবর পেয়ে যাব।'

শচীন ভট্টাচার্য বলল, 'আপনার রিলেটিভদের কোনও খবর দিতে চান তো বলুন। সেই ঠিকানায় আমরা খবর পৌঁছে দেব।'

বিজন বলল, 'না ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না।'

'কাল আপনাকে একবার থানায় আসতে হবে। রিপোর্ট লেখালিখির ফর্মালিটিগুলো সেরে নেব। আর আপনার অফিসের ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা দেবেন তো, দরকার হলে—।'

বিজন অফিসের ঠিকানা, ওর ডিপার্টমেন্ট আর ফোন নম্বর বলল। শচীন ভট্টাচার্য একটা ছোট পকেট ডায়েরিতে তা লিখে নিল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর বিজন

BanglaBook.org

বলল, 'একটা রিকোয়েস্ট করব। কালকের কাগজে এই ব্যাপারটার রিপোর্ট যেন নাম-ধাম দিয়ে না বেরোয়।'

তরুণ দত্ত বিজনের হাতে হাত রাখলেন। বললেন, 'ডোন্ট উয়ারি। আমরাও মানুষ, মিস্টার চৌধুরী। এবারে চলুন, হসপিটালে গিয়ে ওয়াইফ আর মেয়েকে দেখবেন চলুন। ছেলেকে এখন আপনি দেখতে পাবেন না। পরশু পোস্টমর্টেম শেষ হলে আপনাকে বডি দেব।' তারপর চাপা গলায় বললেন, 'এখন ওকে দেখলে আপনি সইতে পারবেন না, চৌধুরী। দি বয় ইজ আ ব্যাটার্ড মেস।'

ওরা চারজনেই উঠে পড়ল। বসবার ঘরে ঢুকে দেখল ঘর ফাঁকা। ল্যাবের লোকজন কখন নিজেদের কাজ শেষ করে চলে গেছে। ঘরটা মোটামুটি গুছিয়ে ফেলা হলেও টিভি-র নীচে পড়ে থাকা জিনিসটা বিজনের চোখে পড়ল। ও এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিল।

জন্মদিনের উপহার! বিজন দেখেছে এটা পড়ে ছিল অপুর দেহের পাশে। ওর মৃত্যু-মুহূর্তের সাথী। অপুর পকেট কম্পিউটার। পকেটবই মাপের ইলেকট্রনিক যন্ত্রটার একটা কোণ সামান্য টোল খেয়ে গেছে। আর তার ছোট্ট কাচের পর্দার ওপরে দুটো কালচে বিন্দুর টিপ। রক্ত? অপুর রক্তের দাগ?

একহাতে চোখ মুছে বিজন কম্পিউটারটা রেখে দিল টিভি-র ওপরে। তারপর তিনজন অফিসারের সঙ্গে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাটের বাইরে। ওর হঠাৎই খুব ঘুম পাচ্ছিল, আর চোখ জ্বালা করছিল একইসঙ্গে।

তরুণ দত্ত বিজনকে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, সত্যিই এ-ফ্ল্যাটে থাকতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

বিজন মাথা নাড়ল, না।

তখন তিনি বললেন, 'এখন যে-কনস্টেবল আপনার ফ্ল্যাট পাহারা দিচ্ছে কাল সকালেই সে চলে যাবে। তবে আপনাকে বলা রইল, দরকার হলেই আমাদের কন্ট্যাক্ট করবেন।'

রাস্তায় বেরিয়ে ওরা চারজন উঠে বসল একটা জিপে। মাঝরাতের অন্ধকার কেটে জিপ ছুটতে শুরু করল।

বিজনের চোখে-মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগছিল। একইসঙ্গে ও টের পাচ্ছিল বৃষ্টির গন্ধ। কাছেই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। গলার ভেতরে ব্যথাটা আবার নড়তে শুরু করেছে। বিজন অসহায়ভাবে মাথার চুলে হাত চালাল।

কবিতা! গোলাপ! অপু—ওঃ, আমার অপু!

BanglaBook.org

চার

সকালের রোদ পুরোনো হয়ে গেলেও বিজনের ঘুম তখনও ভাঙেনি। ও গোলাপ-কবিতা-অপুকে নিয়ে সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল। ফুলের বাগান, ভোরের আলো, ঘাসের শিশির, প্রজাপতির মেলা, পাখির ডাক আর বাতাসে ভেসে বেড়ানো অদ্ভুত সুবাস। এরই মাঝে বিজন ওদের তিনজনকে নিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিল।

হঠাৎই একটা উৎকট জান্তব গন্ধ বিজনের নাকে ধাক্কা মারল। স্বপ্ন ভেঙে গেল ওর। দেখল, গতকালের তোলপাড় হওয়া ফ্ল্যাটে ও শুয়ে আছে। জানলা দিয়ে রোদের বর্শা এসে বিঁধে গিয়েছে ওর বুকে। বিজনের বুকের ভেতরে ব্যথা করছিল। ও কিছুক্ষণ চোখ বুজে ভাবল কাল রাতের কথা। হসপিটালে ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের পাশাপাশি দুটো বেড-এ ঘুমোচ্ছিল গোলাপ ও কবিতা। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। গোলাপের মুখ দেখে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও কবিতার মুখের চেহারা অনেক কিছুই বলে দিচ্ছিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল ওরা দুজনে। তবে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। কারণ খুব সূক্ষ্ম নজরে তাকালে বুকের কাছটায় চাদরের ওঠানামা টের পাওয়া যাচ্ছে। তরুণ দত্ত আর নরেন পাল দু-পাশ থেকে বিজনের দু-বাহু চেপে ধরে রেখেছিল। আর বিজন কবিতা ও গোলাপের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে দারুণভাবে হাতড়াচ্ছিল—খুঁজে বেড়াচ্ছিল ওর কোনও শত্রুকে। ওর বুকের ভেতরে একটা খ্যাপা জানোয়ার ছটফট করছিল।

সাদা পোশাক পরা ডাক্তারদের সব কথা বিজনের মাথায় ঢোকেনি। যদিও ওঁরা কথাগুলো বলছিলেন তরুণ দত্ত, নরেন পাল ও শচীন ভট্টাচার্যকে লক্ষ করে। যেটুকু বিজনের মগজে ছাপ ফেলেছে তা হল, একাধিক লোক সাংঘাতিকভাবে ধর্ষণ করেছে গোলাপকে। শরীরের নানা জায়গায় আঘাত ছাড়াও প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে ও। হসপিটালে যখন ওকে আনা হয় তখন সচেতন থাকলেও কোনও কথা বলতে পারছিল না। কেমন অস্বাভাবিক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। দিনসাতেক পরে ওর শরীর সেরে উঠলেও হয়তো মন সেরে উঠবে না। তখন কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আর কবিতার আক্রমণকারী বোধহয় একজন। তবে ওর শরীরও কম আঘাত পায়নি। যদিও মন সুস্থ ও সবল আছে। ও অনেক তাড়াতাড়ি সামলে উঠতে পারবে।

এরপর অপুর কথা জিগ্যেস করেছিল বিজন। তখন জানতে পারল যে প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী ডান রগের কাছে ভোঁতা কিছুর তীব্র আঘাতে মৃত্যু হয়েছে অপুর। তার পরে ওর দেহকে কেউ অহেতুক থেঁতো করতে চেয়েছে। গায়ে বেশ কয়েক জায়গায় স্পষ্ট জুতোর দাগ পাওয়া গেছে।

বিজন মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। ওকে সামলে নিলেন তরুণ দত্ত। তারপর হসপিটাল থেকে বেরিয়ে জিপে। জিপ থেকে আবার এই ফ্ল্যাটে। ফেরার পথে ওরা বিজনকে দু-চারটে সান্ত্বনার কথা বলছিলেন। কিন্তু বিজন কিচ্ছু শুনতে পায়নি। ওর মাথার ভেতরে তখন আগুন লকলক করছিল।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বিজন। ভাবল, হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পরে বেরোবে। আজ আর অফিসে যাওয়া যাবে না। বরং ফোন করে কবিতাদের বাড়িতে একটা খবর দেওয়া যাক। তারপর টিকিয়াপাড়ায় গিয়ে সুজনকে ধীরে-ধীরে সব জানানো যাবে। এই বিপদে সুজন নিশ্চয়ই ওকে সাহায্য করবে।

প্রথমে কবিতাদের বাড়িতে ফোন করল বিজন। ওর বড়দা তমাল ধরল। বিজন খুব সংক্ষেপে বলল সব। তারপর হসপিটালের বেড নম্বর দিল, আর পুরনো খবরের কাগজটা নিয়ে এসে তরুণ দত্তের নাম, ডিপার্টমেন্ট ও লিখে দেওয়া টেলিফোন নম্বরটা জানাল। ফোনের ও-প্রান্তে নানান উত্তেজিত প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছিল বিজন। কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে ও ফোন নামিয়ে রাখল। ওর চোখ দিয়ে আবার জল পড়ছিল। বিজন

BanglaBook.org

চোখের জল মুছে নিয়ে চোয়াল শক্ত করল। এখন চোখের জল ফেলার সময় নয়, চোখের জল মুছে নেওয়ার সময়। কিন্তু কে ওর এত ভয়ংকর শত্রু?

হঠাৎই বিজনকে চমকে দিয়ে টেলিফোনটা মিষ্টি সুরে বেজে উঠল। একটা শ্বাস টেনে ফোনটা তুলে নিল ও।

'হ্যালো—!'

'কে, চৌধুরী?'

গলা শুনেই চিনতে পারল বিজন। অবাক হল। দীনেশ চোপরা। কম্পিউটার কর্পোরেশনের সিস্টেমস্ ইঞ্জিনিয়ার। বিজনের সঙ্গে মোটামুটি হৃদ্যতা আছে। কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ও অন্যান্য ব্যাপারে মাঝে-মাঝেই বিজনের সাহায্য নেয় ও। এমনকী বাড়িতেও দু-একসময় টেলিফোন করেছে। আজকের মতো। তবে মাসখানেক ধরে ওর সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক...।

উত্তর দেওয়ার আগে গলার স্বর স্বাভাবিক করতে চাইল বিজন। কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, 'চৌধুরী বলছি। বলো দীনেশ, কী ব্যাপার?'

ওপাশ থেকে হাসি শোনা গেল। তারপর ঃ 'গলা শুনেই চিনেছ! যাকগে, শোনো, আমি অফিস থেকে ফোন করছি। তুমি আজ অফিসে এলে না? একটা জরুরি দরকার ছিল।'

বিজন হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে ন'টা প্রায়। ওদের অফিস শুরু হয় ন'টায়। ও বলল, 'না, আজ আর অফিসে যাওয়া হবে না। কালও হয়তো যেতে পারব না। বাড়িতে একটু ট্রাবল হয়েছে।'

ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বলল, 'তেমন সিরিয়াস কিছু? টেল মি ইফ আই ক্যান হেল্প।'

বিজন বলল, 'না, না, তেমন কিছু নয়। তুমি কী দরকারে ফোন করেছ, বলো।'

'মাসখানেক আগে তোমাকে একটা ফ্লপি ডিস্ক পড়তে দিয়েছিলাম, মনে আছে? পড়ে দিতে পারলে পার্ক হোটেলে ডিনার খাওয়াব বলেছিলাম—।'

বিজনের সব মনে পড়ল।

এপ্রিলের এক ফুরফুরে বিকেলে ওদের অফিসের ন'তলার কম্পিউটার সেন্টারে হঠাৎই এসে হাজির হয়েছিল দীনেশ চোপরা। বিজন পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে মগ্ন ছিল। নতুন ধরনের একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করতে চেষ্টা করছিল ও—যা দিয়ে মোটর-জেনারেটর ডিজাইনের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। ঘরে আরও তিন-চারজন প্রোগ্রামার ছিল। তারা নিজের মনে কাজ করছিল। দীনেশ হঠাৎই সেখানে ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'চৌধুরী, হিয়ার ইজ আ রিয়েল চ্যালেঞ্জ ফর য়ু। এই ফ্লপিটা পড়ে দিতে পারলে পার্ক হোটেলে ডিনার।'

হেসে কথা বলতে-বলতে একটা ফ্লপি ডিস্ক উঁচিয়ে ধরেছিল দীনেশ।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের কারিকুরিতে বিজন চৌধুরীর অলৌকিক দক্ষতার কথা অফিসে সবাই জানে। শুধু অফিসেই বা কেন, ভারতের কম্পিউটার জগতে বিজন চৌধুরী একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম। ফ্লপি ডিস্ক যার নিত্যকার জল-ভাত তাকে ডিস্ক পড়ার চ্যালেঞ্জ! বিজনের হাসি পেয়েছিল। অথচ প্রথম যখন এই বস্তুটার

BanglaBook.org

সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটে তখন কী অবাকই না হয়েছিল।

ফ্লপি ডিস্ক অথবা ডিস্কেট। কিংবা আরও সংক্ষেপে শুধুই ফ্লপি। সোয়া পাঁচ ইঞ্চি বাই সোয়া পাঁচ ইঞ্চি মাপের একটা চৌকো কালো কাগজের খাপ। তারই মধ্যে বন্দি রয়েছে গোলাকার পাতলা প্লাস্টিকের একটা রেকর্ড। অনেকটা গ্রামোফোনের ইপি রেকর্ডের মতো। এই পাতলা প্লাস্টিকের রেকর্ডেই কম্পিউটারের সাহায্যে লিখে রাখা যায় প্রচুর তথ্য। গাদা-গাদা কাগজে লেখা অসংখ্য তথ্য বা খবরাখবর খুব সহজেই লিখে নেওয়া যেতে পারে একটা ছোট্ট ফ্লপিতে। তখন কাগজগুলো ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই। তথ্য সঞ্চয় করা ফ্লপিটা যখন খুশি কম্পিউটারে ঢুকিয়ে প্রয়োজনীয় বোতামগুলো টিপলেই হল—সমস্ত তথ্য একের পর এক ফুটে উঠবে কম্পিউটারের টিভি-র পরদায়। অথবা চাইলে সেই লেখা কম্পিউটারের লাগোয়া প্রিন্টারের সাহায্যে ছাপিয়েও নেওয়া যেতে পারে কাগজে। কোনও লেখা কাগজ, যেমন জেরক্স কপি করে নেওয়া যায় অন্য সাদা কাগজে, তেমনি তথ্য সঞ্চিত ফ্লপিকে কম্পিউটারের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে কপি করে নেওয়া যায় অন্য ফ্লপিতে। কোনও ফ্লপি পড়তে গেলে—অর্থাৎ, তাতে সঞ্চিত সমস্ত তথ্য টিভি-র পরদায় ফুটিয়ে তুলতে গেলে—সেটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে কী-বোর্ডের বোতাম টিপে কম্পিউটারকে বিশেষ কতকগুলো নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। নির্দেশ ঠিকমতো না দিতে পারলে ফ্লপিটা পড়া যাবে না। কম্পিউটার নিয়ে যাদের রোজকার ওঠা-বসা তাদের কাছে কোনও ফ্লপি পড়া অথবা একটা থেকে আর-একটায় কপি করা জলের মতো সহজ। বিজনের কাছেও এখন তাই।

তাহলে দীনেশ চোপরা এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে কেন? ও নিজেও তো কম্পিউটার কম নাড়াচাড়া করেনি!

খানিকটা অবাক হয়েই বিজন তাকিয়ে ছিল দীনেশের দিকে। তাহলে কি ফ্লপিটা 'লক' করা? কোনও ফ্লপি 'লক' করার অর্থ হল কম্পিউটার মারফত নির্দেশ দিয়ে ফ্লপিটাতে কেউ এমন একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছে যাতে যে-কেউ সাধারণ নিয়মমাফিক নির্দেশ কাজে লাগিয়ে ওটাতে সঞ্চিত কোনও তথ্য পড়তে পারবে না বা ছাপাতে পারবে না। সাধারণত কোনও প্রোগ্রাম বা তথ্য গোপন রাখতে সফ্টওয়্যার বিশেষজ্ঞরা এরকম কৌশল করে তথ্য সঞ্চিত ফ্লপিটা 'লক' করে দেয়। 'লক' করার কাজে তারা 'চিচিং ফাঁক'-এর মতো কোনও পাসওয়ার্ড বা সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে। অতএব এইরকম ভাবে 'লক' করা ফ্লপির সংরক্ষিত তথ্য পড়তে চাইলে সেই কোড ওয়ার্ড বা সাংকেতিক শব্দের সাহায্য নিতে হবে। তবে অনেক কম্পিউটার এক্সপার্ট নিজেদের অভিজ্ঞতা ও নানা কৌশল কাজে লাগিয়ে কোড ওয়ার্ডের সাহায্য ছাড়াই কোনও ফ্লপির 'লক' খুলে ফেলতে পারে। 'লক' ভাঙার কাজে বিজনও কম ওস্তাদ নয়—আর সেটা সবাই জানে।

বিজন নিজের কাজ নিয়ে সত্যিই ডুবে ছিল। অন্য দিকে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে ওর তখন ছিল না। কিন্তু তিন-চারজন কোলিগের সামনে ছুড়ে দেওয়া ওই ওপেন চ্যালেঞ্জ বিজনের অহঙ্কারে আঘাত করেছিল। তাই ও হাত বাড়িয়ে দীনেশের হাত থেকে ফ্লপিটা নিয়েছিল। বলেছিল, 'এখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি—পরে দেখব। ফ্লপিটা আমার কাছে রেখে যাও।'

BanglaBook.org

দীনেশ চোপরার হাসি পলকের জন্য মুছে গিয়ে একটা দ্বিধার ভাব ফুটে উঠেছিল। একটু ইতস্তত করেছিল ও। কিন্তু বিজন ওকে ঠাট্টা করে দু-চারটে কথা বলতেই দীনেশ ক্লিপটা ওকে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বিজনও সেটা ওর ব্রিফকেসে না ক্লিপের বাক্সে কোথায় যেন রেখে দিয়েছিল পরে 'লক'টা আনলক করবে বলে। যাওয়ার আগে দীনেশ বারবার করে বলেছিল, 'আগামীকালই রেজাল্ট চাই। আর আনলক করার সময় আমাকে ডাকবে।'

কিন্তু পরদিন সেই ক্লিপটা খুঁজতে গিয়ে বিজন আর পায়নি।

ও একটু অবাক হয়েছিল। তারপর নানান জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল। তাও পায়নি। এমনিতে সব ক্লিপের চেহারাই একরকম। শুধু যে-কোম্পানির তৈরি তার নামের স্টিকারটা আলাদা। বিজনদের অফিসে হাজার-হাজার ক্লিপ ব্যবহার করা হয়। তাতে বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি অন্তত কয়েকশো করে ক্লিপ রয়েছে। তারই মধ্যে কোথাও কি মিশে গেছে ওটা? কারণ ওই ক্লিপটার গায়ে আলাদা কোনও লেবেল লাগায়নি দীনেশ, আর তার স্টিকারের ওপরে কিছু লিখেও রাখেনি—এটুকু ভালোমতোই মনে ছিল বিজনের। ক্লিপটা খুঁজে না পেয়ে ও বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিল।

ব্যাপারটা দীনেশ চোপরাকে জানাতেই ওর মুখে প্রচ্ছন্ন রাগ ফুটে উঠেছিল। ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বেশ রূঢ় গলায় জিগ্যেস করেছিল, 'সত্যিই ওটা হারিয়ে গেছে?'

বিজন বলেছিল, 'বিশ্বাস করো, খুঁজে পাচ্ছি না। এই বাক্সের মধ্যেই তো রেখেছিলাম...আচ্ছা, ওটায় কি খুব ইম্পর্ট্যান্ট কিছু লেখা ছিল?'

দীনেশ কর্কশ গলায় জবাব দিয়েছিল, 'সেটা জানলে তো হতই!'

'ওটার কোনও ডুপ্লিকেট কপি করে রাখোনি? তাহলে...।'

মনে আছে, এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়েই দীনেশ গটগট করে চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই বিজনকে ক্লিপটার কথা জিগ্যেস করেছে দীনেশ। ওর প্রশ্নের ধরনে বিজনের মনে হয়েছে, দীনেশ ওকে সন্দেহ করে। ক্লিপটা যে বিজন সত্যি-সত্যিই খুঁজে পায়নি তা বোধহয় দীনেশ বিশ্বাস করে না। বিজন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, ওদের সহজ সম্পর্কটা ধীরে-ধীরে কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

পলকের মধ্যে পুরোনো ভাবনাগুলো খেলে গিয়েছিল বিজনের মাথায়। দীনেশের কথায় ওর সংবিৎ ফিরে এল। দীনেশ কথা বলছিল ফোনের ও-প্রান্ত থেকে।

'চৌধুরী, কাল হঠাৎই সেই হারানো ক্লিপটার একটা কপি পেয়েছি। তুমি যদি আজ অফিসে আসতে তাহলে তোমাকে দিয়ে ওটার 'লক' ওপেন করার চেষ্টা করতাম। আর হ্যাঁ, পার্ক হোটেলে ডিনারের অফারটা এখনও রয়েছে—আমি ওটা ফিরিয়ে নিইনি।'

একটু চুপ করে থেকে দীনেশ বলল, 'প্লিজ, চৌধুরী, কুড ইউ হেল্প?'

বিজন এলোমেলো চিন্তা করছিল। ওর মনে হল, গতকালের দুর্ঘটনার স্মৃতি আবছা করতে যে-কোনও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন। তাই থেমে-থেমে বলল, 'ঠিক আছে। বিকেলের দিকে আমি অফিসে যাব, তখন ট্রাই করে দেখব।'

'ধন্যবাদ। তোমার ওপর ভরসা করছি।' বলে ফোন ছেড়ে দিল দীনেশ। বিজনও টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

BanglaBook.org

বিজন ঠিক করল, হাওড়া ঘুরে এসে তারপর অফিসে যাবে। কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে হবে। এমনসময় ওর কানে এল গানের কলি। ওপরের ফ্ল্যাটে কিংবা পাশের বাড়িতে কেউ টেপরেকর্ডার বাজাচ্ছে। বিজনের তেমন গানের শখ নেই। তবে গান-পাগল ছিল অপু আর গোলাপ। ক্যাসেট বাজিয়ে শোনা ছাড়াও পুরনো রেকর্ড শোনার ঝোঁক ছিল গোলাপের। তাই বাড়িতে টেপরেকর্ডার ছাড়াও রয়েছে গ্রামোফোনের আধুনিক মডেল।

কী মনে হল বিজনের, হঠাৎই ওর গান শুনতে ইচ্ছে করল। ও উঠে গেল শোওয়ার ঘরে। দেওয়ালের তাক থেকে দু-তিনটে রেকর্ড নিয়ে এল। তারপর বসবার ঘরের কোণে রাখা গ্রামোফোনের ঢাকনা তুলে সুইচ অন করে ইহুদী মেনুহিনের আবহ সুরের একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিল। বেহালার স্পর্শকাতর মরমী সুর ঘরের দেওয়ালে মাথা কুটে মরতে লাগল। অন্য রেকর্ডগুলো হাতে নিয়ে বিজন চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এটা গোলাপের খুব প্রিয় সুর। বিজনেরও। গোলাপ এখন কেমন আছে?

এসব ভাবতে-ভাবতেই হাতের রেকর্ডগুলো তাসের মতো শাফল করছিল বিজন। হঠাৎই যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে ও চমকে উঠল। মেনুহিনের বেহালার তার ছিঁড়ে গেল যেন। ওর হাতে এটা কী? মান্না দে'র ছবি ছাপানো ইপি রেকর্ডের একটা শৌখিন খাপের ভেতরে একটা ফ্লপি! ফ্লপিটা ভেতরে রাখতে গিয়ে খাপের একপাশের আঠার জোড় খুলে গেছে। এটা এখানে কে রাখল?

ফ্লপিটা খাপ থেকে বের করে নিয়েই বিজন বুঝল, এটা দীনেশ চোপরার দেওয়া সেই ফ্লপি!

কাজের প্রয়োজনে অনেকসময় বিজনের ব্রিফকেসে দু-চারটে ফ্লপি থেকে যায়। এটাও হয়তো সেইভাবে ভুল করে চলে এসেছিল বিজনের ব্যাগে। সেখান থেকে বাড়িতে। বিজনের সব ফ্লপিরই স্টিকারে বা লেবেলে সূচীপত্রের মতো সঞ্চিত তথ্যের বিষয় বা নাম লেখা থাকে। কিন্তু এই ফ্লপিটায় সেরকম কিছু লেখা নেই।

তেমন কোনও কারণ ছাড়াই বিজনের বুকের ভেতরে বারকয়েক হাতুড়ির শব্দ হল। ওর ব্যাগ খুলে অপু সময়ে-সময়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। ও-ই হয়তো ফ্লপিটার নাম-ধাম লেখা নেই দেখে ওটা নিয়ে মজা করে রেখে দিয়েছে রেকর্ডের খালি খাপের ভেতরে। সেইজন্যই ফ্লপিটা পরে আর খুঁজে পায়নি বিজন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বিজন রেকর্ড প্লেয়ার অফ করে দিল। হাতের রেকর্ডগুলো রাখল প্লেয়ারের ওপরে। তারপর ফ্লপিটা ব্রিফকেসে ভরে নিল। বেশ কয়েকদিন ব্রিফকেস নিয়ে অফিসে যায়নি ও। তাই ভেতরের কাগজপত্রগুলো একবার উলটে-পালটে দেখে নিল। ব্রিফকেস বন্ধ করতে গিয়ে বিজনের আবার মনে পড়ল, এই ফ্লপিটা হারিয়ে গেছে শুনে দীনেশ চোপরা কেমন রেগে গিয়েছিল। বিজন স্বাগনের মতো একজন শত্রুর আভাস খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ওর এই শত্রুহীন জগতে এই মুহূর্তে ও শুধু দীনেশ চোপরার ছায়া দেখতে পাচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বিজন। লক্ষ করল, ভাঙা দরজার কাছে দাঁড়ানো প্রহরীটি এখনও অবিচল হাজির। আরও ঘণ্টাখানেক হয়তো থাকবে। তারপর কি ভাঙা দরজা অরক্ষিত রেখেই চলে যাবে? গেলে যাক, বিজনের

BanglaBook.org

তাতে কিছু আসে যায় না। ওর ফ্ল্যাটে রাহাজানি করার মতো আর-কিছুই বাকি নে যা খোয়া যাওয়ার গতকালই তা গেছে। বিজনের বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকল। একইস সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আবার সেই উৎকট জান্তব গন্ধটা ওর নাকে এল।

পাঁচ

অফিসে যখন পৌঁছল বিজন তখন প্রায় বিকেল চারটে। হাতের ব্রিককেসটা এখন আর বেশি ভারী লাগছে। ভারী মনে হওয়ার কারণ শুধুই ক্লান্তি নয়। এখন ওর ব্রিককে রয়েছে লেদ মেশিনে ব্যবহার করার দু-দুটো ডায়মন্ড টিপ্‌ড্ কাটিং টুল। ইস্পাতের টে প্রায় ছ'-সাত ইঞ্চি লম্বা চৌকোনা রড। তার একটা মাথা ভীষণ ছুঁচলো। তারই ডগ বসানো রয়েছে এককুচি হিরে। কাটিং টুল। লেদ মেশিনে লাগিয়ে সহজে ইস্পাত ক যায়। এ-দুটো নেওয়ার সময়ে বিজনের মনে সামান্য দ্বিধা ছিল। কিন্তু সুজন মাথাগ ছেলে। সবশুনে একরকম জোর করেই কাটিং টুল দুটো ঢুকিয়ে দিয়েছে দাদার ব্যা তারপর বলেছে, 'আমি তাহলে একজন বন্ধুকে নিয়ে তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে ক'দিন থাবি

বিজন বলেছে, 'না। আমার আর কিসের ভয়! সবই তো গেছে—।'

আবার কান্নার ঢেউ জাপটে ধরেছে বিজনকে। সামলে নিয়ে বলেছে, 'লোকগুলো অমি পাগলের মতো খুঁজব। আমি চাই, ওরা আবার আমার কাছে আসুক...দরকার হ তোকে খবর দেব।'

বাবাকে কিছুই জানায়নি বিজন। শুধু তাঁর কুশল জিজ্ঞাসার সময়ে ঘরের দেওয়া টাঙানো মায়ের ফটোর দিকে চোখ পড়েছিল। মারা যাওয়ার পর থেকে মায়ের বয়ে আর বাড়েনি। আশ্চর্য, অপুও ওর কাছে চিরকাল ছোটই থাকবে। ছেলেটা বড় হ পারল না। বিজন সেই মুহূর্তে দুরন্তভাবে কোনও শত্রু খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

হসপিটালের ওয়ার্ড, বেড নম্বর ইত্যাদি জেনে নিয়েছিল সুজন। খাওয়া-দাওয় শেষে একটু বিশ্রাম নিয়ে দুজনে একই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বিজন যাবে অফিসের আর সুজন দু-একটা কাজ সেরে হসপিটালে যাবে কবিতা ও গোলাপকে দেখতে।

অফিসের লিফটে চড়ে ন'তলার ওঠার সময়েও মনের মধ্যে মরিয়া হয়ে হাতড়াচ্ছিল বিজন। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর।

কম্পিউটার কর্পোরেশনের সিস্টেম্‌স্ ডিজাইন ডিভিশনে ঢুকতেই দীনেশ চোপরা দেখতে পেল বিজন। দুটো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কাচের ঘর পেরিয়ে একটা সুদৃশ্য টেবিলে কাছে ও দাঁড়িয়ে। কোম্পানির ডিরেক্টর মনমোহন আঙ্কিলার সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয় পি. এ. জ্যানেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে। জ্যানেট অফিসে অনেক পুরুষকেই বে গুরুত্ব দেয়। বিজনকে ওর কম্পিউটার দক্ষতার জন্যে হয়তো দেয় আরও বেশি। ম করে বিজনকে ডাকে 'এক্সপার্ট' বলে। আর জ্যানেটের সাহেবী নাম বিজনের একদম পছ নয়। তাই জ্যানেটকে ও বদলে করে নিয়েছে জনিতা।

BanglaBook.org

বিজন কাছে যেতেই দীনেশ কথা বলা থামিয়ে দিল। কেমন অদ্ভুত চোখে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। জনিতাও বিজনকে দেখছিল। অন্য দিনের মতো 'হ্যালো, এক্সপার্ট' বলে ও মজা করল না। বিজন একটু থমকে গেল। ওদের কাছে হেঁটে আসার পথে এপাশে-ওপাশে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিলের দিকেই ওর নজর গেছে। লক্ষ করেছে, সবার মুখ-চোখেই কেমন একটা ছন্দপতনের ছায়া।

তাহলে কি ওরা সবাই বিজনের বাড়ির দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরেছে? কিন্তু কাগজে খবরটা বেরোলেও কোনও নাম তো ছাপা হয়নি। এমনকী অকুস্থল হিসেবে 'উত্তর কলকাতার এক ফ্ল্যাটবাড়ি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তরুণ দত্ত তাঁর কথা রেখেছেন। অথচ...।

বিজন কষ্ট করে হাসল। বলল, 'হ্যালো, জনিতা...।'

জনিতা একবার দীনেশের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'এক্সপার্ট, কনফারেন্স চেম্বারে চলো, কথা আছে।' —বলেই জনিতা ও দীনেশ ঝকঝকে রাবার টাইল্‌ড মেঝেতে পা ফেলে এগিয়ে চলল বিশাল ফ্লোরের কোণের একটা কাচের ঘরের দিকে। ওটাই সিস্টেম্‌স্ ডিজাইন ডিভিশনের কনফারেন্স চেম্বার।

নিঃশব্দে ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকল।

সুদৃশ্য জ্যামিতিক ডিজাইনের টেবিল। তাকে ঘিরে আধুনিক গঠনের সবুজ মোল্ডেড ফাইবারের ছ'টা চেয়ার। ঘরের তিন দেওয়াল কাচের। আর চতুর্থ দেওয়ালে প্লাইউডের তৈরি পৃথিবীর বহুবর্ণ মানচিত্র। মাথার ওপরে গোটা চারেক মনোরম ফ্রস্টেড আলো। এয়ারকুলার ঠান্ডা বাতাসের ঢেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে একমনে।

ব্রিফকেসটা মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রেখে বিজন টেবিলের একদিকে বসে পড়ল। জনিতা বসল ওর পাশে। আর দীনেশ উলটোদিকে, মুখোমুখি।

বিজন দীনেশের চৌকো চোয়াল দেখছিল। দেখছিল, কপালের দু-পাশ চওড়া হয়ে টাক পড়েছে। মোটা গোঁফ। নাকের বাঁ-দিকে ছোট্ট আঁচিল। দু-গালে প্রাচীন বসন্তের দু-চারটে করে দাগ। এখন গরম কম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীনেশের পরনে ফুলহাতা রঙিন চেকশার্ট, চওড়া সাদা টাই, আর জিন্‌স।

দীনেশ জনিতার কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাই দু-একমুহূর্ত অপেক্ষা করে বিজন তাকাল জনিতার দিকে। ওর নাকে পারফিউমের মোলায়েম সুগন্ধ আসছিল।

জনিতা মিষ্টি স্বরে খবরটা বলল বিজনকে।

'অশোক বাসু ইজ ডেড!'

ও যেন মহাশূন্যে ভেসে যাচ্ছিল। মহাকাশযান থেকে কোমরে দড়ি বেঁধে মহাকাশে পায়চারি করতে বেরিয়েছিল বিজন। হঠাৎই যেন কেউ সেই দড়ি কেটে দিয়ে ওকে মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ও হারিয়ে যাচ্ছে উথালপাথাল শূন্যে।

পৃথিবী ভয়ংকর দ্রুত কয়েকটা ওলটপালট পাক খেয়ে আবার যেন ছন্দে ফিরে এল। তখনই বিজন স্পষ্টভাবে আবার দেখতে পেল জনিতার লাল টুকটুকে যুবতী ঠোঁট। টানা চোখের দীঘল পালক। হালকা সবুজ মসলিন শাড়ি। ধারারেখায় কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে যাওয়া নাইলন সুতোর মতো শ্যাম্পু করা কেশরাশি।

জনিতা আবার বলল, 'রিয়েলি স্যাড নিউজ, এক্সপার্ট। গতকাল সকালে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার সময় কার অ্যাকসিডেন্টে অশোক বাসু স্পটেই মারা গেছে।'

BanglaBook.org

অশোক বাসু। এই এতবড় প্রতিষ্ঠানে বিজনের একমাত্র বন্ধু। যাকে বিজন প্রায় সব কথাই বলত। অবশ্য অশোক ছিল কম কথার মানুষ। তবে মনটা ছিল ভারী চমৎকার আর অনেক না-বলা কথা বুঝে নিতে পারত। এ ছাড়া একটা বিষয়ে দুজনের খুব মিল ছিল। বিজনের মতো অশোকও ছিল সফট্‌ওয়্যার এক্সপার্ট। অবশ্য জনিতা বা দীনেশের সঙ্গে ওর তেমন মাখামাখি ছিল না।

কম্পিউটারের নানা বিষয় নিয়ে অশোকের সঙ্গে বিজনের কম ঝগড়া হয়নি অনেকসময় কিছুদিন দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ থেকেছে। গতকাল রাতের ঘটনার পর বিজন যখন ক্রমাগত মনের ভেতর একজন শত্রুর অনুসন্ধান করছিল তখন দু-একবার অশোক বাসুর নাম যে ঝিলিক মারেনি তা নয়। কিন্তু বিজন জানে, গতকালের ঘটনা ওকে পাগল করে তুলেছে। ও সম্ভব-অসম্ভব সবরকম চিন্তাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে তাছাড়া তরুণ দত্ত ওর মাথায় একটা সন্দেহের পোকা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন।

পারফিউমের সুবাস মুছে গিয়ে কুৎসিত জান্তব গন্ধটা আবার ধাক্কা মারল বিজনে নাকে। দাড়িতে আঙুল চালিয়ে ও বলল, 'গাড়ি কি অশোক নিজেই ড্রাইভ করছিল?'

দীনেশ বলল, 'না। তুমি তো জানো, অশোক একটা জরুরি মিটিংয়ে সাত দিনের জন্যে দিল্লি গিয়েছিল। গতকাল সকালের ফ্লাইটে ফিরেছিল। অফিসের গাড়ি নিয়ে জহরলাল ওকে এয়ারপোর্টে পিকআপ করতে গিয়েছিল। স্পটে সে-ও মারা গেছে। ওদের গাড়িটা হাই-স্পিডে ছুটে আসছিল। এমনসময় একটা লাক্সারি বাস অন্য দিকের লেন থেকে ওদের লেনে আচমকা ঢুকে পড়ে। অশোকদের গাড়িটা ছিটকে নিচের খালে পড়ে। একইসঙ্গে গাড়িতে আগুন ধরে যায়। যারা অ্যাকসিডেন্টটা দেখেছে তাদের কাছ থেকেই রিপোর্ট নিয়ে পুলিশ এসব জানতে পারে। বাসটার তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি বাসের ড্রাইভার সারেন্ডার করেছে। সে বলছে, হঠাৎ করে নাকি ব্রেক ফেল করায় সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।'

বিজনের চোখের কোণ ভিজে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে অশোকের ঘনিষ্ঠতার কথা অফিসে প্রায় সকলেই জানে। সেইজন্যেই কি দীনেশ ওকে শোক-সংবাদটা এত বিশদভাবে জানাচ্ছে?

জনিতা আর দীনেশের কাছে ধীরে-ধীরে সমস্ত ব্যাপারটাই জানতে পারল বিজন

কম্পিউটার কর্পোরেশনের ড্রাইভার জহরলাল সাউ বা সফট্‌ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অশোক বাসুকে শনাক্ত করা যায়নি। বিকৃত অ্যামব্যাসাডর গাড়ির নাম্বারপ্লেট ভিত্তি করে তদন্ত করে পুলিশ ওদের শনাক্ত করতে পেরেছে। ঘণ্টাদুয়েক আগে পুলিশ অফিসে এসে আঞ্জিলা সাহেবকে প্রথম খবরটা দেয় এবং ওদের রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ করে যায় অশোকের স্ত্রী নমিতা বাসুকে ওর আলিপুরের ফ্ল্যাটে এই দুঃসংবাদ পুলিশই পৌঁছে দেয়। জহরলালের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে অফিসে এসে কান্নাকাটি করছিল। আর অশোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই ডিরেক্টর একটা কন্ডোলেন্স মিটিং ডেকেছেন এবং আগামীকাল অফিস বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন। তার নিয়মমাফিক নোটিশ একটু আগেই দেওয়া হয়েছে।

জনিতা বিজনের হাতের ওপরে হাত রাখল। চাপ দিল। বলল, 'সরি, এক্সপার্ট।'

বিজনের হঠাৎই যেন মনে হল, ওর বাড়ির দুর্ঘটনার জন্য জনিতা ওকে

সহানুভূতি জানাচ্ছে। জলের কয়েকটা ফোঁটা পরপর ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। অশোক-নমিতা অনেকবার বিজনের বাড়িতে এসেছে। বিজনও ওদের আলিপুরের বাড়িতে গেছে কবিতা আর ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। এখন কীভাবে ও যাবে সাদা শাড়ি পরা নমিতার সামনে? নিজেই যে পুড়ে ছাই কীকরে অন্য আর-একজনকে সে শোকের আগুন থেকে বাঁচাবে? বিজন ভেবেছিল, আজ অফিসে দেখা হলে কবিতা-গোলাপ-অপুর কথা বলবে অশোককে। কিন্তু...।

বিজনের মনে হল এক্ষুনি ব্রিফকেস থেকে কাটিং টুল দুটো বের করে নেয়। তারপর দু-হাতে দুটো অস্ত্র মুঠো করে ধরে সামনের দেওয়ালে সাজানো পৃথিবীর মানচিত্রের ওপরে হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাশবিক আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তারপর...।

বিজন পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে নিল। এমনসময় ডিরেক্টরের বেয়ারা ইয়াকুব কনফারেন্স চেম্বারের কাচের দরজা ঠেলে উঁকি মারল। জ্যানেটকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিস্, বড়সাহেব ডাকছেন।'

জনিতা বিজনের হাতে আর-একবার চাপ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'সরি।'

তারপর উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দীনেশ একইভাবে বসে রইল ওর চেয়ারে। শুধু ওর চোখ ঘোরাফেরা করছিল।

কাচ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে জ্যানেট আর ইয়াকুব হেঁটে যাচ্ছে। ওদের চলার ভাব দেখে বোঝা মুশকিল অশোক বাসু আর নেই।

দীনেশ চোপরা একটা সিগারেট ধরাল। বিজনের দিকে প্যাকেট আর লাইটার এগিয়ে দিল। বারদুয়েক গভীর টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড—এখন কি ফ্লপিটা নিয়ে কম্পিউটারে বসবে? বুঝতেই পারছ, কাল অফিস ছুটি থাকছে। আর আমার...।'

বিজন চায়নি। কিন্তু দীনেশের অভিব্যক্তি দেখে ও স্পষ্ট বুঝল, দীনেশের কথায় ওর মুখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘৃণার ভাব ফুটে উঠে থাকবে। সেটা লক্ষ করেই দীনেশ তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'আমাকে ভুল বুঝো না, চৌধুরী। অশোক বাসুকে আমিও কম পছন্দ করতাম না। তবে এই ফ্লপিটা—।'

বিজন কী ভাবল কে জানে। ও মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল পুরোনো ফ্লপিটা অদ্ভুতভাবে খুঁজে পাওয়ার কথা দীনেশকে বলবে না। বরং দীনেশের নতুন মকড় ফ্লপিটাই আজ আনলক করার চেষ্টা করবে ও। কারণ, কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে হবে। নইলে বাড়ি ফিরলেই তো আবার মনে পড়ে যাবে ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো।

বিজন উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে ব্রিফকেস তুলে নিয়ে বলল চাপা গলায়, 'ও. কে., চোপরা। তুমি ফ্লপিটা নিয়ে এসো। এখানকারই কোনও একটা কম্পিউটারে ফ্লপিটা পড়ার চেষ্টা করে দেখি।'

দীনেশ উঠে এসে বিজনের কাঁধে ছোট্ট চাপড় মেরে বলল, 'থ্যাংক য়ু। এ রিয়েল বাডি।' তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল কনফারেন্স চেম্বার থেকে।

বিজনও বেরিয়ে এল বাইরে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়াতেও ওর ঘাড়ের কাছে ঘাম জমছিল।

BanglaBook.org

একটি অল্পবয়েসি স্মার্ট ছেলে বিজনের কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'স্যার, আজ অফিসে আসেননি?'

এত দুঃখেও বিজনের ঠোঁটে হাসির ছোঁয়া লাগল। বলল, 'কেন, এই তো এসেছি।'

ছেলেটি বলল, 'না, মানে, সকালে আপনাকে—।'

বিজন ছেলেটার টগবগে মুখ দেখছিল। প্রাণবন্ত। পরিশ্রমী। চোখে অনেক স্বপ্ন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরোনোর পর বিজনের যেমন ছিল। সবকিছুই এক। শুধু চেহারা আর নামটা আলাদা। সহদেব চ্যাটার্জি।

বিজন বলল, 'সহদেব, তুমি ডেটালাইফ-এর ফাইলটা তৈরি রেখো, আর ডি-ও-ই-র চিঠিটা ড্রাফট করে রেখো। কাল তো ছুটি, পরশু আমি আসব, তখন দেখব।'

'ও. কে. স্যার।'

'কাজে আর কোনও প্রবলেম নেই তো?'

'না, স্যার।'

'আচ্ছা, তাহলে পরশু দেখা হবে।' বিজন সামান্য হাসতে চেষ্টা করল। সহদেব চলে গেল।

বিজন সহদেবের চলে যাওয়া দেখছিল, হঠাৎই ওর পিঠে কেউ টোকা মারল। বিজন ফিরে তাকাল। দীনেশ চোপরা। হাতে একটা ফ্লপি। বলল, 'চৌধুরী, এখানে নয়। জ্যানেটকে ইন্টারকম ফোনে বলে পারমিশান নিয়েছি। বড়সাহেবের কম্পিউটার রুমে নিরিবিলি কাজ করব আমরা। লেট্স্ গো।'

ডিরেক্টর মনমোহন আহুজার চেম্বার নাইন্থ্ ফ্লোরে। অর্থাৎ সিস্টেম্স্ ডিজাইন ডিভিশনের ঠিক ওপরের তলায়। পাশাপাশি তিনটে ঘর। প্রথমটা পি. এ. জ্যানেট অ্যান্ডারসনের। মাঝের বড় ঘরটা বড়সাহেবের। আর সবশেষের কাচের ঘরটা কম্পিউটার রুম। ভেতরে দুটো পার্সোনাল কম্পিউটার, যার সংক্ষিপ্ত নাম পিসি, রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে সবুজ ও লাল রঙের দুটো টেলিফোন। একটা ইন্টারকম, আর-একটা ডায়রেক্ট বাইরের লাইন।

প্রত্যেক ঘরেই সুদৃশ্য নেমপ্লেট রয়েছে। আর সামনে সারি দিয়ে সাজানো রয়েছে টবের ছায়ালতা। ইয়াকুব ইস্তিরি করা ইউনিফর্ম পরে বড়সাহেবের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে।

ফ্লোরের এই অংশটা একেবারে আলাদা। এর সলিড সাউন্ডপ্রুফ পার্টিশনের ওপাশেই রয়েছে অ্যাকাউন্ট্স ডিপার্টমেন্ট।

ওদের দুজনকে দেখল ইয়াকুব। দীনেশ ওকে ইশারায় কী বোঝাল। তারপর ওরা কম্পিউটার রুমের কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দরজায় ঝোলানো প্লাস্টিক বোর্ডে 'নো অ্যাডমিশন' লেখাটা বিজনের নজর এড়ায়নি। কিন্তু বড়সাহেবের অনুমতি পেলে যে-কোনও নিষেধকেই অগ্রাহ্য করা যায়। ও ব্রিফকেসটা একটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। দেখল, বড়সাহেবের ঘর থেকে কম্পিউটার রুমে ঢোকার মার্বেল কাচের দরজাটা বন্ধ।

একটা পিসিতে বসে পড়ে সুইচ অন করে দিল বিজন। দীনেশের কাছ থেকে ফ্লপিটা নিয়ে কাজ শুরু করল। মাথায় জমে থাকা ফ্লপি আনলক করার যতরকম কলাকৌশল সবই একে-একে প্রয়োগ করতে লাগল। পিছন থেকে দীনেশ ওর কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। বিজন কানের পাশে উত্তেজিত উত্তপ্ত নিশ্বাস টের পাচ্ছে। ও যান্ত্রিক ঢঙে বোতাম টিপে চলল।

BanglaBook.org

হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটে গেল কম্পিউটারের টিভি-র পরদায়। বিজনের অন্তত তাই মনে হল। ওর হাত কেঁপে গেল কী-বোর্ডের বোতামের ওপরে। ফ্লপিটা আনলক করার প্রথম ধাপে সফল হয়েছে বিজন। কারণ, ফ্লপিতে সঞ্চিত কিছু লেখা এইমাত্র ফুটে উঠেছে টিভি-র পরদায়। সেই লেখাগুলোই বিজনের মাথার ভেতরে ওলটপালট ঘটিয়ে দিল। আর দীনেশ চোপরার উত্তেজিত থাবা ওর কাঁধে আঁকড়ে বসল। বিজনের ব্যথা করছিল। কিন্তু হাতটা সরিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা ওর ছিল না। ও সম্মোহিতের মতো টিভি-র লেখাগুলো দেখছিল। ইংরেজি লেখাগুলোর তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

'আমি অশোক বাসু। কম্পিউটার কর্পোরেশনের সিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। যে এই লেখাগুলো পড়ছে তাকে অভিনন্দন। কারণ, আমার ফ্লপির প্রথম লক সে খুলতে পেরেছে। তবে আরও দুটো লক আমি করে রেখেছি। সে-দুটো খোলা আরও কঠিন। সে-দুটো খুলতে পারলে প্রকাশিত হবে কিছু তথ্য। আমার গত পাঁচ বছরের তদন্তের ফল। আমি চাই সেগুলো যথাযথ জায়গায় উপযুক্ত হাতে পড়ুক। তবেই আমার পরিশ্রম সফল হবে। এখন এই ফ্লপিটা যে পড়ছে, সে এটা হয় আমার কাছ থেকে পেয়েছে, নয় চুরি করেছে, অথবা লুকিয়ে কপি করেছে। এই ফ্লপিটা যখন পড়া হবে তখন আমি বেঁচে থাকতে পারি, অথবা না-ও পারি। এখন দ্বিতীয় তালা খোলার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।'

বিজনের হাতের দশ আঙুল পলকে পাগল হয়ে গেল। ও পটাপট বোতাম টিপে ফ্লপির আনলক করা প্রথম লকটা আবার লক করে দিল। টিভি-র পরদা থেকে অশোকের কথাগুলো মুছে গেল। বিজন কম্পিউটার থেকে ফ্লপিটা বের করে নিয়ে উঠে পড়তে যাবে, দীনেশের দুটো থাবা ওকে চেপে বসিয়ে দিল চেয়ারে। পিছন থেকে ওর চাপা স্বর বলে উঠল, 'ডু ইট, চৌধুরী। ডোন্ট স্টপ ফর গড্‌স্ সেক। বাসু আর আমি একইসঙ্গে তদন্ত করছিলাম। তথ্যগুলো আমার দরকার। তা ছাড়া, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি এ সমস্ত কিছু গোপন রাখবে। তাই—।'

বিজনের বুক জ্বালা করছিল। চোখও জ্বলছিল একইসঙ্গে। ওর মনে হল নমিতার সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি। নইলে এভাবে অশোকের গোপন ফ্লপি পড়াটা অন্যায়। তা ছাড়া, এই রহস্যময় নকশার মধ্যে দীনেশ চোপরা কেমন করে এল? কেমন করে?

এক ঝটকায় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল বিজন। ওর ধাক্কায় পিছনে দাঁড়ানো চোপরা টাল খেয়ে গেল। বিজন ওকে দেখল।

দীনেশ চোপরার চোখ লাল—কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে। চৌকো চোয়াল যেন পাথর কেটে তৈরি। আর দু-হাতের আঙুল শক্ত, বাঁকানো, স্থির। যেন স্টার্টারের হুইস্‌ল বাজলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজনের ওপরে।

বিজন সব দেখল, তবে কোনও আমল দিল না। হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল থেকে ব্রিফকেসটা তুলে নিতে-নিতে জিগ্যেস করল, 'কিসের তদন্ত করছিলে তোমরা?'

দীনেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বলল, 'টপ সিক্রেট। বলা যাবে না।'

'এই ফ্লপিটা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

BanglaBook.org

'অশোক বাসু দিয়েছিল।'

'তাহলে ওকে দিয়েই আনলক করাওনি কেন?'

'ও বলেছিল, পরে সময় হলে করে দেবে।' দীনেশের চোখ চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করছিল।

বিজনের অবাক লাগছিল। এখন কি তাহলে উপযুক্ত সময় হয়েছে? কারণ, অশোক যখন আর নেই!

কিন্তু সে-কথা দীনেশকে ও জিগ্যেস করল না। তার বদলে একটা মারাত্মক প্রশ্ন করল।

'চোপরা, মাসখানেক আগে আমাকে যে-লকড্ ফ্লপিটা তুমি পড়তে দিয়েছিলে —যেটা তোমার কথামতো এই ফ্লপিটার ডুপ্লিকেট—সেটা তোমাকে কে দিয়েছিল? অশোক?'

দীনেশ চোপরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কী বলবে? সব কথা কি খুলে বলা যায় বিজন চৌধুরীকে? হঠাৎই ও এগিয়ে এসে বিজনের হাত চেপে ধরল। অনুনয়ের সুরে বলল, 'চৌধুরী, ডোন্ট বি ডিফিকাল্ট। এই ফ্লপিটা পড়া আমাদের কাছে খুব জরুরি। প্লিজ, আমাদের হেল্প করো।'

বিজন ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'বারবার আমাদের-আমাদের বলছ কেন? তুমি ছাড়া আর কে আছে?'

দীনেশ চোপরা সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল, 'কেন, অশোক বাসু—।'

বিজন হাসল। বলল, 'অশোক বাসু ইজ ডেড। তুমি নিশ্চয়ই ওর কথা বলছ না?'

দীনেশ চুপ করে রইল।

তখন বিজন আবার বলল, 'অশোকের প্রাইভেট ফ্লপি এভাবে আমি পড়তে পারি না। এটা আমি লালবাজারের স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা অন্য কোনও ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সামনে পড়তে চাই। আই ওয়ান্ট টু মেক ইট অফিসিয়াল। ভেরি-ভেরি অফিসিয়াল।'

সঙ্গে-সঙ্গে ছোঁ মেরে বিজনের হাত থেকে ফ্লপিটা ছিনিয়ে নিল দীনেশ। বলল, 'তোমার পাগলামি ছাড়ো। এখনও আমাদের তদন্তের কথা ফাঁস করার সময় আসেনি। তোমার কাছে সাহায্য পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু—।'

বিজন বলল, 'একটা কথা তোমাকে জানানো হয়নি, চোপরা। তোমার সেই হারানো ফ্লপিটা আজ সকালেই আমি খুঁজে পেয়েছি।'

কথাটা বলেই বিজন কম্পিউটার রুমের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে চোপরা ওর হাত চেপে ধরার চেষ্টা করল। বিজন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওর মুখোমুখি হল। ব্রিফকেসের হাতলের ওপর ওর মুঠো আরও শক্ত হল। বলল, 'চোপরা, লোক-হাসানো কাজ কোরো না, সবাই হাসবে।' একটু থেমে আরও বলল, 'অশোক আমার বন্ধু ছিল। এখনও ওকে আমি বন্ধু বলেই মনে করি।'

দীনেশ চোপরার দাঁত দেখা গেল। একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। বিজন সেসব গ্রাহ্য না করেই দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তখনই পিছন থেকে ও চোপরার হুমকি শুনতে পেল।

BanglaBook.org

'চৌধুরী, তোমার কপালে আরও দুঃখ আছে। য়ু উইল রিগ্রেট দিস।'

বিজনের হাতে ব্রিফকেস ভারী ঠেকছিল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ডিরেক্টরের চেম্বারের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় দেখল, ইয়াকুব একইভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেখছে।

বিজন যখন ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে যায় তখন দীনেশ চোপরা টেলিফোন তুলে কারও সঙ্গে কথা বলছিল।

ছয়

হসপিটালের দিকে যত এগোচ্ছিল ততই কান্না পাচ্ছিল বিজনের। গতকালের ঘটনা ধীর পরম্পরায় ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। কেমন আছে ওরা? এখনও কি ঘুমিয়ে রয়েছে? বিজন কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা করছিল, গতকাল ওর ফ্ল্যাটে ঠিক কীভাবে ব্যাপারগুলো ঘটেছে। ও যদি ঘণ্টাখানেক আগে অফিস থেকে ফিরত তাহলে কি ঠেকানো যেত এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা? বিজন মনে-মনে বারবার নিজেকেই দায়ী করছিল। ওর মনের ভেতরে শোকতাপের অনুভূতি ক্রমশ মরে যাচ্ছিল। তার বদলে জায়গা করে নিচ্ছিল হতাশা আর ক্রোধ। একইসঙ্গে একটা জুতসই শত্রু খুঁজে বেড়াচ্ছিল বিজন। ব্রিফকেসের ওজন ওকে হঠাৎই তৃপ্তি দিল। কারণ ওজনটাই ওকে জানিয়ে দিচ্ছে ওর ব্যাগের ভেতরে রয়েছে দুটো হাই স্পিড কাটিং টুল। আত্মরক্ষার অস্ত্র—অথবা আক্রমণের। অস্ত্র দুটো নিয়ে বিজনের এলোমেলো ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে করছিল, কালা-কালা করে চিরে ফ্যালে বাতাস আর বুক ফাটানো চিৎকার দিয়ে ওঠে। ওর বুকের ভেতরে একের-পর-এক ঢেউ ভেঙে পড়ছিল।

বিকেল থেকে আকাশে মেঘ জমছিল। সন্ধের মুখে ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। আজকের দিনটা কি কালকের মতোই? বিজন অবাক হয়ে ভাবল। বাস থেকে নেমে হাঁটছিল ও। বৃষ্টির ফোঁটা থেকে মাথা বাঁচাতে ইচ্ছে করল না। বরং ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা ওর মনের ঢেউগুলোর শক্তি ও তেজ যেন অনেকটা নরম করে দিল।

হসপিটালে যখন ঢুকল তখন অন্ধকার ঘন হয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে বৃষ্টি-ভেজা মুখ মুছে নিল বিজন। নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে দেখল সুজন মাথা নিচু করে পায়চারি করছে, আর একপাশে বেঞ্চিতে বসে রয়েছে কবিতার দুই দাদা—তমাল আর কুণাল।

বিজনকে দেখে তিনজনেই কাছে এগিয়ে এল। সুজন বলল, 'কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না। এমনকী যে-ডাক্তার ওদের দেখাশোনা করছেন তিনিও মুখ খুলছেন না। পুলিশের তরফ থেকে নাকি কড়া নির্দেশ রয়েছে তোমাকে ছাড়া আর-কাউকে যেন কিছু না বলা হয়।'

তমাল আর কুণালের দিকে তাকাল বিজন। ওরা বিজনের হাত চেপে ধরল। চাপ দিল। সেই চাপের অনুভব থেকে বিজন বুঝতে পারল, ওরা বিজনকে ভরসা দিতে চাইছে না, নিজেরাও মরিয়া হয়ে যে-কোনওরকম ভরসা চাইছে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা খুঁজে পেল না। তারপর বিজন বলল, 'আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

বিজন ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকে গেল। থমথমে মুখে ওরা তিনজন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আধঘণ্টা পরে বিজন বেরিয়ে এল। ওদের কাছে এসে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, 'কবিতা-গোলাপ দুজনেই আগের থেকে অনেকটা ভালো আছে। ইঞ্জেকশান দিয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।'

ওরা ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসতে লাগল হসপিটালের বাইরে। কিন্তু ওয়ার্ডের সদর দরজার মুখে এসে দেখল বৃষ্টি তখনও থামেনি। তাই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তমাল বলল, 'বিজন, তুমি ক'টা দিন আমাদের বাড়িতে এসে থাকো। অবস্থা একটু সামলে নাও, তারপর—'

বিজন মাথা নাড়ল। বলল, 'না, তমালদা, এখন একটু কাজের মধ্যে রয়েছি। তা ছাড়া, পুলিশের তদন্ত চলছে। এ-অবস্থায় গেলে আমার নিজেরই অসুবিধে। বরং কবিতা-গোলাপ সেরে উঠলে কিছুদিন আপনাদের বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নিতে পারে। কারণ, আমার ওখানে ঠিক রেস্ট পাবে না...।'

কুণাল বলল, 'সে তো একশোবার। এ ছাড়া তোমার যদি কোনও হেল্প দরকার হয়...।'

বিজন বলল, 'জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশ হয়তো আপনাদের কাছে যাবে। ওদের যা-যা বলার বলবেন। আর আমি দরকার হলে আপনাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেব।'

তমাল বলল যে, ইতিমধ্যেই ওরা মিস্টার দত্তের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছে এবং কথাবার্তা হয়েছে।

বিজনের দিকে তাকিয়ে ছিল সুজন। বিজন ওকে একপাশে ডেকে নিল। বলল, 'পরশুদিন পুলিশ তোর বউদির স্টেটমেন্ট নেবে। আর...আর পরশু কিংবা তরশু অপুর পোস্টমর্টেম শেষ হবে। তখন বডি দেবে পুলিশ। আমাকে বাড়িতে-অফিসে ফোনে না পেয়ে ডাক্তারের কাছে ওরা ইনফরমেশান রেখে গেছে।'

বিজনকে অসহায় দেখাচ্ছিল। সুজন বলল, 'তুমি এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি রোজ খবর নেব। আর যদি বলো তাহলে তোমার সঙ্গে ক'দিন থাকতে পারি।'

বিজন ক্লিষ্ট হাসল। ছোট্ট করে বলল, 'এখন নয়।'

তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই খোলা আকাশের নীচে পা রাখল বিজন। ভিজে জামা-প্যান্টে কেমন শীত-শীত করছিল ওর।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বিজন অশোকের কথা ভাবছিল। ভাবছিল টিভি-র পরদায় দেখা অশোকের লেখাগুলোর কথা। গত পাঁচ বছর ধরে কীসের তদন্ত করছিল অশোক? ওর সেই তদন্তের ফলই বা কী? তদন্তে উদ্‌ঘাটিত তথ্য 'যথাযথ জায়গায় উপযুক্ত হাতে' তুলে দিতে চেয়েছিল অশোক। নাম কী সেই জায়গার? আর উপযুক্ত হাত বলতে ও কার কথা বোঝাতে চাইছে? তা ছাড়া, ফ্লপিটা উপযুক্ত হাতে তুলে দেওয়ার সময় পায়নি ও। তার আগেই বিশ্রী দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। এর পিছনে কি অদৃশ্য কোনও হাত

BanglaBook.org

রয়েছে? দীনেশ চোপরা বলছে, সে আর অশোক একইসঙ্গে তদন্ত করছিল। অথচ এক-দেড় মাস আগে লকড় ফ্লপিটা আনলক করতে বিজনের সাহায্য চেয়েছিল সে। অশোক অফিসে নিয়মিত হাজির থাকা সত্ত্বেও অশোকের কাছে যায়নি কেন দীনেশ? তা ছাড়া, ফ্লপিটা ও পেয়েছিল কোথা থেকে? আর দ্বিতীয় কপিটাই বা ওকে দিল কে? দ্বিতীয় ফ্লপিটা কি সত্যি-সত্যিই প্রথমটার ডুপ্লিকেট? ব্যাগের ফ্লপিটা আনলক করলেই সেটা বুঝতে পারবে বিজন। ওটা আনলক করতে হবে পুলিশের সামনে—অফিসিয়ালি। তরুণ দত্তকে ফোন করে ব্যাপারটা বলতে হবে। মনের মধ্যে এলোমেলো ঝড় নিয়ে ভিজে চুপসে বাড়ি ফিরল বিজন।

ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাটটাকে ওর অচেনা লাগল। দরজায় পাহারায় কেউ নেই। তবে ভাঙা দরজাটা মেরামত করে কেউ ভদ্রস্থ করেছে। পুলিশের তরফ থেকেই ব্যবস্থা নিয়েছে হয়তো। সিঁড়ির আলোটা তেমন জোরালো নয়। তবুও বিজনের গাঢ় ছায়া দরজাটাকে অন্ধকার করে দিল। দরজা ঠেলল বিজন। বন্ধ। তাহলে কি মেরামত করা দরজায় চাবি দিয়ে গেছে পুলিশ? তাই যদি হয়, চাবিটা রেখে গেল কোথায়?

দীপেনের কথা মনে পড়ল ওর। সঙ্গে-সঙ্গে ওপরের ফ্ল্যাটে যেতেই সুনন্দার দেখা পেল। পুলিশ চাবিটা ওদের কাছে দিয়ে গেছে। আর বলে গেছে, লোকাল থানার ও. সি.-র সঙ্গে একবার দেখা করতে। খবরটা জানিয়ে বিজনকে চায়ের প্রস্তাব দিল সুনন্দা। কিন্তু বিজন সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে চাবি নিয়ে নীচে নেমে এল।

দরজার গায়ে চাবি লাগাতে গিয়েই ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে একটা শব্দ পেল বিজন। মুহূর্তে ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। চোখের সামনে অপু-গোলাপ-কবিতা-অশোক এদের মিষ্টি মুখগুলো পরপর ভেসে উঠল। ওর মাথার ভেতরে কেউ একটানা ফুলঝুরি জ্বালাতে শুরু করল। যথাসম্ভব কম শব্দ করে পলকে হাতের ব্রিফকেস খুলে ফেলল ও। একটা কাটিং টুল বের করে বাগিয়ে ধরল হাতে। ব্রিফকেসের ডালা নামিয়ে আলতো করে ঠেলে দিল দেওয়ালের গায়ে। শব্দ হওয়ার ভয়ে স্প্রিং লক বন্ধ করল না। তারপর ভাঙা দরজার ফাটলে চোখ রাখল।

অন্ধকার অলিন্দ পেরিয়ে বসবার ঘরে আলোর বর্শা ঘোরাফেরা করছে। টর্চ!

এবারে সন্তর্পণে দরজার গায়ে কান পাতল। তরল চলকে পড়ার অদ্ভুত শব্দ ওর কানে এল।

বিজন শব্দটার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, এমনসময় ভাঙা জোড়াতালি দেওয়া দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গন্ধটা এল নাকে। পেট্রল! ওর ফ্ল্যাটে কেউ পেট্রল ছড়াচ্ছে!

বিজনের মাথার ভেতরে ফুলঝুরিগুলো অসম্ভব দ্রুতগতিতে জ্বলে যাচ্ছিল। একবার মনে হল চিৎকার করে লোক জড়ো করে। কিন্তু বিচিত্র এক পাগল-করা-জেদ বিজনের টুঁটি চেপে ধরল। ফ্ল্যাটের ভেতরে যে-জন্তুগুলো রয়েছে তাদের ও আঘাত করতে চায়। আঘাত পেতেও চায় নিজে।

মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওর হারানোর তেমন কিছুই ছিল না। কবিতাকে ভালোবাসার পর কবিতা ছিল ওর জীবনে সবচেয়ে দামী। আর তারপর...তারপর গোলাপ-

BanglaBook.org

অপু। ওদেরকে ঘিরে গড়ে তোলা পৃথিবীটা বিজনকে রোজ বেঁচে থাকার লোভ দেখাত। প্রাণ হারাতেও ভয় করত বিজনের। প্রাণের ওপরে মায়া পড়ে গিয়েছিল ওর। জীবনটাকে দামী মনে হত।

আর এখন? এখন অপু যেন বলছে, 'ড্যাডি, একটা কিছু করো। সুপারম্যান হয়ে যাও। প্লিজ, ড্যাডি।'

গোলাপ তো কথা বলতে পারছে না। তাই শুধুই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

আর কবিতা অনুনয় করে বলছে, 'বিজন, পাগলামি কোরো না। তুমি ওদের সঙ্গে পারবে না—।'

তেতো হাসি পেল বিজনের। কবিতা তো এ-কথা বলবেই। কারণ, ও যে জানে, বিজনের শোধ নেওয়ার ক্ষমতা নেই। দাঁড়িপাল্লা সমান করতে বিজন পারবে না।

কিন্তু মাথার ভেতরে অপু চিৎকার করছিল, 'ওঃ, কাম অন, ড্যাড, ডু সামথিং! তুমি আমার অরণ্যদেব, তুমি আমার লোথার, তুমি আমার সুপারম্যান। ডু সামথিং, ড্যাড—।'

গতকাল রাতেও অপুর এই কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল বিজন। কিন্তু তখন তার শব্দ এত তীব্র, এত ভয়াবহ ছিল না।

সুতরাং নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে, একহাতে চাবি আর অন্য হাতে কাটিং টুল নিয়ে বিজন চৌধুরী পলকে ছবি হয়ে গিয়ে কমিক্স বইয়ের পাতায় ঢুকে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে অপুর হাততালির শব্দ শুনতে পেল।

হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে খুব সাবধানে চাবি ঘোরাল বিজন। তারপর চাবিটা বের করে নিয়ে পকেটে রেখে হাতল ঘুরিয়ে দরজায় চাপ দিল। দরজা ফাঁক হতেই হামাগুড়ি দিয়ে ঝটিতি ঢুকে পড়ল ভেতরে। আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল। পেট্রলের গন্ধটা ভীষণ রকম তীব্র হয়ে ওকে অবশ করে দিতে চাইল।

অন্ধকার অলিপথে দেওয়াল ঘেঁষে পা ফেলতে লাগল বিজন। টর্চের আলোর নড়াচড়াটা এখন ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বসবার ঘর থেকে টুকরো ছোট-ছোট শব্দও শোনা যাচ্ছে। উত্তেজনায় বিজনের হাত-পা কাঁপছিল। বড়-বড় শ্বাস পড়ছিল ঘন-ঘন।

আচমকা এক ছুট লাগাল বিজন। এলোমেলোভাবে দৌড়ে লাফিয়ে ও ঢুকে পড়ল বসবার ঘরে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে আরও ঘন দুটো অন্ধকার অবয়ব দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হতভম্ব হয়ে গেল। আর ওই অবাক অবস্থাতেই টর্চ-ধরা লোকটিকে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করল বিজন। টর্চ ছিটকে পড়ে কাচ ভেঙে গেল। আলো নিভে গেল। বিজন টের পেল কাটিং টুল লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে। বিদ্ধ হচ্ছে। ধস্তাধস্তির শব্দের মধ্যে চাপা গোঙানি ওর কানে আসছিল। আর বিশ্রী ঘামের গন্ধে ওর গা গুলিয়ে উঠছিল।

দ্বিতীয় লোকটা পেট্রলের টিন ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিজনের ওপরে। বিজনের মাথা ঠুকে গেল তার দাঁতে। কে যেন বিজনের হাত চেপে ধরল। বিজন খামখেয়ালিভাবে পা ছুড়ছিল। একটা সপাট লাথি লাগল কারও গায়ে। একটা 'ওঁক' শব্দ ঠিকরে বেরোল তার মুখ থেকে। বিজনের মুখের কাছে একজনের পিঠ কিংবা কাঁধ ঘবে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক কামড় বসাল ও। স্পষ্ট টের পেল মাংস কেটে দাঁত বসে

BanglaBook.org

যাচ্ছে। মুখে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে নোনতা স্বাদ। বিজন দাঁতের চাপ প্রাণপণে বাড়িয়ে দিল। কেউ ওর বুকে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মারল। কিন্তু ওর কামড় এতটুকু আলগা হল না। যন্ত্রণার গর্জন অথবা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। দুটো হাত ওর গলা টিপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে এক হাতে নখ দিয়ে হিংস্রভাবে সেই হাতটা খামচে দিল বিজন। আর ওর অন্য হাতের বাঁধন সামান্য ঢিলে হতেই কাটিং টুলসমেত হাতটা সজোরে চালিয়ে দিল অন্ধকারে। একটা শক্ত জিনিসে আঘাত করল অস্ত্রটা। কাঠফাটার মতো নীরস শব্দ হল। কেউ চেঁচিয়ে উঠল জোরে, 'আঁ-আঁ—।'

বিজনের ব্যাকরণহীন লড়াই অচেনা মানুষ দুটোকে নানাভাবে অসুবিধেয় ফেলে দিচ্ছিল।

হঠাৎই কাটাপটি ধস্তাধস্তি কমে গেল। একটা ছায়া ছুটে পালাল অন্ধকারে। আর দ্বিতীয় লোকটা অবশভাবে পড়ে রইল বিজনের বুকের ওপরে। বিজন দাঁতের বাঁধন আলগা করল। জিভ চটচট করছে। কয়েকবার ঢোক গিলল ও। তারপর থু-থু করে থুতু ছেটাল। বুকের ওপরে পড়ে থাকা লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল একপাশে। তারপর হাঁ করে শ্বাস নিতে-নিতে কোনওরকমে উঠে বসল। ওর হাত থেকে কাটিং টুলটা সশব্দে খসে পড়ল মেঝেতে। বিজনের গলার কাছটা জ্বালা করছিল। মাথার বাঁ-পাশটা অসম্ভব ব্যথা। ও মাথায় হাত বোলাল। যন্ত্রণার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি স্নায়ুতন্তু বেয়ে। মাথার আহত জায়গাটা বেশ ফুলে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে চেয়ার-টেবিল ধরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের কোথায় কী আছে, কোন দিকে জানলা-দরজা, কিছুই ঠাহর করতে পারছিল না। মাথা টলছিল। মনে হচ্ছিল মাথার ভেতরে কেউ যেন একরাশ উল ঠেসে দিয়েছে। মাথার ভেতরে একটা উলের বল ডুপ খাচ্ছে ক্রমাগত।

আসবাবপত্রে, দেওয়ালে, দরজার পাল্লায় ক্রমাগত ধাক্কা খেতে-খেতে অবশেষে ঘরের আলোর সুইচ-বোর্ডের কাছে পৌঁছল বিজন। সুইচ টিপতেই আলোয় ভেসে গেল ঘর। বিজন নিজের ঘরটাকে চিনতে পারল। পেট্রলের তীব্র গন্ধের সঙ্গে একটা হালকা আঁশটে গন্ধ ভেসে আসছিল নাকে।

বিজন ঘরের অবস্থাটা ভালোভাবে জরিপ করে দেখল। তল্লাশিতে ওরা তছনছ করেছে ঘরটাকে। সকালে রেকর্ড প্লেয়ারের ওপরে রেখে যাওয়া রেকর্ডগুলো খাপ থেকে বের করে ছড়িয়ে দিয়েছে ঘরময়। ঘরের বিভিন্ন আসবাবে, আনাচে-কানাচে সর্বত্র ওদের হানাদার হাতের ছাপ। আর এইরকম একটা ঝড়-পর্যুদস্ত ঘরের মাঝে নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মাঝারি মাপের লোক। পরনে ছাইরঙের ওপরে কালো ডোরা-কাটা বুশ-শার্ট আর খয়েরি প্যান্ট। পায়ে রবার-সোল জুতো। চোয়াড়ে ফরসা মুখে এলোমেলো কালির দাগ।

বিজন লোকটার কাছে এগিয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। নাড়ি দেখল। বেঁচে আছে। লোকটাকে চেনে না বিজন। অচেনা মুখ, তবে পুরোনো পাপীর ছাপ। কপালের বাঁ-দিকে একটা ক্ষতের দাগ। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কানের পাশ দিয়ে। এ ছাড়া মুখে আরও কয়েক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে।

লোকটার জামা-প্যান্ট বহু জায়গায় ছেঁড়া। এবং রক্তাক্ত বুকে, উরুতে বেশ কয়েকটা আঘাতের দাগ। আর বাঁ-কাঁধের কাছটা রক্তমাখা। এইখানেই কি কামড় বসিয়েছিল বিজন?

BanglaBook.org

লোকটার মুখের বিচিত্র কালির দাগ বিজনকে অবাক করল। দাগের ওপর আঙুল ঘষল ও। আঙুলে কালি লেগে গেল। এগুলো মুখে লাগিয়েছে কেন? যাতে কেউ চট করে চিনে ফেলতে না পারে? লোকটার পকেটগুলো হাতড়াতেই ভুরু-আকার কালো পেনসিলটা খুঁজে পেল বিজন। ওর গতকালের কথা মনে পড়ছিল। গোলাপ ও কবিতার মুখে এরকম ঘষা কালো দাগের আবছা ছাপ ছিল। বিজন পেনসিলটা নিয়ে লোকটার মুখে হিজিবিজি দাগ কাটতে লাগল। ওর জিভে নোনতা স্বাদটা আবার ফিরে এল। চোখ ভিজে গেল। উঠে দাঁড়াল বিজন। লোকটার মুখ হিংস্রভাবে মাড়িয়ে দিতে লাগল বুট দিয়ে। ওর বুকের ভেতর অপু হাততালি দিয়ে যাচ্ছিল পাগলের মতো। আর চেঁচাচ্ছিল: 'সুপারম্যান! সুপারম্যান!' বিজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

ও একসময় সরে এল সংজ্ঞাহীন লোকটার কাছ থেকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাটিং টুলটা দেখতে পেল। সেটা ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল। রাখল একটা খাটো টেবিলের ওপরে। লক্ষ করল, ঘরের সব জানলা বন্ধ। বোধহয় হানাদার লোকদুটোই বন্ধ করেছে। বিজনের গরম লাগছিল। ও জানলাগুলো একে-একে খুলে দিয়ে দু-পয়েন্টে পাখা চালিয়ে দিল। পরনের জামা-প্যান্ট এখনও ভিজে থাকায় জ্বালাময় যন্ত্রণাময় শরীরে ঠান্ডা আমেজ টের পেল। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে অলসভাবে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে গিয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে এল। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিল।

ব্রিফকেস নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল বিজন। আলো জ্বালল। এ-ঘরেও একইরকম তছনছ অবস্থা। দেওয়ালের তাক থেকে সমস্ত রেকর্ড বের করে খাপ ছিঁড়ে কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বত্র। বিজন ব্রিফকেসটা বিছানার ওপরে রাখল। ওটা খুলে দ্বিতীয় কাটিং টুলটা বের করে নিল। ওটা লুকিয়ে রাখল বিছানার তোশকের তলায়। আপাতত পুলিশের হেফাজতে এটা জমা রাখার ইচ্ছে ওর নেই।

ব্রিফকেসটা নিয়ে বসবার ঘরের একপাশে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রাখল বিজন। তারপর সমস্ত জামা-কাপড় ছেড়ে ঘরের বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো স্টিল আলমারির আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কেটে গেছে শরীরের অনেক জায়গায়। বাঁ হাতের কনুই থেকে হাতঘড়ি পর্যন্ত অনেকটা চিরে গেছে। ভীষণ জ্বালা করছে। রক্ত শুকিয়ে লেগে রয়েছে। একইরকম রক্তের দাগ ওর ঠোঁটে, ঠোঁটের পাশে, আঙুলের নখে। ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে। পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। মাথা, গলা আর কাঁধের কাছটায় ভোঁতা ব্যথা দপ্‌দপ্‌ করছে। ঢোক গিলতে গিয়েও ব্যথা টের পেল ও।

আহত শরীরটাকে আয়নার কাছ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল বিজন। শাওয়ার খুলে স্নান করতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, কবিতাকে পাশে নিয়ে ও ভিক্টোরিয়ার মাঠে বৃষ্টিতে ভিজছে। বিজনের শরীর ক্রমশ জুড়িয়ে আসছিল। ও প্রাণভরে ভিজতে লাগল। একটা অদ্ভুত ঘুমের ঘোর ওকে জড়িয়ে ধরছিল।

স্নান সেরে নিজের দেহে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজটুকু সেরে নিল বিজন। নতুন জামা-কাপড় পরে তাজা হয়ে নিল। তারপর ফোন করল লালবাজারে—তরুণ দত্তকে চাইল। তাঁকে না পাওয়ায় নরেন পালের সঙ্গে কথা বলল। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল, 'মিস্টার পাল, দয়া করে জলদি আসুন। মনে হচ্ছে, গতকালের একজন কালপ্রিট ধরা পড়েছে...।'

BanglaBook.org

নরেন পাল বলল, 'আমরা দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।' তারপর ফোন ছেড়ে দিল।

টেলিফোন রেখে শোওয়ার ঘরে গিয়ে পাখা চালিয়ে বিছানায় গা ছেড়ে দিল বিজন। পেট্রলের গন্ধটা আগের তুলনায় অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। বাইরে বৃষ্টির তেজ বেড়েছে। একটা শীতের আমেজ খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ছিল।

বিজন ভাবছিল, নরেন পালকে কতটুকু বলা যায়। ফ্লপির কথাটা এখন বলা যায় কি? প্রথম থেকে ঘটনা পরম্পরাগুলো ভাবতে শুরু করল ও। কেমন করে ও জড়িয়ে গেল এই নৃশংস ঝড়-ঝাপটায়? মাসখানেক আগে দীনেশ চোপরা একটা ফ্লপি আনলক করতে দিল ওকে। বিজন সেটা 'হারিয়ে' ফেলল। দীনেশ রেগে গেল। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অবশেষে অশোক বসু মারা গেল গতকাল সকালে—এক রহস্যময় দুর্ঘটনায়। গতকাল রাতে আকস্মিকভাবে কারা হানা দিল বিজনের এই ফ্ল্যাটে। অপুকে খুন করল। গোলাপ-কবিতাকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করল। অথচ বিজনের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না। তার পরদিন, অর্থাৎ আজ সকালে, দীনেশ চোপরা ফোন করে জানাল ফ্লপিটার একটা কপি ও পেয়েছে। সেটা পড়তে গিয়ে বিজন প্রথম জানতে পারল সেটা অশোকের। অশোক গত পাঁচ বছর ধরে গূঢ় কোনও তদন্তে লিপ্ত ছিল। দীনেশ বিজনকে আগে কখনও বলেনি যে, ফ্লপিটা অশোকের। সেটা ফ্লপি পড়ে জানার পর দীনেশ দাবি করল যে, ও আর অশোক একইসঙ্গে 'তদন্ত' করছিল। কিন্তু বিজনের বিভিন্ন প্রশ্নের ঠিক মতো জবাব দিতে পারেনি দীনেশ। ওর আচরণে খেপে গিয়ে বিজন ওকে বলল যে, হারানো ফ্লপিটা খুঁজে পাওয়া গেছে। আর তারপরই আজ রাতে দুজন লোক নকল অথবা সবখোল-চাবি ব্যবহার করে ঢুকে পড়ল এই ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট সার্চ করে ব্যর্থ হয়ে ওরা কারও নির্দেশ মতো পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল ফ্ল্যাটে। চেষ্টা করছিল সবকিছু নিশ্চিহ্ন করতে। আর তখনই বেহিসেবিভাবে বিজন ফ্ল্যাটে হাজির হল কাটিং টুল নিয়ে...।

দীনেশ চোপরার একটা কথায় বিজনের কেমন যেন খটকা লেগেছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এই মুহূর্তে কথাটা মনে করতে পারল না ও। হয়তো সময় হলেই কথাটা নিজে থেকেই ভেসে উঠবে স্মৃতিপটে।

বিজনের মাথা দপদপ করতে লাগল। এই বিপদ ও একা সামলাতে পারবে না। কাল সুজনকে একবার খবর দিলে হয়। ওরা দুজনে মিলে মোকাবিলা করতে পারে অদৃশ্য শত্রুর। আরও একটা ব্যাপার বিজনের মাথায় ঢুকছিল না। অশোক বসু না হয় জটিল কোনও তদন্ত করছিল, তাই শত্রুপক্ষ হয়তো সরিয়ে দিয়েছে তাদের পথের কাঁটা। কিন্তু বিজন তো কিছু করেনি। ও তো নিয়ম করে অফিস যেত আর কবিতা-গোলাপ-অপুকে নিয়ে দিন কাটাত। তাহলে ওর ওপরে রোখ কেন? আচ্ছা, নমিতার সঙ্গে একবার কথা বললে কেমন হয়? এমনিতেই অশোকের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিজনের যাওয়া উচিত। সুতরাং বিজন ঠিক করল, নমিতার সঙ্গে কাল দেখা করতে যাবে। ওর সঙ্গে কথা না বলে ফ্লপির কথাটা পুলিশকে জানাবে না বিজন।

হঠাৎই বসবার ঘরে নড়াচড়ার অস্পষ্ট শব্দ পেল ও। সব জ্বালা-যন্ত্রণা-ব্যথা ভুলে গিয়ে বিদ্যুৎ-ঝলকের ক্ষিপ্রতায় উঠে বসল বিজন। এক লহমায় দৌড়ে গেল পাশের ঘরে। মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটা নড়ছে, ধীরে-ধীরে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। কাছেই রাখা

BanglaBook.org

ব্রিফকেসটা ও এক পলকে তুলে নিল। হাত টানটান করে বৃত্তাকার পথে পাক দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ব্রিফকেসটা আছড়ে দিল লোকটার মাথায়। লোকটা আর্তনাদ করে আবার পড়ে গেল মেঝেতে। বিজন থামল না। পরপর আরও দু-বার হিংস্রভাবে লোকটার মাথায় আঘাত করল। তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে ব্রিফকেসটা রেখে দিল একপাশে।

ঠিক সেইসময় কলিংবেল বেজে উঠল।

বোধহয় নরেন পাল। বিজনের খিদে পাচ্ছিল, আর ঘুম পাচ্ছিল একইসঙ্গে। ও ঠিক করল, পুলিশের সঙ্গে কথা শেষ করেই রাস্তায় বেরোবে। কোনও পাইস হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে টালা পার্কে এলোমেলো বেড়িয়ে ঘরে ফিরবে। আর যদি ডাক্তার বোসের চেম্বার খোলা পায় তাহলে কিছু ওষুধ নিয়ে নেবে। নইলে ব্যথা ও যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। স্রেফ ইচ্ছাশক্তি এবং একটা বুক-ফাটা ক্ষোভ বিজনকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর একইসঙ্গে ওর মরা ছেলেটা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে ওর বুকের ভেতরে, 'ফাইট, ড্যাডি, ফাইট!' বিজন ভয় পাচ্ছিল, ওর ভেতরে বোধহয় একটা পাগলা কুকুর ধীরে-ধীরে জেগে উঠছে।

বিজন দরজা খুলতেই দেখল নরেন পাল দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সাদা পোশাকের আরও একজন অফিসার ও দুজন কনস্টেবল—সম্ভবত লোকাল থানার।

বিজন কষ্ট করে হাসল। বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন। একটা জানোয়ারকে ধরেছি। আশা করি এখনও বেঁচে আছে।'

সাত

সাদা ধবধবে শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়াতে-জড়াতে মাথা নিচু করে নমিতা বলল, 'কাউকে বলিনি, আপনাকে বলছি—ও গভর্নমেন্টের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং-এর হয়ে কাজ করত।'

বিজন যেন শঙ্খচূড়ের ছোবল খেল। অশোক 'র'-তে কাজ করত! অথচ কোনওদিন এর বিন্দুমাত্র আঁচ পায়নি ও!

বিজন চকিতে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ঘরে কেউ নেই। নমিতা-অশোক এই ফ্ল্যাটে রয়েছে প্রায় দশ বছর। ওদের কোনও সন্তান না থাকলেও বাইরে কোনও অভাববোধ প্রকাশ করেনি ওরা। একে অপরকে আঁকড়ে ধরে দিব্যি ছিল দুটিতে। অশোক আগে কলকাতারই অন্য একটা কোম্পানিতে কাজ করত। বছর ছয়েক হল ও জয়েন করেছে কম্পিউটার কর্পোরেশনে। আর তার মধ্যে পাঁচ বছর ধরে ও গোপন তদন্ত করছিল 'র'-এর হয়ে। তার ফলেই কি ওর গায়ে আঁচড় বিঁধিয়েছে মরণের নখ?

পাশের ঘর থেকে দু-একটা কথাবার্তার শব্দ কানে আসছিল। অশোকের খবরটা পাওয়ার পর নমিতার বাড়ির দু-একজন এসে ওর সঙ্গে রয়েছে। অশোকের মূল বাড়ি উত্তরবঙ্গে, শিলিগুড়িতে। সেখানে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই ওর বাড়ির লোকেরা এসে পড়বে।

BanglaBook.org

বিজন যখন নমিতার বাড়িতে এসে হাজির হয় তখন বেলা প্রায় এগারোটা। ওকে দেখে নমিতা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। স্বামীর এরকম একটা অকালমৃত্যু ও মেনে নিতে পারছিল না। বিজন নিজের চোখের জল সামলাতে পারেনি। বসবার ঘরের সোফায় বসে দু-হাতের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে মাথা নিচু করে কাঁদছিল ও। ঘরের জানলায় গোলাপি ফুলকাটা সাদা পরদা। মাথার ওপরে বনবন করে সিলিং ফ্যান ঘুরছিল। সেই হাওয়ার পরদার ফিনফিনে কাপড়গুলো মায়াবী শোকবস্ত্র হয়ে উড়ছিল যেন। বিজন একটা ছুটন্ত টালমাটাল লাক্সারি বাস দেখতে পাচ্ছিল। আর শূন্যে ওলটপালট খাচ্ছে একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি—তার পিছনের সিটে বসা অশোক প্রাণপণে চিৎকার করছে, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না ওর মুখ থেকে।

বিজন হঠাৎই চোখের জল মুছে নিল। ভাঙা গলায় বলল, 'নমিতা, তুমি বোধহয় জানো না, গত পরশু এক গুণ্ডার দল আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে অপুকে খুন করেছে, গোলাপকে কবিতাকে নিয়ে যা-নয়-তাই করেছে। ওরা এখন হসপিটালে। কবিতা হয়তো দু-একদিনের মধ্যে সেরে উঠবে, কিন্তু গোলাপ প্রায় বোবা হয়ে গেছে—।'

নমিতার শব্দ করে শ্বাস টানল। জলে টইটম্বুর অবাক চোখে বিজনকে দেখছিল ও। কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিজন ওকে হাত তুলে থামতে ইশারা করল। বলল, 'গতকাল রাতেও আমার ফ্ল্যাটে দুটো লোক ঢুকেছিল। ওরা পেট্রল ছড়িয়ে আমার ফ্ল্যাটে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনকে আমি ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পেরেছি—অন্যজন পালিয়ে গেছে। পুলিশ লোকটার কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে চেষ্টা করছে। আমি আজ সকালে লোকাল থানায় গিয়েছিলাম, লালবাজারেও গিয়েছিলাম। ওরা ওদের কাজ করছে...।'

নমিতা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল। বলল, 'বিজনদা, কবিতাদি... গোলাপ...এসব আপনি কী বলছেন!'

'নমিতা, কখনও কারও কোনও ক্ষতি আমি করিনি। কারও সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু তবুও কেন যে আমাকে এসব সইতে হচ্ছে জানি না। পুলিশ আমাকে বারবার বলছে কোনও শত্রু খুঁজতে। তাই খুঁজছি। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি অন্ধের মতো। কিছু একটা না করতে পারলে অপু কি আমাকে ক্ষমা করবে, বলো?'

বিজন ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপতে চেষ্টা করল। ওর শরীরটা হেঁচকি তুলে ফুলে-ফুলে উঠছিল। একটু সামলে নিয়ে ও ফ্লপি ডিস্ক, দীনেশ চোপরা এবং কম্পিউটার কর্পোরেশনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল নমিতাকে। ফ্লপিটা একটা পুরোনো প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে নিয়ে এসেছিল বিজন। সেটা সোফার পাশেই রাখা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে নমিতাকে দেখাল। বলল, 'এটা আমি পড়ে দেখিনি। তবে দীনেশ বলছে, এটা ওই ফ্লপিটারই একটা কপি। নমিতা, এবারে একটা জরুরি কথা তোমাকে বলতে চাই। সেটা হল, এখন শোকের সময় নয়—আমাদের লড়তে হবে, নমিতা...।'

কথাগুলো বলার সময় বিজনের গলা ভেঙে গেল। ঢোক গিলতে ব্যথা করছিল ওর। ও নমিতাকে দেহের কাটা-ছেঁড়া জায়গাগুলো দেখিয়ে বলল, 'এ তো সবে শুরু। এর শেষ আমি দেখবই। সেইজন্যেই তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব, নমিতা। বিশ্বাস করে মন খুলে জবাব দেবে?'

BanglaBook.org

তা কেঁদে ফেলল, বলল, 'এখন বিশ্বাস করে মন খুলে কথা বলার আর কে
নদা?'
ন জিগ্যেস করল, 'অশোক কীসের তদন্ত করছিল তুমি জানো?'
তা শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়াতে-জড়াতে মাথা নিচু করে বলল, 'কাউকে
পনাকে বলছি—ও গভর্নমেন্টের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং-এর হয়ে
।'
ন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। একটি বাচ্চা মেয়ে ট্রে-তে করে সন্দেশ, বিস্কুট
ঢুকল। বিজন সপ্রশ্নে নমিতার চোখে তাকাতেই নমিতা বলল, 'আমি খেয়েছি।
য় নিন।'
নের খিদে পাচ্ছিল। ও খাওয়া শুরু করতেই মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেল।
গে কৌতূহলী চোখে বিজন ও নমিতাকে দেখে গেল।
য়া শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিল বিজন। অশোক নেই। কিন্তু তবুও
কর ছাপ নানা জায়গায়। ও ভালো ছবি আঁকতে পারত। ঘরের দেওয়ালে
না ওর হাতে আঁকা দুটো ছবি। সোফার কভারে ফ্যাবরিক পেইন্ট দিয়ে
আঁকা ডিজাইন। বিজন নমিতাকে দেখল। বয়েস বড়জোর তিরিশ-বত্রিশ হবে।
শোকের ছাপ ওর বয়েস বাড়িয়ে দিয়েছে। মাথার চুল এলোমেলো। সিঁথির
চে আভা এখনও নির্মূল করা যায়নি। চোখের নীচে আবছা কালচে ছাপ।
নতে প্রসাধন-বিলাসী। এখন শোকই ওর একমাত্র প্রসাধন।
না জানলা আর বারান্দার দরজা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশ চোখে পড়ছিল।
আসছিল কাকের কর্কশ ডাক। ঝড় আসছে নাকি? বিজন শুনেছে পাখিরা
র্যোগের আভাস টের পায় যন্ত্রের অনেক আগে। এই কর্কশ ডাক কি সেরকমই
ত? বিজনের চোখে ভেসে উঠল ওর ফ্ল্যাটের মেঝেতে পড়ে থাকা মুখে
সিল-ঘষা সংজ্ঞাহীন লোকটার ছবি। আর একইসঙ্গে মনের মধ্যে দীনেশ
লে যাওয়া কথাগুলো উঁকিঝুঁকি মারছিল। লুকোচুরি খেলছিল বিজনের স্মৃতির

ার কাপে চুমুক দিতে-দিতেই বিজন জিগ্যেস করল, 'অশোক কী নিয়ে তদন্ত
মি জানো না?'
গলায় নমিতা বলল, 'ঠিক জানি না, তবে মাঝে-মাঝে বলত, আমাদের দেশের
হপূর্ণ খবর বাইরে চলে যাচ্ছে। আর বাইরে থেকে গোপনে চোরাপথে অস্ত্রশস্ত্র
—পরে সেগুলো তুলে দেওয়া হচ্ছে উগ্রপন্থীদের হাতে। একটা বিশেষ চক্র
এই কাজ করছে।'
চ্ছা, অশোক কি দীনেশ চোপরার সঙ্গে তদন্ত করছিল?'
তা একটু ভেবে বলল, 'না, কখনও সেরকম শুনিনি। শুধু ও বলত, আপনাদের
ই কীসব গোলমাল রয়েছে, ও তারই হদিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'
"র"-এর হয়ে কাজ করছে ক'বছর?'
তা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে
সাত-আট বছর। ও কী একটা কাজে একবার দিল্লি গিয়েছিল। সেখান থেকে

BanglaBook.org

ফিরে এসে একদিন রাতে ওই বারান্দায় বসে আমাকে বলল, নমি, দেশের কাজ করার একটা সুযোগ পেয়েছি। দেখি, যদি কিছু করতে পারি। ওরা আমার মতো কম্পিউটার জানা একজন লোক খুঁজছিল। আমি রাজি হয়ে গেছি। আমি জিগ্যেস করলাম, কারা লোক খুঁজছিল? তখন ও বলল, গভর্নমেন্টের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং—"র"। আর শোনো, এ-কথা কাউকে বলবে না। তাতে আমার বিপদ হতে পারে।'

চা শেষ করে বিজন কাপ-প্লেট নামিয়ে রাখল সামনের টেবিলে। বলল, 'ওর অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা কি তোমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়?'

নমিতা আঁচল গুঁজল মুখে। কান্না চাপল। একটু সময় নিয়ে তারপর বলল, 'হ্যাঁ। কারণ, শেষ কয়েকটা মাস ও খুব ভয়ে-ভয়ে কাটাচ্ছিল। বাড়িতে সবসময় দরজা বন্ধ করে রাখত। অচেনা লোককে চট করে ঘরে ঢোকাত না। আর...আর এই এপ্রিলের গোড়ায় যখন দিল্লিতে মিটিং করতে গিয়েছিল তখন একটা রিভলভার নিয়ে ফিরে এসেছিল। হেডকোয়ার্টার থেকে ওকে দিয়েছিল—বিপদ-আপদ সামলানোর জন্যে।'

'ও কারও নাম-টাম তোমাকে কখনও বলেছে?'

নমিতা বলল, 'না। শুধু একটা ঠিকানা দিয়েছিল—দিল্লির, বলেছিল, ওর যদি হঠাৎ কিছু ভালো-মন্দ হয় তাহলে ওই ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে জানাতে। আর বারবার করে বারণ করেছিল, পুলিশকে আমি যেন কিছু না বলি। আজ সকালেই আমি টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি। গতকাল পুলিশ এসেছিল। ওদের কিছু বলিনি। ওরা আমাকে মর্গে নিয়ে গিয়েছিল ওকে শনাক্ত করার জন্য। সে-দৃশ্য আমি...আমি..সহ্য করতে পারিনি। সমস্ত দেহটা পুড়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে।'

নমিতা কাঁদতে-কাঁদতে কথা বলার চেষ্টা করছিল। ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সেইরকমভাবেই ও বলল, 'আপনি বলুন, বিজনদা, এরকম একটা মৃত্যু কি ওর পাওনা ছিল?'

এইবার সবরকম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নমিতা ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। বিজন ওকে সময় দিল। তারপর অনেকটা যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'অপু কোনও তদন্ত করছিল না। গোলাপও না, কবিতাও না। এইরকম একটা বীভৎস দুর্ঘটনা কি ওদের পাওনা ছিল! ওঃ গড...।'

বিজন অশোকের কথা ভাবছিল। শালা একটা কথাও কখনও ওকে খুলে বলেনি। অবশ্য কী করেই বা বলবে। গোপনীয়তাই যে ওর একমাত্র অস্ত্র। তবে শেষদিকে অশোক যে ভয়ে-ভয়ে থাকত সেটা এখন নমিতার কথায় কিছুটা আঁচ করতে পারছে বিজন। কখনও-কখনও ও সংযম হারিয়ে বিজনকে বলে ফেলেছিল, 'নমিতাটার জন্যে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি কী যে করি—।'

বিজন অবাক হয়ে বলেছিল, 'এ-কথা কেন বলছিস?'

অশোক আনমনাভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিয়েছে, 'কিছু না—এমনিই হঠাৎ মনে হল।'

আর-একদিন রেস্তরাঁয় খেতে-খেতে অশোক বলেছিল, 'বিজন, তুই একটা দায়িত্ব নিতে পারবি?'

বিজন জিগ্যেস করেছিল, 'কী দায়িত্ব?'

BanglaBook.org

'বেশ কঠিন দায়িত্ব। কতগুলো মানুষের মুখোশ টেনে খুলতে হবে—পারবি? আমি এখন চেষ্টা করছি, কিন্তু...।'

'কিন্তু কী?'

বিজনের চোখে সরাসরি তাকিয়ে অশোক বলেছিল, 'আমি বোধহয় বেশি সময় পাব না।'

রেস্তরাঁর স্তিমিত আলোতেও অশোকের চোখের তারা চকচক করছিল।

এইসব টুকরো ঘটনাগুলো ভুলেই গিয়েছিল বিজন। কিন্তু এখন নমিতার কথায় সবকিছু আবার মনে পড়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে।

নমিতা ফিসফিসে গলায় বলল, 'পুলিশ বডি দিতে চেয়েছিল, আমি বলেছি ওরাই যেন সৎকারের ব্যবস্থা করে। যে-দেহে আমার স্বামীর কোনও চিহ্ন নেই সেই দেহ আমার চাই না। আমি মনে-মনে ওর সৎকার করেছি।'

বিজন প্যাকেটে মোড়া ফ্লপিটা নমিতার হাতে দিয়ে বলল, 'এই ডিস্কটা তুমি যত্ন করে লুকিয়ে রাখো। আমার কাছে এটা নিরাপদ নয়।'

নমিতা ওটা নিয়ে জিগ্যেস করল, 'ওর কম্পিউটারের ঘরে রেখে দেব?'

কম্পিউটারের ঘর? তার মানে! বিজন সে-বিষয়ে প্রশ্ন করতেই নমিতা বলল যে, অশোক প্রায় বছরদুয়েক হল বাড়িতে একটা পার্সোনাল কম্পিউটার এনেছিল। অদ্ভুত ধরনের বিদেশি মডেল। পুরো যন্ত্রটা একটা বড়সড় অ্যাটাচি কেসের মধ্যে এঁটে যায়। অশোকই ওকে বলেছিল, এরকম কম্পিউটার এখানে পাওয়া যায় না, বিদেশ থেকে আনতে হয়। কীসব ব্যবস্থা করে 'র' ওকে যন্ত্রটা দিয়েছিল। এটার কথা কাউকে বলতে মানা করেছিল অশোক। নমিতা কাউকে বলেনি। আজ বিজনকে বলল। অশোকের পড়াশোনার ঘরের এককোণে যন্ত্রটা বসানো আছে। বাইরের কেউ এলে অশোক ওটার ওপরে স্তূপাকারে জামা-কাপড় চাপিয়ে ঢাকা দিয়ে দিত।

আশ্চর্য! এত বছরের বন্ধুত্ব অথচ মুখচোরা সংযমী ছেলেটা কিছুই বলেনি বিজনকে! বিজন বেশ কয়েকবারই এসেছে এ-বাড়িতে, কিন্তু ওই যন্ত্রটার কথা কখনও জানতে পারেনি। ওর ভীষণ ইচ্ছে হল, অশোকের পড়ার ঘরটা একবার দেখে। নমিতাকে বলল সে-কথা। নমিতা কোনও কথা না বলে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আসুন—,'

বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে ছোট অলিপথ। তার একদিকে ডাইনিং-স্পেস ও রান্নাঘর। আর দু-পাশে দুটো ঘর। একটা বড়—শোওয়ার ঘর, আর অন্যটা ছোট—অশোকের পড়ার ঘর।

রান্নাঘর থেকে রান্নার শব্দ আসছিল। শোওয়ার ঘর থেকে শাড়ি-পরা এক যুবতী ওদের দেখে নিয়ে আবার সরে গেল। পড়ার ঘরের চৌকাঠে পৌঁছে নমিতা আস্তে-আস্তে বলল, 'শেষ দিকটায় প্রায়ই আপনার কথা বলত। তবে ওর কথা তো জানেন, ভাসা-ভাসা—কখনও মন খুলে কিছু বলত না। সবকথাই কেমন ধোঁয়াটে করে বলত।'

বিজনের দিকে ফিরে তাকাল নমিতা, 'আপনাকে কখনও কিছু বলেনি?'

বিজন বলল, 'না।' একটু থেমে আবার বলল, 'ফ্লপিটা তুমি তোমার শাড়ি-টাড়ির ভাঁজে কোথাও লুকিয়ে রেখো। কাউকে এটার কথা বোলো না। দিল্লি থেকে কোনও

BanglaBook.org

খবর এলে বা কেউ এলে তখন ঠিক করা যাবে কী করব। দরকার হলে দিল্লির লোকজনের সামনে আমি ওটা অফিসিয়ালি পড়ার চেষ্টা করব।'

ওরা দুজনে অশোক বসুর ঘরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে বিজন একটা চেনা গন্ধ পেল যেন। অশোকের গন্ধ? একটু পরেই সেটা চাপা দিয়ে ভেসে উঠল একটা নতুন গন্ধ—উৎকট জান্তব গন্ধ। বিজন জিগ্যেস করল, 'ওর সেই রিভলভারটা কোথায়?'

নমিতা বলল, 'ও-ঘরে আছে, নিয়ে আসছি।' ও ক্লিপটা হাতে করে শোওয়ার ঘরে চলে গেল। একটু পরেই ওটা রেখে কাপড়ের ভাঁজে মোড়া একটা ছোট পুঁটলি নিয়ে ফিরে এল। বলল, 'এই যে—।'

বিজন কাপড়ের ভাঁজ খুলে রিভলভারটা বের করে হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখল। ও রিভলভার চেনে না। কিন্তু ওটার চেহারা একটা সমীহ জাগিয়ে তোলে। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে নিজেকে একশো গুণ শক্তিশালী মনে হচ্ছিল বিজনের। ও সেফটি হ্যামারের দিকে আঙুল বাড়াতেই নমিতা সচকিতভাবে বলে উঠল, 'সাবধান! গুলি ভরা আছে।'

বিজন রিভলবারটা কাপড়ে মুড়ে নমিতাকে ফিরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'নমিতা, অশোকের কম্পিউটার আর কাগজপত্রগুলো আমি একটু ঘেঁটে দেখতে চাই। তুমি কোনও আপত্তি কোরো না, প্লিজ। হয়তো এ-থেকেই ওর শত্রুপক্ষের কোনও হদিশ পাওয়া যাবে।'

নমিতা স্বামীর পড়ার ঘরটা নতুন করে চোখ বুলিয়ে দেখছিল। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল আবার। বিজনের কথায় ও বলল, 'এখন আপত্তি করার সময় নয়, বিজনদা। আপনি যদি কিছু করতে পারেন করুন। আমার সে-ক্ষমতা কোথায়? আর আপনাকে একটা কথা বলি। শুধু টাকার জন্যে ও "র"-এর হয়ে কাজ করেনি। ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা দেশপ্রেমিক মানুষ লুকিয়েছিল। ঠিক আমার শ্বশুরমশাইয়ের মতো।'

অশোকের বাবা স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। বিজন সেটা জানে।

আট বাই আট মাপের ঘরের দুটো জানলাই খোলা ছিল। তা দিয়ে মেঘলা ঘষা আলো ঢুকছিল ঘরে। নমিতা সুইচ টিপে টিউব লাইটটা জ্বালিয়ে দিল। ছোট সিলিং পাখাটাও অন করে দিল।

এলোমেলো অগোছালো ঘর। এককোণে একটা ছোট টেবিল—তাতে বই, কাগজপত্র, কালি-কলম খেয়ালখুশি মতো সাজানো। টেবিলক্লথের রঙ একসময়ে হয়তো সবুজ ছিল, এখন তা কালচে সবুজ। তার ঝুলন্ত কোণাগুলোয় কালির দাগ, রঙের দাগ। অশোক হয়তো নিয়মিত কলমের বাড়তি কালি বা তুলির রঙ মুছেছে।

টেবিলের সামনে একটা হাতলবিহীন চেয়ার। পুরোনো হলেও তার কাঠের পালিশ ঝকঝক করছে। তার পাশে বড় মাপের একটা লিটার টিন। ধাতুর পাতে তৈরি জিনিসটার গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি প্রিন্ট করা। আর তার ভেতরটা বাজে কাগজের টুকরোয় ঠাসা।

টেবিল-চেয়ারের পাশেই ময়লা-আধময়লা জামা-কাপড়ের স্তূপ। এর নীচেই বোধহয় রয়েছে সেই বিদেশি কম্পিউটার। তার থেকে একটু দূরে, ঘরের বাঁ-দিকের দেওয়ালে দাঁড় করানো রয়েছে একটা একমানুষ লম্বা কাচের ঢাকনা দেওয়া বুক-কেস। তার বিভিন্ন তাকে বাংলা-ইংরেজি নানান বই। দু-একটা নাম পড়ে নিল বিজন। বেশির ভাগ

BanglaBook.org

বই-ই কম্পিউটার অথবা চিত্রকলার বিষয়ে। বই ছাড়া অশোকের হাতে আঁকা দু-তিনটে রঙিন শুভেচ্ছাপত্রও শোভা পাচ্ছে বুক-কেসের বিভিন্ন তাকে।

দরজা পেরিয়ে হাতদুয়েক দূরেই ডান দিকে মেঝেতে ম্যাগাজিনের টাল। তার পাশে সুতো দিয়ে বাঁধা দুটো কাগজের বান্ডিল। এ ছাড়া ম্যাগাজিনের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা আর হিজিবিজি স্কেচ করা কয়েকটা কাগজ এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

ঘরের দেওয়ালে হালকা-আকাশি রঙ। তিনটে পেরেকে অশোকের আঁকা তিনটে জলরঙের স্কেচ। সবই ল্যান্ডস্কেপ। তার মধ্যে একটায় চা-বাগান দেখা যাচ্ছে। চতুর্থ একটা পেরেকে ঝোলানো একটা একপৃষ্ঠার বারোমাসের ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারটা পাখার বাতাসে দুলছিল।

বিজনের চোখ দ্রুত সবকিছু দেখে নিচ্ছিল। ওর পিছনে দাঁড়ানো নমিতা বলল, 'আমাকে এ-ঘর ও গোছাতে দিত না।'

বিজন প্রথমে সুতো-বাঁধা কাগজের বান্ডিল দুটো খুলল। কাগজগুলো ওলটাতেই দেখল ছবি—অশোকের হাতে জলরঙে আঁকা। কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে দেখতে লাগল বিজন। গাছপালা, ঘাসে ছাওয়া মাঠ, কুয়াশা ঢাকা শীতের সকাল। আর তার পরেই নমিতার একটা ছবি। ছবির নীচে আট বছর আগের তারিখ। ছবিতে নমিতার লাজুক মুখ যেন কোনও কিশোরীর।

পাশের ঘরে ফোন বাজছে শুনতে পেল বিজন। ছবিটা নিয়ে ঘুরে নমিতাকে কিছু বলতে গিয়েই দেখল নমিতা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল ছবিটা থেকে। ওর চোখে জল। কোনওরকমে ও বলল, 'ফোনটা ধরি গিয়ে। আপনি দেখুন—দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।'

নমিতা চলে গেল।

বিজন ছবিগুলো নামিয়ে রেখে ধৈর্য ধরে মেপে-মেপে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করল। যত সময় লাগে লাগুক, কিছুই ও বাদ দেবে না। যে-প্রশ্নটা এখন ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে তা হল, শত্রুপক্ষ হঠাৎ অশোক বসুকে ছেড়ে বিজনকে কেন বেছে নিল? বিজন তো 'র'-এর সঙ্গে কোনওভাবে জড়ায়নি!

অশোককে নিয়ে যেসব স্মৃতি ওর মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে জমা ছিল সেগুলো একে-একে যথাসম্ভব খুঁটিয়ে মনে করতে চেষ্টা করছিল বিজন। একইসঙ্গে ওর চোখ আর হাত অনুসন্ধানের কাজ করছিল। প্রতিটি কাগজ, প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি পাতা, ঘরের প্রতিটি সরঞ্জাম, কোনওকিছুই ও বাদ দিচ্ছিল না। ওর কাজের মাঝে একসময় নমিতা এসে বলে গেল, 'বিজনদা, আপনি দুপুরে এখানে খেয়ে যাবেন।'

শোকতপ্ত নমিতার কথায় কোথায় যেন একটা আবেদন ও আদেশ লুকিয়ে ছিল। তাকে অমান্য করার শক্তি ছিল না বিজনের। শুধু বলল, 'তোমার কোনও অসুবিধে না হলে আমার আপত্তি নেই...।'

নমিতা চলে যাওয়ার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে অশোকের লেখা অদ্ভুত চিঠিটা খুঁজে পেল বিজন।

লিটার বিনের ভেতরে দোমড়ানো বল-পাকানো অবস্থায় চিঠিটা পড়েছিল। অসমাপ্ত দীর্ঘ চিঠি। কী ভেবে সেটা আর শেষ করেনি, ডাকেও দেয়নি। কিন্তু চিঠির বক্তব্য জলের মতো পরিষ্কার।

BanglaBook.org

চিঠিটা দু-হাতে ধরে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল বিজন। ওর হাত কাঁপছিল। চোখের সামনে অনেকগুলো বিকৃত ছায়া খামখেয়ালিভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিরায়-শিরায় ধমনীতে-ধমনীতে রক্তবিন্দুগুলো পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে শুরু করেছে। মাথার মধ্যে অপুও শুরু করেছে ওর কচি গলার চিৎকার : 'সুপারম্যান! সুপারম্যান! সুপারম্যান!'

চিঠির লেখাগুলোর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলেও অক্ষরগুলো যেন ধরা দিচ্ছিল না বিজনের মগজে।

অন্তত মিনিটদুয়েক তাকিয়ে থাকার পর চিঠিটা পড়তে পারল বিজন। ওকে লেখা অশোকের অসমাপ্ত চিঠি। কম্পিউটারের প্রিন্টারের কাগজে ছোট-ছোট সুন্দর হরফে দু-পিঠে লেখা। কতগুলো শব্দ ও লাইন লিখে আবার কেটে দেওয়া। তার কিছু পড়া যাচ্ছে, কিছু দুর্বোধ্য। চিঠির তারিখ সপ্তাহদুয়েক আগের। অর্থাৎ, অশোক হয়তো ভেবেছিল, চিঠিতে নয়, বিজনকে মুখোমুখিই জানাবে সবকিছু। তাই চিঠিটা শেষ করে আর ডাকে দেয়নি। কিন্তু একইসঙ্গে ওর মনে হয়েছিল, যদি মুখোমুখি বিজনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ও আর না পায়। তাই হয়তো দিল্লি যাওয়ার আগে চিঠি লিখে সব জানাতে চেয়েছিল বিজনকে।

বিজন চিঠিটা পড়ল।

প্রিয় বিজন,

বিপদে পড়ে তোকে এ-চিঠি লিখছি। তুই জানিস না, প্রায় সাড়ে সাত বছর ধরে আমি ভারত সরকারের একটা তদন্ত বিভাগের হয়ে গোপনে কাজ করছি। গত দশ বছর ধরে একটা শক্তিশালী অপরাধী চক্র আমাদের দেশে সক্রিয় রয়েছে। তাদের কাজ হল বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র চোরাপথে দেশে নিয়ে এসে উগ্রপন্থীদের জোগান দেওয়া এবং বিভিন্ন জরুরি গোপন সামরিক তথ্য অর্থের বিনিময়ে বিদেশে পাচার করা। হয়তো এরকম চক্র ভারতের বুকে নতুন নয়। কিন্তু এই দলটি কাজ করে অভিনব পদ্ধতিতে। ওদের একমাত্র অস্ত্র হল কম্পিউটার ও ফ্লপি ডিস্ক। অর্থাৎ ওদের কাজকর্মে কখনও কোনও কাগজ-কলম ব্যবহার হয় না বললেই চলে। ওরা সবসময় ব্যবহার করে কম্পিউটার। আর চোরাচালান ও গুপ্তচরবৃত্তির যাবতীয় তথ্য ওরা সঞ্চয় করে নানান ফ্লপি ডিস্কে। তারপর বিভিন্ন কৌশলে ফ্লপিগুলো পাঠিয়ে দেয় দেশের বাইরে। ফলে, দু-একবার ওদের দলের দু-চারজন অস্ত্রশস্ত্রসমেত বা কোনও গোপন নকশার ছবিসমেত ধরা পড়লেও দলের মূল চাঁইদের সঙ্গে তাদের কোনওরকম যোগাযোগ প্রমাণ করা যায়নি। ওদের ফ্লপি বেশ কয়েকবার সরকারি তদন্ত-বিভাগের হাতে এসেছে। কিন্তু সেগুলো এমন কৌশলে লক করা ছিল যে, ফ্লপির সঞ্চিত তথ্য তক্ষুনি পড়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং এইসব কারণেই কয়েকজন কম্পিউটার এক্সপার্ট জরুরি হয়ে পড়েছিল সরকারের কাছে। তাই তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওরা জেনেছিল, দলটির মূল ঘাঁটি কলকাতায়। এবং ভারতের বেশ কয়েকটি কম্পিউটার

BanglaBook.org

কোম্পানি এই চক্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। যাই হোক, আমি সরকারের তরফে কাজ করতে রাজি হওয়ার পর আমাকে বেশ কয়েকটা লক্‌ড ফ্লপি পড়তে দেয় ওরা। আমার কাছে ওগুলো আনলক করাটা কোনও সমস্যাই ছিল না। ফ্লপিগুলো পড়ে যেসব সূত্র আমি পেয়েছিলাম তা তেমন জোরালো নয়। শুধু একটা আবছা সন্দেহ দানা বেঁধেছিল মাত্র। তার ওপরে ভিত্তি করেই আমি কম্পিউটার কর্পোরেশনে চাকরি নিই। এবং আমার গোপন তদন্ত শুরু করি।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমি একা গোপনে অক্লান্তভাবে তদন্ত করেছি। বেশ কয়েকটা নাম-ধাম ও যোগাযোগের ঠিকানা জানতে পেরেছি আমি। আমার ইচ্ছে আছে সরকারি তদন্ত বিভাগকে অনুরোধ করব একই দিনে সব ক'টা ঠিকানায় তারা যেন হানা দেয়, আর যে-ক'জনের নাম আমি পেয়েছি তাদের যেন একইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহলে তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদে অনেক খবরই ফাঁস হয়ে যাবে। এ সবই আমার পরিকল্পনা, তবে কাজে কতটা সফল হব জানি না। আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে সব কাজ আমি শেষ করে যেতে পারব না।

গত দু-তিনমাস ধরে আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি শত্রুপক্ষ আমাকে সন্দেহ করছে। আমার গতিবিধির ওপরে ওরা নজর রাখছে। সেইজন্যেই আমি সবসময় দিল্লির হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে পারছি না, দেখা করতে পারছি না। শুধু চুপচাপ বসে আছি সুযোগের অপেক্ষায়। আমার তদন্তের যাবতীয় তথ্য একটা ফ্লপিতে আমি স্টোর করে রেখেছি। সেটা যাতে কেউ পড়তে না পারে তার জন্যে তিনটে অদ্ভুত সফ্‌ট লক ব্যবহার করেছি—তবে তুই হয়তো সেটা আনলক করতে পারবি।

যাই হোক, নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে আমি একটা অন্যায় কাজ করেছি। তার জন্যে তোর কাছে ক্ষমাও চাইছি, বিজন। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না।

আমি যখন টের পেলাম যে আমার...আমার জীবন বিপন্ন, তখন আমি একটা চাল চাললাম। আমি কতগুলো সাজানো জাল সূত্র কায়দা করে তুলে দিলাম শত্রুদের হাতে। সেইসব সূত্রের মাধ্যমে এমন ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে...তুই...তুই বিজন আমাকে তদন্তে সাহায্য করছিস। এটা করার কারণ নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। যাতে ওরা বুঝতে পারে শুধু আমাকে সরিয়ে দিলেই ওদের পথের কাঁটা পরিষ্কার হবে না। আমার পরে তুই থাকবি—আর-এক সফ্‌টওয়্যার এক্সপার্ট বিজন চৌধুরী, যে আমার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

তুই হয়তো ভাববি, আমি কী ভীষণ স্বার্থপর। এতদিনের বন্ধুত্বের বিনিময়ে তোর গলায় কাঁকড়াবিছের মালা ঝুলিয়ে দিলাম। যার স্পর্শে শিহরন জাগে, দংশনে জ্বালা হয়। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে দেখেছি, তোর নাম ছাড়া অন্য কারও নাম ওরা বিশ্বাস করবে

BanglaBook.org

না—ধরে ফেলবে যে, আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে বাঁচতে চাইছি। তুই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একইসঙ্গে সফট্‌ওয়্যার ওস্তাদ—তাই বিশ্বাস করতে ওরা বাধ্য যে, অশোক বসু একা নয়, তার পেছনে রয়েছে বিজন চৌধুরী।

নমিতার জন্যে আমার ভয় হয়। আমাকে কাবু করতে ওরা ওর ওপরে কোনও হিংস্র অত্যাচার না করে বসে। এদের দল অনেক বড়, এবং এরা ভয়ঙ্কর, নৃশংস। কোনও কিছু করতে এদের হাত কাঁপে না। যেখানে কয়েকশো কোটি টাকার খেলা, সেখানে হাত না-কাঁপাই স্বাভাবিক। তাই নমিতার কথা ভেবেও তোর নাম আমি ওদের শত্রুর তালিকায় জুড়ে দিয়েছি। তুই তো জানিস, বাবা দেশের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছিল। আমারও তাতে ভয় নেই। আশা করি তোরও নেই।

তোকে এসব কথা মুখোমুখি জানাব ভেবেছিলাম, কিন্তু পারিনি। এমনিতেই আমি বেশি কথা বলতে পারি না! তার ওপর তুই হয়তো আমাকে নীচ ভাববি। তোর চোখের ঘৃণা আমি সইতে পারব না। তাই এই চিঠি লিখছি। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না। আর-একটা কথা, শত্রুপক্ষ তোকে হয়তো আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। হয়তো তোকে দিয়ে ওদের ফ্লপি লক করাতে পারে যাতে অন্য কোনও এক্সপার্ট সহজে তা আনলক করতে না পারে। কিংবা আমার কোনও ফ্লপি কোনওভাবে কপি করে চুরি করে তোকে দিয়ে আনলক করানোর চেষ্টা করতে পারে। তুই সে-ব্যাপারে সাবধান থাকিস। আমার সন্দেহ হচ্ছে, ইদানীং কেউ আমার ফ্লপি আমার অজান্তে কপি করে নিচ্ছে। সাধারণত আমি ফ্লপিগুলো চোখের সামনে অযত্নে ফেলে রাখি—যাতে কেউ সন্দেহ না করে যে, ওরই মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও ফ্লপি রয়েছে। আমার কাজের ফ্লপির সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটা অকাজের ফ্লপি আমি মিশিয়ে রাখি—যাতে কপি করা বা চুরি করার কাজটাও সহজ না হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও...যাই হোক, তোকে সংক্ষেপে সব জানালাম। শিগগিরই দিল্লি যাচ্ছি। ওদের চোখ এড়িয়ে তদন্ত-দপ্তরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। জানি না পারব কি না। তুই কি এসব পড়ে আমাকে খুব ছোটলোক ভাবছিস? আসলে ভয় পেয়ে গিয়ে আমার মাথাটাই গেছে ওলটপালট হয়ে। ঠিক বুঝতে পারছি না—মানে, কী করব, কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। বন্ধুর জন্যে আর দেশের জন্যে একটু ঝুঁকি তুই নিতে পারবি না? ওদের কথা ভেবে তোর জন্যে আমার আরও বেশি ভয় হচ্ছে। তুই যদি—

চিঠিটা এখানেই শেষ। শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে দিল্লিতে আর যোগাযোগ করতে পারেনি অশোক। চিঠিটা বারকয়েক পড়ার পরেও বিজনের হাত কাঁপছিল। ও ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল চেয়ারটার কাছে। ধপ করে বসে পড়ল। টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে

BanglaBook.org

হাতের চেটোয় মাথা ঝুঁকিয়ে বসেই রইল। ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। অসহায় অশোক বসু এক দুর্দান্ত শত্রুর মালা ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছে বন্ধুত্বের বিনিময়ে। এ-মালা এখন খুলে ফেলার উপায় নেই। টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে হবে নিষ্ঠুরভাবে। মাথার যন্ত্রণার মধ্যেও অপুর চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল বিজন। আর মা-ও দু-হাত নেড়ে পাখি ডাকছিল। রাজধানী এক্সপ্রেস বারবার ছুটে যাচ্ছিল ওর মাথার ভেতর দিয়ে।

ভয়ত্রস্ত বিজনের ঠোঁটে তেতো হাসি ফুটে উঠল। ওকে মরিয়া হয়ে শত্রুর খোঁজ করতে বলেছিলেন তরুণ দত্ত। বলেছিলেন, এ-ধরনের নিষ্ঠুর আক্রমণের কোনও মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না। বিজনের সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতা আছে এমন কোনও লোকের নাম জানতে চাইছিলেন তিনি। আজ সকাল পর্যন্তও বিজন মনে-মনে শত্রু খুঁজে বেড়িয়েছে। সম্ভব-অসম্ভব সবরকম নামই ভেবেছে, চুলচেরা বিচার করেছে। কিন্তু সঠিক নিশ্চিত কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। আর এখন?...কত মোটিভ চাই? কত শত্রু চাই!

বিজনের মাথার ভেতরে বিভিন্ন অঙ্কের উত্তর ধীরে-ধীরে মিলে যাচ্ছিল। মনে পড়ছিল অশোকের লেখা চিঠির লাইন, 'এদের দল অনেক বড়, এবং এরা ভয়ঙ্কর, নৃশংস। কোনও কিছু করতে এদের হাত কাঁপে না।' অপু ...গোলাপ...কবিতা...সত্যিই কোনও কিছু করতে এদের হাত কাঁপে না।

নমিতা বোধহয় খাওয়ার টেবিলে বসার জন্য বিজনকে ডাকতে এসেছিল। ওকে চেয়ারে ওই অবস্থায় বসা দেখে উৎকণ্ঠিত গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, বিজনদা?'

বিজন নমিতাকে দেখল। তারপর চিঠিটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। আলতো গলায় বলল, 'পড়ো, সব বুঝতে পারবে।'

চিঠিটা পড়ে শেষ করার পর মায়াময় চোখে বিজনকে দেখল নমিতা। একটা ক্ষুরধার বিপজ্জনক খেলার মাঝখানে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে এই আনকোরা খেলোয়াড়টিকে নামিয়ে দিয়ে গেছে অশোক। এখন খেলে যাওয়া ছাড়া এর কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ খেলা চলবে একে খেলে যেতে হবে। এলোপাথাড়ি শট নিতে হবে, প্রতিপক্ষের আক্রমণ রুখতে হবে, পালটা আক্রমণ করতে হবে। এ-খেলায় কোনও রেফারি নেই। সুতরাং নিয়ম-নীতির কোনও বালাই নেই। দু-দলের লক্ষ্য শুধু একটাই : জিততে হবে।

বিজন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। চিঠিটা ফেরত নিয়ে পকেটে রাখল। অশোকের কম্পিউটার ও ফ্লপির বাক্স সবই ও ঘেঁটে দেখেছে। কোন ফ্লপিতে কী আছে এখন দেখার সময় নেই। ও বলল, 'নমিতা, তুমি অশোকের সমস্ত ফ্লপি ডিস্কগুলো একটা প্যাকেটে করে লুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ-বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলো। দিল্লি থেকে কোনও খবর এলে তখন ঠিক করা যাবে কী করব। আর যে-ফ্লপিটা আমি তোমাকে দিলাম ওটা সময় হলে আমি চেয়ে নেব।'

নমিতা বলল, 'আপনি এখন খেতে চলুন—আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

বিজন ওর কাছ থেকে আরও দশমিনিট সময় চেয়ে নিল অনুসন্ধান নিখুঁতভাবে শেষ করার জন্য। তখন নমিতা অশোকের সমস্ত ফ্লপিগুলো জড়ো করে তুলে নিল বুকের কাছে। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

BanglaBook.org

একটু পরেই হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসল বিজন। সকালে স্নান সেরে বেরিয়েছে, তবু মনে হচ্ছিল আর-একবার স্নান করতে পারলে ভালো হত। শরীরের জ্বালা কিছুটা কমত। গত রাতের আঘাতের ব্যথাগুলো বিজন ধীরে-ধীরে আবার টের পেতে শুরু করল।

বাড়ির আর-সকলের খাওয়ার পাট আগেই চুকিয়ে দিয়েছে নমিতা। এখন মাছ-ভাত-ডাল-তরিতরকারির বাটিগুলো টেবিলে সাজিয়ে ও বিজনের মুখোমুখি বসল। বিজনকে থালায় ভাত বেড়ে দিল। নিজেও সামান্য নিল। দুজনেই চুপচাপ। শুধু ইস্পাত এবং চিনেমাটির ঠোকাঠুকির আলতো শব্দ উঠছিল থেকে-থেকে।

বিজন খাওয়া শুরু করল। নমিতা খাওয়ার বদলে আনমনাভাবে খাবার খুঁটতে লাগল। মাঝে-মাঝেই ও চোখ তুলে বিজনকে দেখছিল। আর চোখাচোখি হতেই নজর নামিয়ে নিচ্ছিল, বোধহয় অশোকের কথা ভাবছিল নমিতা। চোখ তুলে পরিচিত জায়গায় অশোককেই ও দেখতে চাইছিল। কিন্তু তার জায়গায় বিজনকে দেখে হয়তো কষ্ট হচ্ছিল ওর।

খেতে-খেতে বিজন জিগ্যেস করল, 'এখন কী করবে ভাবছ?'

নমিতা চোখ নিচু করেই জবাব দিল, 'কিছু ঠিক করিনি। বছরদুয়েক আগে বিউটিশিয়ান কোর্সের একটা ডিপ্লোমা নিয়েছিলাম। দেখি, ওটা দিয়ে কিছু করা যায় কি না।'

বিজন বলল, 'আজ অফিস বন্ধ। কাল আমি গিয়ে খোঁজ নেব অশোকের কী পাওনা আছে কোম্পানি থেকে। এদিককার নিয়মকানুনের ব্যাপারটা চুকে গেলে তুমি অফিসে এসো। ...টাকাগুলো তোমার কাজে লাগবে।'

বিজন লক্ষ করল, নমিতা মাছ খেল না। কতগুলো সনাতন প্রথা যুক্তির চেয়েও বড় হয়ে ওঠে, রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। হয়তো সেই কারণেই আধুনিকা হয়েও সব ক'টা নিয়ম বা প্রথা লঙ্ঘন করতে পারেনি নমিতা—অন্তত এখনও।

নমিতা বলল, 'দু-চারদিন পরে যাব। আর...আর...ককিতাদি-গোলাপকে দেখতে যাব আমি।'

বিজন বলল, 'এখন কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না। আমি পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। আর এখনও ওই ফ্ল্যাটেই আছি, দরকার হলে ফোনে খবর দিয়ো। ফোন নম্বর জানো তো?'

নমিতা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'জানি। ওর ডায়েরিতে লেখা আছে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আপনি ফোন করে জানাবেন ককিতাদি-গোলাপ কেমন আছে।'

বিজন খেতে-খেতেই ঘাড় নাড়ল। তারপর জিগ্যেস করল, 'অশোক ডায়েরি লিখত?'

'ওর ডায়েরিতে ফোন নম্বর ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই। ডায়েরিটা শোওয়ার ঘরে টেলিফোনের পাশে রাখা থাকত, এখনও তাই আছে।'

বিজন লক্ষ করল নমিতা দাঁতে দাঁত চেপে খাওয়ার চেষ্টা করছে। চোয়াল শক্ত করে অবরুদ্ধ কান্না চাপতে চাইছে। বিজনের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ও জল খেয়ে উঠে পড়ল। নমিতাও মাঝপথে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল একইসঙ্গে।

BanglaBook.org

বিজন বলল, 'এখন শক্ত হতে হবে, নমিতা। অশোক ফিরবে না জানি। কিন্তু ওদেরও আমি এক মুহূর্তের জন্য শান্তি দেব না। আর দিল্লি থেকে কোনও খবর পেলেই আমাকে জানিয়ো।'

হাত-মুখ ধুয়ে আসার পর নমিতা বিজনকে বলল একটু জিরিয়ে যেতে। বিজন বলল, 'না, কাজ আছে। পরে আবার আসব।'

বিজন আলতো পায়ে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। নমিতাও এল ওর সঙ্গে-সঙ্গে। জিগ্যেস করল, 'এখন কী করবেন ভাবছেন?'

বিজন বলল, 'জানি না। ভাবছি আমার ভাইকে খবর দেব। একা-একা তেমন ভরসা পাচ্ছি না। কাল অপুর বডি রিলিজ করবে। আর কবিতার স্টেটমেন্ট নেবে পুলিশ। সারাদিন হয়তো ব্যস্ত থাকতে হবে। কিন্তু তারই ফাঁকে আমি একবার অফিসে যেতে চাই—নতুন চোখে অফিসটা একবার দেখতে চাই।...পরের আঘাতটা যে কোনদিক থেকে আসবে সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না...।'

নমিতা হঠাৎ বলে উঠল, 'একমিনিট দাঁড়ান, বিজনদা, আমি আসছি।'

দ্রুতপায়ে ভেতরের দিকে চলে গেল নমিতা। একটু পরেই ফিরে এল কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে। বলল, 'এটা আপনি রাখুন—অনেক ভরসা পাবেন।'

বিজন নমিতার দিকে তাকাল। ওর মধ্যে ধীরে-ধীরে লড়াইয়ের প্রবৃত্তিটা জেগে উঠছে। মনকে শক্ত বাঁধনে বেঁধে ফেলতে চাইছে নমিতা।

কাপড়ের পুঁটলি খুলে রিভলভারটা বের করে পকেটে ঢুকিয়ে নিল বিজন। গুলিভরা রিভলভার পকেটে ভরতে ওর হাত এতটুকু কাঁপল না, বুক ধুকপুক করল না তিলমাত্র। বিজনের হাসি পেল। রিভলভার না হয়ে জিনিসটা যদি অ্যাটম-বোমা হত তা হলেও ওর কোনওরকম ভাবান্তর হত না। গত দু-দিনে ও বিপদ নিয়ে খেলতে শিখে গেছে।

বিদায় নিয়ে পা বাড়াতেই পিছন থেকে নমিতা বলে উঠল, 'খুব সাবধানে থাকবেন, বিজনদা—আপনাকে আরও কত সইতে হবে কে জানে।'

বিজন পিছন ফিরে তাকাল না। সিঁড়ি নামতে শুরু করল। হঠাৎই যেন দীনেশ চোপরার কথা মনে পড়ল ওর। কী একটা কথা বলেছিল যেন দীনেশ? যা শুনে খটকা লেগেছিল বিজনের...।

রাস্তায় পা দিয়েই বিদ্যুৎ-চমকের মতো সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক কোটি কাক কর্কশ কা-কা ডাকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। ডাকতেই থাকল।

বিজন পকেটের অস্ত্রটাকে অনুভব করল। চোখ তুলল আকাশের দিকে। ঈশান কোণে মেঘ জমাট বেঁধে গাঢ় হয়েছে। একফোঁটা বাতাস নেই। কোনও গাছের পাতা কাঁপছে না। চারদিক থমথম করছে। আজও বোধহয় বৃষ্টি হবে। যখন হয় তখন এমনটাই হয়। বৃষ্টি ছুটি দেয় না একদিনও।

কাকের ডাক তখনও শুনতে পাচ্ছিল বিজন। সমবেত কর্কশ চিৎকারে কানের পরদা যেন ফেটে যাবে। অথচ তখনই ওর খেয়াল হল আশেপাশে একটা কাকও ওর নজরে পড়ছে না।

BanglaBook.org

বিজন বুঝতে পারল, কাকগুলো ওর মাথার ভেতরে ডাকছে। ওকে লড়াইয়ের নামার জন্য 'দুয়ো' দিচ্ছে, উত্তেজিত করছে।

বিজনের বুকের ভেতরে একটা হিংস্র জন্তু ছটফট করছিল। দীনেশ চোপরার কথাগুলো ও কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

আট

বাস ছুটছিল হাওড়ার দিকে। বিজনের কেমন ঝিমুনি আসছিল। ও ভিড় বাসের রড ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। গতকাল রাতের আক্রমণকারী লোকটার কথা ওর মনে পড়ছিল।

নরেন পালকে মোটামুটি সব ঘটনাই খুলে বলেছিল বিজন। শুধু বলেনি যে, কাটিং টুলটা ওর নিজের, আর লোকটার কালি-মাখা মুখে আরও বেশি করে কালি মেখে দিয়েছে ও। বিজন বলেছে, প্রাণ বাঁচাতে মরণপণ লড়াই ছাড়া ওর আর কোনও পথ ছিল না। নরেন পাল অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল বিজনের দিকে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা লোকটা বিরাট পালোয়ান কিছু নয়, তবে হাতাহাতি লড়াইয়ে বিজন চৌধুরীকে সে বোধহয় পরাস্ত করতে পারত। সেখানে তারই হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে ভয়ঙ্কর আঘাত করে বিবশ করে ফেলার কাজটা নেহাতই অবিশ্বাস্য মনে হয়—অথচ বাস্তবে তাই ঘটেছে। বিজন চৌধুরী এই কাজ করেছে! এই লোকটাই না কাল চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিল? বুকফাটা হাহাকারে চিৎকার করে উঠছিল বারবার। লোকটা পালটে গেল কেমন করে?

অবাক হলেও নরেন পাল কিছু বলেনি। রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে জোর দিয়ে বলে গিয়েছিল, মুখে কালি-মাখা লোকটার কাছ থেকে যেমন করে হোক সূত্র তারা আদায় করবেই।

সেই খবরটা নিতেই আজ সকালে তরুণ দত্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল বিজন। কিন্তু নতুন কোনও খবর মেলেনি। লোকটাকে সুস্থ করে তোলার জন্য হাসপাতালে দিতে হয়েছে। দিনদুয়েক বাদেই পুলিশ ওর ওপরে কাজ শুরু করবে। এই লোকটাই কি প্রথম দিন বিজনের ফ্ল্যাটে ঝড় তুলেছিল?

আগামীকাল কবিতার জবানবন্দি নেবে পুলিশ। তারপর প্রয়োজন বুঝলে ওকে নিয়ে গিয়ে ওই লোকটাকে শনাক্ত করানোর চেষ্টা করবে। আর গোলাপ? তমালদাকেও বলবে, একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট নিয়ে গিয়ে গোলাপকে হাসপাতালে দেখে আসার জন্য। ও কথা বলতে পারছে না কেন? একইসঙ্গে বিজনের মনে পড়ল অপুর কথা। কাল ওর বডি পাওয়া যাবে—তরুণ দত্ত আজ বলেছেন। তারপর...তারপর শুরু হবে এক বালকের শবযাত্রা। এক অপদার্থ পাগল বাপ তার মুখে আগুন দেবে।

বিজনের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল, আর অপু ছুটোছুটি করতে লাগল ওর বুকের মধ্যে।

এইরকম মনের অবস্থা নিয়েই সুজনের কারখানায় পৌঁছে গেল বিজন। শুনল,

BanglaBook.org

ও কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। গরমে এতটা পথ এসে বিজন দরদর করে ঘামছিল। একটু জিরিয়ে নিতে ও বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। বলল, সুজন এলে যেন বাড়িতে যায়—ওর সঙ্গে দেখা করে।

বাড়িতে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করল বিজন। বিছানায় বাবু হয়ে বসে হুমড়ি খেয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পাশের খোলা জানলা দিয়ে মেঘলা আলো এসে পড়েছে চশমার কাচে। এই জানলা দিয়ে দূরের ছুটে যাওয়া ট্রেন দেখা যায়। শোনা যায় কু-ঝিক-ঝিক। ছোটবেলায় বিজনরা কোথাও দেশ ঘুরতে যায়নি। ওদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য বাবার ছিল না। বেড়াতে যাওয়ার নাম করলেই বকুনি খেতে হত। তখন বিজন আর সুজন দুজনে মিলে এই জানলাটিতে এসে গরাদে মুখ চেপে কাঁদত। চোখ বুজে ছুটে যাওয়া ট্রেনের কু-ঝিক-ঝিক শুনত, আর শরীরটা দোলাত। এইভাবেই ওরা কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত, কন্যাকুমারী, রাজস্থান সব বেড়িয়ে এসেছে। মা-ও এই জানলা দিয়েই রেলগাড়ির আসা-যাওয়া দেখতে ভালোবাসত।

বাবা খুব খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়েন। বিজনের বাড়ির খবরটাও নিশ্চয়ই পড়েছেন। এখন ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। অবাক চোখে বিজনকে দেখলেন। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'কেমন আছিস?'

বিজন খাটের একপাশে বসে পড়ল। বলল, 'ভালো। তোমার শরীর কেমন আছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললেন, 'ওই আছি আর কী...।'

বিজন ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ফটো দেখছিল। তার কিছুটা দূরেই বাবা-মায়ের বিয়ের ফটো। খয়েরি মলিন হয়ে গেছে।

হঠাৎই বাবা বলে উঠলেন, 'খোকা, তোর কীসের কষ্ট?'

বিজনের বুকে যেন কেউ গুনে-গুনে তীর মারল, এবং সবক'টা তীরই নির্মমভাবে হৃদয়ে বিদ্ধ হল।

খোকা, তোর কীসের কষ্ট?

পুরোপুরি পাগল হওয়ার আগে মা দিনরাত্তির অস্থিরভাবে ছটফট করত, হঠাৎ-হঠাৎ রেগে যেত, কাঁদত। তখন বাবা একই কথা জিগ্যেস করতেন, 'নির্মলা, তোমার কিসের কষ্ট?' মা কাঁদতে-কাঁদতে বলত, 'সে কি আমি নিজেই জানি!'

বৃদ্ধের মুখে স্মৃতিবিধুর এই প্রশ্নটা শুনে বিজনের কান্না পেয়ে গেল। ও কথা বলতে সাহস পেল না, পাছে কান্নার শব্দ ঠেলে বেরিয়ে আসে। শুধু ঠোঁট চেপে মাথা নাড়ল : কোনও কষ্ট নেই।

বাবা আবার কাগজ পড়তে শুরু করলেন। বিজন উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করল। আর তখনই রুমালে টান লেগে নমিতার দেওয়া রিভলভারটা পড়ে গেল মেঝেতে। বিশ্রী শব্দ হল। বিজনের বুক ধড়াস করে উঠল। না, বাবা রিভলভারটা দেখে ফেলবেন বলে নয়। কোনও কারণে যদি গুলি-ভরা অস্ত্রটা থেকে গুলি ছুটে বেরোত?

ঝটিতি রিভলভারটা মেঝে থেকে তুলে নিল বিজন। পকেটে ঢুকিয়ে দিল আবার। বৃদ্ধ একদৃষ্টে ওকে দেখছিলেন। বিজন রুমালে চোখ মুছল, মুখ মুছল।

BanglaBook.org

ঠিক সেইসময়ে সুজন এসে ঢুকল ঘরে। বলল, 'কী ব্যাপার, দাদা?'

বিজন ওকে ডেকে নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। যাওয়ার সময়ে দেখল, বাবা আবার কাগজের ওপরে ঝুঁকে পড়েছেন।

সুজনকে মোটামুটি সব খুলে বলল বিজন। অশোকের চিঠি আর রিভলভারটাও দেখাল। তারপর চিন্তা জড়ানো সুরে বলল, 'দিল্লি থেকে কেউ না-আসা পর্যন্ত বা কোনও খবর না-পাওয়া পর্যন্ত তরুণ দত্তকে সব খুলে বলা যাচ্ছে না। আমি ভাবছি, আজ সন্ধেবেলা হসপিটালে কবিতা-গোলাপের সঙ্গে দেখা করার পর একবার অফিসে যাব। আজ অফিস বন্ধ। তবে দারোয়ান থাকে। নিরিবিলি অফিসে ঢুকে একবার তল্লাশি করতে পারলে মন্দ হয় না।'

একটু থেমে বিজন আরও বলল, 'তুই আমার সঙ্গে যাবি?'

সুজন দাদাকে দেখছিল। একটা ছাপোষা ভালোমানুষ লোক এই দু-দিনে কীরকম বদলে গেছে। চাপদাড়ি থাকা সত্ত্বেও চোয়াল শক্ত করলে টের পাওয়া যাচ্ছে। বিজন সিগারেট খাচ্ছিল। ধোঁয়ার এলোমেলো রেখায় ওর মুখের সাবলীল রেখাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। বহুদিনের চেনা দাদাকে খুঁজতে-খুঁজতে সুজন বলল, 'এই বিপদে তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। আমি তোমার সঙ্গে ক'দিন থাকতে চাই।'

বিজন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। বলল, 'আজ সকালেও আমি জানতাম না কে আমার শত্রু, কাদের সঙ্গে আমার লড়াই, কেনই বা লড়াই। তাই তোকে জড়াতে চাইনি। কিন্তু এখন সব প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। তাই একা ভয় পাচ্ছি...।'

সুজন দাদার হাত চেপে ধরল। টের পেল বিজনের ধমনির কাঁপুনি। বলল, 'তুমি আমাকেও কিছু করতে দাও।'

বিজন হাসল। এই প্রথম ও ভাইকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে—বিপদের দেশে, জঙ্গলে, বাঘের মুখোমুখি।

বিশাল বাড়ির পরপর চারটে ফ্লোর নিয়ে কম্পিউটার কর্পোরেশনের অফিস। ন'তলায় সিস্টেমস্ ডিজাইন ডিভিশন। আর তার ওপরের তলায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনমোহন আঙ্কিলার অফিস ব্লক ও অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট। সাততলায় এবং আটতলায় সেল্‌স অ্যান্ড সার্ভিস ডিভিশন, সফট্‌ওয়্যার ম্যানেজমেন্ট সেল, কম্পিউটার টেকনোভেশন সেল, জেনারেল অফিস ও ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

একতলায় অটোমেটিক এলিভেটরের কাছে টিউব লাইট জ্বলছিল। মোজেক করা মসৃণ মেঝেতে কাদা-পায়ের ছাপ। কারণ সন্ধের দিকে অল্পসময়ের জন্য দু-একপশলা ঝোড়ো বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিজন চকিত নজরে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল। অফিস বিল্ডিং-এর সামনেই পার্কিং স্পেস। সেখানে চারটে অ্যাম্বাসাডর আর একটা লাল রঙের কনটেসা দাঁড়িয়ে। কনটেসাটা বিজন চেনে। আঙ্কিলা সাহেবের গাড়ি। ইয়াকুব চালায়। ও সুজনকে সে-কথা জানাল। আঙ্কিলা সাহেব অফিসে রোজই প্রায় রাত ন'টা পর্যন্ত থাকেন। ছুটির দিনেও এই নিয়মের হেরফের হয় না। অবশ্য কলকাতার বাইরে গেলে বা বিদেশে থাকলে অন্য কথা।

BanglaBook.org

বিজন ঘড়ি দেখল। সোয়া আটটা। এমন কিছু রাত হয়নি। তবে বৃষ্টি-বাদলের জন্য রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা মনে হচ্ছে। আর কর্মব্যস্ত এই অফিস বিল্ডিং-এর বেশিরভাগ জানলাই এখন অন্ধকার। নিচের তলায় একপাশে কয়েকটা দোকান রয়েছে। সেগুলো অন্যদিন এ-সময়ে খোলা থাকলেও আজ নেই।

এলিভেটরে ওঠার সময়ে গেটের কাছে টুলে বসা দারোয়ানের দিকে তাকাল বিজন। লোকটা চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে। ঠোঁটের নীচটা সামান্য ঢিবি হয়ে ঝুলে আছে। বোধহয় খইনি পুরে বসে আছে। পায়ের শব্দে আধখোলা চোখে তাকাল লোকটা। বিজন ও সুজনকে একবার দেখে নিল। ততক্ষণে ওরা এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে।

বিজন বোতাম টিপল। গন্তব্য সিস্টেম্‌স্ ডিজাইন ডিভিশন। ও অশোকের বসার জায়গাটা একবার দেখতে চায়। জানতে চায়, সেখানে কোনও সূত্র অশোক রেখে গেছে কিনা।

এলিভেটর থেকে মেঝেতে পা রাখামাত্রই বিজনের গায়ে কাঁটা দিল। ও চারপাশে সতর্ক নজর চালাল। কেউ নেই। তবে সামনের কাচের দরজা পেরিয়ে ভেতরে যথেষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। আঙ্কিলা সাহেব কি জরুরি কোনও কাজ সারছেন? নাকি অন্য কোনও কাজপাগল কর্মী ছুটির দিনেও কাজে মত্ত?

সুজন দাদার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। অপরিচিতের সন্দিহান চোখে সবকিছু দেখে নিতে চাইছিল ও। বিজন ওকে হাত ধরে টানল। দুজনে এসে দাঁড়াল কাচের দরজার সামনে। কাচের ওপরে কম্পিউটার কর্পোরেশনের নেভি-ব্লু মনোগ্রাম—একজোড়া ইংরেজি 'সি' অক্ষর। তার নিচে লেখা : সিস্টেম্‌স্ ডিজাইন ডিভিশন।

বিজন দরজায় চাপ দিল। ওকে অবাক করে দিয়ে দরজা খুলে গেল। ওরা ভেতরে ঢুকে গিয়ে পাল্লাটা ছেড়ে দিতেই ডোর ক্লোজারের স্প্রিংয়ের চাপে ওটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

বিশাল অফিস ফ্লোর খাঁ-খাঁ করছে। রিসেপশানে কেউ নেই। দূরের চেয়ার-টেবিলগুলো সবই ফাঁকা। বিজন সুজনকে বলল, 'তুই ওই পার্টিশনটার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক। ওখান থেকে দরজাটার দিকে নজর রাখবি। আমি ওই কাচের ঘরগুলোর দিকে দেখছি। ওগুলো কম্পিউটার-রুম। ওর মধ্যে একটা কম্পিউটার ছিল অশোকের ব্যবহারের জন্যে। ওখানটা একটু খুঁজে-টুজে দেখব। আর সামনে ডানদিকে ওর বসার জায়গা ছিল। সেখানটাও বাদ দেব না।'

এয়ারকুলারের ভ্রমর-গুঞ্জন ওদের কানে আসছিল। এই শব্দটা যেন নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বিজন ভাইকে ঠেলে দিল সবুজ প্লাস্টিক কোটেড পার্টিশনটা লক্ষ্য করে। তারপর নিজে এগোল কম্পিউটার-ঘরগুলোর দিকে। ওখানে যেভাবে আলো জ্বালানো রয়েছে তাতে কেউ নিশ্চয়ই ভেতরে বসে কাজ করছে।

খানিকটা এগোতেই বিভিন্ন জিনিসের আড়াল সরে গেল বিজনের চোখের সামনে থেকে। তখনই লোকটার স্বাস্থ্যবান পিঠ দেখতে পেল। পরনে কালো-সাদা ছাপা বুশ শার্ট আর জিনসের প্যান্ট। পায়ে ভারী নর্থস্টার জুতো। একমনে কম্পিউটার কী-বোর্ডের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বোতাম টিপছে লোকটা। আর তার পাশের টেবিলে এলোমেলো অগোছালোভাবে ছড়ানো রাজ্যের ফ্লপি ডিস্ক।

BanglaBook.org

বিজনের বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। ওটাই তো অশোক বসুর কম্পিউটার—ওই যন্ত্রটাই অফিসে নিত্য ব্যবহার করত ও! আর পাশের টেবিলে ছড়ানো ফ্লপিগুলো যে-দেরাজ থেকে নেওয়া হয়েছে তার পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। অশোকের ফ্লপি রাখার দেরাজ।

কম্পিউটার-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল বিজন। অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে বাঁধানো কাচের দরজায় আস্তে-আস্তে চাপ দিল। এয়ারকুলারের ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা মারল ওর চোখে-মুখে। দরজার স্প্রিংটা বোধহয় পুরোনো হয়ে গিয়ে থাকবে। কারণ, সামান্য 'ক্যাচ' শব্দ হল। বিজনের হাত কাঁপছিল। ও সেই কাঁপুনি সামাল দেওয়ার আগেই ওর দিকে পিছন ফিরে বসে কী-বোর্ডে ঝুঁকে পড়া লোকটা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো ফিরে তাকাল।

চৌকো চোয়াল। মোটা গোঁফ। গালে বসন্তের দাগ। নাকের বাঁ-দিকে আঁচিল আর কপালের দু-পাশে ফিকে হয়ে আসা চুল।

দীনেশ চোপরা!

ওকে দেখেই সেই কথাগুলো স্পষ্ট পড়ে পড়ল বিজনের ঃ ...তোমার কপালে আরও দুঃখ আছে।

'আরও' দুঃখ! ওর ফ্ল্যাটে গত পরশু রাতে ঘটে যাওয়া নিষ্ঠুর দুর্ঘটনার কথা অফিসের কাউকে জানায়নি বিজন। খবরের কাগজেও ওর নাম উল্লেখ করে কিছু প্রকাশিত হয়নি। তা হলে 'আরও দুঃখ' বলল কেন দীনেশ? ও কি তাহলে জানত বিজনের প্রথম 'দুঃখের' কথা। জানত, বিকারগ্রস্ত হানাদারেরা তছনছ করেছে ওর সংসার? না, কোনও ভুল নেই। এত সহজ একটা যোগ অঙ্কের উত্তর কখনও ভুল বেরোতে পারে না। দীনেশ চোপরা, তুমিই তা হলে পরদার পিছনে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে চলেছ একনাগাড়ে? তুমিই আবার দাবি করছ, অশোকের 'সাথী' হয়ে ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তদন্ত করছিলে?

বিজনের গা গুলিয়ে উঠল। বমি পেয়ে গেল। শব্দ করে থুতু ফেলতে ইচ্ছে করল ওর। অতিকষ্টে সেই ইচ্ছে সংযত করল।

দীনেশের মুখে পলকের জন্য সতর্ক ভাব ফুটে উঠেছিল। কোনও আক্রমণের জন্য তৈরি করে নিয়েছিল নিজেকে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা মোলায়েম হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলল। বলল, 'হ্যালো, চৌধুরী। কী ব্যাপার, অসময়ে এখানে? কিছু নিতে ভুলে গেছ কি?'

বিজন একটা ফোম-আঁটা রিভলভিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ও বুঝতে পারছিল, রিংয়ের মধ্যে যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা হয় তখন লড়াই অনিবার্য। বিনা লড়াইয়ে রিং ছেড়ে কেউ যেতে পারে না। এখনও তাই। তবে ভদ্রতার কপট মুখোশ এখনও টেনে ছিঁড়ে ফেলেনি ওরা।

বিজন মাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'অশোকের ফ্লপি ঘেঁটে আর কিছু পেলে?'

দীনেশ চোপরা কোনও জবাব না দিয়ে আঁচ করতে চাইল পরিস্থিতি। ওর উদগ্রীব চোখ বিজনের ভেতরটা পড়ে ফেলতে চাইছিল।

বিজন সিগারেট ধরাল। কম্পিউটারের ঘরে ধূমপান নিষেধ। সেটা ও ভালো করেই

BanglaBook.org

জানে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর প্রচণ্ড অবাধ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করল। চোপরার মুখ লক্ষ করে বারকয়েক ধোঁয়া ছেড়ে বিজন বলল, 'চোপরা, আমি হাতে অঢেল সময় নিয়ে এসেছি। এবারে তুমি আমাকে মৌজ করে তোমার বানানো গালগল্পগুলো শোনাতে পারো। মানে, এই ধরো...তুমি অশোকের সঙ্গে টপ সিক্রেট কীসব তদন্ত করছিলে, একটা ফালতু ক্লপি পড়ে দিতে পারলে আমাকে রেস্তরাঁয় খাওয়াবে বলেছিলে...ইউ ক্যান টেল মি অল দ্য ফানি স্টোরিজ।'

দীনেশ চোপরা বাঘের মতো উঠে দাঁড়াল।

বিজন তখনও বলছিল, 'গতকাল রাতে আমার বাড়িতে ক্লপি চুরি করতে আর আগুন ধরাতে যে-দুটো লোককে পাঠিয়েছিলে তার মধ্যে একজন যে পুলিশের হেফাজতে তা নিশ্চয়ই জানো। আচ্ছা, অন্য লোকটা কেমন আছে? বেশি চোট পায়নি তো? আর হ্যাঁ—আমার কাছে যে-ক্লপিটা ছিল সেটা আমার বাড়িতে নেই। ওটা এমন এক জায়গায় রাখা আছে যে, কারও হাত সেখানে পৌঁছবে না।'

দীনেশ চোপরা একটা লম্বা পা ফেলে বিজনের খুব কাছে চলে এল। ডান হাতটা মুঠো করে সবে তুলেছিল মাথার ওপরে, বিজন চোখের নিমেষে জ্বলন্ত সিগারেটটা ওর গলায় চেপে ধরল। বসা অবস্থাতেই চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে উলটে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। চোপরা একটা চাপা আর্তনাদ করে দু-হাতে গলা চেপে ধরল। হিসহিসিয়ে বলল, 'ফাক য়ু!'

বিজন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমনসময় কম্পিউটার ঘরের টেবিলে রাখা সাদা টেলিফোনটা বেজে উঠল। দীনেশ চোপরা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজনের ওপরে। একটা প্রচণ্ড ঘুষি চালিয়ে দিল ওর বুক লক্ষ করে। বিজন আঘাত এড়াতে শরীরটা সামান্য কাত করেছিল। ফলে ঘুষিটা এসে লাগল বাঁ-কাঁধে। বিজনের শরীরটা লাট্টুর মতো কয়েক পাক ঘুরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা টেবিলের ওপরে। মাথাটা গুঁতো খেয়ে গেল একটা পিসি-র গায়ে। বিজন মাথায় হাত দিয়ে ব্যথার জায়গাটা অনুভব করতে গেল। টের পেল চটচটে ভাব। হাতটা চোখের কাছে এনে ধরার আগেই ওর কোমরে একটা প্রচণ্ড লাথি এসে পড়ল। একইসঙ্গে দীনেশ চোপরা বলে উঠল, 'হাউ ডু য়ু লাইক ইট, চৌধুরী? কেমন লাগছে?'

বিজন ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ওর শরীরের ধাক্কায় একটা চেয়ার উলটে গেল। ঘরের মেঝেতে রাবার টাইল্‌স পাতা থাকায় তেমন শব্দ হচ্ছিল না। বিজন চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছিল। দেখছিল দীনেশকে। ফোনটা তখনও বেজে চলেছে। দীনেশ চোপরা চাপা গলায় কী একটা খিস্তি করল। গলায় হাত বুলোতে-বুলোতে উলটে পড়ে থাকা একটা চেয়ার ডিঙিয়ে টেলিফোনের কাছে গেল। রিসিভার তুলে কথা বলল, 'হ্যালো, চোপরা স্পিকিং...হ্যাঁ, ইয়েস, স্যার...না, কিছু পাইনি...তার মধ্যে আবার চৌধুরী কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে...ওকে নিয়ে কী করব, স্যার?...হ্যাঁ, এখানেই রয়েছে...গাধাটাকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাই...ওর বউ-মেয়ের ওই দশা হল, ছেলেটা খরচ হয়ে গেল, তবু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই...হি মাস্ট বি রেডিং ম্যাড...আপনি কাউকে পাঠান, আমি ওপরে যাচ্ছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে...ও. কে. স্যার...।'

দীনেশ চোপরা ফোন নামিয়ে রাখল। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা বিজনের দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়েই পাথর হয়ে গেল। বিজনের হাতের ছোট্ট রিভলবারটাকে যথেষ্ট কুৎসিত দেখাচ্ছিল।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল বিজন। চোপরার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'ঠিক ধরেছ, আমি পাগল। পাগল বলেই এতক্ষণ এটা ব্যবহার করিনি।'

বলেই রিভলবার দিয়ে চোপরার বাঁ-গালে ভয়ঙ্কর আঘাত করল বিজন। সংঘর্ষের ধাক্কায় ওর কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। উনুনে কাঁচা কয়লা ফাটার মতো শব্দ হল। চোপরার গাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। বিজন রিভলবারের নলটা ওর নাকের ফুটোয় ঠেসে ধরল। বলল, 'গুলি করব? য়ু উইল লাভ ইট।'

দীনেশ চোপরা পাথর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে-কোনও দুর্ঘটনার।

বিজন বলল, 'জামা খোল। জলদি!'

ওর গলায় কী যেন ছিল। দীনেশ ওই অবস্থাতেই শার্টের বোতাম খুলতে লাগল পটাপট। তারপর জামাটা খুলে ফেলে দিল মেঝেতে। জামার নিচে গেঞ্জি ছিল না। ওর লোমশ বুক দেখা গেল। বিজন তখন ওকে প্যান্ট খুলতে বলল। আদেশ পালন করতে একটুও ইতস্তত করল না দীনেশ চোপরা—কারণ ও পেশাদার শয়তান। তক্কে-তক্কে রয়েছে সামান্যতম সুযোগের অপেক্ষায়। দীনেশের দু-পায়ের গোছের কাছে প্যান্টটা জড়ো হয়ে রইল। জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় কম্পিউটার-ঘরের ভেতরে বিচিত্রভাবে দাঁড়িয়ে রইল ও। নাকের কাছটা ব্যথা করছিল। গাল বেয়ে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে কাঁধে। এয়ারকুলারের বাতাসে শীত করছিল ওর। পাগলটা এখন কী করবে কে জানে।

হঠাৎই দীনেশের নগ্ন দেহে থুতু ছেটাতে শুরু করল বিজন। ঘেন্নায় বমি পাচ্ছিল ওর। এই লোকটা...এই নোংরা লোকটা ওর এতবড় সর্বনাশ করেছে! অশোক বসুকে শেষ করেছে নিষ্ঠুরভাবে। দেশের গোপন খবর নির্বিকারভাবে পাচার করে চলেছে বিদেশে।

কিন্তু দীনেশ চোপরা তো একা নয়। আর কে আছে? এইমাত্র কাকে ফোন করছিল ও? কথা শুনে মনে হয়েছে ওপরের তলায় কারও সঙ্গে ইন্টারকমে কথা বলছিল। স্যার, স্যার, করে যখন সম্বোধন করছিল তখন সেই ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই দীনেশ চোপরার ওপরওয়ালা স্থানীয় কেউ হবে। তবে সে কি এই কোম্পানির ওপরওয়ালা, নাকি ওদের গোপন দেশদ্রোহী চক্রের ওপরওয়ালা? বিজন চৌধুরীকে শায়েস্তা করতে এখন কাকে পাঠাচ্ছে সে? কাচের দেওয়াল ভেদ করে দূরে দেখতে চেষ্টা করল বিজন। কেউ কি ঢুকেছে এই ফ্লোরে? পার্টিশনের আড়ালে থাকায় সুজনকে দেখা যাচ্ছে না।

বিজন বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—অন্তত দীনেশ চোপরার সেইরকমই মনে হয়েছিল। কারণ, সেইজন্যই পেশাদার হওয়া সত্ত্বেও সে ঝুঁকিটা নিল। এক ঝটকায় বিজনের রিভলবার ধরা হাতটা সরিয়ে দিয়ে ডান হাতে বিজনের মুখ লক্ষ করে ঘুষি চালাল। ঘুষি লাগল বিজনের চোয়ালে। ও ছিটকে পড়ে গেল। আর একইসঙ্গে রিভলভারের ট্রিগারে চাপ পড়ায় কানফাটানো শব্দে এলোপাথাড়ি গুলি ছুটতে লাগল। একটা কম্পিউটারের টিভি ছিটকে গিয়ে লাগল কাচের দেওয়ালে। কম্পিউটার-ঘরের দুটো বড়-বড় কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। দীনেশ চোপরা গুলির আঘাত

BanglaBook.org

এড়াতে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল মেঝেতে। বিজনের নিয়ন্ত্রণহীন হাতে ধরা রিভলভারের শেষ দুটো গুলি ওর শরীরে আঘাত করল। দীনেশ চোপরা চিৎকার করে উঠল। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল বিজনকে। ওর কাঁধ আর পা থেকে রক্ত পড়ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে ওর প্রকাণ্ড শরীর।

গুলির শব্দ এবং কাচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ চমকে দিয়েছিল সুজনকে। ও আড়াল ছেড়ে ছুটে এল কম্পিউটার-ঘরের কাছে। পলকে ঢুকে পড়ল ঘরে। ঝুঁকে পড়ে বিজনকে তুলে ধরল মেঝে থেকে। বলল, 'তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলো। এখুনি পালাতে হবে এখান থেকে। কেউ হয়তো এসে পড়তে পারে।'

বিজন কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'একমিনিট দাঁড়া। দেখছি...।'

রিভলবারটা পকেটে ঢুকিয়ে বিজন টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। কী অনুমান করে মনমোহন আঙ্কিলার ঘরে ফোন করল। শুনতে পেল ফোন বাজছে। তখন সুজনকে চাপা গলায় বলল, 'ওই টেবিলের সবক'টা ডিস্ক গুছিয়ে তুলে নে, পরে কাজে লাগবে। আর ওই যে চেয়ার-টেবিলটা দেখা যাচ্ছে—' ইশারায় কম্পিউটার-ঘরের বাইরে কিছুটা দূরে একটা সুদৃশ্য চেয়ার-টেবিল দেখাল বিজন—অশোক বসু বসত ওখানে। সেটা দেখিয়ে সুজনকে বলল, 'ওখানে কাগজপত্র, ফ্লপি ডিস্ক যা পাস সব তুলে নিয়ে তুই বিল্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে যা। পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কর। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।'

সুজন দ্রুত হাতে কাজ শুরু করল। দীনেশ চোপরাকে একবার দেখে নিয়ে ওর ক্ষতস্থান দুটো জুতো দিয়ে রগড়ে দিল। দীনেশ দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠল। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে-ফেলতে বলল, 'প্লিজ, আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলুন। নয়তো ব্লিড করে-করে আমি শেষ হয়ে যাব। প্লিজ!'

সুজন ওর কথা গ্রাহ্য করল না। বউদি-গোলাপ ও অপুর কথা মনে পড়ছিল ওর।

ইতিমধ্যে বিজন ফোনে কথা বলতে শুরু করেছে। ও-প্রান্তের গলাটা চেনা হলেও অচেনা লাগছিল। আঙ্কিলা সাহেবের মতোই অথচ...।

বিজন গলার স্বরটা সামান্য বিকৃত করে হাঁপানোর ভান করে বলল, 'স্যার, চোপরা হিয়ার। কাউকে পাঠানোর দরকার নেই। চৌধুরী আমাকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করেছিল রিভলবার নিয়ে। আই টট হিম আ লেসন। এখন ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। আমি আপনার কাছে যাচ্ছি...।'

ওপাশ থেকে আদেশের ভঙ্গিতে কেউ বলে উঠল, 'ও কে. চোপরা, মেক ইট কুইক। আর বিজন চৌধুরীকেও অশোক বাসুর মতো একটা মোটরকার অ্যাকসিডেন্টের ব্যবস্থা করে দাও। ওর কাছ থেকে আমরা কোনওরকম সুবিধে পাব বলে মনে হচ্ছে না। হি. মাস্ট বি ফানি ইন দ্য হেড।'

ফোন ছেড়ে দিল ও-প্রান্ত থেকে। বিজনও রিসিভার নামিয়ে রাখল। ততক্ষণে সুজন ঘরের কাজ শেষ করে বাইরে রওনা হয়েছে। বিজনও খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ওর পিছন-পিছন বেরিয়ে এল।

আধমিনিটের মধ্যেই সুজনের কাজ শেষ হয়ে গেল। আহত রক্তাক্ত দীনেশ চোপরাকে খাঁ-খাঁ সিস্টেমস্ ডিজাইন ডিভিশনে একা রেখে ওরা দুজনে এগিয়ে চলল

BanglaBook.org

ফ্লোরের দরজার দিকে। চোপরার যন্ত্রণার আর্তনাদ ওদের কানে এসে আর পৌঁছচ্ছে না। বিজন যে-কোনও মুহূর্তে লোকজন আশা করছিল। কারণ, গুলির শব্দ নেহাত কম হয়নি। তবে এই ফ্লোরের প্রায় সবটাই শব্দ-নিরোধক। ফলে ফ্লোরের বাইরে শব্দগুলো তেমন জোরালো নাও শোনাতে পারে।

ফ্লোরের কাচের দরজা ঠেলে ওরা দুজনে বেরিয়ে এল বাইরে। সমস্ত কাগজপত্র এবং রুপি একটা বড় ব্রাউন খামে ভরে প্যাকেট করে নিয়েছিল সুজন। এলিভেটর ব্যবহার না করে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বলল, 'আমি ট্যাক্সি ডেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি বেশি দেরি কোরো না।'

সুজন অদৃশ্য হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। বিজন এপাশ-ওপাশ তাকাল। কেউ নেই। ও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে।

ডিরেক্টরের অফিস-ব্লকে পৌঁছে বিজনের বুক ধুকপুক করে উঠল। কে রয়েছে এখন এই ফ্লোরে? আঞ্জিলা সাহেবের গাড়ি ও নীচে দেখেছে। উনি ছাড়া আর কেউ আছে কি?

কাচের দরজা ঠেলে সন্তর্পণে ভেতরে পা রাখল বিজন। অন্যদিনের মতো ডিরেক্টরের ঘরের দরজায় ইয়াকুবকে চোখে পড়ল না। আরও দেখল, অ্যাকাউন্টস ডিভিশনে কোনও আলো জ্বলছে না। ছুটির দিনে অনেক সময় অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ চলে। আজ কেউ নেই। তবে ডিরেক্টর্স ব্লকে নিয়মমাফিক আলো জ্বলছে। সেখানে এমন কোনও আড়াল নেই যা বিজনকে শত্রুপক্ষের নজর থেকে বাঁচাতে পারে। তবুও মরিয়া হয়ে বিজন সামনে এগিয়ে গেল। পকেটের খালি রিভলবারটাই এখন ওর একমাত্র জীবনবীমা।

প্রথমেই জ্যানেটের ঘরের দরজার চৌকো কাচের ছোট্ট জানলা দিয়ে উঁকি মারল বিজন। দেখল, ঘর খালি, জনিতা নেই। এরপর দ্বিতীয় ঘর—মনমোহন আঞ্জিলার ঘর। সেখানে কয়েকজনকে দেখতে পেল ও। জনিতা, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক হরিসাধন দত্ত এবং কম্পিউটার টেকনোভেশন সেলের ম্যানেজার বরুণ চক্রবর্তী প্রায় অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। বিজন ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। প্রত্যেকের মুখেই চিন্তার ছাপ। এ ছাড়া আরও দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল ঘরে। দরজার দিকে পিঠ করে তারা অন্য তিনজনের সঙ্গে কথা বলছিল। তবে কোনও কথাবার্তার শব্দই বিজন শুনতে পাচ্ছিল না।

আরও কয়েক লহমা ঘরের পরিস্থিতি দেখল বিজন। কী কথাবার্তা হচ্ছে ঘরে? ঘরের সকলেই কি জানে নীচের তলায় পড়ে থাকা আহত দীনেশ চোপরার কথা? জানে অশোক বসুর আসল রহস্য? পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোকের মধ্যে একজনের বাঁ-হাত তার পিঠের কাছে। অন্য হাতটা নেড়ে কথা বলছিল সে। বাঁ-হাতের আঙুলগুলো নড়াচড়া করছিল, তর্জনী দিয়ে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছিল। চাপা উত্তেজনা বা অস্বস্তিই কি এর কারণ? নাকি মুদ্রাদোষ? বিজন খুঁটিয়ে সবকিছু লক্ষ করছিল। তখনই দেখল, মানুষটার বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কালো। হয়তো কোনও পুরোনো আঘাতের চিহ্ন। আর দ্বিতীয় লোকটা সামান্য ছটফট করছিল। প্রথমজনের ভয়ে কিছুটা যেন তটস্থ।

কী ভেবে দরজায় কান পাতল বিজন। ঘরের ভেতরের কথাগুলো গুনগুন করে কানে এল ওর। মনে হল, আঞ্জিলা সাহেব বলছেন, 'চোপরার কী হল? এখনও আসছে না কেন? চক্রবর্তী, রিং হিম আপ—।'

বরুণ চক্রবর্তী ইন্টারকম টেলিফোন তুলে নিল। ডায়াল করতে লাগল। আঙ্কিলা সাহেব আবার বললেন, 'হোয়াট টু ডু উইথ চৌধুরী?'

কর্কশ গলায় কেউ বলল, 'ও কো-অপারেট করবে না। রাব হিম অফ। ওকে শেষ না করে দিলে ও আমাদের শেষ করে দেবে। আমাদের সবকিছু "র"-এর কাছে ফাঁস করে দেবে। ও এখন পাগলা কুকুর হয়ে গেছে।'

এমনসময় বরুণ চক্রবর্তী টেলিফোনে চিৎকার করে উঠল, 'কী বলছ, চোপরা! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি!' —তারপর ফোন রেখে উত্তেজিত গলায় বলল, 'চোপরা উন্ডেড। হি ইজ ব্লিডিং টু ডেথ। কথা শুনে মনে হল এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর চৌধুরী ওখানে নেই...ও অশোক বসুর সমস্ত ক্লিপ আর কাগজপত্র নিয়ে উধাও হয়েছে।'

বিজন সঙ্গে-সঙ্গে ছুট লাগাল দরজার দিকে। শরীর ক্লান্ত হলেও প্রাণের ভয় ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। এখনও কয়েকটা দিন ওকে বাঁচতে হবে। শেষ করতে হবে, গুঁড়ো করে দিতে হবে এই ভয়ঙ্কর চক্রকে। সুতরাং বিজন ছুটতে লাগল। কাচের দরজা পেরিয়ে এলিভেটরের কাছে এসে হাজির হল ও। ডিসপ্লে প্যানেলে দেখল, এলিভেটরটা কেউ থার্ড ফ্লোরে নিয়ে গেছে। এখন অপেক্ষা করার সময় নেই। বিজন সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। অন্তত দু-তিনতলা দ্রুত নেমে যেতে পারলে ও নিশ্চিন্ত। অপু ওর মাথার ভেতরে চিৎকার করছিল, 'জলদি, বাবা, জলদি—।'

তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো বিজন নেমে চলল নীচে। একতলায় নেমে ঝড়ের গতিতে টুলে বসা দারোয়ানকে পেরিয়ে গেল ও। লোকটা তখনও ঝিমোচ্ছিল। পায়ের শব্দে যখন চোখ মেলল, বিজন ততক্ষণে পার্কিং স্পেসের অর্ধেকটা জমি পেরিয়ে গেছে। তখন ভিজে যাওয়ার মতো বৃষ্টি পড়ছিল আকাশ থেকে।

বিজন ভিজতে-ভিজতেই পৌঁছে গেল পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতে। এপাশ-ওপাশ তাকিয়েই দেখতে পেল ট্যাক্সি ডেকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সুজনকে। ও কাছে যেতেই সুজন ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল। বিজন ঢুকে পড়ল। সুজন ওর পাশে বসে পড়েই ড্রাইভারকে বলল, 'চলুন—জলদি!'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল সুজন। বলল, 'দাদা, আজ রাতে তুমি ফ্ল্যাটে যেয়ো না। ওরা কোনও বিপদ তৈরি করতে পারে। এমনকী পুলিশে খবর দিয়ে তোমার নামে অ্যাটেম্প্‌ট টু মার্ডারের অভিযোগও আনতে পারে। ওদের হাতে প্রচুর টাকা। আর তোমার হাতে তো সেরকম কোনও প্রমাণ নেই...।'

প্রমাণ? অশোকের ক্লিপটা এখনও পড়া হয়নি। প্রমাণ হয়তো তারই মধ্যে পাওয়া যাবে। বিজন চোখ বুজে ট্যাক্সির সিটে গা এলিয়ে দিয়েছিল। বলল, 'তাহলে হাওড়াতেই চল। ওখান থেকে কোন করে বরং তরুণ দত্তর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। আর নমিতার কাছেও খবর নেব দিল্লি থেকে কোনও মেসেজ এসেছে কি না। নইলে এভাবে আমি আর পারব না।'

ক্লান্ত বিজনের মাথার ভেতরে অপু বলে উঠল, 'তোমাকে পারতেই হবে, ড্যাডি। ডোন্ট বি চিকেন।'

বিজন চোয়াল শক্ত করল। ওর হাতের আঙুল হাইস্পিড কাটিং টুলের আশ্বাস

BanglaBook.org

*

পাড়ারই এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে টেলিফোন করার ব্যবস্থা করে দিল সুজন। বিজন প্রথমে ফোন করল লালবাজারে। তরুণ দত্তকে পাওয়া গেল না। কথা বলল নরেন পাল, 'কী ব্যাপার, মিস্টার চৌধুরী? আপনাকে আমরা খুঁজে-খুঁজে হয়রান। সন্ধেবেলা হসপিটালে গিয়ে শুনলাম আপনি একটু আগেই চলে গেছেন। কাল আপনার ছেলের বডি রিলিজ করা হবে। তার নিয়ম-কানুন রয়েছে, সই-সাবুদের ব্যাপার রয়েছে...।'

বিজন বলল, 'দয়া করে রাগ করবেন না। আমার এখন মাথার ঠিক নেই। হঠাৎই এক বন্ধুর বাড়ি দেখা করতে চলে গিয়েছিলাম। কাল সকালে আমি আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। অনেক কথা বলার আছে। আর ফরম্যালিটি যা আছে সব কমপ্লিট করে দেব। আচ্ছা, কালই কি আপনারা আমার ওয়াইফের স্টেটমেন্ট নিচ্ছেন?'

ও-প্রান্তে নরেন পাল বলল, 'হ্যাঁ, আর উনি তেমন সুস্থ থাকলে হয়তো পুলিশ হসপিটালে নিয়ে যাব—ওই গুণ্ডাটাকে আইডেন্টিফাই করতে। দেখি, জরুরি কোনও ক্লু পাওয়া যায় কি না। কাল তাহলে আপনি আসছেন, উইদাউট ফেইল—।'

বিজন বলল, 'অবশ্যই যাচ্ছি—।'

তারপর ফোন রেখে দিল। সুজনকে বলল, 'এখনও আমার নামে কোনও অভিযোগ পৌঁছয়নি।'

দ্বিতীয় ফোনটা নমিতাকে করল বিজন।

ফোন বেজে ওঠার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নমিতার উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'বিজনদা, দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছিল। আজকের ইভনিং ফ্লাইটে "র" থেকে জয়ন্ত ভাটনগর নামে এক অফিসার কলকাতায় আসছেন। কাল সকাল আটটা নাগাদ উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনি...আপনি তখন থাকলে ভালো হয়।'

বিজন কী যেন চিন্তা করে বলল, 'উনিই যে আসল লোক তা তুমি বুঝবে কী করে?'

নমিতা বলল, 'অশোকের একটা কোড নম্বর ছিল। ট্রাঙ্ককলে সেটা ওরা ঠিক মতো বলতে পেরেছে। আর ভাটনগরের সঙ্গেও আমার কথা বলিয়ে দিয়েছে। তবে এ-ও বলেছে, ভাটনগর আমার বাড়িতে এলে আর-একদফা যাচাই করে নিতে।'

বিজন বলল, 'আমি কাল সকালে তোমার ওখানে যাচ্ছি। সঙ্গে আরও কয়েকটা ফ্লপি আর কাগজপত্র নিয়ে যাব। সবই অশোকের—অফিসে ছিল।'

নমিতা বলল, 'আপনি তাহলে সকালে আসছেন...আমি অপেক্ষা করব...।'

নমিতা ফোন ছেড়ে দিল। বিজনও ফোন রেখে রওনা হতে যাচ্ছিল, হঠাৎই কী ভেবে নিজের ফ্ল্যাটের নম্বরে ডায়াল করল। কয়েকবার রিং বাজার পরই কে যেন ফোন ধরল। কিছুটা চেনা, কিছুটা অচেনা গলায় বলল, 'হ্যালো, বিজন চৌধুরী বলছি। হু ইজ ইট?'

বিজনের বুক কেঁপে উঠল। ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেছে ওরা! কিন্তু কেন? দীনেশকে তো ও জানিয়ে দিয়েছে যে, ফ্লপিটা ওর বাড়িতে নেই। তাহলে...? ওরা বিজনের সন্ধানেই ওখানে যায়নি তো? অশোক বসুর মতো বিজন চৌধুরীকেও...।

ও-প্রান্ত থেকে আবার শোনা গেল, 'বিজন চৌধুরী বলছি। হু ইজ ইট?'

BanglaBook.org

বিজন দাঁতে দাঁত চাপল, বলল, 'আমিও বিজন চৌধুরী বলছি। হু ইজ দেয়ার?'

ও-প্রান্ত থেকে একটা হিংস্র হাসির শব্দ শোনা গেল। হাসির ধরনটা বিজনের টেলিফোন-ধরা হাতকে অবশ করে দিল। একটা ঠান্ডা জটিল জলস্রোত ছড়িয়ে পড়ল বিজনের প্রতিটি তন্ত্রীতে।

ও ফোন রেখে দিল।

নয়

সুজনের কাছ থেকে বাদামি খামের প্যাকেটটা নিয়ে বিজন যখন নমিতার বাড়ি পৌঁছল তখন দেখল জয়ন্ত ভাটনগর ওর আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন।

নমিতার ফ্ল্যাটের দরজার কাছে ছিপছিপে চেহারার একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ছোট-ছোট চোখ। সরু গোঁফ। মাথায় কাঁচা-পাকা কোঁকড়ানো চুল। গাল ভাঙা। নাকটা থ্যাবড়ানো। কোমরে বেল্ট। পরনে আকাশি ফুলশার্ট ও কালো প্যান্ট। চেহারায় ছিপছিপে হলেও জামার পাতলা কাপড়ের নিচে তার শরীরের ঢেউ খেলানো পেশিগুলো জানান দিচ্ছিল। বিজন দরজায় পৌঁছতেই লোকটা ওকে আটকাল। ভুরু কুঁচকে হিন্দিতে জিগ্যেস করল, 'কাকে চাই?'

বিজন নমিতার নাম বলল। তখন লোকটা বিজনের নাম জানতে চাইল। নামটা শোনার পরই একচিলতে হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলে বলল, 'গুড মর্নিং...অন্দর যাইয়ে।'

পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই নমিতাকে দেখতে পেল বিজন। গতকাল সোফায় যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে আছে আজ। ওর মুখোমুখি মাঝবয়েসি একজন লোক। চোখে চশমা। ঠোঁটে সিগার। কাঁচা-পাকা মোটা জুলপি। তার সঙ্গে মানানসই গোঁফ। পরনের জামা-প্যান্ট অতিরিক্ত ঢোলা।

ওদের সামনে টেবিলে জলখাবারের প্লেট ও ধূমায়িত চায়ের কাপ। মোটা ভদ্রলোক চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন।

বিজনকে দেখেই নমিতা উঠে দাঁড়াল। ইংরেজিতে বলল, 'আসুন, বিজনদা। ইনিই মিস্টার ভাটনগর, দিল্লি থেকে এসেছেন। ওঁকে মোটামুটি সব বলেছি।'

বিজন লক্ষ করল নমিতার চোখ ফোলা। ও হেসে ভাটনগরের সঙ্গে করমর্দন করল। নমিতা বিজনের পরিচয় দিল। তারপর বলল, 'বিজনদা, আপনারা কথা বলুন, আমি আপনার চা নিয়ে আসছি।'

নমিতা চলে যেতেই ভাটনগর বললেন, 'অশোক বাসুর কাছে আপনার নাম কয়েকবার শুনেছি। আপনাকে ধন্যবাদ না জানালে অন্যায় হবে, মিস্টার চৌধুরী। আর আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে আপনার যা ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে আমরা দুঃখিত। তবে কথা দিচ্ছি, দিল্লি ফিরে গিয়ে আমি চেষ্টা করব যাতে অন্তত কিছুটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়।'

বিজন দাঁড়িয়েই ছিল। সেটা লক্ষ করে ভাটনগর বললেন, 'আরে বসুন, বসুন। ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় অর্জুন থাপার আপনার সঙ্গে কোনওরকম খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

BanglaBook.org

বিজন সপ্রশ্নে তাকাতেই ভাটনগর বললেন, 'আমাদের ব্ল্যাক প্যান্থার কমান্ডো গ্রুপের এক্সপার্ট ফাইটার অর্জুন থাপার। ও দিল্লি থেকে আমার বডিগার্ড হয়ে এসেছে। ওকে বলেছি ফ্ল্যাটের দরজায় পাহারায় থাকতে। তাই জিগ্যেস করছিলাম—।'

বিজন মাথা নেড়ে জানাল, না সে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। তারপর হাতের প্যাকেটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ভাটনগরের মুখোমুখি বসল।

নমিতা ইতিমধ্যে চা-জলখাবার নিয়ে এসেছিল। বলল, 'বিজনদা, নিন, চা খান—।'

বিজন নমিতাকে বসতে বলল। প্লেট থেকে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে কামড় বসাল। তারপর ভাটনগরের দিকে তাকাল।

জয়ন্ত ভাটনগর কাশলেন। সিগারটা টেবিলের অ্যাশট্রেতে চেপে নিভিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'মিসেস বাসুর কাছে সব শুনেছি। এবারে আপনার কথা বলুন, মিস্টার চৌধুরী।'

বিজন চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে কথা বলতে শুরু করল। একটি ঘটনাও বাদ দিল না। কাউকে সবকিছু বলতে পেরে ওর ভালো লাগছিল। অপু-গোলাপ-কবিতার কথা বলার সময়ে বিজনের গলা ধরে এসেছিল। ভাটনগর ওর দিকে সহানুভূতি-মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। বিজন ওঁকে অশোকের চিঠিটা দেখাল। আর নমিতার দেওয়া রিভলভারটা পকেট থেকে বের করে ভাটনগরের হাতে তুলে দিল। ভাটনগর সেটা পকেটে রাখলেন।

সব কথা শোনার পর জয়ন্ত ভাটনগর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বারান্দার দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে কী যেন ভাবছিলেন।

কয়েকদিন মেঘলার পর আজ রোদ উঠেছে। বিজনের রোদ দেখতে ভালো লাগছিল। নমিতা শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, আর বিজনকে খুঁটিয়ে দেখছিল। এই দুঃখী অথচ বেপরোয়া একরোখা মানুষটাকে কি চেনা মনে হয়?

হঠাৎই ভাটনগর নীরবতা ভাঙলেন। বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু তবু আপনাকে একটা কথা বলে সান্ত্বনা দেব—আপনি যা করেছেন, সয়েছেন, সবই দেশের জন্যে। বাসু আমাদের বেশ কিছু ইনফরমেশান আগেই দিয়েছিল, তবে ওর ফ্লপির ভেতরে আরও জরুরি অনেক খবর থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আর এখন বাসু নেই...অতএব আপনাকেই ফ্লপির "লক" ভাঙতে হবে। আপনাকেই শেষ করতে হবে ওর অসমাপ্ত কাজ।'

বিজন মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ তুলে বলল, 'আমাকে এখুনি লালবাজারে যেতে হবে। কিন্তু ভাবছি, যদি কম্পিউটার কর্পোরেশন থেকে কোনওরকম ডায়েরি করা হয়ে থাকে বা দীনেশ চোপরার অবস্থা যদি খারাপের দিকে যায় তাহলে হয়তো পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারে। তখন ফ্লপি বা কাগজপত্র নিয়ে আপনার সঙ্গে কেমন করে বসব?'

ভাটনগর শব্দ করে হাসলেন, বললেন, 'কোনও সমস্যাই নয়। আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আপনার সঙ্গে যাব। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব। অফিসিয়াল সমস্ত ব্যাপার আপনি আমার ওপরে ছেড়ে দিন। দিল্লি থেকে আমি "টপ প্রায়োরিটি" অর্ডার নিয়ে এসেছি। সমস্ত ক্লিয়ারেন্স আমি সেরে নেব। তাহলে সারাদিনে আপনি আপনার

BanglaBook.org

কাজ শেষ করে নিন, সন্ধেবেলা আমরা বরং এখানে বসব। কারণ, বিশেষ ব্যবস্থা করে বাসুর কাছে আমরা একটা পার্সোনাল কম্পিউটার দিয়েছিলাম। সেটাতেই আপনি ফ্লপির "লক" ভাঙার কাজ সারতে পারেন।'

বিজন অনেকটা ভরসা পেল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ভাটনগরকেও অফার করল। কয়েকটা গভীর টান দিয়ে বিজন বলল, 'মিস্টার ভাটনগর, শুধু আর দুটো কথা...আমরা চলে গেলে মিসেস বাসু এখানে একা থাকবেন?...মানে, এই ফ্লপি আর কাগজপত্রগুলো এখানে থাকছে...।'

ভাটনগর জোরে একটা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন। চশমার ডাঁটিটা নেড়ে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'থাপার এখানে থাকবে। ও থাকলে মিসেস বাসুর কোনও ভয় নেই। বরং কেউ যদি এই ফ্ল্যাটে জোর করে ঢুকতে আসে তাহলে তার ভয় আছে। কারণ, ব্ল্যাক প্যান্থার গ্রুপকে মানুষ খুন করার বিস্তারিত ট্রেনিং দেওয়া হয়—আর থাপার সেই গ্রুপের এক্সপার্ট।'

বিজন উঠে দাঁড়াল। ভাটনগরের কথায় ওর গায়ে কাঁটা দিল। কত সহজে মানুষ খুন করার কথা বলছেন এই ভদ্রলোক। অথচ সে-কথা বলার সময়ে তাঁর মুখের হাসি-হাসি ভাবটুকু পর্যন্ত পালটায়নি।

ভাটনগর নমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিসেস বাসু, আমরা সন্ধের পর ফিরব। আপনি কোনওরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। ইতিমধ্যে আপনি আপনার স্বামীর ফ্লপিগুলো সব আনিয়ে রাখুন। থাপার ওগুলোর জিম্মা নেবে। ...আর, হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী, আর একটা কী কথা বলবেন বলছিলেন?'

বিজন ইতস্তত করে বলল, 'একটু আগে যে-রিভলভারটা আপনাকে ফেরত দিয়েছি ওতে আর গুলি নেই...মানে—।'

ভাটনগর হাত তুলে বিজনকে থামালেন। বললেন, 'জানি—দেখেছি। তবে আমারটায় আমাদের দুজনের আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট গুলি আছে।' —বলে ঢোলা প্যান্টের পকেট থেকে বেঢপ চেহারার একটা পিস্তল বের করলেন তিনি, বললেন, 'বার্জারসন অটোমেটিক গুটার—এতে মারাত্মক মার্কারি বুলেট ভরা আছে। একডজন গুলি ছোড়া যায় এ থেকে। চিন্তা করবেন না। আমার ট্রেনিংটা হল হ্যান্ডগান গুটিংয়ে—থাপারের মতো অতটা রোমাঞ্চকর না হলেও মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। চলুন, মিস্টার চৌধুরী, আর তাহলে দেরি করে লাভ নেই। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ।'

ভাটনগর দরজার দিকে এগোতে-এগোতে বললেন, 'আপনি আসুন, আমি থাপারকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে দিই। বাই, মিসেস বাসু—সি য়ু...।'

ভাটনগর পর্দার ও-পিঠে চলে যেতেই নমিতা উঠে এসে বিজনের হাত চেপে ধরল। অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'বিজনদা...আপনার চিন্তায় কাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি...।'

বিজন নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল না। বলল, 'নমিতা, আমি এর শেষ দেখবই। নইলে অপু আমাকে ক্ষমা করবে না, আর অশোকের বন্ধুত্বের ঋণও শোধ হবে না। শুধু তোমাকে নিয়েই আমার ভয় হয়, চিন্তা হয়...।'

হাতের ওপর উষ্ণ অশ্রুর ফোঁটা টের পেল বিজন। কী অদ্ভুত! অপরিসীম দুঃখ-বেদনা কীভাবে ওদের দুজনকে ক্রমশ এক অলৌকিক বন্ধনে বেঁধে ফেলতে চাইছে।

BanglaBook.org

বিজন হাত ছাড়িয়ে নিল, বলল, 'আসছি...সাবধানে থেকো...।'

ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে ভাটনগরের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বিজন নিজের হাতটা দেখল। অশ্রুবিন্দুটা এখনও চকচক করছে, মুক্তোর মতো। ওটা মুছতে ইচ্ছে করল না ওর।

সূর্য নিষ্ঠুরভাবে ডুবে যাচ্ছিল গঙ্গার ওপারে। সন্ধের ছায়াময় মলিন জলে পাড়ের ঘরবাড়ির ঘন ছায়া কাঁপছিল। বাতাস বইছিল বেহিসেবী। লালের ছোঁয়া-লাগা বিষণ্ণ মেঘের ওপর দিয়ে কালো ফুটকি হয়ে উড়ে যাচ্ছিল ঘরে-ফেরা পাখিরা। শ্মশানের এককোণে দাঁড়িয়ে বিজন কাঁদছিল। আর কবিতা ওর কাঁধে মাথা রেখে ওর জামা ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

ভাবতে অবাক লাগছিল, গঙ্গার তীরে সূর্যাস্ত এত নিষ্করুণ হতে পারে। সেই চেনা সূর্য, সেই চেনা ছলছল জল, সেই চেনা বাতাস আর বিজনের পরিচিত কাঁধ। অথচ সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক মর্মান্তিক শোকগাথা। ওদের চোখের সামনে একটু দূরেই অপুর অণু-পরমাণু জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

কবিতা চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। তিন দিন আগের ভয়ঙ্কর রাতটার কথা ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল। ও বিজনকে জাপটে ধরে কাঁদছিল। বলছিল, 'অপুর কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?'

বিজন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কোনও কথা বলতে পারছিল না। ওদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তরুণ দত্ত, নরেন পাল ও অচেনা আরও দুজন লোক। ভাটনগর ওদের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বলছিলেন। সুজন ও কুণাল শ্মশানঘাটের শেষ পর্যায়ের কাজ গোছাতে ব্যস্ত ছিল। আর তমাল বোন নিনিকে সঙ্গে নিয়ে বিজনদের কাছাকাছিই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

সন্ধের ছায়া ঘন হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সুজন ও কুণাল এসে বিজনকে ডাকল। ওরা সকলে নীরবে পা বাড়াল। পুলিশের দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল : একটা ভ্যান, আর-একটি মারুতি। তরুণ দত্ত ও নরেন পাল তাদের লোকজন নিয়ে তাতে উঠে রওনা হয়ে গেল। যাওয়ার আগে তরুণ দত্ত কী যেন বলে গেলেন ভাটনগরকে। বিজনকে আর বিরক্ত করলেন না। আরও দুটো প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। একটা সুজন ব্যবস্থা করেছে। অন্য গাড়িটা জয়ন্ত ভাটনগরের। কলকাতায় ক'দিন ব্যবহারের জন্যে গাড়িটা সম্ভবত ভাড়া নেওয়া।

বিজন ও কবিতা ভাটনগরের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠল। ভাটনগর গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসলেন। বিজন তাঁকে বলল, 'আমি ওকে নিয়ে আমার টালার বাড়িতে একবার যাব।' বিজনের কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে ভাটনগর গাড়ি চালাতে লাগলেন।

সুজন ও অন্যান্যরা দ্বিতীয় গাড়িতে ওদের অনুসরণ করল।

বিজন কবিতাকে দেখছিল। চুল এলোমেলো। চোখ-গাল বেয়ে এখনও জল পড়ছে। সেই সকালবেলা হসপিটালের ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে পুলিশ ওকে নিয়ে গিয়েছিল শনাক্তকরণের কাজে। কবিতা একরকম নির্দ্বিধায় শনাক্ত করেছিল হসপিটালের বিছানায় শয্যাশায়ী ঘৃণ্য লোকটাকে। তার আগে ও অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল বিজনের

BanglaBook.org

চোখের দিকে। হয়তো ওই কয়েকমিনিটে ও পড়ে নিতে পেরেছিল বিজনের মনের ব্যথা, দুর্দশা, বেদনা।

লোকটাকে শনাক্ত করার পর কবিতা কেন যেন কেঁদে ফেলেছিল। নরেন পাল ওদের বাইরে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'চিন্তা করবেন না, ম্যাডাম। এবারে ওকে এমন দাওয়াই দেব যে, ওর মনে হবে ও না-জন্মালেই ছিল ভালো। কোর্টে কেস ওঠার সময় আমরা পুরোপুরি তৈরি থাকব। উই শ্যাল ট্রাই আওয়ার লেভেল বেস্ট।'

কবিতার জবানবন্দি পুলিশ নিলেও তা থেকে বিশেষ সূত্র মেলেনি। তরুণ দত্ত ও নরেন পালের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাদা কথা বলেছিলেন ভাটনগর। পরে বিজন ও কবিতার সঙ্গে পুলিশ কথা বলতে চায়। ওদের সঙ্গে কথাবার্তায় বিজন বুঝল, ভাটনগর অশোক বসু, ফ্লপি বা কম্পিউটার কর্পোরেশনের কথা পুলিশের কাছে ভাঙেননি। এ-ও বুঝল, ওর নামে কোনও ডায়েরি বা রিপোর্ট এখনও লালবাজারে পৌঁছয়নি। মনে হয়, আঞ্জিলা সাহেব এ-ব্যাপারে পুলিশকে জড়ানোর ঝুঁকি নেবেন না। অন্তত এখনও। ওরা কি তাহলে বিজন চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব আঁটছে?

কবিতাকে আবার ফিরে যেতে হবে হসপিটালে। আরও দু-দিন মেডিক্যাল অবজারভেশানে থাকতে হবে। কিন্তু হসপিটাল থেকে বেরিয়েই ও একবার বাড়িতে যেতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'তোমার একা-একা খুব কষ্ট হচ্ছে, না গো?'

বিজন কোনও জবাব দেয়নি। কোনও কথা বলেওনি ওকে। ভাটনগরের সঙ্গে কবিতার পরিচয়ও করায়নি। শুধু ওর অনুরোধটুকু রাখার জন্য রাজি হয়েছে টালার বাড়িতে একবার যেতে। নইলে এখনও কত কাজ বাকি। তা ছাড়া, থাপারের পাহারায় নমিতা ওদের ফেরার অপেক্ষা করবে। দুশ্চিন্তা করবে।

বিজনের ফ্ল্যাটের কাছে এসে দুটো গাড়িই থামল। বিজন-কবিতা নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ভাটনগর বললেন, তিনি গাড়িতেই অপেক্ষা করবেন। সুজন, তমাল, কুণাল, নিনি ওরাও নেমে পড়েছিল পিছনের গাড়ি থেকে। বিজন সুজনকে বলল, 'তোরা অপেক্ষা কর, আমি ওকে একবার ওপরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

কবিতাকে নিয়ে বিজন ঢুকে গেল বাড়িতে। ওরা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রইল। নিচু গলায় কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল বিজন। অলিপথের আলো জ্বালল। কবিতাকে বলল, 'এসো, ভেতরে এসো—।'

দুজনে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বিজন সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল ঘরের।

কবিতার ঠোঁট কাঁপছিল থরথর করে। ও এগিয়ে এসে একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজনের বুকে। ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল আবার। দু-হাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল বিজনকে।

কাঁদতে-কাঁদতে কীসব বলছিল কবিতা। কিন্তু বিজন তার একবর্ণও বুঝতে পারছিল না। ও চোখ বুলিয়ে ফ্ল্যাটের খুঁটিনাটি দেখছিল। কারণ, ফ্ল্যাটটা আবার কেউ এসে লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে। সম্ভবত গতকাল রাতে। আর ওদের কাজের মাঝেই হয়তো বিজন ফোন করেছিল। তখনই কেউ একজন বিজন চৌধুরী সেজে উত্তর দিয়েছে।

BanglaBook.org

কবিতাকে জড়িয়ে ধরে বিজন বসবার ঘরে ঢুকল। বলল, 'কবিতা, এই তোমার ঘর—যেমন আগে ছিল তেমনই থাকবে। তুমি আবার সাজিয়ে তুলবে একে। আবার হাসি ফোটাবে গোলাপের মুখে, তোমার মুখে, আমার মুখে। তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ফিরে এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি—কিন্তু অপেক্ষা আর সইছে না।'

কবিতাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বিজন ফ্ল্যাটটা ঘুরে ফিরে দেখল। আবার কি ক্লিপিগুলোর খোঁজ করে গেছে ওরা? শোওয়ার ঘরে গিয়ে কবিতার প্রিয় একটা রেকর্ড বেছে নিয়ে এল বিজন। রেকর্ড প্লেয়ার চালু করে দিল নিচু গ্রামে। তারপর কবিতার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে গভীর চুমু খেল ওর ঠোঁটে। ওর মাথার এলোমেলো চুল গুছিয়ে দিল বারবার। শেষে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। কবিতার কোলে মুখ গুঁজে দিল। মরুভূমির ঝড়ে বালিতে মুখ লুকোনো উটের মতো বিজন যেন কোনও নৃশংস ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে চাইছিল। কবিতা ওর মাথায় হাত রাখল ইতস্ততভাবে। আর তখনই বিজন বলগাহীনভাবে কেঁদে উঠল। কাঁদতেই থাকল।

কবিতা ওকে শান্ত করতে চাইছিল। আর মাথার ভেতরে অপু বিজনকে বলছিল, 'বাবা, কী হচ্ছে এসব? তোমার কত কাজ এখনও বাকি জানো! অরণ্যদেব হলে এখন কী করত বলো তো? ডায়ানার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদত! ওঃ ড্যাডি, ডোন্ট বি আ সিসি!'

বিজন মুখ তুলল। চোখ-মুখ জ্বলছে। এই অপুটাকে নিয়ে মহা মুশকিল! এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয় না। ও উঠে পড়ল। রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ করে টানটান পায়ে হেঁটে ঢুকে গেল শোওয়ার ঘরে। বিছানার তোশক তুলল। কাটিং টুলটা জায়গা মতোই আছে। ও সেটা তুলে নিল। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে নিল অস্ত্রটা। তারপর বসবার ঘরে এসে চারপাশে তাকাল। হঠাৎই চোখ পড়ল টিভির ওপরে। অপুর পার্সোনাল পকেট কম্পিউটারটা এখনও একইভাবে পড়ে রয়েছে। কী খেয়ালে বিজন সেটা তুলে নিল হাতে। ওটা হাতে নেওয়ামাত্রই একটা অলৌকিক ভরসা খুঁজে পেল ও। এটা ও সঙ্গে রাখবে। নমিতাকে দেখাবে।

আঙ্কিলা সাহেবের ঘরের দৃশ্যটা মনে পড়ছিল বিজনের। ও একটা কালো কড়ে আঙুলের নখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

কবিতা কিছুটা অবাক হয়ে বিজনকে লক্ষ করছিল। একটু আগেই যে-মানুষটা অসহায়ভাবে চোখের জল ফেলছিল, এখন সে যেন কীরকম পালটে গেছে।

বিজন ওর কাছে এসে বলল, 'চলো, এবারে যাই—।'

কবিতা উঠে দাঁড়াল। নিজেকে সঁপে দিল বিজনের বুকে।

আর ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

এক মুহূর্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিজন। তারপর কবিতার কাঁধে সামান্য চাপ দিয়ে এগিয়ে গেল টেলিফোনের কাছে। কম্পিউটারটা টেবিলে রেখে রিসিভার তুলে নিল।

'হ্যালো—!'

'হ্যালো, আমি মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' ও-প্রান্ত থেকে মিষ্টি মেয়েলি গলা শোনা গেল।

'বিজন চৌধুরী বলছি।'

এ-কথা বলামাত্রই ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর থেকে শান্ত সংযত পোশাকটা খসে পড়ল।

BanglaBook.org

উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'হ্যালো এক্সপার্ট—জ্যানেট...জনিতা বলছি...।'

বিজন ভীষণ অবাক হল। জিগ্যেস করল শান্তভাবে, 'কী ব্যাপার? কী চাও তুমি?'

জনিতা বড়-বড় শ্বাস নিয়ে বলে উঠল, 'এক্সপার্ট, রাগ কোরো না। দিস ইজ ইমার্জেন্সি। তুমি এক্ষুনি পালাও...ওরা তোমাকে ছাড়বে না...।'

বিজন বলল, 'ওরা বলতে কারা? তার মধ্যে তুমিও তো আছ!'

ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর হোঁচট-খাওয়া গলায় বলল, 'আমি হেল্পলেস ছিলাম, এক্সপার্ট। এখন সেসব কথা এক্সপ্লেইন করার সময় নেই। শুধু আমার কথা মন দিয়ে শোনো। ওরা তৈরি হয়ে বেরোচ্ছে...দে আর আফটার য়ু...এক্ষুনি পালাও!'

বিজন ঠান্ডা গলায় বলল, 'জনিতা, তুমি কার দলে?'

জনিতা বোধহয় কেঁদে ফেলল। বলল, 'জানি না, এক্সপার্ট, জানি না। তোমাকে ওরা বিনা দোষে যে-শাস্তি দিয়েছে তা কেউই ক্ষমা করতে পারবে না। আমি আগে এতটা জানতাম না। গতকালই সব শুনেছি। আই ফিল ফর য়ু...বিলিভ মি, এক্সপার্ট।'

বিজন জিগ্যেস করল, 'দীনেশ চোপরা কেমন আছে?'

'শয্যাশায়ী।' জনিতা বলল, 'কিন্তু দীনেশ তো একা নয়। ওরা যে অনেক। আর ওরা শত্রুর কোনও বাছবিচার করে না। দে আর ভেরি-ভেরি রুথলেস। তুমি এক্ষুনি পালাও...।'

বিজন বলল, 'জনিতা, এখন তুমি যা করলে তার নাম বিশ্বাসঘাতকতা। ওরা জানতে পারলে...।'

জনিতা একটু থেমে বলল, 'এখানেও আমি হেল্পলেস, এক্সপার্ট...বিকজ আই লাইক য়ু...বিশ্বাস করো...নাউ ডু রান ফর গড্‌স্ সেক, উইল য়ু?'

বিজন দাঁতে দাঁত চাপল। কাটিং টুলের মোড়কের ওপরে ওর মুঠো শক্ত হল। বলল, 'থ্যাংক য়ু, জনিতা। তবে একটা কথা...তুমি ওদের পালাতে বলো। কারণ, আমি ওদের ছাড়ব না ঠিক করেছি। আর "র"-ও ছাড়বে না। সো, ডু মি আ ফেভর—টেল দেম টু রান লাইক ব্লাডি হেল!'

বিজন শব্দ করে ফোন নামিয়ে রাখল। কম্পিউটারটা তুলে নিয়ে কবিতাকে বলল, 'চলো—।'

কবিতা বিজনের মুখের রেখা পড়ে নিল। কী ভেবে আর জিগ্যেস করল না কে ফোন করেছিল। বিজন সব আলো একে-একে নিভিয়ে দিচ্ছিল। তখন কবিতা হঠাৎই বলতে শুরু করল, 'সেদিন কলিংবেলের শব্দ শুনে দরজা যেই খুলেছি, অমনি একটা অচেনা লোক ঢুকে পড়ে আমার পেটে লাথি মারল...তারপর...।'

বিজন ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'ওসব কথা থাক। ওগুলো এখন অতীতের কথা। আমি পরশু হসপিটালে তোমাকে নিয়ে আসতে যাব। আর তমালদাকে বলেছি গোলাপের জন্যে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট নিয়ে যেতে—ওখানে গোলাপকে পরীক্ষা করে দেখবে, কেন ও কথা বলতে পারছে না। ও ফিরে এলে ওকে সারিয়ে তোলাই হবে আমাদের একমাত্র কাজ, কবিতা। নতুন করে আমরা সবকিছু সাজিয়ে দেব ওর জন্যে, কেমন?'

কবিতা কাঁদতে শুরু করল আবার। বিজন ওকে নিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে

BanglaBook.org

এল। দরজায় চাবি দিল। বলল, 'তোমাকে হসপিটালে পৌঁছে দিয়ে আমি অশোকের বাড়িতে যাব। সেখানে অনেক জরুরি কাজ বাকি।'

ওরা দুজনে সিঁড়ি নামতে লাগল। বিজনের একহাতের মুঠোয় কাটিং টুল, অন্য হাতে অপুর কম্পিউটার। অপুর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বিজন বিস্তারিত শুনেছে। আজ অপুকে দেখেছে আবার। ওর শরীরের ভেতরে রক্ত ফুটছিল পাগলের মতো। শত্রুর দিকে হাতছানি দিয়ে পাগল মায়ের মতো ও যেন পাখি ডাকতে লাগল, 'আয়, কাছে আয়! তোরা একবার কাছে আয়!'

বিজনের মাথার ভেতরে ঝমঝম শব্দ তুলে অসংখ্য মেল ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল।

দশ

নমিতার বাড়িতে বিজন চৌধুরী ও জয়ন্ত ভাটনগর যখন পৌঁছল তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েই বিজন সুজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। বলেছে, ভাটনগরের সঙ্গে ওর কিছু গোপন কাজ আছে। পরদিন সুজনের সঙ্গে দেখা করবে।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল। ভাটনগর কোনও কথা না বলে বার্জারসন অটোমেটিকটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরলেন। তারপর একটা বিশেষ ছন্দে টোকা মারলেন দরজায়। বিজন লক্ষ করল, মাঝবয়েসি স্থূলকায় এই মানুষটা কেমন করে পলকে ওত পেতে থাকা শিকারি চিতা হয়ে গেল। বিজনও কাগজের মোড়ক ফেলে দিয়ে কাটিং টুলটা শক্ত মুঠোয় ধরে তৈরি হল।

ধীরে-ধীরে দরজা খুলল অর্জুন থাপার। বিজন দেখল, ইঞ্চিসাতেক লম্বা একটা সরু স্টিলের পাত ওর হাতের মুঠোয় ধরা। অস্ত্রটা ও হাত বরাবর লুকিয়ে রেখেছে।

ওদের দেখেই আশ্বস্ত ভাব ফুটে উঠল থাপারের মুখে। অস্ত্রটা কৌশলে জামার হাতার মধ্যে গোপন করে বলল, 'আইয়ে, স্যার—।'

ভাটনগর বিজনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। বসবার ঘরের সোফায় নমিতা বসে ছিল। ভাটনগরকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। ভাটনগর বললেন, 'মিসেস বাসু, যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে, তাহলে মিস্টার চৌধুরীকে নিয়ে আমি এখনই কাজ শুরু করতে চাই। আপনি ফ্লপি ডিস্কগুলো সব রেডি করে রেখেছেন তো?'

নমিতা বিজনকে দেখছিল। চমক ভেঙে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সব ডিস্ক আর কাগজপত্র ওর স্টাডিতে রেখেছি। ও-ঘরেই কম্পিউটারটা আছে।'

'ধন্যবাদ।' বলে ভাটনগর থাপারকে কাছে ডাকলেন।

অর্জুন থাপার ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। তারপর এগিয়ে এল ভাটনগরের কাছে। ভাটনগর ওকে বললেন, 'থাপার, তুমি মিসেস বাসুকে নিয়ে এই ঘরে অপেক্ষা করো। আমি মিস্টার চৌধুরীকে নিয়ে ভেতরের ঘরে যাচ্ছি, কাজে বসছি। দরকার পড়লে তোমাকে ডাকব। আর তুমি যে-কোনও সময়ে যে-কোনওরকম বিপদের জন্যে তৈরি থাকবে।'

থাপার নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

BanglaBook.org

তখন ভাটনগর নমিতাকে বললেন, 'মিসেস বাসু, ফ্ল্যাটে আপনার অন্যান্য যে-সব আত্মীয়-স্বজন বা লোকজন রয়েছেন তাঁদের বলবেন আমাদের যেন বিরক্ত না করেন। আমরা নিরিবিলি কাজ করতে চাই।'

নমিতা নীরবে সম্মতি জানাল। তারপর বলল, 'সামান্য চায়ের ব্যবস্থা করলে আপত্তি নেই তো?'

ভাটনগর হেসে বললেন, 'না, নেই। তবে আমাদের দুজনের চা-টা আপনার স্বামীর পড়ার ঘরেই দিন।'

এই কথা বলে ভাটনগর বিজনকে নিয়ে ফ্ল্যাটের আরও গভীরে ঢুকলেন, অশোক বসুর স্টাডিতে গেলেন। নমিতা চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। আর খাপার বসবার ঘরের একটা দেওয়াল ঘেঁষে নির্বিকারভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অশোকের স্টাডিতে পা রাখল বিজন। ঢুকেই দেখল, নমিতা এরই ফাঁকে ঘরটাকে অনেকটা গুছিয়ে ফেলেছে। সুটকেসবন্দি পার্সোনাল কম্পিউটারের কাছেই ফ্লপি ডিস্কের প্যাকেটগুলো সাজানো। তার পাশেই রয়েছে অশোকের অফিস থেকে পাওয়া কাগজপত্রের ছোট বান্ডিলটা। বিজন অপুর পকেট পিসি-টা অশোকের টেবিলে রাখল। ভাটনগরকে গাড়িতেই এটার কথা খুলে বলেছিল ও। তাই এখন তিনি কোনও প্রশ্ন করলেন না। পিসি-র পাশে ভারী কাটিং টুলটাও নামিয়ে রাখল বিজন। ভাটনগর অস্ত্রটা আবার দেখলেন, কিন্তু সমঝদার মানুষের মতো এবারেও কোনও প্রশ্ন তুললেন না। শুধু বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, এবারে তাহলে শুরু করা যাক।'

শুরু হল। জামা-কাপড়ের আড়াল সরিয়ে কম্পিউটারটা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিল বিজন। তারপর সুইচ অন করে যন্ত্রটার সামনে মেঝেতেই বসে পড়ল। ভাটনগর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বিজনের ঠিক পিছনে বসলেন। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে কম্পিউটারের টিভি পরদা লক্ষ করে চললেন।

বিজন দেখল, ওর দেওয়া ফ্লপিটা নমিতা আলাদা করে রেখেছে। ও সেটাকে প্রথমে নিল না। অন্য একটা ফ্লপি নিয়ে কম্পিউটারে ঢোকাতে-ঢোকাতে বলল, 'মিস্টার ভাটনগর, লক করা ফ্লপিগুলো আনলক করতে সময় লাগতে পারে। তার চেয়ে আগে লক-না-করা ফ্লপিগুলো চটপট দেখে নিই, তারপর লকড্ ডিস্কগুলো নিয়ে লেগে পড়ব।'

ভাটনগর সিগার ধরিয়েছিলেন। ভরাট গলায় বললেন, 'অ্যাজ ইউ লাইক। য়ু আর দ্য এক্সপার্ট।'

বিজন সিগারের গন্ধ পেল। ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে ও নিজেও একটা সিগারেট ধরাল। মাথার চুলে কয়েকবার আঙুল চালিয়ে আপনমনেই কী যেন বিড়বিড় করল। তারপর কম্পিউটারের কী-বোর্ড নিয়ে কেতাম টেপা শুরু করল। ভাটনগরের চোখ সার্চলাইট হয়ে জ্বলে রইল।

একের-পর-এক ফ্লপি পড়তে লাগল বিজন। যেগুলো পড়ে ওর মনে হল, ফ্লপিগুলো নিতান্তই কম্পিউটার কর্পোরেশনের ব্যবসা সংক্রান্ত, সেগুলো ও আলাদা করে রাখতে লাগল। আর যে ডিস্কগুলো পড়ে ও ধন্দে পড়ে গেল, রহস্যের গন্ধ পেল, সেগুলো দিতে লাগল ভাটনগরের হাতে। এই ডিস্কগুলোতে কতকগুলো কোড নম্বর ব্যবহার করে

BanglaBook.org

কিছু জায়গায় নাম, কিছু অস্ত্রশস্ত্রের নাম, দাম ও বিবরণ এবং কতকগুলো সাল-তারিখ রয়েছে। এইরকম ফ্লপি মোট তিনটে পাওয়া গেল। তারপরেই একটা লক্‌ড্‌ ফ্লপি ডিস্ক পেল বিজন।

ডিস্কটা আনলক করতে ওর মিনিট কুড়ি সময় লাগল। প্রথম লক ভাঙতেই টিভি পরদায় ভেসে উঠল অশোক বসুর লেখা সেই পুরোনো কথাগুলো। তবে তাতে একটাই পরিবর্তন নজরে পড়ল। দীনেশ চোপরার সেই ফ্লপিটার মতো এতে তিনটে লক নেই—রয়েছে দুটো লক। দ্বিতীয় লক আনলক করতেই পাওয়া গেল বিভিন্ন সাংকেতিক কোড নম্বর ও তার ব্যাখ্যা। এ ছাড়া বলা রয়েছে, অন্য তিনটে ফ্লপির যে-লেখাগুলো আপাতভাবে অর্থহীন খাপছাড়া মনে হচ্ছে তার অর্থ কেমন করে বুঝতে হবে। দু-একটা উদাহরণও দেওয়া রয়েছে তাতে। সেগুলো পড়ে ভাটনগরের নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হল। তিনি অনেকক্ষণ আগে নিভে যাওয়া সিগার দাঁতে চেপে বলে উঠলেন, 'মাই গড!'

নমিতা কিছুক্ষণ আগেই চা দিয়ে গেছে। ভাটনগর তাতে নিয়ম করে চুমুক দিচ্ছিলেন। কিন্তু বিজন দু-একচুমুকের পরই নিবিড়ভাবে ঢুকে পড়েছে কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যারের জগতে। ওর পাশে মেঝেতে রাখা কাপের চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

বিজন এবারে অফিস থেকে নিয়ে আসা ফ্লপিগুলোর শেষ ফ্লপিটা কম্পিউটারে ঢোকাল। দেখল সেটা লক করা। অনেক কসরতের পর লক ভাঙতেই আবার সেই একই লেখা। মোট তিনটে লক রয়েছে ফ্লপিতে। ক্রমে-ক্রমে দ্বিতীয় লক ভাঙল বিজন। তখন পড়তে পারল অশোকের লেখা :

> *'কে তুমি, তোমার নাম জানি না, চিনিও না। তবে তোমাকে অভিনন্দন। তোমার সফট্‌ওয়্যারে দক্ষতা আমি মেনে নিচ্ছি। অনেকটা এগিয়েছ তুমি। কিন্তু তিন নম্বর লকটা মোটেই সহজ নয়। ওটা যদি খুলতে পারো তাহলে ধরে নেব কম্পিউটারের ব্যাপারে তুমি আমার সমকক্ষ। আর তার পুরস্কার হিসেবে তুমি পড়তে পারবে সাংঘাতিক সব গোপন তথ্য—আমার তদন্তের ফলাফল। সুতরাং তৃতীয় লক খোলার খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।'*

বিজন নিভে যাওয়া সিগারেট ফেলে দিল একপাশে। অশোককে যেন চোখের সামনে ও দেখতে পাচ্ছিল। এমনিতে কম-কথা-বলা ছেলেটা ফ্লপিতে বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে। ও যে নেই সে-কথা যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না।

তৃতীয় লক খুলতেই ছোট-ছোট হরফের জ্বলজ্বলে লেখা ফুটে উঠল টিভি-র পরদায়। ভাটনগর শব্দ করে চেয়ারটা বিজনের আরও কাছে টেনে নিলেন। গলা বাড়িয়ে লেখাগুলো পড়তে লাগলেন। 'র', গোপন দেশদ্রোহী চক্র, অস্ত্রের চোরাচালান, সামরিক তথ্য পাচার ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ভাটনগর আশা করছিলেন যে, বিজন এবার ফ্লপির সমস্ত লেখা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ফুটিয়ে তুলবে পরদায়, কিন্তু বিজন তা করল না। ও ফ্লপিটা বের করে নিল। বলল, 'মনে হচ্ছে এই ফ্লপিটা থেকে দীনেশ চোপরা বেশ কয়েকটা কপি তৈরি করেছিল। তারই একটা ও মাসখানেক আগে আমাকে দিয়েছিল...।'

BanglaBook.org

বিজন কথা বলতে-বলতে পাশেই আলাদাভাবে রাখা ফ্লপিটা তুলে দেখাল ভাটনগরকে। বলল, 'আর সম্ভবত এটারই দ্বিতীয় একটা কপি দীনেশ চোপরা গত পরশু আমাকে আনলক করতে দিয়েছিল—যেটা পড়তে গিয়েও আমি পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আর দীনেশ একেবারে খেপে গিয়েছিল...।'

সুতরাং এবারে শেষতম ফ্লপিটা কম্পিউটারে ঢোকাল বিজন। আগের পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করেই আনলক করল ওটা, এবং পড়তে শুরু করল। হ্যাঁ, যা ভাবা গিয়েছে তাই। এই দুটো ফ্লপিই একে অপরের কপি। দীনেশ চোপরা অশোকের ফ্লপি চুরি করে ক'টা কপি বানিয়েছে কে জানে! তবে লক করা ফ্লপিগুলোর তালা নিশ্চয়ই ভাঙতে পারেনি ও। কারণ, পারলে বিজনকে আর পরশুদিন বিরক্ত করত না। লক না খুলতে পারলে অন্যান্য আনলকড্ ফ্লপিগুলোর তথ্যের প্রকৃত অর্থ বা গুরুত্ব দীনেশ চোপরা একবর্ণও বুঝতে পারবে না। বিজন মনে-মনে একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই ফ্লপিটার সব ক'টা লক খুলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে শুরু করল।

কম্পিউটার কর্পোরেশনের নামে নানান মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে সেখানে। আর রয়েছে সেইসব অভিযোগ প্রমাণের অভিনব সমস্ত হদিশ। যতই পড়ছিল, বিজন ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভাটনগর গম্ভীরভাবে একবার গলাখাঁকারি দিলেন।

হঠাৎই একটা পৃষ্ঠায় এসে বিজনের চোখ আটকে গেল। অশোক লিখেছে :

এই শয়তান চক্রের কলকাতার দলে যারা রয়েছে তার মধ্যে অন্তত দশজন কম্পিউটার কর্পোরেশনে চাকরি করে। এমনকী তাদের নেতাও। এই লোকটিই আমাকে অবাক করেছে বেশি। জ্যানেট অ্যাডারসন বা দীনেশ চোপরার মুখোশ খুলে যাওয়ার পর আমি অবাক হয়েছি ঠিকই, কিন্তু চক্রের নেতার পরিচয় আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে। অফিসের সকলেই তাকে চেনে, অথচ আসলে কেউ চেনে না। সকলেই রোজ তাকে দেখে, কিন্তু আসলে কেউ দেখে না। এই লোকটির ব্যক্তিত্ব চমকে দেওয়ার মতো। একই সঙ্গে সে সাহসী, এবং মরিয়া। আর তার বিশেষত্ব হল, তার বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কালো। এদের সবারই নাম-ঠিকানার লিস্ট আমি লিখে দিচ্ছি, আর সেইসঙ্গে এদের কুকর্মের প্রমাণ কীভাবে পাওয়া যাবে তার হদিশও দেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই জানিয়ে দিই দলপতির নামটা...।

ঠিক তক্ষুনি ফ্ল্যাটের দরজায় একটা বিশ্রী শব্দ হল। ভাটনগর ও বিজন ভেতরের ঘরে বসে কাজে মগ্ন থাকলেও আওয়াজটা ওদের কানেও বেখাপ্পা ঠেকল। ভাটনগর গুলির শব্দ চেনেন। উনি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন বিজনকে, কিন্তু তার আর সময় পেলেন না। তার আগেই অশোক বসুর স্টাডি-রুমের দরজা থেকে একটা চেনা কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল, 'ফ্রিজ! ছবি হয়ে যাও, নইলে ফটোতে মালা ঝুলিয়ে নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দেব...।'

ভাটনগর ধীরে-ধীরে পিছনে ফিরলেন। আর বিজন কম্পিউটারে ঢোকানো আনলকড্ ফ্লপিটাকে পলকে বোতাম টিপে লক করে দিল। তারপর তাকাল পিছনে। লোকটাকে দেখল।

BanglaBook.org

কম্পিউটার টেকনোভেশন সেলের ম্যানেজার বরুণ চক্রবর্তী।

আজ, এই মুহূর্তে, চক্রবর্তীর মুখটা অন্যরকম লাগছে। হিংসা এবং ক্রোধের কুটিল রেখা রসিক মানুষটার হাসিখুশি মুখের চরিত্র একেবারে পালটে দিয়েছে।

ভাটনগর ধীরে-ধীরে তাঁর হাত দুটো ওপরে তুলে ধরেছেন। বিজনও তাই করল। ওর চোখ জ্বালা করছিল আবার। ওর মাথার ভেতরে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে অপুর লাশ পুড়ছিল। মাংস-পোড়া গন্ধ পাচ্ছিল বিজন। আর সেইসঙ্গে একটা গাঢ় জান্তব গন্ধ। ওর গা গুলিয়ে উঠল।

বরুণ চক্রবর্তীর হাতে একটা কালো পিস্তল। তার সামনে বাড়তি একটা কালো লম্বা নল লাগানো। সাইলেন্সার?

পিস্তল নাচিয়ে চক্রবর্তী আদেশ দিল, 'বাইরে চলে আসুন, জলদি!' সে কোনওরকম অস্ত্রের জন্যে ওদের পকেট সার্চ করল না। ফলে এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই পরে সর্বনাশ ডেকে আনল।

ভাটনগর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে-ধীরে পা ফেলে এগোলেন স্টাডির দরজার দিকে। বিজনও তাঁকে অনুসরণ করল। চক্রবর্তী সরে দাঁড়িয়ে ওদের বাইরে বেরোতে দিল। তারপর ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ড্রইংরুমে—কুইক—।'

বসবার ঘরের দিকে যেতে-যেতে বিজন লক্ষ করল, শোওয়ার ঘরের দরজায় এবং রান্নাঘরের দরজায় বাইরে থেকে শেকল তোলা। নমিতা...নমিতা কোথায়? অর্জুন থাপার কী করছে? কোনও প্রতিরোধই কি তৈরি করতে পারেনি সে? চক্রবর্তীরা ক'জন এসেছে। জনিতা ফোনে বলছিল, ওরা বিজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে খ্যাপা কুকুরের মতো। এখন ওরা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কী করবে ওকে নিয়ে? অমানুষিক অত্যাচার করবে ওর ওপরে? ওকে দিয়ে জবরদস্তি করে আনলক করাবে অশোক বসুর লকড় ক্লপি? বিজনের ভেতরে একটা অদ্ভুত গোঁয়ার্তুমি জন্ম নিল। একটা জেদ টগবগ করে ফুটতে লাগল বুকের ভেতরে।

পিছন থেকে বরুণ চক্রবর্তী পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা মারল বিজনের পিঠে। বলল, 'জলদি...জলদি...।'

ওরা তিনজনে এসে পড়ল বসবার ঘরের দরজায়। একপলকে কয় জিনিস দেখে নিল বিজন।

অর্জুন থাপার সোফার পাশে মেঝেতে সটান শুয়ে। না, আহত নয়। তাকে শুয়ে থাকার আদেশ দিয়ে তার দিকে একটা রিভলবার তাক করে রেখেছে একজন মানুষ। বিজনদের দিকে পিছন ফিরে থাকায় বিজন তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তবে তার বাঁ-হাতটা রয়েছে তার পিঠের কাছে। হাতের আঙুলগুলো নড়াচড়া করছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে তর্জনীর নখ খুঁটছিল সে। আর তখনই বিজন কড়ে আঙুলের কালো নখটা দেখতে পেল। ওর বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল।

চোখের কোণ দিয়ে নমিতাকেও দেখতে পেল বিজন। ও ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে। না, একা নয়। একটা লোক কীসব জিগ্যেস করছে ওকে। লোকটার চেহারা ভারীর দিকে। মুখ ফিরিয়ে থাকায় তাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

বিজনদের নিয়ে ঘরে ঢুকেই চক্রবর্তী বলে উঠল, 'স্যার, নিয়ে এসেছি—।'

BanglaBook.org

নমিতার সঙ্গে যে কথা বলছিল সে ঘুরে তাকাল। বিজন চমকে উঠল। মনমোহন আঙ্কিলা!

কিন্তু আঙ্কিলাসাহেব চক্রবর্তীকে কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। বরং জবাব দিল থাপারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি। স্পষ্ট ইংরিজিতে কর্তৃত্বের সুরে সে মনমোহন আঙ্কিলাকে বলল, 'আঙ্কিলা, ইউ নো হোয়াট টু ডু উইথ দেম। ডু ইট কুইক।'

কথার বলার সময়ে লোকটা ঘুরে তাকিয়েছিল। তখনই বিজন তাকে দেখল।

ওর ভীষণ হাসি পেল তাকে দেখে। সত্যি, বিজনরা কী বোকা! অশোক ঠিকই লিখে গেছে...সকলেই তাকে চেনে, অথচ আসলে কেউ চেনে না। সকলেই রোজ তাকে দেখে, কিন্তু আসলে কেউ দেখে না...।

এই লোকটাকে দিনের পর দিন দেখেছে বিজন। অথচ দেখেনি। ওকে ভালো করে চেনে। অথচ একফোঁটাও চেনে না।

বিজন ঠান্ডা গলায় বলল, 'ইয়াকুব, কেমন আছ?'

ইয়াকুব বিজনের দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসল। বরুণ চক্রবর্তীকে লক্ষ করে বলল, 'চক্রবর্তী, চৌধুরীর ওপরে নজর রাখবে। হি ইজ আ ম্যাড বাস্টার্ড। দীনেশ চোপরা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে।'

বিজন অবাক হয়ে ভাবছিল। ওদের ধারণা ছিল ইয়াকুব হচ্ছে বড়সাহেবের খাস বেয়ারা। কিন্তু আসলে মনমোহন আঙ্কিলাই ছিল ইয়াকুবের 'খাস বেয়ারা'। আঙ্কিলাসাহেবের অফিস ছিল আসলে ইয়াকুবেরই অফিস। এর চেয়ে ভালো ছদ্মবেশ আর কী হতে পারে? একটা বেয়ারা অফিসের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। কেউ তাকে সন্দেহ করে না, প্রশ্ন করে না। এইভাবেই হয়তো সে কপি করে নিয়েছিল অশোক বসুর ফ্লপি। সবাই ইয়াকুবকে দেখেছে, কিন্তু তেমন করে কেউই দেখেনি। ও ছিল অফিসের অন্যান্য আসবাবপত্রের মতো।

সত্যি, ওর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

বিজন দেখল ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো, কিন্তু দরজার লকের কাছটা ভাঙা। হয়তো সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে ওরা লকটা উড়িয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে। এখন দরজা দিয়ে পালানোর কোনও পথ নেই। ইয়াকুব রয়েছে দরজার কাছে। ফিটফাট সাদা পোশাকে ওর ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোচ্ছে। মাথার চুল তেল দিয়ে পেতে আঁচড়ানো। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। চোখ চঞ্চল, সতর্ক।

আঙ্কিলাসাহেব নমিতাকে ছেড়ে এগিয়ে এলেন বিজনের কাছে। বিজন লক্ষ করল, তাঁর হাতে কোনও অস্ত্র নেই।

আঙ্কিলা বললেন, 'চৌধুরী, অশোক বাসুর সমস্ত ফ্লপি আমাদের চাই। আর ওগুলো তোমাকেই রিড করে দিতে হবে। এক্ষুনি! আমরা বাসুর স্টুডিতে আবার যাব। ওর পোর্টেবল্ কম্পিউটারে সমস্ত ফ্লপিগুলো পড়ে দেখব। সো, লেট্স্ গো।'

বিজনের মাথার ভেতরে অপু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল। 'সুপারম্যান! সুপারম্যান! সুপারম্যান!' আর মাংস-পোড়া গন্ধটা বিজনকে পাগল করে দিচ্ছিল।

আঙ্কিলাসাহেব বিজনকে নিয়ে পা বাড়ালেন। বরুণ চক্রবর্তীকে পাশ কাটানোর ঠিক আগের মুহূর্তে বিজন আচমকা তাঁকে ঠেলে দিল চক্রবর্তীর গায়ে। এবং একইসঙ্গে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের ওপরে।

BanglaBook.org

একটা ভোঁতা শব্দ হল। তারপর আর-একটা।

প্রথম গুলিটা করেছে চক্রবর্তী। সেটা ওর গায়ে ঠিকরে পড়া মনমোহন আঙ্কিলার শরীরের কোথাও লেগেছে। সুতরাং প্রথম গুলিটা বিজন টের পায়নি।

কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা বিজন টের পেল। ওকে লক্ষ করে গুলি করেছে ইয়াকুব। গুলিটা বিজনের পিঠে এসে ধাক্কা মেরেছে। বিজন অপুর হাততালি শুনতে পাচ্ছিল। মরা ছেলেটা শ্মশানে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো হাততালি দিচ্ছে। তারই মধ্যে নমিতার চিৎকার বিজনের কানে এল।

ওদের তিনজনের জটলার দিকে ইয়াকুবের মনোযোগ এসে পড়েছিল। এবং সে গুলিও ছুড়েছে। আর ওই এক লহমায় অর্জুন থাপার তার দক্ষতা প্রমাণ করল।

ইয়াকুব বোধহয় থাপারকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ফলে এখন তার দাম দিতে হল ওকে। থাপার ওই শোওয়া অবস্থা থেকেই কেমন এক অদ্ভুতভাবে লাথি চালাল। লাথিটা ইয়াকুবের বগলে গিয়ে লাগল। ও টলে যেতেই থাপার ছিটকে উঠে দাঁড়াল। আর-একবার পা চালাল আধপাক ঘুরে। কখন যেন সেই ইস্পাতের ফলাটা ওর হাতে উঠে এসেছিল। সেটা নিয়ে আক্রমণ করতে যেতেই ইয়াকুব এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ল। সাইলেন্সার লাগানো থাকায় ভোতা শব্দ হল কয়েকটা। ঘরের একটা টিউব লাইট ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ভাটনগর ইতিমধ্যে বার্জারসন অটোমেটিকটা বের করে নিয়েছেন পকেট থেকে। উনি কোনদিকে নজর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। পিছন থেকে আবার গুলির শব্দ পেয়ে সেদিকে ঘুরলেন। দেখলেন, বিজন চৌধুরী ও মনমোহন আঙ্কিলার শরীরের নীচ থেকে বরুণ চক্রবর্তী বেরিয়ে আসছে। হাতের পিস্তলটা তখনও শক্ত মুঠোয় ধরা। ভাটনগর তার হাতে গুলি করলেন। পিস্তল-ধরা হাতটা কনুই থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। দুরন্ত শব্দে ফ্ল্যাট গমগম করে উঠল। রক্ত ছিটকে গেল চারদিকে।

বরুণ চক্রবর্তী অবাক হয়ে নিজের আধখানা হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল। যন্ত্রণার চেয়ে বিস্ময়টাই বেশি ফুটে উঠল তার মুখে। কাঁদতে-কাঁদতে সে প্রলাপ বকছিল, 'আমার হাত...আমার হাত...।' তার পিস্তল-ধরা কাটা হাত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল মেঝেতে। মার্কারি বুলেটের ভয়ঙ্কর ধাক্কায় হাতের আহত অংশগুলো খোল-কাটা পাশবালিশের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

ভাটনগর যখন অর্জুনের দিকে ফিরে তাকালেন তখন দেখলেন ইয়াকুবের পেটের কাছে গোটা চারেক টানা লাল দাগ। ওর সাদা জামা বীভৎস দেখাচ্ছে। আর অর্জুনের হাতের ফলা বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছে বারবার। হঠাৎই অর্জুন থাপার ঘুরে গিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি চালাল ইয়াকুবের শিরদাঁড়ায়। ইয়াকুব ছিটকে গেল নমিতার কাছে। নমিতা চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন আর চিৎকারও করতে পারছিল না। ইয়াকুবের রক্তাক্ত শরীরটা ওর পায়ের ওপরে গিয়ে পড়ল। আর তখনই আহত বাঘ ইয়াকুব কোথা থেকে যেন একটা ছোট্ট ছুরি বের করে নমিতার রগের কাছে চেপে ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় গুলি ছুড়লেন ভাটনগর। ঘাড়ের ওপরে ইয়াকুবের মাথাটা পলকে চৌচির তরমুজ হয়ে গেল। ওর কবন্ধ দেহটা টলে পড়ল নমিতার ওপরে। ওরা

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে। একটা টি-টেবল ভেঙে গেল ওদের শরীরের ভারে। নমিতার গায়ের ওপরে লেপটে রইল ইয়াকুবের মৃতদেহ। ওর রক্তে স্নান করতে লাগল নমিতা। কান্না মেশানো আতঙ্কিত স্বরে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। ওর চিৎকার কিছুতেই থামছিল না।

ভাটনগর আর থাপার পেশাদারি ভঙ্গিতে পরিস্থিতির সামাল দিলেন। মনমোহন আহুজা ততক্ষণে উঠে বসেছেন। কাঁপছেন থরথর করে। বরুণ চক্রবর্তী নিজের জামা দিয়ে হাতের কাটা অংশটা চেপে ধরে 'ডাক্তার! ডাক্তার!' করে চেঁচাচ্ছে। আর বিজন চৌধুরী পড়ে আছে উপুড় হয়ে। ওর পিঠ ভিজে গেছে রক্তে।

ভাটনগর থাপারকে বললেন শোওয়ার ঘরে গিয়ে পুলিশে এবং হসপিটালে ফোন করতে। ফ্ল্যাটের দরজায় লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ করে ডাক্তার ডাকতে বললেন ভাটনগর। তারপর নমিতাকে টেনে বের করে একটা সোফায় বসিয়ে দিলেন। আবার দ্রুতপায়ে ফিরে গেলেন বিজনের কাছে। ওর ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর ওকে পাশ ফিরিয়ে শোয়ালেন। দেখে মনে হল, অজ্ঞান হয়ে গেছে। ভাটনগর ভাবলেন, লোকটা কি সত্যি পাগল? নইলে এভাবে কেউ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

ভাটনগর পাগলটাকে দেখছিলেন অপলকে।

হাসপাতালে ঘুমের ইঞ্জেকশন নিয়ে পড়ে থাকা বিজন চৌধুরী স্বপ্ন দেখছিল।

কবিতাকে নিয়ে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিক্টোরিয়ায়, বোটানিকাল গার্ডেনে, এয়ারপোর্টের কাছে কোনও ফাঁকা মাঠে—বিয়ের আগে ঠিক যে-যে জায়গাগুলোয় ওরা ঘুরে বেড়াত। চারদিকে ফুল ফুটেছে। মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাস বইছে ফুরফুর করে।

বিজন আর কবিতা ছুটোছুটি করছিল, আর গোলাপ লুকোচুরি খেলছিল ওদের সঙ্গে। ওরা তিনজনে বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে উঠছিল বারবার। ওদের জামা-কাপড়-শাড়ির আঁচল স্বপ্নের ওড়নার মতো ভাসছিল ওদের ঘিরে। দূরে একটা অচেনা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে মা হাতছানি দিয়ে ডাকছিল বিজনকে। বলছিল, 'আয়, কাছে আয়!' আর একটা জীর্ণ ঘরের খোলা জানলার পাশে বসে বৃদ্ধ বাবা ভাঙা গলায় জিগ্যেস করছিলেন, 'খোকা, তোর কিসের কষ্ট?'

বিজন স্বপ্নের মধ্যেই বলে উঠল, 'আমার কোনও কষ্ট নেই, বাবা। আমার আর কোনও কষ্ট নেই।'

বিজনের নাকে গোলাপের সুবাস আসছিল। স্বপ্নের মধ্যেই গভীর শ্বাস নিল ও।